আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের জীবনবেদ



নন্দলাল মাইতি

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের জীবনবেদ

নন্দলাল মাহাত

জ্ঞান বিচিত্রা প্রকাশনী
১১, জগন্নাথবাড়ি রোড, আগরতলা-৭৯৯ ০০১

harya Prafulla Chander Jīvanved

—Nandalal Maiti

প্রথম প্রকাশ :

আগরতলা বইমেলা, ফেব্রুয়ারি ২০০২

প্রকাশক :

দেবানন্দ দাম

জ্ঞান বিচিত্রা প্রকাশনী

১১, জগন্নাথবাড়ি রোড, আগরতলা-৭৯৯ ০০১

মুদ্রণ :

জ্ঞান বিচিত্রা অফসেট

আগরতলা-৭৯৯ ০০১, ত্রিপুরা

প্রচ্ছদ :

ক্যাপস্ মাইক্রোগ্রাফিক্স

৮/২ কিরণশঙ্কর রায় রোড, কলকাতা-৭০০ ০০১

অক্ষরবিন্যাস :

প্রিন্টিং পাবলিসিটি

১১৭ কেশব চন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৯

কলকাতা অফিস ও বিক্রয়কেন্দ্র :

জ্ঞান বিচিত্রা

১৬ ডঃ কার্তিক বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৯

ফোন : (০৩৩) ৩৬০-৪৯৮১

ISBN : 81-86792-33-3

সার্বিক যোগাযোগ :

জ্ঞান বিচিত্রা কার্যালয়

১১, জগন্নাথবাড়ি রোড, আগরতলা-৭৯৯ ০০১, ত্রিপুরা

ফোন : (০৩৮১) ৩২ ৩৭৮১ / ৩২ ৬৩৪২

মূল্য : ১৭৫ টাকা

দীপঙ্কর-বনশ্রী
পারমিতা-গৌতম
ও
সঙ্ঘমিত্রাকে

ভূমিকা

চরিত-গ্রন্থ রচনায় যে তীক্ষ্ণ বস্তুনিষ্ঠা, তথ্য সংগ্রহে নিপুণতা এবং সঙ্কলিত তথ্যকে বিন্যস্ত করা প্রয়োজন, তা অতীব দুরূহ কাজ। কারণ, তার জন্য প্রয়োজন গভীর অন্তর্দৃষ্টি। আলোচ্য ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের সামগ্রিকতা ও চরিত্র-রহস্য উদঘাটন করা চাই ;এই লক্ষ্যে অবিচল থেকে তথ্যের উপযুক্ত ও যথার্থ বিন্যাসের মাধ্যমে যুগ ও সমাজ পরিবেশের যথাযথ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা চাই। জীবনী গ্রন্থে ব্যক্তিবিশেষের জীবন ও কর্মধারার বর্ণনাই মুখ্য। সেই বর্ণনায় কখনো প্রাধান্য পায় বস্তু কিংবা ভাব জীবন, আবার কখনো উভয়েই।

চরিত-গ্রন্থের এই রূপ বৈশিষ্ট্য অবলম্বনে বাংলা ভাষায় চরিত-গ্রন্থের একান্ত অভাব। অদ্যাবধি যে-সব চরিত-গ্রন্থ দেখা যায়, তা সবই আংশিক ; এতে পূর্ণাঙ্গ জীবন-চিত্র নেই, বহু কাট-ছাঁট হয়েছে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের জীবিতকালেই তাঁর জীবনী 'প্রদীপ' পত্রিকায় প্রকাশিত হতে দেখা যায়। তিনি 'আত্মচরিত' রচনা করেছেন ;তাঁর ছোটবড় জীবনীও লিখিত হয়েছে ;আবার অনেকে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করেছেন, স্মরণিকা রচনা করেছেন। এসব সত্ত্বেও তাঁর পূর্ণাঙ্গ জীবনীর একান্ত অভাব অনুভূত হয়। এই অভাব ও শূন্যতা পূরণের উদ্দেশ্যে 'আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের জীবনবেদ' রচনার ঐকান্তিক প্রয়াস। আচার্যদেবের জীবন যথার্থই 'a career, which is serious, complete and of a certain magnitude, is fit for biographic theme.' তাঁর জীবন প্রগাঢ়, পূর্ণ ও ব্যাপক ; তাঁর চরিত্র ও কীর্তি সমাজের নিম্নস্তর পর্যন্ত আলোড়িত করেছে ;তাঁর প্রভাব বহুজনের ওপর ব্যাপ্ত ও পূর্ণতাপ্রাপ্ত। তাঁর জীবনে এমনই *magnitude* বিদ্যমান যে, মৃত্যুর ষাট বছর পরেও আজও তা সমান প্রাসঙ্গিক। তাঁর জীবনের বহুল বৈচিত্র্য ও বিপুল কর্মধারা বাঙালী জাতির ব্যতিক্রম, অবাক বিস্ময়ের।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র নাইট্রাইট যৌগের মাস্টার, ভারতে রসায়নবিদ্যা চর্চার জনক, স্কুল অফ কেমিস্ট্রীর সৃজনকারী ;শিল্পের প্রতিষ্ঠাতা, ব্যবসা ও বাণিজ্যের সক্রিয় উদ্যোগী ও পৃষ্ঠপোষক। অলস, ভীরু, কেরানীপদলোভী, ডিগ্রীলোলুপ বাঙালীর চেতনা উন্মেষে সদা প্রহরণশীল ; দুর্ভিক্ষ ও বন্যায় দুর্দশাগ্রস্থ ও ক্লিষ্ট জনগণের উদ্ধারকারী ; আর্তের ত্রাণে 'সম্ভবামী যুগে যুগে'।

চিন্তা-ভাবনায় ভারতীয় ও আন্তর্জাতিক। আবার তিনি বাঙালীর আপনজন, এক ব্যতিক্রমী আপনজন। বাঙালীর আর্থিক দুর্দশা, বাঙালীর দৈন্য-দুর্দশা, বাঙালী চরিত্রের দুর্বলতা নিয়ে এমন করে আর কোন মনস্বী কোন দিন দিবারাত্র চিন্তা-ভাবনা করেছেন, তার উদাহরণ নেই। তিনিই একমাত্র বিজ্ঞানী যিনি গবেষণাগারের গজদন্তী মনারে বসে

না থেকে অতিসাধারণ মানুষের পাশে এসে সক্রিয় কর্মোদ্যোগ গ্রহণ করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

একথা আদৌ অতিরঞ্জন নয় যে, প্রাচীন ভারতের ঋষির ন্যায় তাঁর জীবনচর্চা ও চর্যা। আচার্য বিশেষণের বহুল অপব্যবহার হলেও প্রফুল্লচন্দ্র প্রকৃত অর্থে 'আচার্য'। এই গ্রন্থের পাতায় পাতায় তারই বিবরণ, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ ; অতিরঞ্জন নয়, অহেতুক সম্মান ও মর্যাদা প্রদান নয়, বস্তুনিষ্ঠ আলোচনার মধ্য দিয়ে আচার্যের চরিত্র বিশ্লেষণ করে পূর্ণাঙ্গ জীবনী রচনার সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা করা হয়েছে।

বিদ্যাসাগর রসবাজ বলে বহুল পরিচিত। কিন্তু এই দ্বিতীয় বিদ্যাসাগরের রঙ্গ ও রসিকতার পরিচয় প্রদান অন্যত্র বিরল দৃষ্ট ; আচার্যের সেক্সপীয়ার চর্চার কথা শোনা যায় মাত্র, কিন্তু এই গ্রন্থে তার বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। আমাদের অনুমান পাঠককুল আচার্য-জীবনের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় এই গ্রন্থে পাবেন।

দীর্ঘ সময় ধরে নানা তথ্য সংগ্রহ করে অবশেষে এই গ্রন্থ রচনায় হস্তক্ষেপ করেছি। এতে নানাজনের নানা সাহায্য আছে। আমার জামাতা শ্রীমান গৌতম মান্না গ্রন্থ ও তথ্য সংগ্রহে অসামান্য সাহায্য করেছে ; কন্যাদ্বয় পারমিতা ও সঙ্ঘমিত্রা লেখার কাজে সাহায্য করেছে ; স্ত্রী শ্রীমতী সুধার নীরব সাহায্য সদাবর্তমান। এঁরা ধন্যবাদের পাত্র-পাত্রী নয়, এদের স্নেহ ও আশীর্বাদ জানাই।

সর্বোপরি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নের রীডার ডঃ শ্যামল চক্রবর্তীর নিকট আমি অসীম ঋণে আবদ্ধ। তিনি বহু প্রবন্ধের ফটোকপি প্রদান করেছেন, গ্রন্থ সংগ্রহ করে দিয়েছেন ও আলোচনার মাধ্যমে আমার ভাব ও ভাবনাকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁর পরামর্শেই সেক্সপীয়ার অধ্যায়টি যুক্ত করতে পেয়েছি। তাঁকে শ্রদ্ধা ও নমস্কার জানাই।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের জীবনের ঘটনা ও রচনাপঞ্জী সঙ্কলনে শান্তিময় চট্টোপাধ্যায় ও অমিতাভ সেনের গ্রন্থ ও পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা থেকে প্রভূত সাহায্য পেয়েছি। তাঁদের অসংখ্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

জ্ঞান বিচিত্রা প্রকাশনীর কর্ণধার শ্রীদেবানন্দ দামের নিকট আমার ঋণের ও কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। বস্তুতপক্ষে, তাঁর একান্ত আগ্রহেই আমার এই গ্রন্থটি লেখা। তিনি দীর্ঘসময় ধরে অপেক্ষা করে ও তাগিদ দিতে না থাকলে মাঝে মাঝে অসুস্থ হয়ে পড়ার মধ্যেও লেখাটি সমাপ্ত করতে পারতাম কিনা সন্দেহ। তাঁকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। সেই সঙ্গে শ্রীমতী অঞ্জনা দামের গ্রন্থটি প্রকাশে আগ্রহ ও ছাপায় নির্ভুলতা রক্ষার প্রয়াস আমায় মুগ্ধ করেছে। তাঁকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। আর জানাই জ্ঞান বিচিত্রা প্রকাশনীর কর্মীবৃন্দকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ। তাঁদের সক্রিয় সহযোগিতা ব্যতিরেকে এত তাড়াতাড়ি এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হতে পারত না।

চিন্তা-ভাবনা ও পরিকল্পা সত্ত্বেও কোন গ্রন্থ ত্রুটি-বিচ্যুতি মুক্ত—এ নিয়ে কোন গ্রন্থকার গর্ব ও অহঙ্কার করতে পারেন না। তাই এই গ্রন্থটির সার্বিক উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য পাঠক-পাঠিকা ও সমালোচকের গঠনমূলক আলোচনা আহ্বান করি।

নন্দলাল মাইতি

সূচীপত্র

অবতরণিকা

উনবিংশ শতাব্দী। বাংলা তথা ভারতের ইতিহাসে অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যময় অধ্যায়। এই সময় বাংলায় নবজাগরণ বা জাগরণ শুরু হয়। পাশ্চাত্যের রেনেশাঁ অর্থে বাংলায় নবজাগরণ না হলেও একে জাগরণ (awakening) বলা যায়। এই জাগরণের ফলে মধ্যযুগের অন্ধকার ক্রমশ দূরীভূত হতে থাকে ;বাঙালী আধুনিক যুগের অরুণোদয়ে স্নাত হতে থাকে। ধর্ম ও সমাজ সংস্কার, কুপ্রথা ও কুসংস্কার বিলোপে আন্দোলন, রাজনৈতিক অধিকার ও দেশাত্মবোধ, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ ও অনুসন্ধিৎসা ইত্যাদি এই শতাব্দীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্ব বলে গণ্য করা যায়। এই শতাব্দীর প্রথম দু-দশকের মধ্যেই প্রথাবদ্ধ সংস্কৃত ও আরবী-ফার্সী ভাষায় শিক্ষার পরিবর্তে মাতৃভাষা ও ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের অধিকার লাভের গুরুত্ব উপলব্ধ হতে থাকে। প্রতিষ্ঠিত হয় 'স্কুল বুক সোসাইটি' (1817), 'স্কুল সোসাইটি' (1818) ও 'হিন্দু কলেজ' (1817)। বাংলা তথা ভারতের নবজাগরণে হিন্দু কলেজ অসামান্য ভূমিকা পালন করে। এই কলেজের গুরুত্ব ও সুদূরপ্রসারী তাৎপর্যের কথা বলতে গিয়ে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক শশিভূষণ চৌধুরী লিখেছেন,—"... the Hindu College and Western Learning became the fountain of all the rising forces in Bengal—political, intellectual, social, religious and economic. Beginning with Raja Rammohan Roy, the period from 1817 to 1857 witnessed the activities of many eminent Bengalees, social reformers, political leaders, poets, historians, journalists and business magnates."[1]

রাজা রামমোহন রায় (1772?–1833) এই যুগের অন্যতম প্রধান প্রাণপুরুষ। ধর্ম, সমাজ সংস্কার, রাজনীতি, ইংরেজী শিক্ষা ইত্যাদি প্রায় সব প্রগতিশীল ও অগ্রণী চিন্তা-ভাবনা ও আন্দোলনের সহিত তাঁর প্রত্যক্ষ সংযোগ ও কর্মতৎপরতা অন্বিষ্ট ছিল। এখানে প্রথাবদ্ধ সংস্কৃত ও আরবী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষার পরিবর্তে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান অনুশীলনের জন্য আমহার্স্টকে (1823) লিখিত পত্রটি অবশ্যই স্মরণযোগ্য। ওই পত্রে তিনি গণিত, প্রকৃতি দর্শন, রসায়ন, শারীরস্থান ও অন্যান্য ব্যবহারিক বিজ্ঞানানুশীলন উপযুক্ত পুস্তক ও যন্ত্রপাতিসহযোগে প্রবর্তন করার সুপারিশ করেন। সংস্কৃতে অসামান্য অধিকার ও পান্ডিত্য নিয়ে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজে পাঠ্যসূচীর পরিবর্তন ঘটিয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের দ্বার উন্মুক্ত করলেন। অধ্যক্ষ গৌরীনাথ শাস্ত্রী এই প্রসঙ্গে লিখেছেন,—"প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনতীর্থ-রূপে সংস্কৃত কলেজ আত্মপ্রকাশ করে পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অধ্যক্ষকতায়।"[2]

---

1. *Renascent Bengal, p-10.*
2. সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস, ভূমিকা—৯

রামমোহন কর্তৃক প্রজ্বলিত জাগরণের মশাল নিয়ে এগিয়ে চললেন দেবন্দ্রনাথ (1817-1905), বিদ্যাসাগর (1820-1891), রাজেন্দ্রলাল (1822-1891), মধুসূদন (1824-1874), বঙ্কিমচন্দ্র (1833-1894), মহেন্দ্রলাল (1833-1904), রামকৃষ্ণ (1836-1886), কেশবচন্দ্র (1838-1884), বিবেকানন্দ (1863-1904) প্রমুখ বরণীয় ও স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। এই জাগরণ কেবল বাংলায় সীমাবদ্ধ ছিল না, সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ল। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের উর্বর ভূমিতে যে চারাগাছ রোপিত হলো, দ্বিতীয়ার্ধে তা-ই ফুল ও ফলে শোভিত হয়ে বিরাজ করার অনুকূল পরিবেশ পেল। সিপাহী বিদ্রোহ (1857) বাঙালীর সমর্থন না পেলেও ছদ্মবেশে আশীর্বাদ বহন করে আনল। দেশ ও জাতির এই জাগরণের সন্ধিক্ষণে আবির্ভূত হলেন জগদীশচন্দ্র (1858-1937), রবীন্দ্রনাথ (1861-1941), প্রফুল্লচন্দ্র (1861-1944) প্রমুখ অনন্যপ্রতিভাধর ব্যক্তিত্ব যাঁরা ভারতকে জগৎসভায় সম্মান ও মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করলেন। অনেক দিন পরে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর জীবনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও স্বপ্নের কথা বলতে গিয়ে স্মৃতিচারণায় লিখেছেন,—"More than forty years ago, while a student at Edinburgt I almost dreamt, a dream that, God willing, a time would come when modern India would also be in a position to contribute her quota to the world's stock of scientific knowledge, and it has been my good fortune to see my dream materilise."[3]

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতে বিজ্ঞানচর্চা

পলাশী যুদ্ধের পর থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত এদেশে বিজ্ঞান চর্চার কোন সূত্রপাত দেখা যায় না। ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আমলে এই দেশ কেবল লুণ্ঠিত ও শোষিত হয়েছে। আচার্যদেব স্বয়ং তাঁর ছাত্রাবস্থায় লিখিত *India before and after the Mutiny* পুস্তিকার ভূমিকায় লিখেছেন,—"The lamentable condition of India at present is due to England's culpable neglect of, and gross apathy to, the affairs of that Empire. England has hitherto failed–grievously failed–in the discharge of her sacred duties to India." বস্তুতপক্ষে, কোম্পানী সচেতন হয়ে ইচ্ছাকৃতভাবেই ভারতের প্রতি তাদের কর্তব্য সম্পাদন করেনি ; শোষণ ও লুণ্ঠনের স্বার্থে কোম্পানী আমলে বিলেত থেকে বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ আমদানী করা হয়েছে। প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদ, খনিজ সম্পদ লুণ্ঠনের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হলো 'রয়্যাল বোটানিক্যাল গার্ডেন' (Royal Botanical Gardens, 1787), মাদ্রাজে (বর্তমানে চেন্নাই) 'মানমন্দির' (Observatory, 1792), 'সার্ভে স্কুল' (Survey School, 1794) ও 'ট্রিকোণোমেট্রিক্যাল সার্ভে' (Trigonometrical Survey, 1800)। কয়েকজন বিজ্ঞানী এলেন এদেশে ; কিন্তু এদেশে বিজ্ঞান শিক্ষা ও চর্চা করার সূত্রপাত করানোর জন্য নয়। তাঁরা এলেন তাঁদের ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য—তাঁদের কাজের অর্থাৎ গবেষণার স্বার্থে। এই প্রসঙ্গে বি.ভি. সুব্বারায়াপ্পার মন্তব্যটি উল্লেখ্য : "Historically, it is interesting to note that in the latter

3. 'Acharya Ray and Chemical Research in Modern India', *JICS*, 38, No. 8. 1961, p. 429

half of the eighteenth century, the biological explorations stimulated interest in the natural history of even far off land such as India, Australia, Antartica and the Malayan Archipelago. In addition, the commercial important plants and minerals of the new lands held out great promise for the European trading companies which in their own interest encouraged systematic investigations. The European naturalists, too, were eager to add to their knowledge of botany, zoology and geology by visiting the new countries concerned."[4] প্রখ্যাত উইলিয়াম ল্যাম্বটন (Willium Lambton), জর্জ এভারেস্ট (George Everest), হেনরী ভয়েসি (Henryl Voysey) এদেশে এলেন, কিছু কাজও করলেন। কিন্তু তাঁদের কাজকর্ম এদেশে বিন্দুমাত্র প্রভাব বিস্তার করল না, লেশমাত্র অভিঘাত সৃষ্টি করল না। অবশ্য হিন্দু কলেজের এক উজ্জ্বল ছাত্র রাধানাথ শিকদার (1813-1870) 'গ্রেট ট্রিকোণোমেট্রিক্যাল সার্ভে'-তে কর্মরত অবস্থায় *Auxi Tables* প্রস্তুত করলেন যার সাহায্যে এভারেস্ট 'এভারেস্ট' হলেন, কিন্তু শিকদার অনুচ্চারিত থেকে গেলেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো স্যার উইলিয়াম জোন্স কর্তৃক 'এশিয়াটিক সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা (1784)। এই সোসাইটি প্রথম দিকে কেবল ইউরোপীয় বিদ্বানদের দ্বারা পরিচালিত হতো। সোসাইটির জার্নাল ছিল : প্রথম দিকে *Asiatic Researches* ও *Gleanings in Science* নামে প্রকাশিত হতো, পরে 1832 সাল থেকে *Journal of Asiatic Society of Bengal* নামে প্রকাশিত হতে থাকে। ভারততত্ত্ব ও বিজ্ঞান বিষয়ে নানা প্রবন্ধ এই জার্নালে প্রকাশিত হতে দেখা যায়।

বিজ্ঞানের প্রচার ও প্রসারে মিশনারী, প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন পত্রপত্রিকা

শ্রীরামপুরের মিশনারীদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল 'যিশু ভজনা' করানো। এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের অন্তরালেই তাঁরা জ্ঞান ও বিজ্ঞানের প্রচার ও প্রসার ঘটিয়েছেন। ভেবেছিলেন, পাশ্চাত্য জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সংস্পর্শে এলে এদেশের ছেলে-বুড়োরা নিকৃষ্ট হিন্দুধর্ম জীর্ণ বস্ত্রের মত পরিত্যাগ করে খ্রীস্টধর্মের কোট-বুট-হ্যাট পরিধান করবে। কিন্তু তা হয়নি। যিশু-ভজনা না করে বাঙালী তাঁদের প্রচারিত জ্ঞান ও বিজ্ঞানে নিবিষ্ট হবার প্রয়াস পেয়েছে। মিশনারীদের এই অবদান অবশ্যই স্বীকার্য। বাঙালী পড়তে লাগল ফেলিক্স কেরীর 'বিদ্যাহারাবলী' (1819), ইয়েটসের 'পদার্থবিদ্যাসার' (1834), জন ম্যাকের 'কিমিয়া বিদ্যার সার' (1834)। বাংলা ভাষায় প্রথম অঙ্কের বই 'অঙ্ক পুস্তকং' রবার্ট মে কর্তৃক লিখিত হয়ে প্রকাশিত হলো। অতঃপর হার্লের 'গণিতাঙ্ক', হলধর সেনের 'বাংলা অঙ্ক পুস্তক' প্রকাশিত হয়। 1840 সালের মধ্যে আর একটি অঙ্কের বই 'শিশুসেবধি গাণিতাঙ্ক' প্রকাশিত হয়। ভূগোল ও জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ে গ্রন্থও প্রকাশিত হতে থাকল। বাঙালীর বিজ্ঞানে ক্রমশ আগ্রহ বৃদ্ধি পেতে থাকল। কেবল শ্রীরামপুর মিশনারীগণ, স্কুল বুক সোসাইটি, হিন্দু কলেজই নয়, এগিয়ে এলেন

---

4. *A Concise History of Science in India*, INSA, p.489

ভূদেবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, রাজেন্দ্রলাল, কৃষ্ণমোহন প্রমুখ শিক্ষাবিদ ও মনীষীরা। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বিজ্ঞান-ভাবনা বিজ্ঞানের তথ্যাদি প্রকাশিত হতে থাকল : 'দিগ্দর্শন' (1818), 'সমাচার দর্পণ' (1818), 'পশ্বাবলী' (1828), 'জ্ঞানান্বেষণ' (1831), 'জ্ঞানোদয়' (1831), 'বিজ্ঞানসেবধি' (1832), 'বিজ্ঞান সার সংগ্রহ' (1833), 'বিদ্যাদর্শন' (1842), 'তত্ত্ববোধিনী' (1843), 'বিদ্যাকল্পদ্রুম' (1846), 'বিবিধার্থসংগ্রহ' (1851) ইত্যাদি বাঙালীকে ধীরে ধীরে বিজ্ঞানমনস্ক করে তুলল। বাঙালীর বিজ্ঞান-ক্ষুধার উদ্রেগ হলো বটে, কিন্তু তা নিবারণের উপায় তখন ছিল না। অবশ্য ছিল না বললে সত্যের অপলাপ হয় ; তখন বিজ্ঞানানুশীলনের একমাত্র প্রতিষ্ঠান ছিল 'মেডিক্যাল কলেজ' (1835)।

লর্ড মেকলে (Macaulay) 1833 সালে এদেশের ভবিষ্যৎ শিক্ষানীতি সম্পর্কে তাঁর বিখ্যাত ও বিতর্কিত প্রতিবেদন (minute) পেশ করলেন। সব বিতর্ক ও বিতন্ডার অবসান হলো। সংস্কৃত-আরবী-ফার্সী ভাষায় প্রথাবদ্ধ শিক্ষার পরিবর্তে ইংরেজী ভাষায় পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের পঠন-পাঠনের জন্য শিক্ষাখাতে টাকা খরচের নীতি গৃহীত হলো। 1848 সালে লর্ড ডালহাউসি (Dalhouse) কলকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই-এ প্রেসিডেন্সী কলেজ খোলার পরিকল্পনা করলেন। মেকলের প্রতিবেদনের পর আটত্রিশ বছর পরে কলকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজ চালু হলো। অবশ্য তার আগে 1857 সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়।

1873 সালের আগে এ দেশে বিজ্ঞান শিক্ষার একমাত্র সুযোগ-সুবিধা মেডিক্যাল কলেজে সীমাবদ্ধ ছিল। সেইজন্য মহেন্দ্রলাল সরকার হিন্দু কলেজের পাঠ অসমাপ্ত রেখেই বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য এই কলেজে যোগদান করেন। দেশের উন্নতি ও সমৃদ্ধি যে বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণার মাধ্যমে সম্ভব, তা রামমোহন-বিদ্যাসাগর প্রমুখের পর মহেন্দ্রলাল সম্যক উপলব্ধি করেছিলেন। বিজ্ঞানসভার খসড়া পরিকল্পনায় মহেন্দ্রলাল লিখলেন,—"এই সমিতির উদ্দেশ্য হবে সারা ভারতবর্ষের অধিবাসীরা মৌলিক গবেষণার দ্বারা বিজ্ঞানের সমস্ত বিভাগে অগ্রগতি সাধন করতে পারে এবং (এর স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবে) শিল্পে ও জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য-বিধানে সেই বিজ্ঞানের প্রয়োগ ঘটাতে পারে।"[5] প্রায় অসম্ভবকে সম্ভব করে তুললেন মহেন্দ্রলাল। প্রতিষ্ঠিত হলো 'দি ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অফ সায়েন্স' (*The Indian Association for the Cultivation of Science*, 1876)। এখানে গবেষণা করেই সি. ভি. রমন নোবেল পুরস্কার লাভ করেছিলেন,—একথা কখনোই ভুললে চলবে না।

অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীতে এদেশে রসায়ন চর্চা

অতীত ভারতের রসায়ন চর্চার উন্নতি ও সমৃদ্ধি শ্রুতি-স্মৃতির অপব্যাখ্যায়, আর্থ-সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনে বিস্মৃতির অতল গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের যুগে ভারতে তখন চলছে মুঘল শাসন। এই সময় কাব্য ও ইতিহাস

---

5. *বিজ্ঞানাচার্য ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার*, পৃ—৩৮

লেখা হয়েছে ভূরিভূরি, কিন্তু কারিগরি, হস্তশিল্প, কৃষি বিষয়ক কোন গ্রন্থাদি লেখা হয়নি।[6] এ-বিষয়ে সামান্য মতভেদ থাকলেও সামগ্রিকভাবে ওই সময়ে বিজ্ঞান চর্চায় ভারতের চিত্রটি আদৌ আশাপ্রদ নয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে 'এশিয়াটিক সোসাইটি'-র ন্যায় প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হলেও শত বৎসরে সোসাইটির জার্নালে মাত্র 24টি রসায়ন বিষয়ক পত্র প্রকাশিত হতে দেখা যায়।[7] এতে রসায়নের প্রকৃত গুরুত্ব আরোপিত হয়নি ; গঙ্গার কর্দমাক্ত জল নিয়ে অতি মামুলি ধরনের চর্চা মাত্র। জন ম্যাকের 'কিমিয়া বিদ্যার সার' (1834) প্রকাশ ও এশিয়াটিক সোসাইটিতে রসায়ন বিষয়ক তাঁর ভাষণের প্রায় পঞ্চাশ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর বাঙলায় রসায়ন পাঠের আগ্রহ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই আগ্রহ ও জিজ্ঞাসা মূলত তিনটি সূত্রকে অবলম্বন করে : (i) মেডিক্যাল কলেজে বাংলায় রসায়ন পাঠের ব্যবস্থা, (ii) মাইনর ও ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষাতে এই বিষয়ের অন্তর্ভুক্তি এবং (iii) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ. পরীক্ষায় রসায়নের অন্তর্ভুক্তি। অবশ্যই আই. এ. সি. এস.-র (IACS) ভূমিকা এখানে উল্লেখযোগ্য। কারণ, এখানে রসায়নের জনপ্রিয় বক্তৃতামালার আয়োজন করে সার্বিকভাবে বিজ্ঞানে আগ্রহ ও উৎসাহ বৃদ্ধির আন্তরিক প্রচেষ্টা চলেছিল। এইসব কারণে বাংলা ভাষায় রসায়ন গ্রন্থ প্রকাশিত হতে থাকল। গোপাললাল মিত্র ও ভুবনমোহন মিত্রের 'কৌতুকতরঙ্গিনী' (দ্বিতীয় সংস্করণ, 1852) ও মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের 'রসায়ন' (1875) প্রকাশিত হলো। স্যার রিচার্ড টেম্পল (Sir Richard Temple) রস্কোর (Roscoe, H. E.) 'রসায়ন সূত্র' (1875) অনুবাদ করলেন। প্রখ্যাত কানাইলাল দে সঙ্কলন করলেন 'রসায়ন বিজ্ঞান' (দ্বিতীয় সংস্করণ, 1877)। প্রকাশিত হলো বিপিনবিহারী দাসের 'রসায়নের উপক্রমণিকা' (1877), রাজকৃষ্ণ রায়চৌধুরীর 'সচিত্র রসায়ন শিক্ষা' (1877), যাদবচন্দ্র বসুর 'রসায়ন' (1878) ইত্যদি। আই. এ. সি. এস-এর রসায়নের পঠন-পাঠনে এগিয়ে এলেন সে-যুগের প্রখ্যাত শিক্ষকগণ। এগিয়ে এলেন কানাইলাল দে, তারাপ্রসন্ন রায়, রামচন্দ্র দত্ত, রজনীকান্ত সেন, চুনিলাল বসু প্রমুখ। "তারাপ্রসন্ন রায় মোটামুটি প্রাথমিক স্তরের অজৈব রসায়ন পড়াতেন। যেমন রাসায়নিক বল, পদার্থের রাসায়নিক গঠন, অধাতু ও ধাতু, এবং শিল্পকর্মে কাচ, চীনা মাটির জিনিসপত্র, সাবান ইত্যাদির প্রস্তুতিবিধি। রসায়নের প্রাকটিক্যাল ক্লাসে তিনি প্রশিক্ষণ দিতেন কিভাবে রাসায়নিক যন্ত্রপাতি সাজাতে ও ব্যবহার করতে হয় এবং কেমন করে অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, নাইট্রিক অ্যাসিড, ক্লোরিন, অ্যামোনিয়া, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, সালফিউরিক অ্যাসিড, মার্শগ্যাস ইত্যাদি লেবরেটরীতে তৈরি করা যায় এবং তাদের চেনবার উপায় কি। রামচন্দ্র দত্ত অজৈব রসায়নে ঐ একই ধরনের বিষয়গুলি পড়াতেন, তবে তিনি জোর দিয়েছিলেন জৈব রসায়নের উপর। চুনীলাল বসু প্রবর্তন করেন ভৌতিক রসায়নের পাঠ। শিল্পসম্পর্কিত রসায়নেও তাঁর প্রচুর উৎসাহ ছিল। বিভিন্ন রাসায়নিক শিল্পে রাসায়নিক বিশ্লেষণের কাজ

6. Irfan Habib, 'Capacity of Technological change in Mughal India' in ***Technology in Ancient and Medieval India***, pp. 1-14

7. *Centenary Review of the Asiatic Society of Bengal*, (1784-1883), pt. III, 1986.

অপরিহার্য,—যেমন কাগজ প্রস্তুতের কারখানায়, লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে, সাবান ও ওষুধ তৈরির কারখানায় ইত্যাদি। শিল্পকর্মে রাসায়নিক বিশ্লেষণের কাজ শেখাবার জন্য বিজ্ঞান-সভায় তিনি বিশেষ ধরনের একটি অ্যানালিটিক্যাল ক্লাস খোলবার ব্যবস্থা করেছিলেন।"[৪] মহেন্দ্রলাল পরিকল্পিত এই অনন্য প্রচেষ্টা দীর্ঘস্থায়ী না হলেও বাঙলার সমাজ ও ছাত্রজীবনে এর অভিঘাত বৃথা যায়নি। তলে তলে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি আকর্ষণ অনুভব করতে থাকে ছাত্রসমাজ।

ভারতে রসায়নের জনকের আবির্ভাব

এ হেন আর্থ-সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও বিজ্ঞান পরিমন্ডলে প্রফুল্লচন্দ্রের জন্ম 2রা আগস্ট 1861 সালে। কাকতালীয় হলেও এই একই বছরে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ও প্রখ্যাত ডাঃ নীলরতন সরকার জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র কয়েক বছর আগে (1858) জন্মগ্রহণ করেন জগদীশচন্দ্র বসু। 'আত্মচরিত'-এ প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর জন্ম সালটি একটি ঐতিহাসিক ঘটনার সঙ্গে যুক্ত করে বলেন, "এই বৎসরটি রসায়নশাস্ত্রের ইতিহাসে স্মরণীয়, কেননা ঐ বৎসরেই ক্রুক্স 'থ্যালিয়াম' আবিষ্কার করেন।"[৫] এই মৌলটির বর্ণালীর রঙ সবুজ। পরবর্তীকালে প্রফুল্লচন্দ্রের রসায়ন বিজ্ঞানী হওয়ার 'সবুজ সঙ্কেত' এই মৌলের আবিষ্কারের মধ্যে নিহিত ছিল বলে তাঁর কৌতুককর উল্লেখ। আমাদের মনে হয়, এই উল্লেখ নিছক 'হিউমার' বলেই গ্রহণ করা উচিত।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের দেশাত্মবোধ, স্বদেশপ্রতি, আর্থ-সামাজিক চিন্তা-ভাবনা, রাজনৈতিক ভাবনা, জনহিতকর কার্য ও জনসেবা, শিল্পোদ্যোগ, দানশীলতা, ছাত্রবাৎসল্য, সাহিত্যপ্রীতি, নিজস্ব আবিষ্কার ও গবেষণা, সর্বোপরি রসায়নবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি ক্ষেত্রে তাঁর সহজ ও অবাধ বিচরণ ও উপস্থিতি আমাদের যুগপৎ বিস্ময়, গর্ব ও অহঙ্কার জাগরিত করে। 'মাস্টার অফ্ নাইট্রাইটস' বা রসায়নাচার্য তাঁর উপযুক্ত বিশেষণ নয় ;তিনি আচার্য, ফলাকাঙ্খাহীন প্রাচীন ভারতের মর্যাদাজ্ঞাপক ঋষি শিক্ষক—আচার্য।

---

৪. *বিজ্ঞানাচার্য ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার*, পৃ—৬৯-৭০

৫. *আত্মচরিত*, পৃ—১

প্রথম অধ্যায়

বংশ পরিচয়

সম্ভ্রান্ত ও অভিজাত এক ঐতিহ্যিক পরিবারে জন্ম প্রফুল্লচন্দ্রের। বংশপঞ্জীতে এই পরিবারের সাত-আট পুরুষের নাম জানা যায়। প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর বংশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা করে বলেছেন,—" 'বোধখানার' রায়চৌধুরী বংশ চিরদিনই ঐশ্বর্যশালী, উৎসাহী এবং কর্মকুশল বলিয়া পরিচিত। এই বংশের অনেকে নবাব সরকারের উচ্চপদ লাভ করেন এবং যশোহরের নূতন আবাদী অঞ্চলে অনেক ভূসম্পত্তি ও জায়গির পান।"[1] প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর বংশের ইতিহাস বিস্তারিতভাবে আলোচনা না করে সতীশচন্দ্র মিত্রের 'যশোহর-খুলনার ইতিহাস' পাঠের নির্দেশ করেছেন। এই বংশের প্রাচীন বৃত্তান্ত থেকে জানা যায় যে, নবাবী আমালে "কাঁকর খাসনবিস, গদাইপুরের কাজি ও মলুই-এর চৌধুরী" এই তিনটি পরিবার এদেশে আসেন। পুরাইকাটি গদাইপুর থেকে চৌধুরীদের তিন ভাই কমল, রঘুনন্দন ও শ্রীহরি উঠে এলেন। কমল বসতি স্থাপন করলেন হরিঢালি গ্রামে ;আর রঘুনন্দন ও শ্রীহরি বাস করলেন রাঢ়ুলিতে। রামপ্রসাদ রায় সিরাজদৌল্লার আমলে এদেশে এলেন। শিবচন্দ্র নামে এই বংশের একজন নবাবদের কাছ থেকে মলুই নামে এক বিস্তৃর্ণ পরগণা বন্দোবস্ত নেন। 1399 খ্রীস্টাব্দে রঘুনন্দনের ভাই কমল ও গোপী আর্থিক অবস্থার বিপর্যয়ে চাঁচরার রাজা মনোহর রায়ের নিকট ভূসম্পত্তি বিক্রয় করেন।[2] এই বংশের শ্রীরামের পুত্র রাম-গোপাল হলেন রাঢ়ুলির রায়চৌধুরী পরিবারের আদি পুরুষ।

বংশপঞ্জী

- রঘুনন্দন
  - রামকৃষ্ণ
    - রামপ্রসাদ
      - শিবচন্দ্র
      - শুকদেব
      - দয়ারাম
        - মানিকলাল
          - আনন্দলাল
            - হরিশ্চন্দ্র
              - জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র
              - নলিনীকান্ত
              - প্রফুল্লচন্দ্র
              - পূর্ণচন্দ্র
              - বুদ্ধদেব*
              - ইন্দুমতী
              - বেলামতী*
        - বৈকুণ্ঠনাথ
      - চন্দ্রশেখর

1. *আত্মচরিত,* পৃ—২
2. *Birth Centenary Souvenir Volume* (অতঃপর *Prafulla Chandra Ray*), C.U. 1962, p.238

* বুদ্ধদেব ও বেলামতীর অকালে মৃত্যুর হয়।

প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর 'আত্মচরিত'-এ প্রপিতামহ মানিকলাল, পিতামহ আনন্দলাল ও পিতা হরিশ্চন্দ্রের পরিচয় বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তাঁর আরো উর্ধ্বতন পুরুষের বিবরণ দেননি। প্রপিতামহ মানিকলালের বর্ণনা করে বলেছেন,—"এক শতাব্দী পূর্বে আমার প্রপিতামহ মানিকলাল রায় কৃষ্ণনগরের কালেক্টরের এবং পরে যশোহরের কালেক্টরের দেওয়ান ছিলেন। এই পদে তিনি যে প্রভূত ধন সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমার বাল্যকালে তাঁহার সঞ্চিত ধনের অদ্ভুত গল্প শুনিতাম। তিনি মাঝে মাঝে মাটির হাঁড়ি ভরিয়া কোম্পানির 'সিক্কা টাকা' বাড়ীতে পাঠাইতেন। বিশ্বস্ত বাহকেরা বাঁশের দুইধারে ভার ঝুলাইয়া অর্থাৎ বাঁকে করিয়া এই সমস্ত টাকা লইয়া যাইত। .... ডাকাতদের সন্দেহ দূর করিবার জন্য মাটির হাঁড়ির নীচে টাকা ভর্তি করিয়া উপরে বাতাসা দিয়া ঢাকিয়া দেওয়া হইত।

"আমার প্রপিতামহ বিপুল ঐশ্বর্য সঞ্চয় করিয়াছিলেন। ১৮০০ খ্রীস্টাব্দে তিনি যে ভূসম্পত্তি ক্রয় করেন, তাহা তাঁহার ঐশ্বর্যের কিয়দংশ মাত্র।"[3] প্রফুল্লচন্দ্রের পিতামহ আনন্দলালও যশোহরের সেরেস্তদার হিসাবে ধন উপার্জন করেন, এবং পৈতৃক সম্পত্তির বৃদ্ধি ঘটান। সন্ন্যাস রোগে যশোহরে আনন্দলালের মৃত্যু হয়।

পিতামাতা

রাড়ুলি গ্রামের হরিশ্চন্দ্র রায়চৌধুরী প্রফুল্লচন্দ্রের পিতা, আর মাতা হলেন ভুবনমোহিনী। রাড়ুলির পাশের গ্রাম কাটিপাড়ায় ছিল মাইকেল মধুসূদনের মাতুলালয়। এই দুটি গ্রাম একত্রে রাড়ুলি-কাটিপাড়া বলে উচ্চারিত হতো। ভুবনমোহিনী ছিলেন ভাড়া সিমালা গ্রামের নবকৃষ্ণ বসুর কন্যা। অসামান্য গুণবতী, কোমল হৃদয় ও উন্নত মনের অধিকারিণী ছিলেন ভুবনমোহিনী। স্বয়ং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ছাত্রী হবার সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল।

হরিশ্চন্দ্রের (1826-1895) লেখাপড়া কৃষ্ণনগর কলেজে। এখানে তিনি 1846 সাল পর্যন্ত লেখাপড়া করেন। প্রখ্যাত রামতনু লাহিড়ীর নিকট বাংলা ও সংস্কৃত এবং ডি. এল. রিচার্ডসনের কাছে ইংরেজী শেখেন। কিন্তু পিতা আনন্দলালের নির্দেশে তাঁকে পড়াশোনা ত্যাগ করে ভূসম্পত্তি দেখাশোনার জন্য 1850 সাল থেকে রাড়ুলিতেই অবস্থান করতে হয়। ভাষা শিক্ষার ব্যাপারে হরিশ্চন্দ্রের সহজাত প্রবৃত্তি ছিল। দুর্গাপুরের শেখ মাদার বক্স আখুঞ্জীর নিকট ফারসী এবং সাগরদাঁড়ির মৌলবী মঘমনের নিকট আরবী ভাষা শেখেন। অন্ততপক্ষে সাতটি ভাষা জানতেন হরিশ্চন্দ্র,—বাংলা, ইংরেজী, হিন্দী, সংস্কৃত, আরবী, ফারসী ও উর্দু। গ্রামে বাস করতেন বটে, কিন্তু তাঁর লাইব্রেরী ছিল খুবই উন্নত ও ঈর্ষণীয়।

ইংরেজী সাহিত্যে হরিশ্চন্দ্রের দখল কম ছিল না। প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর বাল্যকালে পিতার কাছ থেকেই ইয়ং-এর *Night Thoughts* ও বেকনের *Novum Organum* গ্রন্থের নাম শোনেন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাতেও তাঁর লাইব্রেরী সমৃদ্ধ ছিল। অক্ষয়কুমার দত্তের

3. *আত্মচরিত, পৃ—৪-৫*

'তত্ত্ববোধিনী', রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'বিবিধার্থসংগ্রহ', 'অমৃত-প্রবাহিনী', 'সোমপ্রকাশ', 'হিন্দুপত্রিকা', 'অমৃতবাজার পত্রিকা' প্রভৃতির গ্রাহক ছিলেন। তাঁর লাইব্রেরীতে ছিল কেরীর হোলী বাইবেলের অনুবাদ, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'প্রবোধচন্দ্রিকা' ও 'রাজাবলী', ল'সনের 'পশ্বাবলী' ও কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'এনসাইক্লোপিডিয়া বেঙ্গলেনসিস'।



পিতৃগৃহের অন্তর্ভাগ

কেবল হরিশ্চন্দ্রেরই যে গ্রন্থ-প্রীতি ছিল তা নয়, তাঁর পিতামহ মানিকলালেরও এই অভ্যাস ও প্রীতি ছিল। মানিকলাল শ্রীরামপুর মিশনারীদের দ্বারা প্রকাশিত 'সমাচার দর্পণ'-এর গ্রাহক ছিলেন।

হরিশ্চন্দ্র সঙ্গীতরসিক ছিলেন। বেহালা বাদনে তাঁর পটুত্ব ছিল। কণ্ঠসঙ্গীতেও তাঁর অনুরাগের কথা জানা যায়। বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর সহিত তাঁর যোগাযোগ ছিল। প্রতি সন্ধ্যায় গানের জলসা বসিয়ে তিনি সঙ্গীতের মধ্যে অপার আনন্দ আস্বাদন করতেন। তা ছাড়া স্থাপত্যেও তাঁর অনুরাগ দেখা যায়।

ভূসম্পত্তি দেখাশোনা করার মধ্য দিয়ে অর্থনীতির মূলসূত্রটি তাঁর আয়ত্তে ছিল। তাঁর পিতা ভুবনমোহিনীকে দশ হাজার টাকার গহনা উপহার দেন। এই অলঙ্কার বিক্রি করে তিনি স্ত্রীর নামে ভূসম্পত্তি ক্রয় করে অর্থ উপার্জনের ক্ষেত্র প্রসারিত করেন। তা ছাড়া তাঁর নগদ টাকা-কড়িও কম ছিলনা। নিজের বাড়ীতে তিনি একটি গ্রামীণ ব্যাঙ্ক স্থাপন করেন ও সাধারণ মানুষের টাকা গচ্ছিত রেখে অর্থ উপার্জন করার দিকে মনোযোগ দেন। তাঁর ভূসম্পত্তির আয় ছিল বার্ষিক ছ'হাজার টাকা, কিন্তু লগ্নী কারবার থেকে উপার্জন যুক্ত করে তাঁর বার্ষিক আয় দশ হাজার টাকায় পৌঁছেছিল।

বস্তুতপক্ষে, সে-যুগে এই আয়ের ফলে তিনি রাজার হালে জীবনযাপন করতেন। প্রফুল্লচন্দ্র লিখেছেন,—"আমার পিতা অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরাজ স্কোয়ারদের মত বেশ সচ্ছলতা ও জাঁকজমকের সঙ্গে বাস করিতে পারিতেন।"[4]

সে-যুগের জমিদার, তালুকদারদের মত বিলাস-ব্যসন, আমোদ-প্রমোদ ও পানভোজনে মত্ত ছিলেন না হরিশ্চন্দ্র। বাংলার নবজাগরণের সুর তাঁর তন্ত্রীতে মন্ত্রিত হয়ে উঠেছিল। বস্তুতপক্ষে, ডিগ্রীধারী না হয়েও তিনি সেকালের প্রেক্ষিতে যথেষ্ট শিক্ষিত ও রুচিসম্পন্ন ছিলেন। কলকাতার সঙ্গেই তাঁর বেশী সংযোগ ছিল এবং তিনি ওই শহরের শিক্ষিত সমাজের সঙ্গে মিশতেন। বিদ্যাসাগর, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, দিগম্বর মিত্র, কৃষ্ণদাস পাল প্রমুখের সহিত তাঁর অন্তরঙ্গ পরিচয় ছিল। প্রফুল্লচন্দ্র পিতার পরিচয় প্রদানে লিখেছেন,—"তিনি 'নব্য বাঙ্গলার' ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। সুতরাং, নিজের জেলায় শিক্ষা বিস্তারে তিনি একজন অগ্রণী ব্যক্তি ছিলেন। রাড়ুলিতে তিনিই বলিতে গেলে প্রথম বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ইহার পার্শ্বে একটি মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ও স্থাপিত হয়। ৭৫ বৎসর পূর্বে এসব বিদ্যালয় বাংলার অধিকাংশ স্থানেই বিরল ছিল এবং গ্রামের গৌরবস্বরূপ বলিয়া গণ্য হইত।"[5] শিক্ষাবিস্তারে অগ্রণী ভূমিকা, বিধবা বিবাহ সমর্থনে প্রগতিশীল ভাবনা, বেথুনের পূর্বেই স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে সক্রিয় ভূমিকা পালন ইত্যাদির মধ্য দিয়ে হরিশ্চন্দ্র উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের এক নীরব কুশীলব, —একথা স্বীকার না করে পারা যায় না।

প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর পিতার কথা বলতে গিয়ে লিখেছেন,—"আমার পিতা তাঁহার পল্লীজীবনের একটি অভাবের কথা বলিয়া প্রায়ই ক্ষোভ প্রকাশ করিতেন। পল্লীর যে ভদ্রসমাজের মধ্যে তাঁহাকে বাস করিতে হইত, তাহার বিরুদ্ধে তিনি অনেক সময়ই অভিযোগ করিতেন। পল্লীর ভদ্রলোকেরা সম্পূর্ণ ভিন্ন জগতে বাস করিতেন। হাফেজ, সাদি এবং বিখ্যাত ইংরাজ সাহিত্যিকদের গ্রন্থ পাঠে যাঁহার মন ও চরিত্র গঠিত হইয়াছিল, যিনি রামতনু লাহিড়ীর পদমূলে বসিয়া শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, তিনি শিক্ষায় অর্ধশতাব্দী পাশ্চাৎপদ, কুসংস্কারগ্রস্ত ও গোঁড়ামিতে পূর্ণ লোকদের সংসর্গে আনন্দলাভ করিবেন, ইহা প্রত্যাশা করা যায় না।"[6]

হরিশ্চন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের সমর্থনে মোহনলাল বিদ্যাবাগীশকে বিধবা বিবাহে সম্মত করিয়ে পিতা আনন্দলালের দাপটে ও প্রতাপে সফল হননি সত্য, কিন্তু এতে তাঁর চরিত্রের প্রগতিশীলতা ও উদারতার দিকটি আলোকিত হয়ে ওঠে। এই অসাফল্য প্রফুল্লচন্দ্রের বিধবা বিবাহের মধ্য দিয়ে সফল করার প্রত্যাশা করেছিলেন ; কিন্তু প্রফুল্লচন্দ্র চিরকৌমার্য অবলম্বন করায় তা সফল হয়নি।

আনন্দলাল প্রতাপশালী ছিলেন। সে-যুগে পিতার কথাই চূড়ান্ত, পিতার মতই চরম। মাথানত করে পুত্রকে পিতার আদেশ মানতে হতো। তাই আনন্দলাল ও

4. *আত্মচরিত*, পৃ—১১
5. *আত্মচরিত*, পৃ—৭
6. *তদেব*, পৃ—২১

হরিশ্চন্দ্রের মধ্যে—পিতা ও পুত্রের মধ্যে—যথেষ্ট ব্যবধান ছিল। কিন্তু উদার ও প্রগতিশীল হরিশ্চন্দ্রের চরিত্রে পিতা ও পুত্রের এই দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান দেখা যায় না। এই প্রসঙ্গে প্রফুল্লচন্দ্রের ভাষায় পিতা-পুত্র সম্পর্কটি উত্থাপন করা যাক ঃ "পিতার সঙ্গে আমাদের (আমি ও আমার ভাইদের) সম্বন্ধ সরল ও সৌহার্দ্যপূর্ণ ছিল। বই পড়া অপেক্ষা পিতার সঙ্গে কথা বলিয়া আমরা অনেক বিষয় বেশী শিখিতাম। তাঁহার নিকটে গিয়া কথাবার্তা বলিতে ও গল্পাদি করিতে তিনি আমাদের সর্বপ্রকার সুযোগ দিতেন। ... আমার পিতা সৌভাগ্যক্রমে চাণক্য পন্ডিতকেও অতিক্রম করিয়াছিলেন।"[7]

এখানে প্রফুল্লচন্দ্র সংশ্লিষ্ট চাণক্য শ্লোকটি উদ্ধৃত করেছেন ঃ

লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি দশবর্ষাণি তাড়য়েৎ।
প্রাপ্তে তু ষোড়শ বর্ষে পুত্রমিত্রবদাচরেৎ।।

অর্থাৎ পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত পুত্রকে লালন করবে (আদর ও যত্ন করবে), পরবর্তী দশ বছর তাকে তাড়না করবে অর্থাৎ কঠোর নিয়ম ও শৃঙ্খলার মধ্যে রাখবে, প্রয়োজনে কঠোর হবে, কিন্তু পুত্র ষোড়শ বর্ষ বয়স্ক হলে তার সঙ্গে মিত্র অর্থাৎ বন্ধুর মত আচরণ করবে।

পরবর্তীকালে প্রফুল্লচন্দ্র পিতার বহু গুণের উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন। দেশাত্মবোধ, জনহিতকর কার্যবালী, সাহিত্যপ্রীতি, অধ্যয়নের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ, ছাত্রবাৎসল্য, উদার ও প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী ইত্যাদি সবই যেন তাঁর পিতৃসূত্রে প্রাপ্ত।

প্রফুল্লচন্দ্রের বাল্যশিক্ষা

বাবা ডাকতেন 'ফুলু' বলে, আর মা ডাকতেন 'ফুলো'।* এই ডাকনাম খুব সম্ভব 'প্রফুল্ল'-এর 'প্র' লোপ করে 'ফুল্ল' থেকে উৎপন্ন। শৈশবে ফুলু হৃষ্টপুষ্ট ছিলেন, আর দুরন্তও ছিলেন। 1865 সালে চার বছর বয়সে পাঠশালায় লেখাপড়া শুরু হলে তিনি ওই সময়ে 'ছাত্র-প্রকৃতি' অনুযায়ী স্কুল পালাতেন। তখন ধেড়ে পড়ুয়াদের অপারেশনে পাঠানো হতো। যেহেতু গুপ্ত বা লুপ্ত স্থানগুলি তাদের নেকনজরে থাকত, সেইহেতু পলাতককে পাকড়াও করে আনার কোন অসুবিধা হতো না। [স্বগতঃ লেখককে তার বাল্যকালে এরকম অপারেশনের সম্মুখীন হতে হয়েছিল ইক্ষু ক্ষেত্রের মধ্যে] ফুলুর পাঠশালা ছিল পন্ডিতমশায়ের বাড়ীতেই। দুপুরে তিনি নাক ডাকিয়ে ভাত-ঘুম দিতে শুরু করলে ফুলু বাগানে ঢুকে আম, জামরুল ইত্যাদি সংগ্রহ করতেন। যদিও পন্ডিত মশায়ের নিদ্রা ভঙ্গের পূর্বে উপস্থিত হতেন যাতে গুরু পন্ডিত বুঝতে না পারেন, তবুও 'চোরের দশ দিন আর গৃহস্থের একদিন'-এর মত ধরা পড়ে গেলেন। গুরু মশায় নালিশ করতেন, কিন্তু হরিশ্চন্দ্র এসব ঘটনায় তেমন আমল দিতেন না, হাসতেন।

হরিশ্চন্দ্র দুটি স্কুল স্থাপন করেন ঃ একটি বালকদের জন্য এম. ই. (M.E.,—

---

7. *তদেব*, পৃ—২২-২৩

* 'ফুনু' এই ডাকনামটি হয় মুদ্রণ প্রমাদ, না হয় লেখকের ভ্রান্তি। দ্রষ্টব্য ঃ *'আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র'*, দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, পৃ—৫

Middle English) আর একটি বালিকাদের জন্য যা ভুবনমোহিনী বিদ্যালয় নামে পরিচিত হয়। পাঠশালার পাঠ শেষ করে প্রফুল্লচন্দ্র পিতার প্রতিষ্ঠিত স্কুলে ভর্তি হলেন। এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন পন্ডিত মোহনলাল বিদ্যাবাগীশ।* এই স্কুলেই ন'বছর বয়স পর্যন্ত লেখাপড়া করেন প্রফুল্লচন্দ্র।

বড়ভাই জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র স্কুলের পাঠ শেষ করেছেন, আর নলিনীকান্ত ও প্রফুল্লচন্দ্রের স্কুলের পাঠ শেষের দিকে। এমত অবস্থায় হরিশ্চন্দ্র দ্বিধা ও দ্বন্দ্বের মধ্যে আন্দোলিত হতে থাকলেন। তাঁর পিতার দ্বন্দ্ব ও সঙ্কটের বিষয় প্রফুল্লচন্দ্র চমৎকার বিশ্লেষণ করে বলেছেন,—"আমার পিতার পক্ষে এক গুরুতর অবস্থার সৃষ্টি হইল। তিনি সাধারণ পল্লবাসী ভদ্রলোকের চেয়ে বেশী শিক্ষিত ছিলেন এবং কাব্য ও সাহিত্য প্রভৃতি উত্তমরূপে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার ছেলেরাও যাহাতে তৎকালীন উচ্চতম শিক্ষা পায়, এজন্য তিনি ব্যগ্র ছিলেন। ... আমার পিতার দুইটি মাত্র পথ খোলা ছিল। প্রথম, একজন শিক্ষক অভিভাবকের অধীনে কলিকাতায় তাঁহার ছেলেদের জন্য একটি পৃথক বাসা রাখা ; দ্বিতীয়, গ্রাম হইতে নিজেরাই কলিকাতায় আসিয়া বাস করা এবং স্বয়ং ছেলেদের তত্ত্বাবধান করা। ... অবশেষে স্থির হইল যে, পিতামাতাই ছেলেদের লইয়া কলিকাতা থাকিবেন, ...।"[৪] হরিশ্চন্দ্র স্ত্রীপুত্রদের নিয়ে কলকাতায় এলেন 1870 সালে।**

কলকাতায় পড়াশোনা

হরিশ্চন্দ্র কলকাতায় এসে 132 নং আমহার্স্ট স্ট্রীটে বাড়ী ভাড়া করলেন। এই ভাড়া বাড়ী ও ওই অঞ্চলের স্মৃতি প্রফুল্লচন্দ্র কখনো ভুলতে পারেননি। এখানে তিনি প্রায় দশ বছর বসবাস করেছিলেন। জ্যেষ্ঠ জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র হিন্দু স্কুলে ভর্তি হলেন, আর নলিনীকান্ত ও প্রফুল্লচন্দ্র হেয়ার স্কুলে ভর্তি হয়ে পড়াশোনা করতে থাকলেন। তখন হিন্দু স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন ভোলানাথ পাল আর হেয়ার স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন গিরীশচন্দ্র দেব। বহু দিন যাবৎ এই দুটি স্কুল বাংলা দেশের প্রধান স্কুল ছিল। হেয়ার স্কুলের একটি ক্লাসের দেওয়ালে মর্মফলকে ডি. এল. রিচার্ডসনের লেখা ডেভিড হেয়ারের স্মৃতির উদ্দেশ্যে লেখা ছিল ঃ

"Ah ! warm philanthropist, faithful friend,
Thy life devoted to one generous end :
To bless the Hindu mind with British lore,
And truth's and nature's faded lights restore !"

প্রফুল্লচন্দ্র অনুবাদ করেছেন,—"হে, পরোপকারী বিশ্বস্ত বন্ধু, তোমার জীবন

* নৃপেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী 'তর্কবাগীশ' লিখেছেন, [পশ্চিমবঙ্গ], পৃ—২৩, এটি ভুল। দ্রষ্টব্য '*আত্মচরিত*', পৃ—৯

৪. *আত্মচরিত*, প—২০-২১

** শান্তিময় চট্টোপাধ্যায় *Acharya Prafulla Ray* গ্রন্থে 1871 সাল ভুল তথ্য দিয়েছেন। দ্রষ্টব্য ঃ *আত্মচরিত*, পৃ—১৭

একমাত্র মহৎ উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল। সে উদ্দেশ্য, ব্রিটিশ জাতির জ্ঞান বিজ্ঞান দ্বারা হিন্দুজাতির মনকে জাগ্রত করা এবং সত্যের—তথা প্রকৃতির যে আলোক তাহাদের মনে ম্লান হইয়া গিয়াছে, তাহাকে পুনঃ প্রদীপ্ত করা।"[9]

সারা জীবন ধরে প্রফুল্লচন্দ্র কবিতার ওই লাইনগুলি মনে রেখেছিলেন এবং অক্ষরে অক্ষরে আবৃত্তি করতে পারতেন।

স্কুলের নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে প্রফুল্লচন্দ্র কখনোই তাঁর জ্ঞানতৃষ্ণা মেটাবার মশলা দেখতে পাননি। তাই পাঠ্যপুস্তকের চেয়ে পাঠ্যবহির্ভূত পুস্তক পাঠের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ দেখা যায়। বস্তুতপক্ষে, এই বিষয়ে তিনি সব সময় তাঁর ক্লাসের ছাত্রদের চেয়ে অগ্রবর্তী ছিলেন। সেই বাল্যকালে মাত্র 12 বছর বয়সে রাত্রি তিনটে চারটেয় উঠে তিনি পড়তে শুরু করতেন। ইতিহাস আর জীবনচরিত্র ছিল তখন তাঁর প্রিয় বিষয়। চেম্বারের জীবনচরিত পড়তেন ;নিউটন ও গ্যালেলিও-র জীবনী পড়তেন। অবশ্য সবই যে বুঝতেন, তা নয়। কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না। তিনি ফ্রাঙ্কলিনের জীবনী পড়তেন ; উইলিয়াম জোন্স, জন লেডেন প্রমুখের ভাষাতত্ত্বের জ্ঞান প্রফুল্লচন্দ্রের ওপর গভীর প্রভাব ফেলত। কলকাতা শহরে এসে প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর জ্ঞানতৃষ্ণা মেটাবার খোরাক পেলেন, মনের মত এক জগৎ পেলেন সত্য, কিন্তু গভীর রাত্রি জাগরণ করে পড়ার জন্য তাঁর পরিণাক ক্রিয়ার ব্যাঘাত হতে থাকল। অবশেষে 1874 সালে তিনি গুরুতর রক্তামাশয়ে আক্রান্ত হলেন। তখন চতুর্থ শ্রেণীতে পাঠরত অবস্থায় স্কুল ত্যাগ করে তাঁকে রাড়ুলিতে ফিরে যেতে হলো। অবশেষে প্রায় দীর্ঘ দেড় বছর পরে তাঁর রোগমুক্তি হলেও তিনি চিরজীবনের জন্য অজীর্ণতা ও নিদ্রাহীনতার শিকার হয়ে রইলেন।

ব্যাধি আশীর্বাদ স্বরূপ

রক্ত আমাশয় রোগে আক্রান্ত হয়ে পাঠে ছেদ হওয়াকে প্রফুল্লচন্দ্র আশীর্বাদ স্বরূপ বলেছেন। একদিক থেকে কথাটি সম্পূর্ণ সত্য। রোগমুক্তির প্রায় দেড় বছর তিনি জ্ঞান-বৃত্তের ব্যাসার্ধ বৃদ্ধি করেছেন ; হেয়ার স্কুলে প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা থাকলেও বাধ্য হয়ে তাঁকে অন্য স্কুল—অ্যালবার্ট স্কুলে ভর্তি হতে হয়, এবং এই সময় তিনি কয়েকজন আদর্শ শিক্ষকের সংস্পর্শে আসার সুযোগ পান, এবং প্রগতিশীল ব্রাহ্মধর্মের ঔদার্য লক্ষ করেন। তাঁর দুর্বল ও ভগ্ন শরীর, পরিপাকহীনতা, অজীর্ণতা ও অনিদ্রা রোগের জন্য সম্ভবত তিনি চিরকৌমার্য অবলম্বন করেন। এর ফলে, রসায়নকেই তিনি বিবাহ করেন, এবং ভারতে রসায়নের জনক বলে আখ্যাত হন। বিপরীতক্রমে, রোগাক্রান্ত না হয়ে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয়ে বিবাহ করে সংসার করলে আমরা বর্তমানে প্রফুল্লচন্দ্রকে যেভাবে পেয়েছি, তা কি পেতাম? এই প্রশ্নের সন্তোষজনক মীমাংসা সম্ভব নয়। তবে বিশ্বের বহু শ্রেষ্ঠ রাসায়নবিদ স্বাস্থ্যসম্পন্ন হয়ে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার করেছেন, এবং ছাত্রদের অনুপ্রাণিত ও উদ্দীপ্ত করেছেন,—এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়। এই প্রসঙ্গে লাভোয়াসিয়ারের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।

9. *আত্মচরিত*, পৃ—২৪

যাই হোক, দেড় বছর ধরে প্রফুল্লচন্দ্র "স্কুলের বৈচিত্র্যহীন শুষ্ক পাঠ্যপ্রণালী হইতে মুক্ত হইয়া আমি মনের সাধে নিজের ইচ্ছানুযায়ী অধ্যয়ন করিবার সুযোগ লাভ" করলেন। আমরা আগেই হরিশচন্দ্রের লাইব্রেরীর সংগ্রহের উল্লেখ করেছি। এই সংগ্রহের আরো সমৃদ্ধ করতে থাকেন জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র। তখন লেথব্রিজের *Selections from Modern English Literature* প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাঠ্য ছিল। প্রফুল্লচন্দ্র আগাগোড়া বইটি পড়লেন। তাঁর ইংরেজী সাহিত্যের সহিত সেতুবন্ধ রচিত হলো। নাইটের *Half-hours with the Best Authors* তাঁকে উচ্চস্তরের ইংরেজী সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হতে খুবই সহায়তা করে। তিনি পড়লেন সেক্সপীয়ারের 'জুলিয়াস সীজার', 'মার্চেন্ট অফ ভেনিস', 'হ্যামলেট'। এইসব নাটকের নির্বাচিত কিছু অংশ এবং *Soliloquy* তাঁর সম্মুখে নতুন জগতের দরজা উন্মুক্ত করে দিল। সেক্সপীয়ার ওই সময় থেকে তাঁর নিত্যসাথী হয়ে গেলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন'-এ প্রকাশিত ধারাবাহিক 'বিষবৃক্ষ' পড়তে লাগলেন। প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাল্মীকি ও তাঁর যুগ' ও রামদাস সেনের 'কালিদাসের যুগ' তাঁকে আকৃষ্ট করল। প্রফুল্লচন্দ্র পুরাতত্ত্বের প্রতি আগ্রহান্বিত ও আকৃষ্ট হলেন। বাংলা ভাষায় পুরাতাত্ত্বিক আলোচনার সূত্রপাত হয় রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'বিবিধার্থ সংগ্রহ'-এর 'বাঙ্গলার সেনরাজগণ' প্রবন্ধে। পরবর্তীকালে *History of Hindu Chemistry* রচনায় এই পুরাতাত্ত্বিক জ্ঞান প্রফুল্লচন্দ্রের সহায়তা করেছিল। তখন যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত 'আর্যদর্শন' প্রকাশিত হতে থাকে। এতে জন স্টুয়ার্ট মিলের আত্মজীবনী অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয়। এই আত্মচরিত পাঠ ছিল প্রফুল্লচন্দ্রের অন্যতম আকর্ষণ।

প্রফুল্লচন্দ্র পাঠ করতেন তিনটি প্রধান সাপ্তাহিক পত্র ঃ 'সোমপ্রকাশ', অমৃতবাজার পত্রিকা' (ইংরেজী ও বাংলা), ও 'হিন্দু পেট্রিয়ট'। তাঁর জীবনের গতি ও প্রকৃতি পরিবর্তিত হলো স্মীথের *Principia Latina* বইটি হাতে আসার পর। বইটি সংগ্রহ করেছিলেন জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র কোন পুরোনো বই-এর দোকান থেকে। যুগপৎ বিস্মিত ও আনন্দিত হয়ে প্রফুল্লচন্দ্র বইটি সম্বন্ধে লিখেছেন,—"কয়েক পাতা উল্টাইয়াই আমি বিস্মিত ও আনন্দিত হইলাম। ইহাতে যে সব পদ ও বাক্য ছিল, চেষ্টা করিয়া তাহার অর্থবোধ আমার হইল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা আমার পড়া ছিল। আমি দেখিলাম ল্যাটিন ও সংস্কৃত এই দুই প্রাচীন ভাষার আশ্চর্য সাদৃশ্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ ল্যাটিন ভাষায় Recuperata pace, artes efflorescent (শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইলে, শিল্পকলার বিকাশ হয়) এই বাক্যটির উল্লেখ করা যাইতে পারে। সংস্কৃতে অনুরূপ পদকে ভাবে ৭মী বলে।"[10] সংস্কৃতে ভাবে সপ্তমীর উদাহরণ ঃ ***সূর্যে উদিতে পদ্মং প্রকাশতে***—সূর্য উদিত হলে পদ্মফুল ফোটে। শিক্ষকের সাহায্য ছাড়াই প্রফুল্লচন্দ্র ল্যাটিন শিখতে শুরু করলেন। প্রথম ভাগ শেষ করে দ্বিতীয় ভাগ ও ব্যাকরণও পড়লেন। অতঃপর ফরাসী ভাষা। ল্যাটিন থেকেই ফরাসী, ইটালিয়ান ও স্প্যানিশ ভাষার উদ্ভব।

10. *আত্মচরিত*, পৃ—২৯-৩০

সুতরাং মূল ল্যাটিন জানা থাকলে অন্য ভাষাগুলি শেখা সহজ হয়ে ওঠে। প্রফুল্লচন্দ্রের ক্ষেত্রেও তাই ঘটল। যেহেতু তিনি ল্যাটিনে প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করেছিলেন, তাঁর পক্ষে ফরাসী ভাষা শেখা সহজ হলো। তিনি এ-সম্পর্কে লিখেছেন,—"...আমি দেখিলাম যে স্মিথের French Principia (Parts I & II) কাহারও সাহায্য ব্যতীত আমি বেশ পড়িতে পারি।"[11] মন্ডারের *Treasure of Biography* প্রফুল্লচন্দ্রের ছিল অন্যতম প্রিয় গ্রন্থ। ওই জীবনী গ্রন্থে রামমোহনের জীবনী ছিল ; ওই প্রবন্ধটি স্কুল বুক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত Reader No. IV-এ উদ্ধৃত হয়েছিল, কিন্তু উৎসের ঋণ স্বীকার ব্যতিরেকে।

কলকাতায় প্রত্যাবর্তন ও অ্যালবার্ট স্কুল

কলকাতা থেকে দূরে গ্রামের স্নিগ্ধ ও মনোরম পরিবেশ ও জড়িবুটির টোটকা ওষুধের গুণে প্রফুল্লচন্দ্র সুস্থ হয়ে উঠলেন। তখন তাঁর পড়াশোনার ইচ্ছা জাগল। কিন্তু তখন বছরের মাঝামাঝি ; সেসন অনেক দূর এগিয়ে গেছে। তাই তাঁর ওই সময় হেয়ার স্কুলে ফেরা সম্ভব হলো না। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্রের সঙ্গে পরামর্শ করে তিনি বৎসরের অবশিষ্ট সময়ের জন্য 1875 সালের জুলাই মাসে নব প্রতিষ্ঠিত অ্যালবার্ট স্কুলের চতুর্থ শ্রেণী অর্থাৎ সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি হলেন। ইচ্ছা ছিল, পরবর্তী সেসনে তিনি হেয়ার স্কুলে প্রত্যাবর্তন করবেন। কারণ, হেয়ার স্কুলের পিছনে ছিল বিরাট গৌরবময় ঐতিহ্য ও শিক্ষা জগতেও ছিল তার নিজস্ব ধারা। বিখ্যাত প্যারিচরণ সরকার, নীলমণি চক্রবর্তী, গিরীশচন্দ্র দেব প্রমুখ ছিলেন ওই স্কুলের স্বনামধন্য শিক্ষক, আর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন ওই স্কুলের ছাত্র। অ্যালবার্ট স্কুল তখন নতুন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ; এর কোন ঐতিহ্য ছিল না ; শিক্ষার কোন বিশিষ্ট ধারাও তখন প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তাই বছরের শেষে পরীক্ষা দিলেন না প্রফুল্লচন্দ্র। তিনি জানতেন যে তিনি অবশ্যই প্রথম হবেন ও পুরস্কারে ভূষিত হবেন। "কিন্তু পুরস্কার লাভ করিবার পর ঐ স্কুল ছাড়িয়া যাওয়া আমার পক্ষে অন্যায় মনে হইয়াছিল। এই সব কথা ভাবিয়াই আমি পরীক্ষা দিলাম না। আমি আমার নিজ গ্রামে গিয়া দীর্ঘ ছুটি ভোগ করিলাম এবং নিজের ইচ্ছামত গ্রন্থ অধ্যায়নের সঙ্গে সঙ্গে কৃষিকর্মের দিকেও মন দিলাম।"[12]

1876 সালের জানুয়ারী মাসের প্রথম ভাগেই প্রফুল্লচন্দ্র কলকাতায় এলেন। এসেই অ্যালবার্ট স্কুলের কর্তৃপক্ষের কাছে সার্টিফিকেট চাইলেন। উদ্দেশ্য হেয়ার স্কুলে ভর্তি হবেন। কিন্তু কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য প্রমুখ শিক্ষকগণ তাঁকে নানাভাবে নিবৃত্ত করলেন। প্রফুল্লচন্দ্রের স্কুল ত্যাগ করা বিষয়ে মত পরিবর্তন যে শুভ হয়েছিল, তাতে

11. *আত্মচরিত*, পৃ—৩১
12. *তদেব*, পৃ—৩৩, কোন কোন লেখক বলেছেন প্রফুল্লচন্দ্র 1874 খ্রী. অ্যালবার্ট স্কুলে ভর্তি হলেন ও স্বাস্থ্যের কারণে গ্রামে ফিরে গেলেন। এই বিবৃতি সম্পূর্ণ ভুল। দ্রষ্টব্য : *'রসায়নাচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়'*, পৃ—৫ ; *Acharya Prafulla Chandra Ray*, p.-3

সন্দেহ নেই। প্রফুল্লচন্দ্র উভয় স্কুলের পরিবেশ সম্বন্ধে লিখেছেন,—"...অ্যালবার্ট স্কুলে আমাদের শিক্ষকেরা শান্ত ও মধুর প্রকৃতির আদর্শস্বরূপ ছিলেন। আদর্শ শিক্ষকের যেসব গুণ থাকা উচিত আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সে সবই ছিল। আমি যেন এখনও চোখের উপর দেখিতেছি, তাঁহার অধরে মৃদু হাস্য এবং মুখ হইতে শান্ত জ্যোতি বিকীর্ণ হইতেছে! মহেন্দ্রনাথ দাঁকেও আমরা সমান ভালবাসিতাসম।" বাৎসরিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান হলো, কিন্তু প্রফুল্লচন্দ্র পরীক্ষা না দেওয়ায় কোন পুরস্কার পেলেন না। কিন্তু স্কুলের শিক্ষকগণ ক্লাসের বহু অগ্রবর্তী এই ছাত্রটি পুরস্কার না পাওয়া অশোভন বোধ করে তাঁর উৎকর্ষতা বিচার করে বিশেষ পুরস্কার প্রদান করলেন। ওই পুরস্কারের মধ্যে ছিল ইয়ং-এর *Night Thoughts,* থ্যাকারের *Humorists* ও হ্যাজলিট সম্পাদিত সেক্সপীয়ারের গ্রন্থাবলী।

কৃষ্ণবিহারী স্মরণে

সেসনের মাঝামাঝি বলে প্রফুল্লচন্দ্রকে বাধ্য হয়ে অ্যালবার্ট স্কুলে ভর্তি হতে হয়েছিল। ওই সময় ওই স্কুলের রেক্টরের কাজ করছিলেন শ্রীনাথ দত্ত। কেশবচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণবিহারী তখন ছিলেন জয়পুরের মহারাজা কলেজের অধ্যক্ষ। কিন্তু শীঘ্রই তিনি ফিরে এসে রেক্টরের ভার গ্রহণ করলেন। কৃষ্ণবিহারী ব্রহ্মবান্ধব কেশবচন্দ্রের ন্যায় বাগ্মী ছিলেন না, কিন্তু জ্ঞানে ও পাণ্ডিত্যে ও লেখনী চালনায় অসাধারণ ছিলেন। বিখ্যাত "ইন্ডিয়ান মিরর"-এর যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন। রবিবারের সংখ্যাটি তিনি স্বয়ং সম্পাদনা করতেন। ইংরেজী সাহিত্যে কৃষ্ণবিহারীর গভীর অধিকার ছিল। প্রফুল্লচন্দ্রের ইংরেজী সাহিত্যের প্রতি যে আগ্রহ ও আকর্ষণ, তার মূলে ছিলেন কৃষ্ণবিহারী। তাঁর শিক্ষাদান প্রণালী সম্বন্ধে প্রফুল্লচন্দ্র লিখেছেন,—"যাহারা কতকগুলি পদের প্রতিশব্দ দিয়া এবং কতকগুলি শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াই কর্তব্য শেষ করে, কৃষ্ণবিহারী সেই শ্রেণীর সাধারণ শিক্ষক ছিলেন না। তাঁহার শিক্ষদানের প্রণালী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিল। তিনি যে বিষয়ে পড়াইতেন তৎসম্বন্ধে নানা নতুন তথ্য সংগ্রহ করিয়া বিষয়টি চিত্তাকর্ষক করিয়া তুলিতেন।"[13] বিখ্যাত কবি বায়রন স্কটকে *Apollo's vernal son* অ্যাখ্যা দিয়েছেন। কৃষ্ণবিহারীর মুখে কথাটি শুনেই প্রফুল্লচন্দ্র লাইব্রেরী থেকে সংগ্রহ করে বায়রন ও স্কটের যাবতীয় গ্রন্থ পড়ে ফেললেন, স্কটের *Ivanhoe* তাঁর পূর্বেও পড়া ছিল। *English Bards and Scotch Reviewers*-এ বায়রনের এডিনবার্গের সমালোচকদের প্রতি তীব্র শ্লেষ ও বিদ্রূপও উপভোগ করলেন। একজন আদর্শ শিক্ষক কিভাবে ছাত্রদের মনে গভীর রেখাপাত করতে পারে, ছাত্রদের উদ্বোধিত ও অনুপ্রাণিত করতে পারে, কৃষ্ণবিহারী, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। প্রফুল্লচন্দ্রও তাঁর শিক্ষকতা জীবনে ঠিক এই আদর্শ অনুসরণ করেছিলেন। তিনি যেন এ-বিষয়ে তাঁর স্বনামধন্য শিক্ষকদের চেয়ে আরো কয়েক ধাপ অগ্রসর হয়েছিলেন। বস্তুতপক্ষে, তিনি পরবর্তীকালে ভারতে রসায়নের আত্মা ও প্রাণ সঞ্চার করেছিলেন।

13. *আত্মচরিত,* পৃ—৩৬

প্রফুল্লচন্দ্র অ্যালবার্ট স্কুল থেকেই 1878-79 সালে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিলেন। তাঁর শিক্ষকগণ তাঁর পরীক্ষার ফল সম্বন্ধে খুবই উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন, কিন্তু তা হলো না। তিনি প্রথম বিভাগে 5 টাকা বৃত্তি পেয়ে উত্তীর্ণ হলেন। পরীক্ষার ফল দ্বারা শিক্ষার্থীর জ্ঞান ও মেধা কোন কালেই যাচাই হয় না, আর প্রফুল্লচন্দ্রের ক্ষেত্রে তো নয়-ই।

মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশন

বিদ্যাসাগর প্রতিষ্ঠিত মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশনে এফ. এ. (First Arts) ক্লাসে ভর্তি হলেন প্রফুল্লচন্দ্র। প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি না হয়ে কেন তিনি এই এখানে ভর্তি হলেন তার কারণ প্রদর্শন করে প্রফুল্লচন্দ্র বলেছেন যে, এই কলেজের বেতন ছিল সামান্য, মাত্র তিন টাকা; এটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান যাকে নিজের বলে ভাবা যায় এবং এই কলেজে ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রসন্নকুমার লাহিড়ী। ওই সময় রসায়নের ক্লাস করতেন প্রেসিডেন্সী কলেজে যেখানে এই বিষয়টি পড়াতেন রসায়নের বিখ্যাত অধ্যাপক আলেকজান্ডার পেডলার। পেডলার সাহেব রসায়নের ক্লাসে কেবল 'লেকচার'-ই দিতেন না; লেকচারের সঙ্গে ক্লাসে পরীক্ষা করেও দেখাতেন। যেমন, গ্যাস প্রস্তুতি, ভৌত ধর্মের পরীক্ষা, রাসায়নিক ধর্মের কোন বিক্রিয়া ইত্যাদি। এইসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা দেখে ও লেকচার শুনে প্রফুল্লচন্দ্রের সাহিত্যের অনুরাগ ক্রমশ রসায়নের অনুরাগে পরিণত হতে থাকল। রস্কোর Elementary Lessons পাঠ্যতালিকায় থাকলেও তিনি আরো কয়েকটি রসায়নের বই পড়তে লাগলেন। শুধু তাই নয়, এক বন্ধুর সহায়তায় ছোট্টখাট লেবরেটরী গড়ে তুললেন বাড়ীতে। সেখানে ছোটখাট 'experiment' চলতে থাকল। সাধারণ টিনের পাত দিয়ে তৈরী oxy-hydrogen blow pipe তৈরী করে পরীক্ষা করতে গিয়ে একদিন বিস্ফোরণও ঘটে গেল। আমাদের খুবই সৌভাগ্য যে প্রফুল্লচন্দ্র আহত হননি।

এই সময়ে নব প্রজন্ম যে জাগরণের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিল তার চমৎকার বিশ্লেষণ প্রদান করেছেন অধ্যাপক শান্তিময় চট্টোপাধ্যায়। তিনি লিখেছেন,—"The time was one of intellectual awakening. After a slumber of about nine hundred years the Indian mind was again opening up to new ideas. Science was the new stimulus. The marvellous world of science could not but fascinate the eager young minds of the new generation and it was quite natural that Ray with his tremendous zest of knowledge would fall for it."[14]

1880 সালে প্রফুল্লচন্দ্র এফ. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন, কিন্তু পরীক্ষায় ফল ভাল হলোনা; দ্বিতীয় বিভাগে পাশ করলেন 1881 সালে। বুদ্ধি ও মেধার বিচারে প্রফুল্লচন্দ্রের এই ফল হতাশাব্যঞ্জক। কিন্তু এর পিছনে দুটি সুস্পষ্ট কারণ দেখা যায়ঃ ওই সময় তাঁর পিতার আর্থিক অবস্থার নিদারুণ অবনতি হতে থাকে।

14. *Acharya Prafulla Chandra Ray*, p.–4

তখন একটির পর একটি জমিদারী বিক্রয় হচ্ছে, আর ঋণ পরিশোধ হচ্ছে। তাঁর মাতার দশ হাজার টাকার অলঙ্কার বিক্রী করে যে সম্পত্তি ক্রয় করা হয়েছিল, তাও বিক্রী হচ্ছে। পিতা চিন্তাক্লিষ্ট আর মাতা ক্রন্দন করছেন,—এই ট্রাজেডী প্রফুল্লচন্দ্রের পড়াশোনার ওপর যে প্রবল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল, তাতে সন্দেহ নেই। তা ছাড়া, প্রফুল্লচন্দ্রের জ্ঞানক্ষুধা তাঁকে পাঠ্যপুস্তকের গতানুগতিকতায় নিবদ্ধ রাখতে পারেনি। এরূপ শিক্ষার্থীর পরীক্ষার ফল কখনো ভাল হতে দেখা যায়নি, এবং প্রফুল্লচন্দ্রের ক্ষেত্রেও হয়নি। যাই হোক, বি. এ. ক্লাসে ভর্তির সময় প্রফুল্লচন্দ্র একটি সমস্যা ও সঙ্কটের সম্মুখীন হলেন। তখন বি. এ.-তে দুটি কোর্স ছিল—A ও B কোর্স। এফ. এ. পড়ার সময়েই রসায়নের প্রতি তাঁর আগ্রহ ও আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়। সুতরাং অবশেষে তিনি B কোর্স নিয়ে বি. এ. পড়তে থাকলেন, এবং রসায়নই হলো তাঁর পাঠের মুখ্য বিষয়।

পিতার সম্পত্তি বিক্রয় হচ্ছে। কলকাতার বাসা উঠিয়ে তিনি রাড়ুলি ফিরে গেছেন 1878 সালে। প্রফুল্লচন্দ্রেরা তখন মেসে অবস্থান করছেন—80 নং মুক্তারামবাবু স্ট্রীটে। মাসিক খরচের টাকা হরিশ্চন্দ্র পাঠাবার চেষ্টা করতেন। কিন্তু পিতাকে টাকা পাঠাবার দুশ্চিন্তা থেকে রেহাই দেবার জন্য প্রফুল্লচন্দ্র একটি উপায় স্থির করলেন। একজন সংস্কৃত পন্ডিতের পরামর্শে হরিশ্চন্দ্র এইচ. এইচ. উইলসনের সংস্কৃত-ইংরেজী অভিধানের তৃতীয় সংস্করণ ছাপেন। জীবানন্দ বিদ্যাসাগর ও ভুবনমোহন বসাক প্রতি খন্ড দু-টাকা মূল্যে কয়েক শত বই কিনলেন, কিন্তু অবশিষ্ট কয়েক শত খন্ড বাড়ীতেই পড়ে রইল। পুরোনো কাগজের দরে বিক্রী করতে রাজী না হয়ে প্রফুল্লচন্দ্র সব বাঁধাই করলেন। অতঃপর প্রফুল্লচন্দ্রের ভাষায় ঃ "অমি সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিলাম, উইলসনের অভিধান প্রতি খন্ড ছয় টাকা মূল্যে বিক্রয় হইবে। কলিকাতার পুস্তক-বিক্রেতাদের নিকট হইতে এবং ভারতের নানা স্থান হইতে অর্ডার আসিতে লাগিল। বই বেশ বিক্রি হইতে লাগিল এবং আমি সাহসপূর্বক পুস্তক বিক্রয়ের এজেন্সি খুলিয়া বসিলাম। জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র রায় অ্যান্ড ব্রাদার্সের নামে উইলসনের অভিধান প্রকাশিত হইয়াছিল। সুতরাং আমার এজেন্সিরও ওই নাম দিলাম।.... মনে মনে সঙ্কল্প করিলাম যে, কলেজের পড়া শেষ হইলে আমি পুস্তক-বিক্রয়ের ব্যবসা অবলম্বন করিব।"[15]

গিলক্রাইস্ট বৃত্তি পরীক্ষা

এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় গিলক্রাইস্ট বৃত্তি প্রদান করত। এই প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা (Matriculation) পরীক্ষার সমতুল্য ছিল। এই পরীক্ষায় বসতে হলে চারটি ভাষায় জ্ঞান অপরিহার্য ছিল ঃ ল্যাটিন, সংস্কৃত অথবা গ্রীক, ফরাসী বা জার্মান।* প্রফুল্লচন্দ্র ল্যাটিন, ফরাসী, ইংরেজী, সংস্কৃত এই চারটি

15. *আত্মচরিত, পৃ—৪১৪*

* বিমলেন্দু মিত্র বলেছেন যে, এই চারটি ভাষার অন্যতম একটি ছিল 'গ্রীক'। এটি নিঃসন্দেহে ভ্রমাত্মক। দ্রষ্টব্য ঃ 'রসায়নাচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়', পৃ—৬-৭

ভাষার জ্ঞান নিয়ে গিলক্রাইস্ট বৃত্তি পরীক্ষায় বসার সঙ্কল্প করলেন। বলা বাহুল্য, তৃতীয় শ্রেণী অর্থাৎ সপ্তম শ্রেণীতে পড়ার সময়েই রক্তামাশা জনিত রোগের প্রকোপে পড়ার ছেদ ঘটানোর সময়ে তিনি ল্যাটিন ও ফরাসী ভাষায় জ্ঞানার্জন করেন, আর সংস্কৃত তো এফ. এ. ক্লাস পর্যন্ত তাঁর পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল। গোপনে চলল বৃত্তি পরীক্ষার প্রস্তুতি পর্ব। জানলেন মাত্র দু-জন ঃ দাদা জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ও গ্রামসম্পর্কীয় এক জেঠতুতো ভাই। এই গোপনীয়তার কারণ হলো পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলে সহপাঠীরা উপহাস ও বিদ্রূপ করবে। কিন্তু যতই গোপনীয়তা অবলম্বন করুন না কেন, তাঁর একজন উজ্জ্বল সহপাঠী জেনে গেলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ স্থানাধিকারী যথারীতি মন্তব্য করলেন ঃ "আমার নাম লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেন্ডারের বিশেষ সংস্করণে বাহির হইবে।"[16] প্রফুল্লচন্দ্র স্বয়ং এই প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার সাফল্য বিষয়ে আত্মপ্রত্যয়ী ছিলেন না। কিন্তু কয়েক মাস পরে 'স্টেটসম্যানে' খবর প্রকাশিত হলো প্রফুল্লচন্দ্র ও বোম্বাই-এর (বর্তমানে মুম্বাই) এক পার্শী যুবক বাহাদুরজী এই কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন।

এরূপ প্রশ্ন উঠতে পারে যে, প্রফুল্লচন্দ্র এই বৃত্তি পরীক্ষা দেওয়ার সঙ্কল্প করলেন কেন। এর কারণ সম্পর্কে প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর আত্মচরিতে কিছু স্পষ্ট করে বলেননি, এবং তাঁর অন্যান্য জীবনীকাররাও এদিকে কিছুমাত্র আলোকপাত করেননি। তবুও আমরা এখানে কয়েকটি কারণের উল্লেখ করতে চাই। প্রফুল্লচন্দ্রের গিলক্রাইস্ট বৃত্তি পরীক্ষা দেবার পশ্চাতে নিম্নরূপ কারণগুলি প্রতীয়মান হয় ঃ (i) প্রফুল্লচন্দ্রের পিতা হরিশ্চন্দ্র যে প্রগতিশীল, সংস্কারহীন ও উদার প্রকৃতির শিক্ষিত মানুষ ছিলেন তার পরিচয় আমরা ইতিপূর্বে পেয়েছি। তাঁর আর্থিক অবস্থাও খারাপ ছিল না। সে-যুগে অবস্থাসম্পন্ন ঘরের সন্তানরাও বিলাতে গিয়ে ডিগ্রী অর্জন করে সমাজে সম্মানিত ও প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আকাঙ্খা পোষণ করত। বস্তুত, এদেশের ডিগ্রীর চেয়ে বিলাতের ডিগ্রী মূল্যবান বলে বিবেচিত হতো।* আমাদের মনে হয়, হরিশ্চন্দ্রের সুপ্ত আকাঙ্খা ছিল তাঁর কোন পুত্র বিলাতে গিয়ে ডিগ্রী আনুক, এবং প্রফুল্লচন্দ্রের মনেও এরূপ সুপ্ত আকাঙ্খা ছিল ; (ii) প্রখর বুদ্ধি ও মেধা সম্পন্ন হয়েও প্রফুল্লচন্দ্র শিক্ষা-জীবনে বিশেষ কিছু সাফল্যলাভ করতে পারেননি। তাই এই হতাশা কাটাবার জন্য বিলাতে গিয়ে ডিগ্রী অর্জনের আকাঙ্খা পোষণ করে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বসেন ; (iii) ওই যুগটি ছিল 'intellectual awakening'-এর। বিজ্ঞানে, বিশেষত রসায়ন বিজ্ঞানে নিপুণ ও পারদর্শী হতে হলে বিদেশে গিয়ে প্রকৃত শিক্ষণ পাওয়া অবশ্যই দরকার ছিল। প্রফুল্লচন্দ্রের পিতামাতা কালাপানি পার হলে জাত যাবে,—এই প্রসঙ্গ বিন্দুমাত্র উত্থাপন করেননি। কিন্তু স্যার আশুতোষ এই বাধা অতিক্রম করতে পারেননি।

---

16. *আত্মচরিত, পৃ—৩৯*

* এখনো এই মানসিকতার বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয়নি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

এডিনবার্গের উদ্দেশে

বিদেশ যাত্রার সব রকম প্রস্তুতি চলতে লাগল। হেয়ার স্কুলের সহপাঠী দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারীর সাহায্যে প্রফুল্লচন্দ্র প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনতে থাকলেন, আর এক মেসের বন্ধু জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ব্যানার্জিও তাঁকে নানা বিষয়ে সাহায্য করতে থাকলেন। রেস্তোরাঁয় গিয়ে ডিনার খাওয়া শিখলেন; বকশিস দিতে শিখলেন; ছুরি-কাঁটা ধরে ব্যবহার করতে শিখলেন। ওই সময় ডাঃ পি. কে. রায়ের ছোট ভাই দ্বারকানাথ রায়ও বিলাত যাওয়ার তোড়যোড় করছিলেন। প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর সঙ্গে দেখা করে একই জাহাজে যাবার বন্দোবস্ত করতেন।

জাহাজের নাম ক্যালিফোর্নিয়া। চার শ' টাকায় প্রথম শ্রেণীর সেলুন ভাড়া করে আগস্ট মাসে উঠে বসলেন জাহাজে। ফলতা থেকে কিছুদূর যাবার পরেই প্রফুল্লচন্দ্র সমুদ্ররোগে (sea fever) আক্রান্ত হলেন, কিন্তু দ্বারকানাথ আক্রান্ত হলেন না। কারণ, তিনি তাঁর দাদার বাড়ীতে ইউরোপীয় জীবনযাপন প্রণালী আয়ত্ত করেছিলেন। পাঁচ-ছ'দিন পরে জাহাজ কলম্বো পৌঁছলে ডাঙায় নেমে যেন হাঁফ চেড়ে বাঁচলেন প্রফুল্লচন্দ্র। কিন্তু কলম্বো থেকে এডেনের পথে পুনঃরায় সমুদ্ররোগের শিকার হলেন; অশান্ত সমুদ্র শান্ত হলে রোগমুক্তি ঘটল।

জাহাজে করে বিলাত যাওয়া তখন দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ ছিল। ক্লান্তিকর যাত্রায় সময় কাটানো ছিল এক সমস্যা। দিবাস্বপ্নে বিভোর হয়ে আর কত দিন কাটানো যায়! জাহাজে সেলুনের লাইব্রেরী ছিল বটে, কিন্তু তা সব অপাঠ্য বই-এ ভর্তি। প্রফুল্লচন্দ্র অবশ্য কয়েকটি বই সঙ্গে নিয়ে গেলেন ঃ স্মাইলসের *Thrift*, স্পেন্সারের *Introduction to the Study of Sociology*, কালীপ্রসন্ন ঘোষের 'প্রভাতচিন্তা', আর ছিল রবীন্দ্রনাথের 'ইউরোপযাত্রীর ডায়েরী'। এখানে লক্ষ করার বিষয় যে, রবীন্দ্রনাথ তখন সাহিত্য জগতে বিশেষ পরিচিত নন, কিন্তু প্রফুল্লচন্দ্র তখন থেকেই রবীন্দ্রনাথের লেখা পড়তেন। আর একটি বই প্রফুল্লচন্দ্র পড়লেন ঃ বসওয়েল কৃত 'জনসনের জীবনচরিত'-এর একটি খন্ড।

ক্যালিফোর্নিয়া গ্রেসেন্ডে পৌঁছল তেত্রিশ দিন পরে। প্রফুল্লচন্দ্র ও দ্বারকানাথ পৌঁছলেন ফেন চার্চ স্ট্রীট স্টেশনে। স্টেশনে অপেক্ষা করছিলেন জগদীশচন্দ্র বসু ও সত্যরঞ্জন দাশ। সত্যরঞ্জন ছিলেন চিত্তরঞ্জনের দাদা। জগদীশচন্দ্রে সঙ্গে এক সপ্তাহ কাটালেন। এন. পি. সিংহ ও এস. পি. সিংহ (পরে লর্ড) তাঁদের পথপ্রদর্শক হলেন।

অতঃপর অক্টোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রফুল্লচন্দ্র এডিনবার্গ পৌঁছলেন। এডিনবার্গ মনস্তত্ত্ব ও চিকিৎসাবিদ্যার জন্য তখন বিখ্যাত ছিল, বিশেষত চিকিৎসা বিদ্যার সুনাম ও খ্যাতির জন্য দেশ-বিদেশের ছাত্ররা এখানে অধ্যয়ন করতে আসত। এখানে তখন কয়েকজন বিখ্যাত অধ্যাপক রসায়ন ও পদার্থবিদ্যা অধ্যাপনা করতেন। লন্ডনের চারশ' মাইল উত্তরে অবস্থিত হওয়ায় লন্ডনের চেয়ে এখানে শীত বেশী অনুভূত হতো।

এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়

শীতকালীন সেসন তখনো শুরু হয়নি, কয়েকদিন বাকী ছিল। তাই সেসনের প্রথমেই প্রফুল্লচন্দ্র ভর্তি হলেন বি. এস-সি ক্লাশে।* প্রাথমিক পরীক্ষার জন্য তিনি পড়তে লাগলেন পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও প্রাণিবিদ্যা। উদ্ভিদবিদ্যাও তাঁর পাঠের বিষয় ছিল। কিন্তু শরৎকালে ওদেশে সব গাছপালার পত্রপুষ্প ঝরে পড়ে বলে ওই বিষয়টি গ্রীষ্মকালের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। অধ্যাপক টেইট ছিলেন পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক। তিনি পদার্থবিদ্যার মূলসূত্র চমৎকারভাবে বোঝাতেন। কিন্তু পাঠ্যপুস্তক হিসাবে তাঁর ও টমসনের *Natural Philosophy* প্রফুল্লচন্দ্রের কাছে দুরূহ ও দুর্বোধ্য বলে মনে হতো। পরপর দুটি সেসনে তাঁর দুটি ধারাবাহিক ভাষণ শুনেও প্রফুল্লচন্দ্র এই বিষয়ের প্রতি আগ্রহ ও আকর্ষণ বোধ করলেন না। কলকাতায় এফ. এ. ও বি. এ. ক্লাসে পড়ার সময় রসায়নের প্রতি তাঁর আগ্রহ ও আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়। এখানে এসে তাঁর নিজস্ব ক্ষেত্র যে রসায়ন তা দৃঢ়ীকৃত হলো। রসায়নের বিখ্যাত অধ্যাপক ক্রাম ব্রাউনের অধীনে তাঁর পড়াশোনা চলতে থাকল।

আলেকজান্ডার ক্রাম ব্রাউনের বয়স তখন চুয়াল্লিশ। তখন তিনি স্থূল হয়েও পড়ছিলেন। এই অমায়িক অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্রের ওপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। তাঁর এই অধ্যাপক সম্বন্ধে স্মৃতিচারণা করে প্রফুল্লচন্দ্র লিখেছেন,—"ক্রাম ব্রাউন অমায়িক ও উদারমনা এবং খাঁটি ভদ্রলোক ছিলেন। তিনি চীনা ভাষাও কিঞ্চিৎ জানিতেন। তাঁহার তীক্ষ্ণ মেধা জটিল গণিতের সমস্যা সহজেই সমাধান করিতে পারিত। শরীরতত্ত্বে কর্ণ সম্বন্ধে তাঁহার কিছু নূতন দানও ছিল। তাঁহার সহযোগী টমাস ফ্রেজার ও তাঁহাকে 'ফার্মাকোলজী'-র একটা নূতন শাখার প্রতিষ্ঠাতা রূপে গণ্য করা যাইতে পারে। উচ্চতর ক্লাসে, Crystallography প্রভৃতি জটিল বিষয়ের অধ্যাপনাতেই তাঁহার গভীর জ্ঞান ও পান্ডিত্যের পরিচয় ভাল করিয়া পাওয়া যাইত। ... তিনি চিন্তা করিতে ভালবাসিতেন এবং জৈব রসায়নের ছাত্রেরা তাঁহার আবিষ্কৃত *Graphic formula*-র জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে, কেননা, ইহা রসায়ন শাস্ত্রের উন্নতিতে বহুল পরিমাণে সহায়তা করিয়াছে।"[1] ক্রাম ব্রাউন তাত্ত্বিক বিষয়ের অধ্যাপনায় সিদ্ধ হস্ত ছিলেন, ব্যবহারিক বা লেবরেটরীতে কাজ করতেন না। 1879 সালে তিনি FRS হন।

---

* বিমলেন্দু মিত্র বলেছেন বি. এ. ক্লাসে, কিন্তু বি. এস-সি ক্লাশই সঠিক।

1. *আত্মচরিত*, পৃ—৪৮-৪৯

লেবরেটরীর ভার ন্যস্ত ছিল দু-জন সহযোগী ও ডেমনস্ট্রেটরের ওপর। তাঁরা হলেন ডঃ জন গিবসন ও ডঃ লিওনার্ড ডবিন। গিবসন ছিলেন হাইডেলবার্গের বিখ্যাত বুনসেনের ছাত্র। জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হওয়ায় তাঁদের পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ প্রণালী জার্মান রীতি অনুযায়ী হতো ; গিবসন তাঁর অধ্যাপকের রীতি অনুসরণ করতেন। প্রফুল্লচন্দ্রের এক প্রখ্যাত সহপাঠী ছিলেন জেমস ওয়াকার। ক্রাম ব্রাউন অবসর গ্রহণ করলে ওয়াকার ওই পদে বৃত হন। প্রফুল্লচন্দ্রের সময়ের আর দু-জন জুনিয়ার ছাত্র বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। তাঁরা হলেন আলেকজান্ডার স্মীথ, এবং হিউ মার্শাল। স্মীথ কলম্বিয়া ও শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হন ;মার্শাল 'কোবাল্ট অ্যালাম' আবিষ্কার করেন এবং 'পারসালফারিকা অ্যাসিড' সম্বন্ধে গবেষণা করে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন।

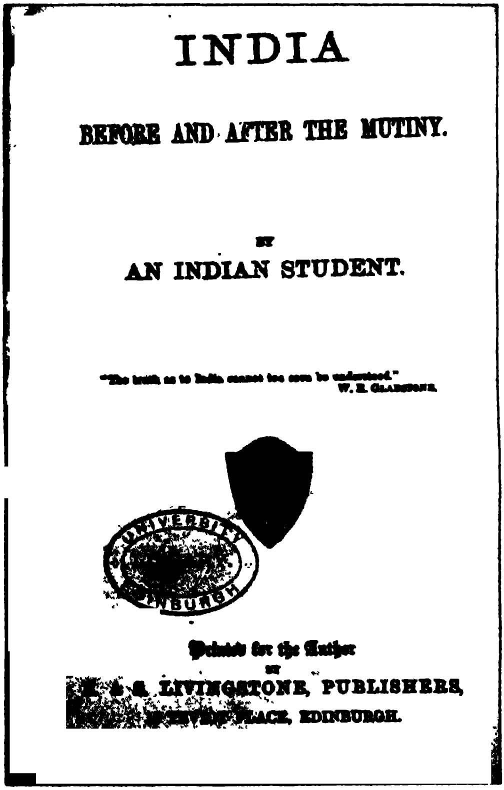
পাঠ্যাবস্থায় প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ

প্রফুল্লচন্দ্র তখন বি. এস-সি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। সেই সময় 1885 সালে এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর ছিলেন স্ট্যার্ফোড নর্থকোট। নর্থকোট আবার 1867-68 সালে ভারতসচিবও ছিলেন। তিনি *সিপাহী বিদ্রোহের পূর্বে ও পরে ভারতের অবস্থা"* *(India before and after the Mutiny)* সম্বন্ধে সর্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেন। ইতিপূর্বে আমরা প্রফুল্লচন্দ্রের বহুবিধ বিষয়ে আগ্রহ ও আকর্ষণের উল্লেখ করেছি। তিনি বিষয়টিতে উৎসাহিত হয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণে সঙ্কল্প করলেন। আত্মচরিতে তিনি লিখেছেন,—"আমার ইতিহাসচর্চার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি পুনরায় জাগ্রত হইল এবং কিছুকালের জন্য রসায়নশাস্ত্রের স্থান অধিকার করিল"। [পৃ—৪৯]

কাব্য-কবিতা নয়, গল্প-উপন্যাস নয় যে কল্পনা ও ভাবোচ্ছ্বাসের বাষ্পে পরিপূরিত করে লেখা যাবে। প্রবন্ধের জন্য মাল-মশলা চাই, প্রামাণিক তথ্যের সমাবেশ চাই। প্রফুল্লচন্দ্র ইতিহাস ও তথ্য সংগ্রহে প্রচুর পরিশ্রম করতে থাকলেন। ইংরেজী ও ফরাসী ভাষায় রচিত গ্রন্থাদি পড়তে থাকলেন ; পত্র-পত্রিকা থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে থাকলেন, এমন কি পুরোনো 'হ্যানসার্ড' অর্থাৎ পার্লামেন্টে বক্তৃতার রিপোর্টও বাদ গেল না। পড়লেন রুসেলের *L'Inde des Rajas* (Rajas of India), লানোই-র (Lanoye) *L'Inde Contemporaine* (The Contemporary India) ও *Revue des deux mondes*-এর (Survey of the two Worlds) অন্তর্গত ভারত সম্পর্কীয় প্রবন্ধাবলী। রাজস্বনীতি, বিনিময়নীতি ও বাজেট সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানের ও ধারণার জন্য পড়লেন ফসেটের *Political Economy* ও *Essays on Indian Finance*। 'ফর্টনাইট রিভিউ', 'কন্টেমপোরারি 'রিভিউ', 'নাইনটিন্থ সেঞ্চুরী' প্রভৃতি মাসিকপত্রগুলিও তাঁর দৃষ্টি এড়ালো না। নানা উপাদান সংগৃহীত করে সাজিয়ে গুছিয়ে অবশেষে প্রবন্ধটি লিখিত হলো। উপরে একটি *মটো* (motto)—মর্মজ্ঞাপক ছোট্ট বাক্য দিলেন : *"The truth as to India cannot too soon be understood*—W. K. Gladstone. প্রতিযোগিতায় প্রফুল্লচন্দ্রের প্রবন্ধ

proxime accesserunt বিবেচিত হলো, কিন্তু পুরস্কার পেলনা। এই প্রবন্ধের পরীক্ষক ছিলেন উত্তর প্রদেশের প্রাক্তন গভর্নর উইলিয়াম মুইর ও অধ্যাপক ম্যাসন। প্রফুল্লচন্দ্রের প্রবন্ধ সম্পর্কে তাঁদের মন্তব্য ছিল ঃ "ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ইহা শ্লেষপূর্ণ আক্রমণে পূর্ণ"। (আত্মচরিত, পৃ—৫১)।

প্রবন্ধটি বড়, দুটি অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে চারটি অধ্যায়, আর দ্বিতীয় অংশে তিনটি অধ্যায়। প্রধমাংশের শিরোনাম ঃ *Half-hours with the British rulers of India, Load Clive—Lord Mayo : 1756-1871* ; দ্বিতীয়াংশের শিরোনাম ঃ *The economical, intellectual and moral condition of India under British Rule*. প্রথমাংশের চারটি অধ্যায়ে পরপর ক্লাইভ, হেস্টিংস, কর্নওয়ালিস, ওয়েলেসলি, মিন্টো, আমহার্স্ট, বেন্টিঙ্ক, মেটকাফ, অকল্যান্ড, এলেনবোরো, হার্ডিঞ্জ, ডালহৌসি, ক্যানিং, লরেন্স ও মেয়োর শাসন ও নীতি আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয়াংশের প্রথমে ভারতে অর্থনীতি, দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষের বিবরণ, দ্বিতীয় অধ্যায়ে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও 'ইয়ং ইন্ডিয়া'-র আলোচনা আর শেষ অধ্যায়ে ইংরেজ-পূর্ব ও ইংরেজ-পরবর্তী ভারতের তুলনামূলক চিত্র দেখা যায়।


INDIA

BEFORE AND AFTER THE MUTINY.

AN INDIAN STUDENT.

W. E. GLADSTONE.

UNIVERSITY EDINBURGH

LIVINGSTONE, PUBLISHERS,

PLACE, EDINBURGH.

মুইর ও ম্যাসন প্রবন্ধটিকে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে শ্লেষপূর্ণ আক্রমণ বলে

অভিহিত করলেও আসলে প্রফুল্লচন্দ্র এই প্রবন্ধে ব্রিটিশের ন্যায় ও নীতি বিসর্জন দিয়ে অপশাসন, শিক্ষাকে উপেক্ষা ও ভারতবাসীকে করভারে জর্জরিত করার প্রকৃত বাস্তব চিত্র অঙ্কন করেছেন ; তথ্যসহযোগে উপস্থাপিত করে বলেছেন,—"The great Mutiny had entirely unhinged the financial equilibrium. In 1857 the public debt of India stood at about £ 60,000,000. In 1863 it rose to the incredible sum of nearly £ 110, 000,000. Thus the direct indirect expenditure incurred for the Mutiny amounts to almost £45,000,000. And it is notorious that England did not contribute a farthing to India as financial relief."

ব্রিটিশ শাসন কখনো অর্থনৈতিক রিলিফের কথা ভাবেনি। ভেবেছে কিভাবে কত রকমে করভাবে জর্জরিত করে এই দেশের দরিদ্র মানুষের রক্তশোষণ করা যায়। লবণ কর বিষয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে প্রফুল্লচন্দ্র লিখেছিলেন,—"It is notorious that the wretched people, unable to buy salt, are often obliged to scrap up the saline incrustations from the sea-shore, to be used as condiment; but even then they are prosecuted for defranding the revenue-collector, as if they had been guilty of illicit distillation."

সাম্রাজবাদীরা শোষণের স্বার্থে উপনিবেশ গড়ে, আর তার সম্প্রসারণ ও রক্ষার স্বার্থে যুদ্ধ করে। আর যুদ্ধের ব্যয়ের বোঝা চাপায় উপনিবেশের বাসিন্দাদের ঘাড়ে। প্রফুল্লচন্দ্র তীব্র ভাষায় সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশদের আক্রমণ করে বলছেন ঃ এই এখন নিউজিল্যান্ড যুদ্ধ, এই এখন চীনা যুক্ত, পারসীয় যুদ্ধ, আফগান ও মিশরীয় যুদ্ধ, আর "unhappy India is made the scapegoat each time for the sins, follies or blunders of English statesmen at home". ইংরেজরা নিজেরা দেশে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য মোট আয়ের 4%-এরও বেশী ব্যয় করবে, অথচ ভারত থেকে সংগৃহীত কর থেকে ছিটেফোঁটাও ব্যয় করবে না।

দেশ ও জাতি সম্পর্কে সচেতন প্রফুল্লচন্দ্র আর মহৎ এক কার্য সম্পন্ন করতে সঙ্কল্প করলেন। তিনি তাঁর প্রবন্ধটি ফেরৎ নিয়ে ছাপাবার ব্যবস্থা করলেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের একটি নিবেদনসহ বিতরণ করলেন। এখানে আমরা তাঁর 'আত্মচরিত' (পৃ—৫১) থেকে কিছুটা উদ্ধৃত করছি ঃ "ভারত-ব্যাপারে ইংলন্ডের গভীর অবহেলা ও উদাসীন্যের ফলেই ভারতের বর্তমান শোচনীয় অবস্থার উৎপত্তি ; ইংলন্ড এ পর্যন্ত ভারতের প্রতি তাহার পবিত্র কর্তব্য পালন করে নাই। তোমরা গ্রেটব্রিটেন ও আয়র্লান্ডের ভবিষ্যৎ বংশধরগণ, ভারতে অধিকতর উদার, ন্যায়-সঙ্গত ও সহৃদয় শাসন নীতি অবলম্বনের জন্য তোমাদের দিকেই আমরা চাহিয়া আছি। সেই শাসননীতির উদ্দেশ্য কতকগুলি মামুলী বুলি হইবে না, তাহার উদ্দেশ্য হইবে ইংলন্ড ও ভারতের মধ্যে ঘনিষ্ঠতর মৈত্রীর বন্ধন স্থাপন। তোমাদের উপরই আমাদের সমস্ত আশা ভরসা।" বলা বাহুল্য, যাদের দিকে চেয়ে প্রফুল্লচন্দ্রের এই আবেদন তারা লঙ্কায় এসে সবাই রাবণ হলো। প্রফুল্লচন্দ্রের বুঝতে অসুবিধা হয়নি যে, 'ভিক্ষা নীতি'-তে কোন কাজ হবে না, আর রাজা জনের হাত থেকে 'ম্যাগনা কাড়া' মত ঘটনাই শ্রেয়।

কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যেই নয়, তিনি প্রবন্ধটির একটি কপি ভারত-সমব্যথী জন ব্রাইট-এর নিকট পাঠালেন, এবং একটি চিঠিতে ভারতের সঙ্গে ব্রহ্মদেশের অন্তর্ভূক্তি এবং তার ফলে ভারতের ওপর লবণশুল্ক বাবদ ট্যাক্স বৃদ্ধির অন্যায় নীতির প্রতি ব্রাইটের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। প্রত্যুত্তরে ব্রাইট লিখলেন,—"আমি আপনারই মত লর্ড ডাফরিনের বর্মানীতির জন্য দুঃখিত এবং তাহার তীব্র নিন্দা করি। পুরাতন পাপ ও অপরাধের নীতির ইহা পুনরাবৃত্তি—যে নীতি চিরদিনের জন্য পরিত্যক্ত হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করিয়াছিলাম। ভারতে আমাদের প্রকৃত স্বার্থ কি, তৎসম্বন্ধে এখানকার জনসাধারণের মধ্যে গভীর অজ্ঞতা—সঙ্গে সঙ্গে ঘোর স্বার্থপরতাও রহিয়াছে।" [আত্মচরিত, পৃ—৫২]

ইংরেজ চরিত্রের কলঙ্কময় দিকটি সর্বসমক্ষে উদ্ঘাটনের জন্য ব্রাইটের সম্মতিক্রমে টাইমস ও অন্যান্য সংবাদপত্রে তাঁর চিঠি প্রকাশের জন্য পাঠালেন প্রফুল্লচন্দ্র। পরদিন বড় বড় পোস্টারে "ভারতীয় ছাত্রের নিকট জন ব্রাইটের পত্র" প্রকাশিত হলো। রয়টার যে পত্রের সারমর্ম ভারতে পাঠিয়েছিল তার কিয়দংশ আমরা ওপরে উদ্ধৃত করেছি।

আমাদের পরম প্রাপ্তি যে, প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর প্রবন্ধ রচনার জন্য পুরস্কৃত হননি। যদি হতেন, তা হলে ইংরেজ শাসকদের কালিমালিপ্ত চরিত্র এমন ভাবে উদ্ঘাটিত হতো না, অন্তত একজন শিক্ষিত ইংরেজও তা স্বীকার করতনা।

Essay on India

1886 সালে প্রফুল্লচন্দ্র 'Essay on India' প্রবন্ধটি লেখেন। ওই প্রবন্ধের আলোচিত বিষয় হলো ইংল্যাণ্ড ভারতের সামাজিক উন্নতিতে প্রশংসনীয় কাজ করেছে। রাশিয়া কখনো কখনো বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজা বন্ধ করে দিলেও ইংল্যাণ্ড কখনো করেনি। লক, বার্ক, হ্যালম ও মেকলের গ্রন্থাবলী পাঠ্যতালিকায় স্থান পেয়ে আছে বলে শিক্ষিতের মন নিয়মতন্ত্রের মূল সূত্র দ্বারা অনুপ্রাণিত হচ্ছে; তারা যেন রাজনৈতিক বুদ্ধির কেন্দ্রস্বরূপ; তা থেকে নানা চিন্তা বিকীর্ণ হচ্ছে। ভারতে যে-সব ঘটনা ঘটছে, তা ইংল্যাণ্ডের জনসাধারণের কাছে তুলে ধরতে হবে; তাদের সচেতন করতে হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, ইংল্যান্ড প্রকৃত তথ্য ও যুক্তি স্বীকার করতে চায় না, বরং নবোত্থিত জাতীয়তার ভাবকে পিষে মারতে চায়; স্বার্থপরতার বশবর্তী হয়ে ভারতীয়দের ওপর অযোগ্যতা ও অক্ষমতার ভার চাপাতে চায়। ব্রিটিশ রাজনীতিবিদদের কথায় ও কাজে কোন সামঞ্জস্য দেখা যায় না। নিজেদের পাপ ও কলঙ্ককে ঢাকবার জন্য কোন কোন ইংরেজ লেখক ব্যতিক্রমী স্বেচ্ছাচারী ধর্মান্ধ মুসলমান শাসনের সহিত ব্রিটিশ শাসনের তুলনা করছে। কিন্তু সাধারণভাবে ভারতে মুসলমান শাসন ব্রিটিশদের তুলনায় আদৌ নিকৃষ্ট ছিল না। উদাহরণস্বরূপ প্রফুল্লচন্দ্র বলেন,—"একথা ভুলিলে চলিবে না, যখন রানী মেরী ধর্মসম্বন্ধীয় মতভেদ ও গোঁড়ামির জন্য নিজের প্রজাদিগকে অগ্নিকুণ্ডে বা কারাগারে নিক্ষেপ করিতেছিলেন, ঠিক সেই সময়ে পরাক্রান্ত মোগল বাদশাহ আকবর

সর্বধর্মের প্রতি উদারনীতি ঘোষণা করিয়াছিলেন এবং মৌলবী, পন্ডিত, রাবি এবং মিশানারীকে দরবারে আহ্বান করিয়া তাঁহাদের সঙ্গে বিভিন্ন ধর্মের সম্বন্ধে দার্শনিক আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ... ধর্মবিষয়ে উদারতা মোগল বাদশাহদের পক্ষে সাধারণ নিয়ম ছিল, বিরল ঘটনা ছিল না।" [আত্মচরিত, পৃ—৫৪]

'স্কটম্যান' পত্রিকায় এই নিবন্ধটি উচ্ছ্বসিতভাবে প্রশংসিত হয়। ওই পত্রিকায় বলা হয় বইটি খুবই চিত্তাকর্ষক ; ভারত সম্বন্ধে এতে এমন তথ্য আছে যা অন্য কোথাও দেখা যায় না।

সেই ছেলেবেলা থেকে প্রফুল্লচন্দ্রের ইতিহাস ও পুরাতত্ত্বে আগ্রহ ; দেশ ও জাতি সম্বন্ধে সচেতনতা ; দেশের জাজ্বল্যমান সমস্যা নিয়ে ভাবনা-চিন্তা। তারই প্রথম প্রকাশ ঘটল ছাত্রাবস্থায় দুটি নিবন্ধের মাধ্যমে। পরবর্তীকালে তিনি হলেন ভারতের শ্রেষ্ঠ স্বাদেশিকগণের অন্যতম। "মনে-প্রাণে, অন্তরে-বাহিরে, অস্থিমজ্জায়, চিন্তায় ও কর্মে এমন স্বদেশী মানুষ বাঙলায় বিরল। অথচ স্বদেশীর চমকপ্রদ, সুবিশাল, কোলাহলমুখর রাজনীতিক্ষেত্রের সহিত তাঁর সাক্ষাৎ যোগ ছিল না।"[2]

রসায়নের রস আস্বাদন

'India before and after the Mutiny' লেখার সময় প্রফুল্লচন্দ্র বি. এস-সি* পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। প্রবন্ধটি লেখার পর তিনি পরীক্ষার জন্য গভীর অধ্যয়নে নিয়োজিত হলেন এবং পরীক্ষাগারেও তাঁর সময় অতিবাহিত হতে থাকল। 1885 সালে বি. এস-সি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ডি. এস-সি-র জন্য প্রস্তুত হতে থাকলেন। অধ্যাপক আলেকজান্ডার ক্রাম ব্রাউনের অধীনে তাঁর গবেষণা চলতে থাকল। মৌলিক গবেষণাপত্র দাখিল করতে হবে। একদিকে লেবরেটরীতে গবেষণা, আর অন্যদিকে ইংরেজী, ফরাসী ও জার্মান ভাষায় লিখিত রসায়ন গ্রন্থাদির পাঠ চলতে থাকল। মৌলিক প্রবন্ধ (thesis) প্রস্তুত হলো ; দাখিল করলেন 1887 সালে ; পরীক্ষকগণ সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে ডি. এস-সি. উপাধি প্রদান করলেন। পরীক্ষকগণের মধ্যে ক্রাম ব্রাউন তো ছিলেনই, তা ছাড়া অপর দু-জন হলেন জন গিবসন ও লিওনার্ড ডবিন।** ডি. এস-সি. উপাধি পাওয়া সম্বন্ধে প্রফুল্লচন্দ্র আত্মশক্তিতে ভরপুর ছিলেন। "ঐ বৎসর আমিই একমাত্র ডক্টর উপাধিপ্রার্থী ছিলাম এবং অধ্যাপকদের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। তাঁহাদের চোখের উপর তাঁহাদেরই পরিচালনাধীনে আমি রসায়ন শাস্ত্রে কতদূর অগ্রসর হইয়াছি এবং আমার মৌলিক গবেষণার মূল্য কি, তাহা তাঁহারা ভালই জানিতেন।" [আত্মচরিত, পৃ—৫৫] তাঁর গবেষণা সাধারণভাবে 'পর্যায় সূত্রের শ্রেণীবিভাগ' সম্বন্ধে ;

2. *আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের চিন্তাধারা,* পৃ—১৮৩

* কোন কোন লেখক বি. এ. পরীক্ষা বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু প্রফুল্লচন্দ্র স্বয়ং বি. এস-সি. পরীক্ষার উল্লেখ করেছেন।

** গিবসন ও ডবিনের নাম দেবাশিস মজুমদার উল্লেখ করেছেন, পশ্চিমবঙ্গ, পৃ—৪৮

বিশেষভাবে "Congugated ('Gepaarte') Sulphates of Copper-Magnesium Group : A Study of Isomorphous Mixtures and Molecular Combination." থিসিসটি শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হওয়ায় তিনি হোপ প্রাইজ লাভ করলেন, এবং গিলক্রাইস্ট বৃত্তির মেয়াদ পূর্ণ হলেও তিনি পুরস্কারস্বরূপ পঞ্চাশ পাউন্ড করে পেতে থাকলেন। রসায়নের রসে নিমজ্জিত প্রফুল্লচন্দ্র আরো এক বৎসর ধরে রসায়নচর্চায় মনোনিবেশ করার সঙ্কল্প করলেন। এই সময় তিনি এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেমিক্যাল সোসাইটির সহসভাপতি নির্বাচিত হন এবং সভাপতি ক্রাম ব্রাউনের অনুপস্থিতিতে সভা পরিচালনার ভারপ্রাপ্ত হন।

বিজ্ঞানে আকস্মিকতা

কখনো কখনো বিজ্ঞানে এমন আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে যার জন্য গবেষক আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না অর্থাৎ সেই বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করেননি বা তাঁর পরীক্ষাধীন বিষয়ও ছিল না। এর একটি অতিপরিচিত কাহিনী আপেল পড়ার ঘটনা থেকে নিউটনের মহাকর্ষ আবিষ্কার। এরকম বেশ কিছু আবিষ্কার বিজ্ঞানের ইতিহাসে দেখা যায়। প্রফুল্লচন্দ্রের নিজের গবেষণা জীবনেই এরকম ঘটনা ঘটেছিল ঃ *মারকিউরাস নাইট্রাইটের* আবিষ্কার। কিন্তু তা পরবর্তী সময়ের ঘটনা। এডিনবার্গেও প্রফুল্লচন্দ্র এরকম একটি ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

হোপ প্রাইজ স্কলার হিসাবে প্রফুল্লচন্দ্রের অন্যতম একটি কাজ ছিল গবেষণাগারে অধ্যাপককে সহায়তা করা। এতে এই সুবিধা ছিল যে অধ্যাপনার কাজটিও শেখা হয়ে যায়। ছাত্র হিসাবে হিউ মার্শাল প্রফুল্লচন্দ্রের জুনিয়ার ছিলেন। গবেষণা সম্পর্কে তিনি মার্শালকে উপদেশ ও পরামর্শ দিতেন। একবার তিনি মার্শালকে কতকগুলি লবণের (salt) নমুনা দিলেন তার বিশ্লেষণ শক্তি পরীক্ষার জন্য। অপরকে পরীক্ষা করা প্রফুল্লচন্দ্রের ছেলেবেলা থেকে প্রবৃত্তি ছিল, তিনি তাঁর পিতার ভূগোল-জ্ঞানের পরীক্ষা করতেও ছাড়েন নি। যাই হোক, লবণগুলি তিনি ডি. এস-সি. থিসিসের জন্য তৈরী করেছিলেন, এবং একটি মধ্যে "ডবল সালফেট অফ কোবাল্ট, কপার ও পটাশিয়াম" ছিল। মার্শাল তড়িৎপ্রণালী অবলম্বনে বিশ্লেষণ করলেন। কিন্তু তিনি দেখে বিস্মিত হলেন যে, নীচে একপ্রকার দানাদার (Crystalline) পদার্থ জমে আছে। ওই পদার্থটি বিশ্লেষণ করে জানা গেল যে তা "কোবাল্ট অ্যালাম"—কোবাল্টের স্ফটিক। বিক্রিয়ায় যে-সব পদার্থ উৎপন্ন হলো তার মধ্যে 'পারসালফারিক অ্যাসিড' আর একটি। মার্শাল বিখ্যাত হয়ে পড়লেন। খুব সম্ভব এই অভিজ্ঞতা থেকে গবেষক হিসাবে তাঁর মন পূর্ব থেকেই প্রস্তুত থাকায় মারকিউরাস নাইট্রাইট সনাক্তকরণ সম্ভব হয়েছিল।

এডিনবার্গে প্রফুল্ল-পূর্ব ডক্টরেট

প্রফুল্লচন্দ্রের পূর্বে এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রসায়নে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়। অঘোরনাথের নাম প্রথমে শোনেন ভ্যান্ট হফের

নিকট থেকে। তিনি ভ্যানস ডানলপ বৃত্তি লাভ করে ইউরোপে রসায়ন শাস্ত্রের জ্ঞান সমৃদ্ধ করেন। অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন অঘোরনাথ ; তাঁর রসায়ন গবেষণা সম্বন্ধে নানা কল্পনা ছিল। দেশে প্রত্যাবর্তন করে তিনি হায়দ্রাবাদ রাজ্যের শিক্ষা বিভাগের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন। কিন্তু রাজনৈতিক আন্দোলনের সহিত যুক্ত হওয়ায় ওই রাজ্য থেকে বিতাড়িত হন। প্রখ্যাত সরোজিনী নাইডুর পিতা ছিলেন অঘোরনাথ। প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর আত্মজীবনীতে বলেছেন,—"বড়ই দুঃখের বিষয়, অঘোরনাথের মহৎ প্রতিভার দান হইতে ভারতবর্ষ, বলিতে গেলে বঞ্চিত হইয়াছে। অন্ততপক্ষে রসায়ন বিজ্ঞান সম্বন্ধে তিনি চেষ্টা করিলে অনেক কিছু করিতে পারিতেন।"

অঘোরনাথ ডক্টরেট হন 1875 সালে—প্রফুল্লচন্দ্রের এক যুগ আগে। ওই সময় ভারতে রসায়ন গবেষণার কোন সুযোগই ছিল না। সুতরাং অঘোরনাথ প্রতিভারধর হলেও রসায়ন বিজ্ঞানের গবেষণায় বেশী-কিছু করতে পারতেন বলে মনে হয় না।

স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ও সুপারিশপত্র সংগ্রহ

1888 সালে শীতের সেসন শেষ হওয়ার পর প্রফুল্লচন্দ্র দেশে ফিরে আসার সঙ্কল্প করলেন। তার আগে 'হাইল্যান্ড' ভ্রমণ করে বিখ্যাত স্থানগুলি দেখে নিলেন। প্রকৃতি প্রেমিক ও সাহিত্য রসিক প্রফুল্লচন্দ্র স্কট বর্ণিত *Lady of the Lake*-এর স্থানগুলি দেখলেন। পাহাড়ে উঠতে উঠতে তাঁর স্মরণ হলো ঃ

Bend against the Steepy hill thy breast
And burst like a torrent from the crest.

অতঃপর লক লমন্ড, বেন·নেভিস পরিদর্শন করলেন। শেষোক্ত স্থানে মানমন্দির দেখাও বাদ গেল না। 'কালোডেন মূর' যুদ্ধ ক্ষেত্র দেখে এডিনবার্গে ফিরে এলেন প্রফুল্লচন্দ্র।

সেই সময় শিক্ষাবিভাগে দু-রকম পদ ছিল ঃ ইম্পিরিয়াল ও প্রোভিন্সিয়াল। ইম্পিরিয়াল সার্ভিস ছিল অধিক মানমর্যাদার, এবং এতে মাইনেও বেশী ছিল। সুতরাং প্রফুল্লচন্দ্র যে এই সার্ভিসে যোগদান করার আকাঙ্খা পোষণ করবেন তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু ওই সার্ভিসে ভারতীয়দের প্রায় নিয়োগ করা হতো না, ইংরেজদের ছিল একচেটিয়া। এইসব অসুবিধা ও বাধার কারণে প্রফুল্লচন্দ্র বিখ্যাত ব্যক্তি ও প্রভাবশালীদের সুপারিশপত্র সংগ্রহ করতে থাকলেন। তাঁর অধ্যাপক ক্রাম ব্রাউন রসায়নে প্রফুল্লচন্দ্রের অসামান্য জ্ঞান ও নৈপুণ্যের উল্লেখ করে সুপারিশপত্র দিলেন। তা ছাড়া তিনি আরো কয়েকটি পরিচয়পত্রও দিলেন। তার মধ্যে একটি ছিল ভূতপূর্ব রসায়ন অধ্যাপক লর্ড প্লেফেয়ারকে। অধ্যক্ষ স্যার উইলিয়াম মুইরও একখানি পরিচয়পত্র দিলেন স্যার চার্লস বার্নাডকে। প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর 'আত্মচরিত'-এ লিখেছেন,—"স্যার চার্লস বানার্ড বর্মার প্রথম গভর্নরের পদ হইতে অবসর লইয়া ইন্ডিয়া কাউন্সিলের সদস্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বানার্ড অতি ভদ্রলোক, সহৃদয় এবং উদারপ্রকৃতি ছিলেন। আমি পরে জানিতে পারি যে তিনি একাধিকবার আর্থিক দুর্দশাগ্রস্ত ভারতীয় ছাত্রদিগকে সাহায্য

করিয়াছেন। স্যার চার্লস আমাকে জলযোগের নিমন্ত্রণ করিলেন এবং প্রতিশ্রুতি দিলেন যে ভারতীয় শিক্ষাবিভাগে আমাকে নিয়োগ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন। লর্ড প্লেফেয়ারও তদানীন্তন ভারতসচিব লর্ড ক্রসকে আমার পক্ষ সমর্থন করিয়া পত্র লিখিলেন।"

ক্রাম ব্রাউন, অধ্যক্ষ মূইর, প্লেফেয়ার, বানার্ড প্রমুখ ছিলেন রবীন্দ্র কথিত বড় ইংরেজ। চিত্ত ও মননে ওঁরা সত্যই বড় ছিলেন। কিন্তু ভারতে যাঁদের হস্তে শাসনের ভার অপির্ত ছিল তাঁরা হলেন ছোট ইংরেজ। বঞ্চনা, শোষণ ও নিপীড়নই ছিল তাঁদের ন্যায় ও নীতি। ফলে, কারুর কোন সুপারিশপত্রে কোন কাজ হলো না। "বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।"

দু-মাস ধরে লন্ডনের এক শহরতলি হ্যানওয়েলে অবস্থান করতে থাকলেন প্রফুল্লচন্দ্র। কিন্তু কর্মহীন আলস্যে দিনযাপন প্রফুল্ল চরিত্র বিরুদ্ধ। লন্ডনের কেমিক্যাল সোসাইটির লাইব্রেরীতে তাঁর প্রিয় বিষয় রসায়ন নিয়ে পড়াশোনা করতে থাকলেন; জার্মান সাময়িকপত্র থেকে 'নোট' করতে থাকলেন।

ইংলন্ড থেকে প্রত্যাবর্তনের মুহূর্ত ঘনিয়ে এল। প্রফুল্লচন্দ্র বার্নাডের নিকট বিদায় গ্রহণ করতে এলেন। তাঁর আর্থিক সম্বল নিঃশেষিত, চাকরীর কোন আশা নেই, আর সহৃদয় বার্নাডের আর্থিক সাহায্যের প্রস্তাব, এহেন পরিস্থিতিতে প্রফুল্লচন্দ্রের কেঁদে ফেলার মত অবস্থার সৃষ্টি হলো। তখন প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ সি. এইচ. টনি ছুটি নিয়ে ইংলন্ডে অবস্থান করচিলেন। ওই সময় টনি বার্নাডের গৃহে তাঁর আত্মীয় হিসাবে অবস্থান করছিলেন। লন্ডন ত্যাগের পূর্বে একদিন বার্নাড প্রাতঃরাশের নিমন্ত্রণ আসরে টনির সঙ্গে প্রফুল্লচন্দ্রে পরিচয় করে দিলেন। অধ্যক্ষ টনি বাংলার শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টার স্যার আলফ্রেড ক্রফটকে একটি পরিচয়পত্র লিখে মন্তব্য করলেন, "ডাক্তার রায়কে নিয়োগ করিলে তিনি যে শিক্ষাবিভাগের অলঙ্কারস্বরূপ হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।" টনি সাহেব আর যাই হোন, তাঁর এই মন্তব্য অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে তিনি কেবল শিক্ষাবিভাগের অলঙ্কারই হননি, মণি-রত্ন-স্বরূপ হয়েছিলেন।

আশা ও নিরাশার দ্বন্দ্বে দোদুল্যমান প্রফুল্লচন্দ্র ঃ দেশে ফিরে সম্মানজনক চাকরী পাবেন, কি পাবেন না। কিন্তু তাঁকে লন্ডন ছাড়তেই হবে। ভাড়া ও পাথেয় বাবদ মাত্র পঞ্চাশ পাউন্ড, গিলক্রাইস্ট বৃত্তি থেকে। জাহাজ ভাড়া গেল সাইত্রিশ পাউন্ড, অবশিষ্ট অর্থে প্রয়োজনীয় কিছু জিনিসপত্র কেনা হলো। লন্ডন থেকে ব্রিন্দিসি পর্যন্ত ট্রেনের টিকিটও কেনা হলো। ফ্রান্স ও ইটালির মধ্য দিয়ে প্রফুল্লচন্দ্র চললেন ব্রিন্দিসির উদ্দেশ্যে। জাহাজে উঠলেন, তখন পকেটে মাত্র কয়েকটি শিলিং।

তৃতীয় অধ্যায়

জাহাজ ভিড়ল জেটিতে

জাহাজ—পি অ্যান্ড ও কোম্পানীর জাহাজ ভিড়ল জেটিতে 1888 সালের আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে।* প্রফুল্লচন্দ্র কপর্দকহীন। লাগেজ রইলো কেবিনে, আট টাকা ধার করলেন 'হেড পার্সারের' কাছে। কলকাতাস্থিত অনেক বন্ধুদের মধ্যে একজনের বাড়ীতে গিয়ে উঠলেন।** কোট-পেন্টালুন ত্যাগ করলেন। বন্ধুর কাছ থেকে ধার করে ধুতি ও চাদর অঙ্গে তুলে নিলেন। পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনদের সহিত দেখা করার উদ্দেশ্যে রাঢুলি যাত্রা করলেন। কয়েক দিনের মধ্যে কলকাতায় ফিরে এসে বন্ধু ডাঃ অমূল্যচরণ বসুর বাড়ীতে উঠলেন। বেকার হয়ে বন্ধুর বাড়ীতে অবস্থান করা কারুর পক্ষেই সম্মান ও মর্যাদার নয়, একথা অনুভব করতে প্রফুল্লচন্দ্রের বিন্দুমাত্র অসুবিধে হয়েছিল বলে মনে হয় না। তাই তিনি চাকরীর জন্য ব্যগ্র হয়ে পড়লেন।

দেখাসাক্ষাৎকার

টনি সাহেবের পরিচয়পত্র ছিল। শিক্ষাবিভাগের ডাইরেক্টার স্যার আলফ্রেড ক্রফটকে লেখা। পেডলার সাহেব ছিলেন প্রফুল্লচন্দ্রের শিক্ষক। তিনি উভয়ের সহিত দেখা করলেন। পেডলার সাহেব রসায়নের শিক্ষাদান কেবল লেকচারের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে ওই বিষয়টিকে গবেষণাময় ও ব্যবহারিক করার জন্য শিক্ষাবিভাগের ডাইরেক্টরের নিকট অতিরিক্ত একটি অধ্যাপক পদ মঞ্জুর করার জন্য অনুরোধ করেন। ওই অধ্যাপক পদটি লাভের জন্য প্রফুল্লচন্দ্র প্রার্থী হলেন। দার্জিলিং গিয়ে দেখা করলেন লেঃ গভর্নর স্টুয়ার্ট বেলির সঙ্গে। দীর্ঘ প্রায় এক বছর ধরে অপেক্ষা করার পর প্রফুল্লচন্দ্র 1889 সালের 15ই জুন বাংলা শিক্ষা বিভাগে অস্থায়ী অধ্যাপকের পদ প্রাপ্ত হলেন। বেতন মাসিক 250 টাকা মাত্র।

প্রফুল্লচন্দ্র খুশী হননি। তাঁর মত বিলাতে শিক্ষাপ্রাপ্ত উচ্চ ডিগ্রীধারীর ইম্পিরিয়াল সার্ভিসে পদপ্রাপ্তিই স্বাভাবিক ছিল। তিনি দার্জিলিং গিয়ে ক্রফটের নিকট অভিযোগ করলেন এই অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে। ক্রফট কৃত্রিম অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন,—"আপনার জন্য জীবনে অনেক পথ খোলা আছে। কেহ আপনাকে এই পদ গ্রহণ করিবার জন্য বাধ্য করিতেছে না।" বস্তুতপক্ষে, প্রফুল্লচন্দ্রকে ইম্পিরিয়াল সার্ভিসে

---

* শান্তিময় চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন জুলাই মাসে : *Acharya Prafulla Chandra Ray, p. 10* তথ্যটি ভুল, সঠিক তথ্য আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহ। দ্রষ্টব্য : *'আত্মচরিত'* পৃ—৬১

** এই একজন বন্ধু জগদীশচন্দ্র কিনা, প্রফুল্লচন্দ্র স্বয়ং উল্লেখ করেননি।

নেওয়া ক্রফটের ইচ্ছা ছিল। কিন্তু বাংলার শাসন কর্তা চার্লস ইলিয়টের ফতোয়া জারীর ফলে তা সম্ভব হয়নি। ইলিয়টের ফতোয়া ছিল ঃ "ভারত সচিব যত দিন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের প্রস্তাবাবলী অনুমোদন না করেন, ততদিন পর্যন্ত ভারতীয়দিগকে ইম্পিরিয়াল বিভাগে গ্রহণ করা স্থগিত রহিল।" [আত্মচরিত, পৃ—৬৫] কিন্তু ভারতীয়দের জন্য 'বিড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধিবে কে?'

এক বছরের কর্মহীন জীবন

1888 সালের আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে 1889 সালের 15 ই জুন পর্যন্ত প্রফুল্লচন্দ্র কর্মহীন, বাসাহীন। স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে বন্ধু ডাঃ অমূল্যচরণ বসুর গৃহে উঠেছিলেন বটে, কিন্তু অনাহুত হয়ে আর কতদিন বন্ধু গৃহে অবস্থান করা যায়। প্রথমে তাঁকে এ-বন্ধু সে-বন্ধু করে দিন কাটাতে হয়েছিল বলে অনুমান করা যায়। অবশেষে বন্ধুবর জগদীশচন্দ্র ও লেডী অবলার আহ্বানে তাঁদের বাড়ীতে অবস্থান করতে থাকলেন। তখন জগদীশচন্দ্র ও তাঁর ভগিনীপতি ডাঃ মোহিনীমোহন বসু 64/2 মেছুয়াবাজারে চন্দনগরের ব্যানার্জিদের বিশাল বৈঠকখানা বাড়ী ভাড়া নিয়ে থাকতেন। এই বাড়ী সংলগ্ন প্রশস্ত ফাঁকা জমি ও পুকুর ছিল। প্রফুল্লচন্দ্রের সময় কাটে না। দেবেন্দ্রনাথ প্রমুখ বাগান তৈরী করেন, আর প্রফুল্লচন্দ্র কোমরে ধুতি জড়িয়ে কোদাল নিয়ে মাটি কুপোতে থাকেন।

কেশহীন সামসনের যে অবস্থা, তখন প্রফুল্লচন্দ্রেও সেই অবস্থা। রসায়নে ডি. এস-সি, অথচ কর্ম নেই, আর লেবরেটরীও নেই। এই অবস্থায় প্রকৃতি চর্চায় মনোনিবেশ করলেন। উদ্ভিদ চর্চার মধ্য দিয়ে তাঁর সময় অতিবাহিত হয়ে চলল। কলকাতার নিকটবর্তী অঞ্চল থেকে কয়েক প্রকার উদ্ভিদের নমুনা সংগ্রহ করলেন। জীবজন্তু, গাছপালায় প্রফুল্লচন্দ্রের আগ্রহ ছিল। পরে তিনি *Nature Club* খোলেন। এই ক্লাবের সদস্য ছিলেন ডাঃ নীলরতন সরকার, ডাঃ প্রাণকৃষ্ণ আচার্য, আলিপুর পশুশালার সুপারিন্টেডেন্ট রামব্রহ্ম সান্যাল, অধ্যক্ষ হেরম্বচন্দ্র মৈত্র ও ডাঃ বিপিন বিহারী সরকার। নেচার ক্লাবের সভা মাসে একবার করে বসত। বহুবিধ বিষয়ে আগ্রহী প্রফুল্লচন্দ্র একদিন প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে একটি মৃত ভাম (*Indian Palm Civet*) কুড়িয়ে এনে ডাঃ সরকার ও ডাঃ আচার্যের সাহায্যে শবব্যবচ্ছেদ করলেন। গ্রীষ্মের ছুটিতে গ্রামে গিয়ে গোখুরা সাপ ধরিয়ে তার বিষদাঁত পরীক্ষা করলেন ; ফেরারের *Thana Tophidia* অবলম্বনে সর্পদংশনের রহস্য আলোচনা করলেন।

আচার্য জগদীশচন্দ্র ও লেডী অবলার উদারতা, প্রশস্ত হৃদয় ও বন্ধুপ্রীতির তুলনা নেই। তাঁরা চাণক্য শ্লোকোক্ত প্রকৃত বন্ধু ছিলেন। সেই দুঃসময়ে তাঁরা প্রফুল্লচন্দ্রকে এমন আত্মীয় জ্ঞানে সমাদর করেছিলেন যে, তাঁকে কখনো গৃহৈষণার কবলে পড়তে হয়নি। লেডী অবলা ও জগদীশ ভগিনী সুবর্ণপ্রভার সহিত তাঁর প্রীতির বন্ধন অটুট ছিল। প্রফুল্লচন্দ্রের সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন দিনগুলিতে মহান জগদীশচন্দ্র ও মহিয়সী অবলা সান্ত্বনা, উৎসাহ ও উদ্দীপনা না যোগালে তিনি ধৈর্যচ্যুত হয়ে হয়তো অন্য কোন কর্মে নিযুক্ত হয়ে পড়তেন। তা হলে ভারতে রসায়ন চর্চা কত বছর পিছিয়ে যেত বলা যায় না। আর প্রিয়দারঞ্জন, নীলরতন, জ্ঞান ত্রয়ী প্রমুখ বিজ্ঞানীদের কি আবির্ভাব সম্ভব হতো?

প্রেসিডেন্সী কলেজ

প্রস্তুতি পর্ব

প্রতীক্ষা শেষ হলো, অমানিশা শেষে সূর্যোদয় হলো। প্রফুল্লচন্দ্র প্রেসিডেন্সী কলেজে অস্থায়ী রসায়ন অধ্যাপক হিসাবে 250 টাকা বেতনে সেসনের প্রথমেই যোগদান করলেন। ছাত্রদের নিকট বিষয়টিকে আকর্ষণীয় করার জন্য প্রস্তুতি পর্ব শুরু হলো। কেবলমাত্র লেকচার দিয়ে শিক্ষাকার্য সমাধা করলে বিজ্ঞানের ব-ও বোঝা যায় না, আর বিজ্ঞানে আকর্ষণ ও আগ্রহও বাড়ে না। এ-বিষয়ে পেডলারের শিক্ষাদানের সহিত তিনি পরিচিত ছিলেন, এবং তাঁর এডিনবার্গের অভিজ্ঞতাও কম ছিল না। তাই ডেমনস্ট্রেশনসহ লেকচার দেওয়ার দিকে তিনি নিজেকে প্রস্তুত করতে থাকলেন। এই প্রস্তুতি সম্পর্কে তিনি 'আত্মচরিত'-এ (পৃ—৬৬-৬৭) লিখেছেন,—"যাহারা রসায়নশাস্ত্র প্রথম শিখিতেছে, এমন সব ছাত্রের শিক্ষকতায় সাফল্যলাভ করিতে হইলে, 'এক্সপেরিমেন্ট' বা পরীক্ষা কাজে নৈপুণ্য চাই। এমনভাবে এক্সপেরিমেন্ট সাজাইতে হইবে যে তাহা একদিকে যেমন চিত্তাকর্ষক হইবে, অন্যদিকে বিষয়টিও সহজে বুঝা যাইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতিত্ব বিবেচনা করিয়া অনেক সময় অধ্যাপক নিয়োগ করা হয়। কোন পদপ্রার্থী হয়ত গবেষণায় প্রশংসনীয় কাজ করিয়াছেন। কিন্তু এই সব ব্যক্তি অধ্যাপকের কাজে সকল সময়ে সাফল্যলাভ করিতে পারেন নাই। ইহার অনেক দৃষ্টান্ত আমি দেখিয়াছি।... লেবরেটরীতে অতি সাধারণ পরীক্ষা কার্যেও তাঁহাদিগকে ইতস্ততঃ করিতে হয়। একটা সংকোচের ভাব আসে, ফলে তাঁহারা ঐ সব 'পরীক্ষা' বাদ দিয়েই যান এবং কেবলমাত্র যন্ত্রটি দেখাইয়া অথবা তদভাবে বোর্ডের উপর চিত্র আঁকিয়াই তাঁহাদের কর্তব্য শেষ করেন। আমার সৌভাগ্যক্রমে প্রেসিডেন্সি কলেজের রসায়ন বিভাগে পূর্ব হইতেই একটা বনিয়াদ গড়িয়া উঠিয়াছিল। পেডলার বাষ্প (গ্যাস্) বিশ্লেষণে বিশারদ ছিলেন এবং পরীক্ষা কার্যে তাঁহার অসীম দক্ষতা ছিল। তাঁহার হাতের নৈপুণ্যও আমাদের সকলের প্রশংসার বিষয় ছিল। দুই একজন সহকারীকে তিনি বেশ শিক্ষিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে চন্দ্রভূষণ ভাদুড়ীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি শিক্ষানবিসরূপে প্রথমে কাজ আরম্ভ করেন। অধ্যাপনায় সাফল্য লাভেই আমার আকাঙ্খা ছিল, সুতরাং সেজন্য মিথ্যা গর্ব আমি ত্যাগ করিলাম। বিলাতফেরত গ্রাজুয়েটদের মনে কোন কোন স্থলে বেশ একটু অহমিকার ভাব থাকে। তাহারা মনে করে যে সহকারী বা অধীনস্থদের নিকট হইতে কিছু শিখিত হইলে তাহাদের জাত যাইবে বা মর্যাদা নষ্ট হইবে। আমার সৌভাগ্যক্রমে এরূপ কোন দৌর্বল্য আমার মনে ছিল না। আমি চন্দ্রভূষণ ভাদুড়ী এবং পেড়লারের সহায়তা গ্রহণ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইতাম না। এইরূপেই আমি অধ্যাপক জীবন আরম্ভ করিলাম। ক্লাসে কিরূপে নিপুণতার সহিত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করিতে হয়, আমি পুনঃ পুনঃ তাহার মহড়া দিতে লাগিলাম। শীঘ্রই আমি সঙ্কোচের ভাব কাটাইয়া উঠিলাম এবং পরবর্তী সেসন আরম্ভ হইলে দেখিলাম, আমি আমার দায়িত্ব পালনে অপটু নহি।" নিজেকে সার্থক ও সফল শিক্ষক হিসাবে প্রস্তুত করার এমন উদাহরণ বিরল।

কেবল ডেমনস্ট্রেশনের জন্য প্রস্তুতিই নয়, ক্লাসে লেকচারের সারমর্ম পর্যন্ত তিনি লিখতেন, ও বিভিন্ন প্রমাণিক গ্রন্থ থেকে 'নোট' করতেন। প্রেসিডেন্সী কলেজে যোগদানের তিন মাসের পর পুজোর ছুটি পড়ল, আর পেডলার সাহেব তিন মাসের ছুটি নিয়ে বিলেত গেলেন। সুতরাং অবধারিতভাবে সমগ্র রসায়ন বিভাগের ভার পড়ল প্রফুল্লচন্দ্রের ওপর। এই সময় তাঁকে পরপর তিনটি ক্লাসও নিতে হয়েছে। কিন্তু বিরক্তি নেই, ক্লান্তি নেই। কাজ পাগল প্রফুল্লচন্দ্র আনন্দের সঙ্গে সম্পাদন করে চললেন। সব সময়েই ভালবাসতেন প্রথম বার্ষিক ও তৃতীয় বার্ষিক ছাত্রদের ক্লাস নিতে। তিনি বলতেন, ওরা হলো কুমোরের চাকে চড়ানো নতুন কাদামাটি, কুমোর যেমন-ইচ্ছে-তেমন মূর্তি ওদের দিয়ে তৈরী করতে পারে।

শিক্ষাদান প্রণালী

অসামান্য তাঁর বক্তৃতার ধরন, আর অদ্ভুত তাঁর উপস্থাপনা। এই সম্পর্কে তাঁর এক উজ্জ্বল ছাত্র সত্যেন্দ্রনাথ স্মৃতি চারণা করে বলেছেন,—"সরল ইংরেজীতে বক্তৃতা, বাগ্মিতার কোন চেষ্টা ছিল না—বরং নানা কথা বলে হাসি-ঠাট্টার মধ্য দিয়ে ডাঃ রায় চাইতেন, রসায়নের মূল কথা যাতে ছাত্রদের মনে গেঁথে যায়।

"সে সময়ের হাবভাব ও অঙ্গভঙ্গী, তাঁর কাছে যারা রসায়ন পড়েছে, তাদের চিরকাল মনে থাকবে। আণবিক আকর্ষণ বোঝাতে গিয়ে তিনি পাশের সীতারাম বেয়ারাকে জড়িয়ে ধরলেন—এই প্রকার আরও কত কি। এতে ক্লাসে মাঝে মাঝে হাসির অট্টরোল উঠতো, তাতে তিনিও খুশী হতেন। গল্পচ্ছলে বলে যেতেন মহারথী বিজ্ঞানীদের কথা—লাভসিয়র, ডাল্টন, বার্জিলিয়স, পাস্তুর—আবার কখনো কখনো নাগার্জুনের নাম শোনা যেত। ভারতে যারা অ্যালকেমীর চর্চা করতো, সে কথা শুনাতেন ছাত্রদের। পুরোনো পুঁথির দু-চারটি শ্লোক আওড়ালেন, আবার কখনও ইংরেজী সাহিত্য থেকে লম্বা উদ্ধৃতি হলো। এই সব মিলে সেই ২ বছরের ভাষণের স্মৃতি আমার মনের মধ্যে অপূর্ব আকার নিয়ে রয়েছে।"[1] এই সম্পর্কে আর এক প্রত্যক্ষ ছাত্রের অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করা যাক : Those of us who were privileged to attend his lectures know that he loved to develop a subject historically and gave scant prominence to mere details. His object was to trace the development of human thought. He believed that this approach was the only method to develop the critical faculty in young students. We became intimately acquainted with the past masters like Davy, Faraday, Berzelius, Thomsen, Maxwell, Kekule, Victor Meyer, Ramsay, Rayleigh, and host of other makers of science of the nineteenth century. When we complained about the scanty equipment we had, he would tell us how Berzelius made epoch making discoveries in a small laboratory and his only assistant was the house-maid, Anna. He believed that the personal skill of a man is all that counts otherwise Berzelius would not have been able to

1 *সত্যেন্দ্রনাথ বসু রচনা সঙ্কলন, পৃ —২৩৬-৩৭*

determine the atomic weights with that uncanny accuracy when he had to use an ink-pot as counter poise. This heartened us a great deal and we took the poor facilities we had as a misfortune of no consequence."[2]

নতুন লেবরেটরী

প্রেসিডেন্সী কলেজের লেবরেটরীটি তখন ছিল ছাত্রদের প্র্যাকটিক্যাল ক্লাশ চালাবার মত বটে, কিন্তু রসায়নে ছাত্রদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় তাতে ক্রমেই স্থান সঙ্কুলানের অভাব অনভূত হতে থাকল। তার ওপর অনিষ্টককর গ্যাস নিষ্কাশন ও বায়ু চলাচলের কোন ব্যবস্থা ছিল না। বস্তুতপক্ষে, লেবরেটরী যেমন হওয়া উচিত অর্থাৎ যথেষ্ট পরিসর, ঝাঁঝালো বা ক্ষতিকারক বাষ্প নিষ্কাশনের ব্যবস্থা ইত্যাদি তার কোন ব্যবস্থা ছিল না। এই অবস্থার সমাধানকল্পে প্রফুল্লচন্দ্র একদিন অধ্যক্ষ টনি সাহেবকে লেবরিটরীতে ডেকে এনে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ প্রত্যক্ষ করালেন। টনির ফুসফুস ছিল দুর্বল, তার ওপর H_2S ও ক্লোরিন বাষ্পের দাপটে উত্তেজিত হয়ে শিক্ষাবিভাগের ডাইরেক্টারকে চিঠি লিখতে তিনি বাধ্য হলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে এও জানালেন শহরের হেলথ অফিসার জানতে পারলে ছাত্রদের স্বাস্থ্য বিপন্ন করার অপরাধে তাদের অভিযুক্ত করতে পারেন। অধ্যাপক পেডলারেরও বুঝাতে অসুবিধা হয়নি যে, নতুন যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জামসহ নতুন রসায়নাগারের প্রয়োজন। টনির চিঠি ও পেডলারের প্রচেষ্টার ফলে ক্রফট ও চার্লস ইলিয়ট এলেন সরোজমিনে তদন্ত করতে। সরকার নতুন রসায়নাগারের পরিকল্পনা মঞ্জুর করলেন। প্রফুল্লচন্দ্রের কাছে ছিল এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগারের বর্ণনাপত্র, বহু নকসা ও চিত্র। পেডলারও জার্মানি থেকে কয়েকটি লেবরেটরীর প্ল্যান আনালেন। চন্দ্রভূষণ ভাদুড়ীও প্ল্যান তৈরীতে পেডলারকে সাহায্য করলেন। এডিনবার্গ ত্যাগের সময় তিনি তখনকার লেবরেটরীর বর্ণনাপত্র, নকশা ও চিত্রাদি সঙ্গে করে এনেছিলেন ভবিষ্যতের প্রয়োজনীয়তা কথা ভেবে, তাঁর এই দূরদর্শিতায় বিস্ময়ে হতবাক হতে হয়। যাই হোক, 1894 সালে এই গবেষণাগার প্রস্তুত হলো।

গবেষণা

প্রেসিডেন্সী কলেজে যোগদানের পর অধ্যাপনার গুণগত দিকটি সবিশেষ উন্নতির জন্য যত্নবান হলন প্রফুল্লচন্দ্র। খুব সম্ভব 1891 সালের আগে তিনি কোন গবেষণায় নিযুক্ত হতে পারেননি। তাঁর প্রথম গবেষণার বিষয় তেল ও ঘি-এর ভেজাল সম্পর্কে। এই সম্পকে তিনি 'আত্মচরিত-এ (পৃ—৬৭) লিখেছেন,—"এখন আমি অবসর সময়ে গবেষণাকার্য করিতে লাগিলাম। বর্তমান সভ্যতার একটা আনুষঙ্গিক ব্যাধি খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিতেছিল। ... বাজারে ঘি ও তেল বলিয়া যাহা বিক্রয় হয়, বিশুদ্ধ নহে।

2. 'Acharya Ray and Chemical Research in Modern India, J.N Ray, JICS, 38, no. 8, 1961, p.428

"অমি এই শ্রেণীর খাদ্যদ্রব্য বিশেষভাবে পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিলাম।" কিন্তু দুঃখের বিষয়, আচার্যের প্রথম গবেষণা পত্র সম্পর্কে কোন কোন লেখক সঠিক তথ্য পরিবেশনে ভ্রান্তি ঘটিয়েছেন। বিমলেন্দু মিত্র বলেন, —"এডিনবরায় তিনি অজৈব রসায়নের তত্ত্বীয় গবেষণাও করেচিলেন। সেই কাজের অনুসরণে তিনি প্রথম যে গবেষণাপত্র এখান থেকে ছাপালেন তা ছিল কপার-ম্যাগনেসিয়ম 'গ্রুপ'-এর বন্ধনযুক্ত (conjugated) সালফেট যৌগ সৃষ্টি বিষয়ে।"(পৃ-২২) আমাদের মনে হয় শান্তিময় চট্টোপাধ্যায় ও অমিতাভ সেন সম্পদিত গ্রন্থের Bibiliography-র দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ডঃ মিত্র ভুলের ফাঁদে পা দিয়েছেন। আচার্যদেব 1889-এর জুলাই মাসে প্রেসিডেন্সী কলেজে যোগদান করেন, এবং ওপরের আত্মচরিতের উদ্ধৃত অংশ থেকে প্রমাণিত হয়, তিনি 1891 সালের পূর্বে কোন গবেষণা কার্যে আত্মনিয়োগ করেননি। Bibiliography-তে (P.114) 1888 সালের উল্লেখ হয় ভুল, না হয় মুদ্রণ প্রমাদ। Indian Chemical Society কর্ত্তৃক প্রকাশিত obituary-তেও মিত্র কথিত গবেষণাপত্র ও সালের কোন উল্লেখ নেই। সুতরাং আচার্যের ডি.এস.সি. থিসিস ব্যতীত প্রথম গবেষণাপত্র তেল ও ঘি-এর ভেজাল সম্পর্কীয়, তাতে কোন সন্দেহ নেই।



প্রফুল্লচন্দ্র (1896)

আচার্য চিরদিন আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে অতিসচেতন ছিলেন। তেল ও ঘি-এর ভেজাল সম্পর্কীয় গবেষণা ছিল একটি সামাজিক সমস্যার জ্বলন্ত উদাহরণ।

গবেষণার জন্য নমুনা সংগ্রহও ছিল চমকপ্রদ। নিজের চোখের সামনে গরু ও মোষের দুধ দোহন করালেন ; স্বয়ং মাখন তৈরী করলেন। সর্ষে ভাঙিয়ে তেল তৈরী করলেন। আর ভেজাল তেলও সংগ্রহ করলেন। তাঁর গবেষণা সম্পর্কে তিনি লিখলেন, — "এদেশের গরুর দুধ হইতে যে মাখন হয় তাহার স্নেহ উপাদান ব্রিটিশ গরুর দুধের মাখনের চেয়ে একটু স্বতন্ত্র রকমের। সেই কারণে ইংরাজী খাদ্য সম্পর্কীয় গ্রন্থে ঐ দেশের মাখনের যে বিশ্লেষণাদির পরিচয় থাকে, তাহা আমাদের পক্ষে নির্ভরযোগ্য নহে। কয়েক প্রকারের তেলের নমুনাও বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করিলাম। এই কাজ হাতে লইয়া আমাকে প্রভূত পরিশ্রম করিতে হইল। আমি তিন বৎসর পর্যন্ত এই কার্যে ব্যাপৃত ছিলাম।" (আত্মচরিত, পৃ-৬৮) 'Chemical Examination of certain Indian Foodstuff – part I. The Fats and Oils' এই শিরোনামে 1984 সালে এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে (Journal of Asiatic Society of Bengal) প্রকাশিত হলো। সুযোগ-সুবিধাহীন গবেষণাগারে সহকারী ব্যতিরেকে একক হস্তে এই দীর্ঘ গবেষণা চালানো যে কি কঠিন, তা ভুক্তভোগী মাত্রই উপলব্ধি করতে পারবেন। কিন্তু গবেষণায় উৎসর্গীত প্রাণ, কেশযুক্ত সামসন প্রফুল্লচন্দ্র তা সম্ভব করে তুললেন। পাতা দেখেই বৃক্ষকে সনাক্ত করা যায়, এই গবেষণা দেখেই আমাদের চিনতে অসুবিধা হয় না যে, প্রফুল্লচন্দ্র অনন্যসাধারণ এক রসায়ন বিজ্ঞানী হয়ে উঠবেন।

দুর্লভ ধাতু বিশ্লেষণ

আচার্যদেবের থিসিস ছিল তত্ত্বীয় অজৈব রসায়নে। সাধারণভাবে বলা যেতে পারে পর্যায় সারণীর শ্রেণীবিভাগ। অনেকে জানেন, রাশিয়ান বিজ্ঞানী মেন্ডেলিফ পর্যায় সূত্র ও পর্যায় সারণীর আবিষ্কারক। মেন্ডেলিফের এই আবিষ্কার যে রসায়ন বিজ্ঞানে যুগান্তর সৃষ্টি করেছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁর সারণীতে ফাঁকা স্থান ছিল। কারণ, তখনো অনেক মৌল (elements) আবিষ্কৃত হয়নি। আচার্যদেবের দুর্লভ ধাতু বিশ্লেষণের উদ্দেশ্য ছিল যাতে দু-একটি মৌল আবিষ্কার করে পর্যায় সারণীর ফাঁকা স্থান পূরণ করা যায়। এই গবেষণাকর্মে সহায়তা করতে এগিয়ে এলেন মি. হল্যান্ড (Mr. Holland)—পরে স্যার চার্লস হল্যান্ড। উনি ছিলেন প্রেসিডেন্সী কলেজের ভূতত্ত্বের অধ্যাপক, আবার 'জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া'-তেও সহকারী হিসাবে কাজ করতেন। তিনি ধাতুর নমুনা যোগাতে রইলেন। Crooks' Select Methods in Chemical Analysis অবলম্বনে আচার্যের গবেষণা চলতে লাগল। বহু মূল্যবান অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হলো বটে, কিন্তু উল্লেখযোগ্য সাফল্য এল না। এই সময়েই হঠাৎ তাঁর জীবনের গতি এক বিশেষ পথে নির্দিষ্ট হয়ে গেল ; তাঁর গবেষণাকার্যের পথের নিশানা স্থির হয়ে গেল ; 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' হলো ঃ

"কী জানি কী হল আজি, জাগিয়া উঠিল প্রাণ—
দূর হতে শুনি যেন মহাসাগরের গান।"

মারকিউরাস নাইট্রাইট

নিজস্ব প্রকৃতি ও প্রবণতার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ গবেষণার বিষয় পাওয়া বা নির্বাচন করা খুবই কঠিন। আচার্যদেব তেল ও ঘি, মৌল আবিষ্কারের যে প্রচেষ্টা করেছিলেন, তা তাঁর প্রকৃতি ও প্রবণতার বিরুদ্ধে না হলেও তাতে "জাগিয়া উঠিল" প্রাণের স্পর্শ ছিল না, মহাসাগরের গানের মুর্ছনাও চিল না। মারকিউরাস নাইট্রাইট আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে তিনি প্রাণের স্পর্শ যে পেলেন তাতে সন্দেহ করার হেতু নেই। কারণ, পরবর্তীকালে বহু গবেষণা এই নাইট্রাইট অবলম্বনেই তিনি করেছেন—**মাস্টার অফ নাইট্রাইট** আখ্যা লাভ করেছেন।

আচার্যদেব হঠাৎই মারকিউরাস নাইট্রাইট আবিষ্কার করেন। এর জন্য তাঁর কোন পূর্ব প্রস্তুতি ও সচেতনতা ছিল না। ইতিপূর্বে এডিনবার্গে হিউ মার্শাল এই রকম হঠাৎ কোবাল্ট অ্যালাম আবিষ্কার করেন। স্বয়ং আচার্যদেব ছিলেন এই আবিষ্কারের অন্যতম সাক্ষী। বস্তুতপক্ষে, এরূপ অভিজ্ঞতার সহিত পরিচয় থাকার জন্যই তিনি মারকিউরাস নাইট্রাইট সনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

1895 সাল। প্রফুল্লচন্দ্র তখন গ্যাস বিশ্লেষণে ব্যস্ত ছিলেন। সাধারণত পারদ সরিয়ে ইউডিওমিটার নলে গ্যাস সঞ্চয় করা হয়। অশুদ্ধ পারদকে বিশুদ্ধ করার কাজে ব্যস্ত ছিলেন প্রফুল্লচন্দ্র। শীতল ও লঘু নাইট্রিক অ্যাসিডে ধীরে ধীরে পারদের বিন্দু ফেললে লম্বা নলের অ্যাসিডের মধ্য দিয়ে পারদবিন্দু নীচে নামতে নামতে বিশুদ্ধ হয়ে যায়। প্রফুল্লচন্দ্র লক্ষ করলেন 13–14% নাইট্রোজেন পেন্টক্সাইড (N_2O_5) সমৃদ্ধ শীতল ও লঘু নাইট্রিক অ্যাসিড (HNO_3) যদি পারদের সঙ্গে বিক্রিয়া করে, তা হলে পারদের ওপর হলুদবর্ণের একটি ক্ষীণ আস্তরণ পড়ে। এটি কঠিন কেলাসের দানা,—একটি যৌগ। "প্রথম দৃষ্টিতে ইহা কোন 'বেসিক সল্ট' (basic salt) বলিয়া মনে হইল। কিন্তু এরূপ প্রক্রিয়া দ্বারা ঐ শ্রেণীর 'সল্টের' উৎপত্তি সাধারণ অভিজ্ঞতার বিপরীত। যাহা হউক, প্রাথমিক পরীক্ষা দ্বারা ইহা মার্কিউরাস্ সল্ট এবং নাইট্রাইট উভয়ই প্রমাণিত হইল।" (আত্মচরিত, পৃ-৮৮, ইংরেজী শব্দ এই লেখকের)। 1895 সালে 'On Mercurous Nitrite' শিরোনামে প্রবন্ধ পাঠালেন JASB-তে। গবেষণাপত্রটি 1896 সালে ওই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পরে আরো বিস্তারিত বিবরণসহ 'Mercurous Nitrite' 'সাইটশ্রিফ্‌ট ফুয়ের আনওরগানিশে আলগেমাইন কেমি' (Zeitschrift für anorganische allgemine Chemie = ZAC) পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কিন্তু আচার্যের প্রত্যক্ষ ছাত্র জে.এন.রায় বলেছেন এই আবিষ্কারের বিস্তারিত বিবরণ লন্ডনের জার্নাল অফ কেমিক্যাল সোসাইটি (JCS) পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বস্তুতপক্ষে, আচার্যের 'Interaction of Mercurous nitrite and the alkyl iodides' প্রবন্ধটি 1896 সালে Prceeding of Chemical Society-তে প্রকাশিত হয়। [Obituary, p.258]

এই আবিষ্কারের প্রতিক্রিয়া ও সুদুরপ্রসারী তাৎপর্য সম্বন্ধে আচার্যদেব আত্মচরিতে বর্ণনা করে বলেছেন—"একটির পর একটি নূতন মিশ্র পদার্থ আবিষ্কৃত হইতে লাগিল,

আর আমি অসীম উৎসাহে তাহা লইয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলাম। নব্য রসায়নী বিদ্যার অন্যতম প্রবর্তক অমরকীর্তি শীলের ভাষায় আমিও বলিতে পারিতাম— "গবেষণা হইতে যে আনন্দ হয়, তাহার তুলনা নাই, ইহা হৃদয়কে উৎফুল্ল করে।" "এই নবোন্মুক্ত গবেষণার ক্ষেত্রে বিচরণ করা এবং তাহার অজ্ঞাত স্থানসমূহ আবিষ্কার করা, ইহাতে প্রতিমুহূর্তেই মনে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হইত।" (পৃ-৮৮)।

মারকিউরাস নাইট্রাইট আবিষ্কারের গুরুত্ব

নাইট্রিক অ্যাসিড (HNO_3) আমাদের অতিপরিচিত এক তীব্র অ্যাসিড, কিন্তু নাইট্রাস অ্যাসিড (HNO_2) তেমন পরিচিত নয়। এই অ্যাসিড খুবই অস্থায়ী, ও অতি সহজেই জারিত হয়ে নাইট্রিক অ্যাসিডে পরিণত হয়। কোন ধাতব মৌল ও নাইট্রিক অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় নাইট্রেট লবণ উৎপন্ন হয়। যেমন, সোডিয়াম নাইট্রেট ($NaNO_3$)। সেই রকম ধাতব মৌল ও নাইট্রাস অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় যে লবণ উৎপন্ন হয়, তার নাম নাইট্রাইট লবণ। এই নাইট্রাইট লবণ খুবই অস্থায়ী ;তাই গুণাগুণ রক্ষা করাও যায় না। তা সহজেই জারিত হয়ে নাইট্রেট লবণে পরিণত হয়। আচার্যদেব এহেন একটি যৌগ আবিষ্কার করে রাসায়নিক সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করলেন। সমগ্র বিশ্ব চমৎকৃত হলো। প্রফুল্লচন্দ্র রায় বিশ্বের সর্বত্র পরিচিতি লাভ করলেন। বিজ্ঞান মহলে এশিয়াটিক সোসাটির জার্নাল মোটেই পরিচিত নয়। তথাপি এই অসামান্য আবিষ্কারের গুরুত্ব Nature পত্রিকার দৃষ্টি এড়ায়নি। ওই পত্রিকায় লেখা হলো ঃ "*The Journal of Asiatic Society* can scarcely be said to have a place in our chemical libraries ; the current number, however, contains a paper by Dr. P. C. Ray of the Presidency College, Calcutta, on mercurous nitrite by the action of nitric acid (dilute) in the cold on mercurry, yellow crystals are deposited, which upon examination, proved to be the mercurous nitrite."

যা ছিল একান্ত অস্থায়ী তাকে স্থায়িত্ব দিয়ে সহজ প্রস্তুত প্রণালীর সাহায্যে প্রফুল্লচন্দ্র অমর কীর্তি স্থাপন করলেন। ক্লোরিন আবিষ্কারক প্রখ্যাত ময়শাঁ তাঁর এনসাইক্লোপিডিয়ায় এ-সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করলেন ; কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত অনুপম ছন্দে বিধৃত করলেন,—

বিসম ধাতুর মিলন ঘটায়ে বাঙালী দিয়েছে বিয়া
বাঙালীর নব্য রসায়ন শুধু গরমিলে মিলাইয়া।

আবিষ্কার-স্রোতপ্রবাহ

মারকিউরাস নাইট্রাইট আবিষ্কার প্রকৃতপক্ষেই 'চিচিং ফাঁক', বন্ধ দরজা খোলার গোপন মন্ত্র। তাই দেখা যায়, প্রফুল্লচন্দ্র একটির পর একটি আবিষ্কার করে চলেছেন। প্রস্তুত করে চলেছেন জিঙ্ক, ক্যাডমিয়াম, ক্যালসিয়াম, বেরিয়াম প্রভৃতি ধাতুর নাইট্রাইটঘটিত যুগ্ম লবণ। প্রস্তুত করেছেন বিভিন্ন প্রকারের হাইপোনাইট্রাইট যৌগ। এইসব যৌগের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মাবলীও পরীক্ষা করেছেন। ফলে, হাইপোনাইট্রাস

অ্যাসিডের আণবিক গঠন সম্পর্কে ধারণা সুস্পষ্ট হতে থাকে। মারকিউরিক নাইট্রাইটের সঙ্গে পটাশিয়াম সায়ানাইডের বিক্রিয়ায় সায়ানাইড জারিত (oxidised) হয়ে সায়ানেট হলো, আর মারকিউরিক নাইট্রাইট বিজারিত (reduced) হয়ে হাইপোনাইট্রাইট উৎপন্ন হলো।

বেরিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম প্রভৃতি ক্ষার মৃত্তিকা (alkaline) শ্রেণীর মৌলের নাইট্রাইট যৌগ প্রস্তুতির দিকে নজর দিলেন প্রফুল্লচন্দ্র। লক্ষ করলেন, ম্যাগনেসিয়াম নাইট্রাইট এ-ধরনের নাইট্রাইটগুলির মধ্যে সবচেয়ে অস্থায়ী। এ-সম্পর্কে জে.এন. রায় লিখেছেন— "...it was noticed that magnesium nitrite was the least stable and formed a link between the nitrites of Zn and Cd and those of Ca, Ba and Sr. The double nitrites of Hg (ic) with alkaline earths revealed that the combining power of mercuric nitrite was increased as the atomic weight of the other metal decreased" [2]

দুটি যুগ্ম যৌগ

নাম	সঙ্কেত
বেরিয়াম-মারকারি যুগ্ম নাইট্রাইট	$3Hg(NO_2)_2, 2Ba(NO_2)_2, 5H_2O$
ক্যালসিয়াম-মারকারি যুগ্ম নাইট্রাইট	$Hg(NO_2)_2, Ca(NO_2)_2, 5H_2O$

কেবল অজৈব নাইট্রাইট নিয়ে গবেষণাই নয়, জৈব নাইট্রাইট প্রস্তুতি করেও অসামান্য সাফল্যলাভ করেছিলেন প্রফুল্লচন্দ্র। আবিষ্কৃত জৈব নাইট্রাইটগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ বিভিন্ন প্রকারের অ্যালকিল অ্যামোনিয়াম নাইট্রাইট, অ্যালাইল অ্যামোনিয়াম নাইট্রাইট এবং অ্যারাইল অ্যামোনিয়াম নাইট্রাইট। এই যৌগগুলির প্রস্তুতির সাধারণ পদ্ধতিও তিনি আবিষ্কার করেন। শুধু মারকিউরাস নাইট্রাইট নয়, তিনি মারকিউরিক নাইট্রাইটও ব্যবহার করেছেন। এ-বিষয়ে হেটেরোসাইক্লিক, অ্যালিসাইক্লিক ও পিপারিজিন শ্রেণীর বহু নাইট্রাইটের যৌগের নাম করা যেতে পারে।

অতঃপর আমরা মারকিউরি অ্যালকিল বা মারকিউরি অ্যারাইল অ্যামোনিয়াম শ্রেণীর যৌগ প্রস্তুতিতে প্রফুল্লচন্দ্রের উৎসাহ ও আগ্রহ দেখতে পাই। কেবল প্রস্তুতিই নয়, উৎপন্ন দ্রব্যের দ্রবণের তড়িৎপরিবাহিতা, ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মাবলীও তিনি পরীক্ষা করেন। এইসব যৌগগুলি নিম্নরূপে উপস্থাপিত করা হয় ঃ

$$(R.NH_2.HgNO_2)NO_2 \text{ এবং } [C_2H_4(NH_2)_2Hg](NO_2)_2$$

1911–1913 সালের মধ্যে মিথাইল অ্যামোনিয়াম নাইট্রাইট, অ্যালকিল অ্যামোনিয়াম নাইট্রাইট ও টেট্রামিথাইল অ্যামোনিয়াম হাইপোনাইট্রাইট বিষয়ে প্রফুল্লচন্দ্রের গবেষণা উল্লেখযোগ্য। সহজসাধ্য উপায়ে এইসব যৌগের প্রস্তুতি ও তাদের রাসায়নিক ধর্মাবলী নির্ধারণও করলেন তিনি।

2. J. N. Ray *op.cit*, p.424

ধাতব নাইট্রাইট লবণ প্রস্তুতির সাধারণ পদ্ধতিগুলির মধ্যে একটি হলো ওই ধাতুর ক্লোরাইড ও সিলভার বা বেরিয়াম নাইট্রাইটের দ্বি-বিযোজন বিক্রিয়া (double decomposition)। যেমন—

$R.Cl_2 + 2AgNO_3 \rightarrow R.(NO_2)_2 + 2AgCl_2$ [R ধাতুর সঙ্কেত]

এই পদ্ধতি কাজে লাগিয়ে তিনি সিলভার নাইট্রাইটের সহিত অ্যালকিল অ্যামাইন হাইড্রোক্লোরাইডের দ্বি-বিযোজন বিক্রিয়ায় অ্যালকিল অ্যামোনিয়াম শ্রেণীর নাইট্রাইট উৎপন্ন করতে সমর্থ হলেন। এই শ্রেণীর কাজগুলি বিমান বিহারী দে-এর সহিত একত্রে করেন। পরে এই গবেষণার বিস্তারিত বিবরণ অধ্যাপক দে 'আচার্য রায় মেমোরিয়াল লেকচারে' প্রদান করেন।

1897–1902 সাল পর্যন্ত প্রফুল্লচন্দ্র ধাতব নাইট্রাইট ও হাইপোনাইট্রাইটের প্রস্তুতি ও স্থায়িত্ব সম্পর্কে 14টি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন। 1903–1911 পর্যন্ত বিভিন্ন ধাতুর ওপর নাইট্রিক অ্যাসিডের বিক্রিয়া সম্বন্ধে আরো 5টি গবেষণাপত্র লন্ডনের কেমিক্যাল সোসাইটির জার্নালে প্রকাশিত হয়। 1912–1913 পর্যন্ত তাঁর 5টি গবেষণাপত্র ভৌত রসায়নের ওপর। এই গবেষণা নীলরতন ধর ও জ্ঞানচন্দ্র ঘোষের সহিত একত্রে পরিচালিত হয়।[3]

এখানে ধরের সহিত তাঁর অ্যামোনিয়াম নাইট্রাইটের ওপর গবেষণা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ-বিষয়ে কিছু আলোচনার পূর্বে অধ্যাপক ধরের *Reminicences* থেকে কিছু অংশ উদ্বৃত করা যাক ঃ "I gratefully remember the long period he spent with me in the laboratory and discussed the results when I was making the experiments on conductivity measurements of simple and complex nitrite solutions utilizing the electric conductivity of water. Before he proceeded to Europe for the third time in 1912, we carried on experiments by the Hoffman method on the vapour density determination of the extremely unstable substance, ammonium nitrite, in vacuum. The material readily breaks up into nitrogen gas and water at the ordinary temperature with evolution of heat

$$(NH_4NO_2 = N_2 + 2H_2O + 718 \text{ Kcal})$$".[4]

অন্যান্য নাইট্রাইটের তুলনায় অ্যামোনিয়াম নাইট্রাইট বিশিষ্ট ধরনের যৌগ। প্লাটিনাম ছড়ানো (Platinised) অ্যাসবেসটসের ওপর অ্যামোনিয়া (NH_3) চালনা করে সহজেই সাদা ও জলাকর্ষী এই যৌগটি প্রস্তুত করা যায়। এইভাবে এই যৌগটিকে সাদা, লম্বা ও ক্ষীণ সূচী-আকারে কেলাসিত অবস্থায় পাওয়া যায়। এই যৌগটি সুস্থিত নয়। প্রফুল্লচন্দ্র ও ধর প্রমাণ করলেন যে, যৌগটি সুস্থিত না হলেও 80° উষ্ণতায় এর অণুগুলি বিশ্লিষ্ট না হয়ে সরাসরি ঊর্ধ্বপাতিত হয়।

ওই সময়ে অন্যান্য বিজ্ঞানীরা, যেমন, আরনডট (Arndt), ব্লানচার্ড (Blanchard)

3. Obituary, JICS, 21, 1944, p.254
4. Acharya Prafulla Chandra Ray, C.U., 1961, p.161

প্রমুখ অ্যামোনিয়াম নাইট্রাইট নিয়ে গবেষণা করেন মূলত তার বিশ্লিষ্ট হওয়ার ঘটনা বোঝার জন্য। কিন্তু উর্ধ্বপাতিত অবস্থায় অবিশ্লিষ্ট ও সুস্থিত অণু পৃথক করার ঘটনা অভিনব। এ-বিষয়ে গবেষণাপত্রটি তিনি লন্ডনের কেমিক্যাল সোসাইটিতে পাঠ করেন। অধ্যাপক



প্রেসিডেন্সী কলেজের ল্যাব

ধর তাঁর পূর্বোক্ত স্মরণিকায় লিখেছেন,—"... he was heartily congratulated by Sir William Ramsay, Sir Henry Roscoe and other eminent British chemists. In welcoming Dr. P.C.Ray, Dr. Veley remarked that Dr. Ray represented a nation which had attained a high degree of civilization and discovered many chemical processes when this country (England) was but a dismal swamp." 1912 সালে 13ই আগস্ট 'নেচার' পত্রিকা লিখেছে— স্বতঃই পলাতক এই উদ্বায়ী যৌগটিকে প্রস্তুত করা ও তার বাষ্পীয় ঘনত্ব নির্ণয় করা অধ্যাপক রায়ের অন্যতম কৃতিত্ব। স্মরণ রাখতে হবে, 1900 সালেও ইংলন্ডে ভৌত রসায়নের কোন অধ্যাপক পদ সৃষ্টি হয়নি। ডিটমারের রসিকতার উত্তর দিলেন প্রফুল্লচন্দ্র প্রথমে কেমিক্যাল কেমিস্ট হয়ে, তারপর ফিজিক্যাল কেমিস্ট হয়ে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, একদা ক্রাম ব্রাউনের সহকারী গ্লাসগোর অধ্যাপক ডিটমারের এডিনবার্গ পরীক্ষাগার পরিদর্শন কালে প্রফুল্লচন্দ্র ভৌত রসায়ন চর্চা করা বিষয়ে তাঁর পরামর্শ চেয়েছিলেন। "ডিটমার উত্তর দেন—আগে কেমিক্যাল কেমিস্ট হও।"

ক্লোরাইড লবণ ব্যবহার করেও নতুন নতুন যৌগ প্রস্তুতিতে আচার্যের নৈপুণ্য ও পারদর্শিতা দেখা যায় : মারকিউরি অ্যালকিল বা মারকিউরি অ্যারাইল অ্যামোনিয়াম

ক্লোরাইড। ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মসহ উৎপন্ন যৌগের তড়িৎ পরিবাহিতা নির্ণয় করে দেখিয়েছেন যে, পদার্থগুলি আসলে পারদের নানা ধরনের জটিল লবণ।

কয়েকটি লবণ

	নাম	সঙ্কেত
(i)	মারকিউরি-মিথাইল-অ্যামোনিয়াম-ক্লোরাইড	$CH_3N(HgCl)_2$
(ii)	মারকিউরি-ইথিলিন-ডাইঅ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড	$C_2H_4(NH_2)_2,2HgCl_2$
(iii)	মারকিউরি পিপারজিনিয়াম ক্লোরাইড	$C_4H_9N_2,HgCl_2$
(iv)	মারকিউরি পিরিডিনিয়াম ক্লোরাইড	$2C_5H_5N,3HgCl_2$

হ্যালোজেন গোষ্ঠীর সবচেয়ে সক্রিয় মৌল হলো ক্লোরিন। এই মৌলটি নিয়ে আচার্য নানা ধরনের বিক্রিয়ার কথা ভেবেছেন, এবং ক্লোরিনঘটিত কয়েকটি জৈব যৌগ প্রস্তুত করেছেন ঃ ক্লোরো-অ্যাসিটন, ক্লোরো-অ্যাসিটো ফেনন, ক্লোরো-অ্যাসিটাল ইত্যাদি।

1916 সালে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে অবসর গ্রহণ করলেন। ওই সময় পর্যন্ত তাঁর একক গবেষণাপত্র ও ছাত্রদের সহিত যৌথভাবে গবেষণাপত্রের সংখ্যা 70-এর অধিক। সমগ্র জীবনে দেড়শত গবেষণাপত্রের মধ্যে তাঁর একক পত্র প্রায় পঞ্চাশ। বলা বাহুল্য, জীবনীগ্রন্থে এ-সব আলোচনা অভিপ্রেত নয়। তত্রাচ বিজ্ঞানী তথা ভারতে রসায়ন চর্চার জনককে বুঝতে হলে আরো কিছু আলোচনা দরকার। পরে এ-বিষয়ে সামান্য রূপরেখা দেবার প্রয়াস পাব।

হিন্দু রসায়নশাস্ত্রের ইতিহাস

ছেলেবেলা থেকেই বহুবিধ বিষয়ে আগ্রহী ছিলেন প্রফুল্লচন্দ্র। কাব্য-সাহিত্য, ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, জীবনী, ভাষা, সমাজ, অর্থনীতি ইত্যাদি ছিল তাঁর আগ্রহের বিষয়। এফ.এ. ক্লাসে পড়ার সময় থেকেই রসায়নে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। কিন্তু বিদেশে পড়ার সুযোগ না পেলে তিনি রসায়নবিদ হতেন কিনা সন্দেহ। গিলক্রাইস্ট বৃত্তিকে ধন্যবাদ যে এই বৃত্তিলাভের ফলেই আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রকে রসায়নবিদ হিসাবে পেলাম, ভারতে রসায়নবিদ্যার জনককে পেলাম। ভুলক্রমে তিনি রসায়নবিদ হোন, আর যে-ভাবেই হোন প্রফুল্লচন্দ্র রসায়নবিদ না হলে এদেশে রসায়নচর্চা কত বছর পিছিয়ে যেত বলা যায় না। আর সেই সঙ্গে বিশ্ব রসায়ন চর্চার ইতিহাসে যে ভারতবর্ষের বিশিষ্ট ও উজ্জ্বল অবদান আছে, তা-ও বিস্মৃতির অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকত। রসায়ন তাঁর প্রিয় বিষয় হওয়ায় প্রফুল্লচন্দ্র বিষয়টিকে সার্বিক দিক থেকে অধ্যয়ন ও বিচার-বিবেচনা করার প্রয়াস পেয়েছিলেন। জার্মান ভাষায় লেখা কপের (Kopp) রসায়নের ইতিহাস পড়তেন, রসায়নবিদদের জীবনীও পড়তেন। কপের *History of Chemistry* সম্বন্ধে লিখেছেন—**"কপের 'ইতিহাস' দুরূহ গ্রন্থ, ইহার কঠিন সমাসযুক্ত লম্বা লম্বা পদগুলি পাঠ করা সুখকর নহে, কিন্তু বিষয়টি এমনই চিত্তাকর্ষক যে আমি গ্রন্থটি নিয়মিতভাবে পড়িতাম।"** [আত্মচরিত, পৃ-৮৯] সেই 1887 বা তার আগে থেকেই রসায়নের ইতিহাস পাঠের

উপযোগিতা সম্বন্ধে তাঁর স্বচ্ছ ও স্পষ্ট ধারণা ছিল। *Old Chemistries* লেখক প্রখ্যাত এডগার স্মীথ এই উপযোগিতা সম্বন্ধে বলেন,— "প্রায়ই শুনতে পাই, রসায়নবিদরা পুরোপুরিভাবেই বাণিজ্যিক হয়ে পড়েছে। বাণিজ্যিক ভাবনা বাদ দিয়ে রসায়নবিদদের কোনো ভাবনাই নাকি আজকাল আর তৈরি হয় না। ভাবনাটা চারপাশে যেন সমর্থন পেতেও শুরু করেছে। কিন্তু অন্য ভাবনাও বর্তমান রয়েছে। রসায়নের যাঁরা শিক্ষক, তাঁরা জানেন, পুরাতনকালের শিক্ষিত রসায়বিদ্যাও অনেক নতুন বার্তা বয়ে আনে। সেই বার্তা ইতিহাসের, দর্শনের, অর্থনীতির ;সেই বার্তা সামাজিক সম্পর্ক, কলা, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, সাহিত্য ও সর্বব্যাপী সংস্কৃতি বিষয়ে অনেক নতুন ভাবনার জন্ম দেয়।"[৫] ইতিপূর্বে আমরা জে.এন. রায়ের লেখা থেকে যে উদ্ধৃতি দিয়েছি, তা থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, প্রফুল্লচন্দ্র কীরূপ ইতিহাসপ্রবণ ছিলেন এবং বিষয়ের পঠন-পাঠনেও কীরূপ ঐতিহাসিক তাৎপর্য ছাত্রদের মনে সঞ্চারিত করার প্রচেষ্টা করতেন।

প্রেরণা ও উদ্দীপনা

প্রেসিডেন্সী কলেজের লাইব্রেরীতে ছিল মার্সেল পিয়ের ইউজেন বার্তেলো-এর (Marcelin Pierre Eugine Berthelot) লেখা *L'Alchemistes Grecs* (Greek Alchemistry)। প্রফুল্লচন্দ্র ওই বইটি খুব মনোযোগের সহিত পড়লেন ;আর পড়লেন উদয়চাঁদ দত্তের *Materia Medica of the Hindus.* এও তিনি জানতেন কবিরাজগণ বহু ধাতব ওষুধ ব্যবহার করেন। সাধারণত পাশ্চাত্য গ্রন্থগুলিতে প্রাচীন ভারতীয় অবদানের বিষয় অনুচ্চারিত থাকে। বার্তেলোর গ্রন্থটিও ব্যতিক্রম ছিল না। তাই প্রফুল্লচন্দ্র চিঠি লিখে জানালেন "প্রাচীন ভারতবর্ষেও 'আলকেমী' শাস্ত্রের বিশেষ চর্চা হইত এবং এ বিষয়ে সংস্কৃতে বহু গ্রন্থ আছে"। পাশ্চাত্য বিদ্বান ও পণ্ডিতদের মহৎ গুণ যে, তাঁরা পত্রের উত্তর দিয়ে থাকেন। বার্তেলোও প্রফুল্লচন্দ্রের পত্রের উত্তর দিলেন এবং লিখলেন,— "আপনার গবেষণার চিত্তাকর্ষক ফলাফলের সংবাদের পুলকিত হইলাম। ইউরোপ এবং আমেরিকার ন্যায় এশিয়া খণ্ডেও যে বিজ্ঞানের সার্বভৌম এবং নৈর্ব্যক্তিক রূপের সমাদর ও চর্চা চলিয়াছে তাহা জানিয়া আনন্দ হইল"—।

এই পত্রটি প্রফুল্লচন্দ্রের ইতিহাস চেতনার ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করল। তিনি লিখেছেন,—"আমার শরীরে যেন বিদ্যুৎপ্রবাহ বহিয়া গেল এবং কার্যে নূতন উৎসাহ আসিল।" বার্তেলো তাঁর পত্রে (1897) ভারতীয় অ্যালকেমি বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ জানতে চেয়ে প্রফুল্লচন্দ্রকে অনুরোধ করলেন। তখন তিনি **রসেন্দ্রসার সংগ্রহ**-এর ভূমিকার ওপর ভিত্তি করে একটি প্রবন্ধ রচনা করে ফ্রান্সে পাঠালেন।* এই প্রবন্ধের ওপর নির্ভর করে বার্তেলো *Journal des Savants*-এ একটি প্রবন্ধ লিখলেন, আর ওই প্রবন্ধের কপি ও তিন খণ্ডে সমাপ্ত বৃহৎ গ্রন্থ সিরিয়া, আরব ও মধ্যযুগের অ্যালকিমি

5. বিজ্ঞানের পৃথিবী বিজ্ঞানীর পৃথিবী, পৃ-১৮৩

* বিমলেন্দু মিত্র লিখেছেন, প্রফুল্লচন্দ্র বার্তেলোকে 'রসেন্দ্রসারসংগ্রহ' পাঠিয়েছিলেন, পৃ-৩৯। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। দ্রষ্টব্য : 'আত্মচরিত', পৃ-৯০।

চর্চা উপহারস্বরূপ পাঠিয়ে দিলেন প্রফুল্লচন্দ্রকে। ওইসব গ্রন্থপাঠ ও বার্তেলো কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত হয়ে হিন্দুদের রসায়নচর্চার ইতিহাস লেখার সঙ্কল্প করলেন প্রফুল্লচন্দ্র।

দেশে দেশে অ্যালকিমি চর্চা

অ্যালকিমির উৎস ও উদ্ভব প্রহেলিকায় আচ্ছন্ন। দেখা যায়, ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বে অ্যালকিমীয় চিন্তা-ভাবনা ও অনুশীলন চীন, মিশর, গ্রীস, ভারত, আরব ও পশ্চিম ইউরোপে জনপ্রিয় ছিল। বলা হয়, চীন হলো অ্যালকিমি চর্চার জন্মভূমি। কিন্তু চীনে অ্যালকিমি সংক্রান্ত গ্রন্থ দ্বিতীয় শতাব্দীর পূর্বে দেখা যায়নি। এই প্রসঙ্গে ওয়েই পোইয়াং (Wei Boyang), কো হোং (Go Hong), থাও হংচিং (Tao Hangjing) প্রমুখের নাম উল্লেখ করা যায়।[6] প্রাচীন অ্যালকিমি চর্চা গাল-গল্প ও রহস্যপূর্ণ একথা বলা যায় না। মিশরে অ্যালকিমি 'খেমিট' (*Khem-it*—the black), গ্রীসে 'কিমা' (*Chyma*—black molten metal), আরবে 'অল-কেমি' (*al—chemy*—alchemy) পরিচিত ছিল। গ্রীসে পঞ্চম খ্রীস্টপূর্বাব্দে 'চতুর্ভূত' তত্ত্ব ছিল ঃ ক্ষিতি, অপ, অগ্নি ও বায়ু। আরবীয় অ্যালকেমিস্ট গেবের (Geber) বা জাহির ইবন হেয়ান (800 A.D.) এক উল্লেখযোগ্য নাম।

সাধারণভাবে ভারতে অ্যালকিমিকে 'রসবিদ্যা' বলা হয়, আর অ্যালকেমিস্টকে 'রসবাদিন'। অ্যালকিমি গ্রন্থে 'রস' অর্থে পারদ (mercury)। সমগ্র ভারতীয় অ্যালকিমি চিন্তার মধ্যবিন্দু হলো 'রস' বা পারদ। বস্তুতপক্ষে, ভারতীয় অ্যালকিমীয় চিন্তায় কোন তাত্ত্বিক ভূমি দেখা যায় না। চীনাদের 'ইয়াং-ইন' তত্ত্বের মত ভারতেও নর-নারী—ভৈরব (হর) ও পার্বতী ভাবনা অ্যালকিমিতে অনুপ্রবিষ্ট। পারদের সমার্থক শব্দ অনেক ; রস, সূত, মহারস, রসেন্দ্র, স্বর্ণকারক, সর্বধাতুপতি, শিবজ, শিববীর্য, হরবীজ ইত্যাদি। রসরত্নসমুচ্চয়ে বলা হয়েছে যে, যে শিবের সৃজনাত্মক নীতিকে উপেক্ষা করবে, যে যুগ যুগ ধরে নরকে পচে মরবে।

বিশ্বের সব সভ্যদেশেই—চীন, মিশর, ভারত, গ্রীস, আরব ইত্যাদি দেশে আদিম রসায়নচর্চার উদ্দেশ্য দুটি প্রধান লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে ঃ (১) অমরত্ব অর্জন করা Elixer of Life প্রস্তুত করে, আর সাধারণ ধাতুকে কোন-না-কোন প্রকারে সোনায় পরিণত করা। অ্যালকেমিস্টদের নিরন্তর প্রয়াস সত্ত্বেও এই দুটি লক্ষ্য সাধিত হয়নি বটে, কিন্তু এই প্রচেষ্টার ফলে যে অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছিল, তা বৃথা যায়নি। কারণ তা রসায়নশাস্ত্রের ভিত্তিস্থাপনে কার্যকর হয়েছিল।

প্রফুল্লচন্দ্রের রসায়নের ইতিহাস

বার্তেলোর পত্র ও তাঁর গ্রন্থগুলি প্রফুল্লচন্দ্রকে ভারতীয় রসায়নের ইতিহাস রচনায় উৎসাহিত ও উদ্দীপ্ত করল। কিন্তু 1900 সাল পর্যন্ত প্রকাশিত সংশ্লিষ্ট গ্রন্থের সংখ্যা মাত্র তিন-চারটি ঃ উদয়চাঁদ দত্তের *Matria Medica of the Hindus* (1877), প্যারিমোহন সেনগুপ্তের 'শার্ঙ্গধর সংহিতা' (1889), বিনায়ক আপ্তে সম্পাদিত বাগভট্টের

6. 'চীনা গণিতের ইতিবৃত্ত', পৃ-১৩

'রসরত্নসমুচ্চয়' (1890) ও নিত্যনাথের 'রসরত্নাকর' (1897)। অবশ্য 'চরক সংহিতা', 'সুশ্রুত সংহিতা' অলভ্য ছিল না। কিন্তু এই অল্প মূল উৎস অবলম্বনে রসায়নের ইতিহাস লেখা যায় না। সুতরাং খোঁজ চলল ভারতের সর্বত্র পুস্তক ও পুঁথির জন্য, নেপাল ও লন্ডনের ইন্ডিয়া অফিসও বাদ গেল না। এই কাজে এগিয়ে এলেন নবকান্ত কবিভূষণ। তাঁকে কাশী পাঠানো হলো। কীটদ্রংষ্ট পুঁথি, তাও আবার জীর্ণ-দীর্ণ। এইসব পুঁথির বিশুদ্ধ পাঠ যে কী অপরিসীম ধৈর্য ও পরিশ্রমের, তা ভুক্তভোগী ব্যতিরেকে অন্যজনের বোঝা কঠিন। নবকান্তের সাহায্যে এই দুরূহ কর্মে এগিয়ে চললেন প্রফুল্লচন্দ্র। পাঠ করলেন Aufrecht's Catalogus Catalogorum, ভান্ডরকার, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এবং বার্নেলের সংস্কৃত পুঁথির বিবরণ। একদিকে বিশুদ্ধ রসায়নে গবেষণা, ও বেঙ্গল কেমিক্যাল ও ফারম্যাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস প্রতিষ্ঠা, আর অন্যদিকে হিন্দু রসায়ন শাস্ত্রের ইতিহাস রচনা কিভাবে তিনি সম্পন্ন করেছিলেন, তা ভাবলে বিস্ময়ে হতবাক হতে হয়, কিন্তু সবই সম্পন্ন হলো। 1902 সালে হিন্দু রসায়নের ইতিহাসের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হলো বেঙ্গল কেমিক্যাল থেকে।

বিষয়বস্তু সম্বন্ধে আভাস

ভারতের রসায়নচর্চার ইতিহাস চারটি স্তরে বিভক্ত ঃ (i) বৈদিক যুগ থেকে আনুমানিক 800 খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত বৈদিক-আয়ুর্বৈদিক পর্যায়। এখানে চরক ও সুশ্রুত সংহিতায় নিহিত রসায়ন-জ্ঞান আলোচিত হয়েছে ;(ii) ক্রান্তিকাল— 800 থেকে 1100 খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ;(iii) তান্ত্রিক যুগ 1100 থেকে 1300 খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত, এবং (iv) ওষুধবিজ্ঞানের যুগ 1300 থেকে 1550 খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত। 'রসায়ন' ও 'রসরত্নসমুচ্চয়'-এ রসায়ন-জ্ঞান এই পর্বে আলোচিত হয়েছে।

চিকিৎসাবিজ্ঞানের পরিপূরক হিসাবেই ভারতে রসায়নের অনুশীলন শুরু হয়। পরবর্তীকালে ধর্মানুশীলনের সহিত যুক্ত হয়ে রসায়ন তন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। ভৈরব ও পার্বতী সর্বজ্ঞানের উৎস হয়ে পড়েন ;তাঁদের প্রশ্ন ও উত্তরের মধ্য দিয়ে নানা প্রকার ওষুধের প্রস্তুতি ও কার্যকারিতা ব্যক্ত হতে থাকে। যেমন,—

শৃণু পার্বতী যত্নেন যথাবৎকথ্যামি তে।
ঈশ্বরীকল্পমাহাত্ম্যং যথাবদবধারয় ।। 449 রসার্ণবকল্প

অনুবাদ ঃ ও পার্বতী, আমি তোমায় এখন ঈশ্বরী লতার মাহাত্ম্যের কথা, তা থেকে প্রস্তুতির কথা বলব। মনোযোগসহকারে শ্রবণ কর।

আয়ুর্বেদীয় যুগের দুটি গ্রন্থ চরকসংহিতা ও সুশ্রুতসংহিতার ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন প্রফুল্লচন্দ্র। চরক ওষুধকে দুটি ভাগে ভাগ করেছেন ঃ সুস্থ ব্যক্তির শরীর ভাল রাখতে ও বল সঞ্চার করার জন্য ওষুধ, আর রোগ নিরাময়ের জন্য ওষুধ। চরকসংহিতা সুলিখিত ও পরিণত। চরকসংহিতা থেকে মনে হয় চরক কোন চিকিৎসা বিজ্ঞানী সম্মেলনের সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণ করে লিপিবদ্ধ করেছেন। সোনা, রূপা ও লোহা থেকে বলবর্ধক ওষুধ প্রস্তুতির বর্ণনা করেছেন চরক। এ থেকে প্রতিপন্ন হয় চরকের

সময় ধাতু ও তাদের যৌগ প্রস্তুতি প্রণালী ভারতে জানা ছিল। চরকসংহিতায় মূলত চিকিৎসা পদ্ধতির ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, কিন্তু সুশ্রুতসংহিতায় শাল্যচিকিৎসার ওপর গুরুত্ব দেখা যায়।

সুশ্রুতসংহিতায় ক্ষারধর্মের ওপর বিস্তারিত আলোচনা দেখা যায়। তিনি ক্ষারকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করেছেনঃ তীক্ষ্ণ ক্ষার, মধ্যম ক্ষার ও মৃদু ক্ষার। ক্ষার প্রস্তুতিতে একটি বিশেষ গাছকে শুকনো করে আগুনে পুড়িয়ে তার ছাই ও পোড়া চুনাপাথর ও নির্দিষ্ট পরিমাণ জল মিশিয়ে নানাপ্রকার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের ক্ষার প্রস্তুতির আলোচনা দেখা যায়। প্রফুল্লচন্দ্র এই সম্পর্কে লিখেছেন, —"ক্ষার ধর্মের এই বিবরণ এত সুন্দর ও বিজ্ঞানসম্মত যে আধুনিক ক্ষারধর্ম পদ্ধতির সহিত ইহার কোন প্রভেদ দেখা যায় না!" সুশ্রুতে অ্যাসিডের সহিত ক্ষারের প্রশমন ক্রিয়ারও উল্লেখ দেখা যায়।

বাগভটের 'অষ্টাঙ্গহৃদয়' অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিকিৎসাবিজ্ঞান। এতে ধাতু ও প্রকৃতিজাত নানা লবণকে ওষুধ হিসাবে ব্যবহার করার উল্লেখ আছে। 'অষ্টাঙ্গহৃদয়'-এ 64 ভাগ স্রোতরঞ্জন (অ্যান্টিমণি সালফাইড), তামা, রূপা ও সোনার প্রত্যেকটির এক ভাগ মিশিয়ে একটি বদ্ধ পাত্রে ভস্ম করে ওষুধ প্রস্তুতির আলোচনা দেখা যায়। বাগভটের সময় ধাতু নিষ্কাশন পদ্ধতি ছিল, সন্দেহ নেই। পরবর্তীকালে বৃন্দ, চক্রপাণি, মাধবকরের সময় ধাতব যৌগের ব্যবহার দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ায় বনৌষধির ব্যবহার ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে। চক্রপাণি পারদ থেকে কজ্জলি অর্থাৎ মারকিউরিক সালফাইড ব্যবহার বিধি প্রদান করেন। এই সম্পর্কে প্রফুল্লচন্দ্র বলেন—'ইউরোপীয় রসায়নের ইতিহাস আলোচনা করলে প্রতীয়মান হয় যে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে তুর্কে দ্য-মেয়ার্স এই বিখ্যাত ঔষধ প্রথম আবিষ্কার করেন।'

1300-1550 খ্রীস্টাব্দের মধ্যে যে-সব বই রচিত হয়েছিল তাতে নাগার্জুনের প্রভাব দেখা যায়। 'রসরত্নসমুচ্চয়'-এ নাগার্জুনকে অ্যালকেমি বিশারদ বলা হয়েছে। নাগার্জুনের 'রসরত্নাকর'-এ অনেক ধাতুর শোধন প্রণালী দেখা যায়। তিনি ছিলেন দহন প্রক্রিয়ার উদ্ভাবক ও তীর্যক পাতনের প্রবর্তক। বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত যন্ত্রের উল্লেখ 'রসরত্নাকর'-এ দেখা যায়।

তান্ত্রিক যুগ ও তার পরবর্তী সময়ে যে-সব গ্রন্থ রচিত হয়েছে তার মধ্যে 'রসার্ণব',* 'রসরত্নসমুচ্চয়' (বাগভট), রসেন্দ্রচূড়ামণি (সোমদেব), রমেন্দ্রচিন্তামণি (রামচন্দ্র গুহ), 'শার্ঙ্গধর সংগ্রহ', 'রুদ্রযামল', 'ভাবপ্রকাশ', 'রসপ্রকাশসুধাকর' (যশোধর) ইত্যাদির নাম করা যেতে পারে। আরো পরবর্তীকালে সংস্কৃত, তামিল, তেলেগু, কন্নাড়, মালায়ালম, মারাঠী, গুজরাটী, বাংলা, ওড়িয়া ইত্যাদি ভাষায় বহু গ্রন্থ রচিত হতে দেখা যায়। বিজ্ঞানের ছাত্রদের শিখা পরীক্ষার সহিত পরিচিতি আছে। এই পরীক্ষা 'রসার্ণব' গ্রন্থে উল্লিখিত হতে দেখা যায়। সেখানে বলা হয়েছে, তামা নীল শিখা উৎপন্ন করে, টিন পায়রার রং-এর ন্যায় শিখা ও সীসা ফ্যাকাশে ধরনের শিখা উৎপন্ন করে। সে-যুগে

* 'রসার্ণব' আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ও হরিশচন্দ্র কবিরত্ন কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে 1910 সালে প্রকাশিত হয়। পুনর্মুদ্রণ হয় 1983 সালে।

ধাতুর বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে প্রফুল্লচন্দ্র লিখেছেন— A pure metal is that when melted in a crucible does not give off sparks, nor bubbles, nor spurts, nor emits any sound, nor shows any lines on the surface but is tranquil like a gem." 'রসার্ণব'-এ পারদভস্মের বিস্তারিত বিবরণ দেখা যায়। এই সম্পর্কে প্রফুল্লচন্দ্র লিখেছেন—"ধাতু জারিত হইলে ইহার ধাতব গুণ অর্থাৎ ভাস্বরতা, কাঠিন্য, নমনীয়তা প্রভৃতি অন্তর্হিত হয় ;মারিত ধাতু সামান্য হাতুড়ির আঘাত পাইলেই গুঁড়া হইয়া যায়। মারিত ধাতুকে আবার পুনর্জীবিত করিতে হইলে তৈল, ঘৃত, লক্ষা ও সোহাগার সহিত মিশ্রিত করিয়া মূষার মধ্যে পুরিয়া মুখ বন্ধ করিতে হইবে এবং আগুনে রাখিয়া ক্রমান্বয়ে উত্তাপ প্রয়োগ করিতে হইবে। শীতল হইলে মূষার মুখ খুলিলে দেখা যাইবে যে মারিত ধাতু পুনর্বার ধাতুরূপে পরিণত অর্থাৎ স্বধর্মপ্রাপ্ত হইয়াছে।" 'রসার্ণব' থেকে তিনি প্রকার পারদভস্মের কথা জানা যায় ঃ **শ্বেত ভস্ম, কৃষ্ণ ভস্ম ও লোহিত ভস্ম**। শ্বেতভস্ম হলো মারকিউরাস ক্লোরাইড এবং অপর দুটি ভস্ম মারকিউরিক সালফাইড। 'রসার্ণব' অবলম্বনে প্রফুল্লচন্দ্র সে-যুগে ব্যবহৃত রাসায়নিক যন্ত্রপাতির বিবরণ ও ছবিও প্রদান করেছেন। যেমন—'সন্দশ' (Foreceps), 'মুচি' (Crucible), 'কাচ কুপী' (Glass retort)। তির্যক পাতন ছাড়াও উর্ধ্বপাতন প্রচলিত ছিল। 'ভাবপ্রকাশ' গ্রন্থে তুঁতে (কপার সালফেট) প্রস্তুত প্রণালীও পরিলক্ষিত হয়।

প্রাচীন ভারতীয় রসায়নচর্চায় পরীক্ষাগার (রসশালা) নির্মাণ এক লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। এখানে কি কি রাসায়নিক দ্রব্য ও যন্ত্রাদি স্থান পাবে, তার বিবরণও দেখা যায়।

কেবল প্রাচীন পুঁথি অবলম্বনে বর্ণনার মধ্য দিয়ে রসায়নের ইতিহাস রচনা করেননি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র। তিনি সেই বর্ণনা অনুসারে বিভিন্ন যৌগ প্রস্তুত করে তাদের রাসায়নিক পরিচিতিও নির্ধারণ করেছেন। তৎকালে অনুপাত বিধি জানা ছিল না সত্য, কিন্তু পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করে কোন যৌগ প্রস্তুত করেননি প্রাচীন রসায়নবিদগণ। এই প্রসঙ্গে 'রসেন্দ্রচিন্তামণি' রচয়িতা ঢুন্ঢুকনাথ বলেছেন—

অশ্রৌষং বহুবিদুষাং মুখাদপশ্যাং শাস্ত্রেষু স্থিতমকৃতং ন তল্লিখামি।
যৎকর্ম ব্যরচয়মগ্রতো গুরুণাং প্রৌঢ়ানাং তদিহ বদামি বীতশঙ্কঃ।।

—"যাহা পণ্ডিতের মুখে শুনিয়াছি এবং শাস্ত্রে দেখিয়াছি কিন্তু কার্য দ্বারা সম্পন্ন করি না, তাহা না লিখিয়া, বৃদ্ধ বৈদ্যের সম্মুখে শুনিয়া যেগুলি কার্য দ্বারা সম্পন্ন করিয়াছি আমি নিঃশঙ্কচিত্তে সেইগুলিই এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিতেছি।"

এই বিশাল গ্রন্থে আচার্যদেব প্রাচীন ভারতে রসায়নচর্চার বহুবিধ বিষয়ের উল্লেখ করেছেন ঃ গন্ধকের বহুরূপতা, ইস্পাত, দস্তা নিষ্কাশন, রৌপ্যশুদ্ধির প্রক্রিয়া ইত্যাদি। সেই সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন ও মধ্য যুগে ভারতে রসায়নচর্চা কিভাবে অবক্ষয় ও অধঃপতনের স্তরে নেমে এল, তার বর্ণনাও দিয়েছেন আচার্যদেব। জাতিভেদ ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা যে অধঃপতনের মূলে তা আচার্যদেব সেই উনবিংশ শতাব্দীর শেষে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন। বার্নাল ও নীডহামের অর্ধ শতাব্দীরও আগে এই উপলব্ধি ও বিশ্লেষণের কথা ভাবাই যায় না। গভীর দুঃখ ও পরিতাপের সহিত তিনি লিখেছেন, "কি

এবং কেন যাহারা বুঝিতে পারিত তাহারা নিরাসক্ত হওয়ায় শিল্পগুলির ক্রমোন্নতি বা অগ্রগতিতে পূর্ণচ্ছেদ পড়িয়া গেল। পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের সহিত হিন্দু মনীষার সংস্রব ছিন্ন হওয়ায় ভারতভূমিতে বয়েল বা নিউটনের আবির্ভাব অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল।". ফেরিংটন গ্রীস বিজ্ঞানের অধঃপতন সম্বন্ধে কত পরে একই উক্তি করেছিলেন!

'হিন্দু রসায়নের ইতিহাস' প্রকাশিত হলে বিশ্বের সর্বত্র পণ্ডিত ও বিদ্বান সমাজে যেমন আদৃত হয়, তেমনি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় উচ্ছ্বসিত প্রশংসার ঢেউ বয়ে যায়। দেশে ইংলিশম্যান, পাইওনিয়ার, টাইমস অফ ইণ্ডিয়া প্রশংসাপূর্ণ দীর্ঘ আলোচনা প্রকাশ করে ;নলেজ, নেচার, আমেরিকান কেমিক্যাল জার্নাল ইত্যাদিতেও প্রশংসাপূর্ণ সমালোচনা দেখা যায়। স্বয়ং বার্তেলো জার্নাল দ্য সাভাঁতে (Joumal des Sovants) পনেরো পৃষ্ঠাব্যাপী সমালোচনা প্রকাশ করেন। ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার ক্যালকাটা জার্নাল অফ মেডিসিন-এ অসাধারণ অভিমত ব্যক্ত করেন। এখানে ডাঃ সরকারের আলোচনার কিয়দংশ 'আত্মচরিত' (পৃ-৯২) থেকে উদ্ধৃত হলোঃ "ভারতবাসীদিগকে এই অপবাদ দেওয়া হয় যে, তাহারা অত্যুক্তিপ্রিয়। তাহাদের ঐতিহাসিক বোধ নাই। সুতরাং এই বহুনিন্দিত ভারতবাসীরা যে ঐতিহাসিক গবেষণা আরম্ভ করিয়াছে, বিশেষতঃ তাহাদের পূর্বপুরুষদের জ্ঞান, বিজ্ঞান, সভ্যতা সম্বন্ধে সত্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছে, ইহা এ যুগের একটি বিশেষ লক্ষণ। এইরূপ সত্যানুসন্ধান ও হিসাবনিকাশ দ্বারাই জাতি নিজের অভাব, ত্রুটি, অক্ষমতা প্রভৃতি বুঝিতে পারে এবং তাহার সংস্কারের পন্থাও নির্ধারিত হয়, এবং পার্থিব সমস্ত বিষয়ে জাতির ঐশ্বর্য ও দারিদ্র্য উন্নতি ও অবনতির হিসাবনিকাশ ইতিহাসই করে। এই কারণে আমরা কেবল কর্তব্যবোধে নয়, অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র রায় ডি. এস-সি. কৃত 'হিন্দু রসায়ন শাস্ত্রের ইতিহাস, প্রথম ভাগ' উল্লেখ করিতেছি।" বিভিন্ন লেখক ও বিজ্ঞানীরা এই গ্রন্থ থেকে নানা তথ্য সংগ্রহ করে তাঁদের গ্রন্থে অনুপ্রবিষ্ট করলেন। হারমান সলেঞ্জ তাঁর 'গেশিখ্‌টে ডের ফারমাৎযী' (*Geschichte der pharmazie*–History of Pharmacology), ফন লিপম্যান তাঁর 'এন্টস্টেহুং উন্ট আউসব্রাইটুং ডের অ্যালকিমি' (*Entstehung und Ausbrietung der Alchemie*–Origin and development of Alchemy) আরহেনিয়াস তাঁর Chemistry in Modern Life গ্রন্থে প্রফুল্লচন্দ্রের মহাগ্রন্থ থেকে তথ্যাদি অনুপ্রবিষ্ট করলেন।

মহাগ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশের পর বিশুদ্ধ রসায়নে গবেষণার জন্য দ্বিতীয় খণ্ড লেখা স্থগিত রাখলেন প্রফুল্লচন্দ্র। দ্বিতীয় বার বিলাত যাত্রা করলেন 1904 সালে। তখন প্যারিসে বার্তেলোর সহিত সাক্ষাৎ করলেন। অবশেষে 1909 সালে তাঁর গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হলো। এতে বৌদ্ধ অ্যালকেমি তন্ত্র, নাগার্জুনের কাল এবং তান্ত্রিক পর্যায় (1350-1600) যুক্ত হলো। উল্লেখযোগ্য আর একটি বিষয় হলো এতে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের "Mechanical and Physical and Chemical Theories of the Hindus of the Old "লেখা একটি অধ্যায়। এই খণ্ডটি বার্তেলোর নামে উৎসর্গীত হয়েছিল, কিন্তু পরিতাপের বিষয়, তিনি তখন আর ইহলোকে নেই। 1907 সালে তিনি পরলোক গমন করেছেন।

প্রফুল্লচন্দ্রের মহাগ্রন্থ পুনঃপ্রকাশের অভাবে ক্রমশ দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়ল। অবশেষে

তাঁর অন্যতম প্রিয় ছাত্র প্রিয়দারঞ্জন রায়ের সম্পাদনায় নতুন নাম *History of Chemistry in Ancient and Medaeval India* নিয়ে 1956 সালে প্রকাশিত হলো। কিন্তু একী করলেন প্রিয়দারঞ্জন! বই-এর নাম পাল্টে গেল, 'হিন্দু' অপসারিত হলো। প্রাচীন ও মধ্যযুগে ভারতে রসায়নের অবক্ষয় ও অধঃপতনের যে-কারণ আচার্য প্রদর্শন করেছিলেন, তা লোপাট করা হলো ;রামচন্দ্রের 'রসচিন্তামণি' বিলুপ্ত হলো। সম্পাদকের দায়িত্ব, কর্তব্য ও দায়বদ্ধতা বিস্মৃত হয়ে প্রিয়দারঞ্জন বললেন 'ইনকরপোরেটিং দি হিস্ট্রি অব হিন্দু কেমিস্ট্রি'! এখানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নের অধ্যাপক শ্যামল চক্রবর্তীর যুক্তি ও মন্তব্য সবিশেষ প্রণিধানযোগ্যঃ "সম্পাদনার সাধারণ সূত্রকে কি অগ্রাহ্য করা হল না? মূল লেখকের চিন্তাভাবনার সঙ্গে সম্পাদকের অভিমতের ফারাক থাকতেই পারে। তার জন্য পৃথক সম্পাদকীয় অভিমত রচনা করা যায়। আমরা কি পারি এখন, রবীন্দ্রনাথ প্রণীত 'বিশ্বপরিচয়' বইয়ে মহাজগতের অতিসাম্প্রতিক জ্ঞাত তথ্যকে একত্রিত করে বইটি অন্য নামে প্রকাশ করতে? যেখানে বলব আমরা, রবীন্দ্রনাথের 'বিশ্বপরিচয়' ইনকরপোরেট করছি!" (বিজ্ঞানের পৃথিবী বিজ্ঞানীর পৃথিবী, পৃ-১৮৮) এহেন খঞ্জ বইটির প্রকাশক ইন্ডিয়ান কেমক্যাল সোসাইটি যার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন স্বয়ং আচার্যদেব। ICS কি প্রায়শ্চিত্ত করবেন আচার্যদেবের মূল বইয়ের দুটি খণ্ড প্রকাশ করে?

চতুর্থ অধ্যায়

বিদেশ ভ্রমণ ঃ ভাবনা-চিন্তা বিনিময়

মারকিউরাস নাইট্রাইট অবিষ্কারের পর প্রফুল্লচন্দ্রের অত্যন্ত ক্রিয়াশীলতার জীবন। নাইট্রাইট নিয়ে গবেষণা, শিল্প-বাণিজ্য ভাবনা ও কার্যকর ভূমিকা পালন, প্রাচীন অ্যালকেমি পুঁথিপত্র সংগ্রহ, পাঠোদ্বার ও পাঠভেদ নির্ণয় এবং প্রাচীন যৌগগুলির পরিচিতি নির্ণয়ে গবেষণা ইত্যাদি তাঁকে গভীরভাবে সমাচ্ছন্ন করে রেখেছিল। এর ফলে সমকালীন রসায়নের সহিত তাঁর পরিচিতি যেমন ক্ষীণ হয়ে এসেছিল, তেমনি নিজস্ব গবেষণা কর্মের প্রতিও তিনি সুবিচার করতে পারেননি। ওই সময় আধুনিক রসায়ন চর্চা দ্রুতবেগে বৃদ্ধি পাচ্ছিল, এবং গবেষণার নতুন নতুন দিক উন্মোচিত হচ্ছিল। র‍্যালে ও রামজে আর্গন আবিষ্কার করেন, এবং নিয়ন, জেনন ও ক্রিপটন—এই বিরল গ্যাসগুলিও আবিষ্কৃত হয়। বেকেরেল, রাদারফোর্ড ও সডী কতকগুলি যৌগ ও খনিজ পদার্থের আলোক বিকিরণ ক্ষমতা সম্বন্ধে পরীক্ষা ও আলোচনা করেন। পিয়ের কুরী ও মাদাম কুরী রেডিয়াম আবিষ্কার করে তেজস্ক্রিয় পদার্থ গবেষণায় নতুন অধ্যায় সূচিত করেন। রামজের পরীক্ষায় জানা গেল রেডিয়াম থেকে বিকিরিত গ্যাস হলো হিলিয়াম—পদার্থের রূপান্তরের অবিসংবাদিত প্রমাণ। বায়ুর তরলীকরণ সমস্যাটির সমাধান করলেন স্যার জেমস ডেওয়ার (James Dewar)। হাইড্রোজেনের তরলীকরণের ন্যায় হিমালয়সদৃশ সমস্যাটিরও সমাধান হলো। আচার্যদেব তাঁর 'আত্মচরিত'-এ লিখেছেন—"যখন একটির পর একটি এই সমস্ত যুগান্তরকারী আবিষ্কার হইতেছিল, সেই সময় আমি প্রাচীন হিন্দুদের রসায়নজ্ঞানের গবেষণা লইয়া ব্যস্ত ছিলাম। সুতরাং আধুনিক রসায়ন শাস্ত্রের সহিত সংযোগ হারাইয়াছিলাম। ...আমি এখন নব্য রসায়ন বিদ্যার সঙ্গে পরিচয় স্থাপনের জন্য ব্যস্ত হইলাম।" [পৃ-৯৪]।

বিজ্ঞানী ও গবেষকদের সব সময় সমকালীন গবেষণার গতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে অবহিত থাকতে হয়। মূল স্রোতের সহিত তাল মিলিয়ে চলতে না পারলে পুরোনো ও অপ্রচলিত হয়ে পড়েন, ছিটকে যান। গবেষণায় ফিরে প্রফুল্লচন্দ্র অনুভব করলেন তিনি সমকালীন রসায়ন-গবেষণার মূল স্রোতধারা থেকে অনেকটাই সরে গেছেন—পিছনে পড়ে গেছেন। সুতরাং তাঁকে স্রোতধারার সামিল হতে হবে। "আমি এখন ইউরোপ ভ্রমণে যাত্রা করিব স্থির করিলাম। আমার উদ্দেশ্য, সেখানে বিশেষজ্ঞদের দ্বারা পরিচালিত কয়েকটি গবেষণাগার দেখিব এবং আধুনিক গবেষণা প্রণালীর সংস্পর্শে আসিয়া নূতন অনুপ্রেরণা লাভ করিব। প্রভাবশালী মনীষী ও আচার্যদের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে

না মিশিলে এরূপ অনুপ্রেরণা লাভ করা অসম্ভব।" (আত্মচরিত, পৃ-১০০) অবশ্য সব বিষয়ের অনুসন্ধানকারীদেরই বিভিন্ন চিন্তা ও ভাবনার সহিত পরিচিতি দরকার, পারস্পরিক চিন্তাধারার বিনিময় হওয়াও প্রয়োজন, কিন্তু বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভাব ও ভাবনার বিনিময় যতটা অত্যাবশ্যক অন্য ক্ষেত্রে তেমন নয়। রবীন্দ্রনাথ খুব সম্ভব তেরো বার বিদেশ ভ্রমণ করেছিলেন ; জগদীশচন্দ্রও একাধিকবার বিদেশে গেছেন, সেখানে গবেষণা করেছেন, যেমন, ডেভি-ফ্যারাডে লেবরেটরীতে। বিভিন্ন ওয়ার্কসপ সেমিনারে উপস্থিত থাকা তো বিজ্ঞানীদের এখন যোগ্যতা নির্ণয়ের অন্যতম মাপকাঠি হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিংশ শতাব্দীর একেবারে গোড়ায় ভারতীয় বিজ্ঞানের মেরুদন্ড দৃঢ় হয়নি। জগদীশচন্দ্র পদার্থবিজ্ঞানে ক্ষুদ্র তরঙ্গদৈর্ঘ্য আবিষ্কার করেছেন, আর প্রফুল্লচন্দ্র মারকিউরাস নাইট্রাইট আবিষ্কার করেছেন। সমৃদ্ধ গবেষণাগার নেই। গবেষণা করার অনুকূল পরিবেশ ও পরিস্থিতিও নেই। সুতরাং সে-যুগে অনুপ্রেরণা ও উদ্দীপনা লাভ করতে হলে বিদেশভ্রমণ একান্তই আবশ্যক।

দ্বিতীয়বার বিদেশ যাত্রা

1904 সালে প্রফুল্লচন্দ্র সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন, তিনি ইউরোপ ভ্রমণে যাবেন। কিন্তু যাব বললেই তো যাওয়া যায় না। সরকারী কর্ম থেকে ছুটি চাই, আর ভ্রমণে যে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন তার সুযোগ-সুবিধা লাভ করা চাই। আমরা ইতিপূর্বে দু-রকম সরকারী চাকরীর উল্লেখ করেছি ঃ ইম্পিরিয়াল সার্ভিস (IES) এবং প্রোভিন্সিয়াল সার্ভিস। ইম্পিরিয়াল সার্ভিসে থাকলে কিছু সরকারী সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যায়। যেমন, রাহাখরচ, ভাতা ইত্যাদি। শর্ত ছিল বৈজ্ঞানিক বিভাগের কোন কর্মচারী বিদেশ ভ্রমণ করলে তাকে কিছু সময় গবেষণা কর্মে নিয়োজিত হতে হবে। কিন্তু প্রোভিন্সিয়াল সার্ভিসের কোন লোকের পক্ষে এই সুবিধা পাওয়ার ব্যবস্থা ছিল না। সরকারী লাল টেপের মহিমা সেকালেও ছিল, এখনও আছে। আমলাদের হামলা যেন অপ্রতিরোধ্য। প্রফুল্লচন্দ্রের বিদেশ ভ্রমণে এইসব বাধা ছিল। তখন ডি.পি.আই ছিলেন প্রফুল্লচন্দ্রের শিক্ষক ও সহকর্মী পেডলার সাহেব। তিনি পেডলারকে বিদেশ ভ্রমণের ইচ্ছা প্রকাশ করে চিঠি লিখলেন। কিন্তু সেই পত্রের কয়েক মাস জবাব এল না। প্রফুল্লচন্দ্র সরকারী বাধা-বিঘ্ন ও প্রতিকূলতা বিষয়ে অবহিত ছিলেন, কিন্তু হাল ছাড়লেন না। এ-বিষয়ে তথ্যানুন্ধান করে চললেন। এমন সময় কার্জন ও কিচনার স্বাক্ষরযুক্ত একটি মন্তব্যলিপি তাঁর হস্তগত হলো। মন্তব্যলিপির সারাংশ এই যে, "কোন ভারতবাসী যদি মৌলিক গবেষণাকার্যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করে, তবে কেবলমাত্র প্রভিন্সিয়াল সার্ভিসের লোক বলিয়াই তাহার পক্ষে study leave বা অধ্যায়ন গবেষণা প্রভৃতির জন্য সুবিধাজনক শর্তে ছুটি পাওয়ার বাধা হইবে না।" (আত্মচরিত, পৃ-১০০) প্রফুল্লচন্দ্রের এই যাত্রা বিষয়ে পেডলারের সহযোগিতা ও সাহায্য অবশ্যই স্মরণীয়। আগস্ট মাসের মাঝামাঝি প্রফুল্লচন্দ্র বিদেশের উদ্দেশে জাহাজে চড়লেন।

গবেষণাগার পরিদর্শন ও গবেষণা

লন্ডনে পৌঁছলেন প্রফুল্লচন্দ্র। কিন্তু নিছক ভ্রমণের জন্য যাননি তিনি। তাই গবেষণাকর্মে নিযুক্ত থাকার জন্য ছটফট করতে লাগলেন। কিন্তু যে-কোন গবেষণাগারে গিয়ে 'আমি গবেষণা করব' বললেই তো আর সুযোগ পাওয়া যায় না। তাই তিনি উপায় সন্ধান করতে থাকলেন। তাঁর পূর্বতন অধ্যাপক ক্রাম ব্রাউন ও স্যার জেমস ডেওয়ারের (James Dewar) সহায়তায় ডেভি-ফ্যারাডে গবেষণাগারে কাজ করার সুযোগ পেলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, এই গবেষণাগারে জগদীশচন্দ্র কিছু দিন কাজ করেছিলেন। এখানে কাজ করতে করতেই তিনি অন্য গবেষণাগারগুলি দেখে আসতেন। তিনি ইম্পিরিয়াল কলেজ অফ সায়েন্স ও ইউনিভার্সিটি কলেজের ল্যাব পরিদর্শন করতেন। জেমস ডেওয়ার তখন খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিয়োজিত ছিলেন—সাধারণ গ্যাসের তরলীকরণ কাজে। তা ছাড়া আর্গন, নিওন ও জেননকে কিভাবে বায়ু থেকে পৃথক করা যায়—এরূপ গবেষণাতেও নিয়োজিত ছিলেন। এইসব প্রত্যক্ষ করে এবং আলোচনা করে প্রফুল্লচন্দ্র আধুনিক রসায়নের গবেষণা-ধারার সহিত নিজেকে পরিচিত করলেন। উইলিয়াম রামজে তখন দুষ্প্রাপ্য গ্যাসগুলি বায়ু থেকে পৃথক করার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। এইজন্য যে-সব যন্ত্রপাতির সাহায্য নেওয়া হয়েছিল, রামজে ও ট্রাভার্স তা প্রফুল্লচন্দ্রকে দেখালেন। এইভাবে প্রফুল্লচন্দ্র সে-সময়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গবেষক ও অধ্যাপকদের সংস্পর্শে এসে তাঁদের চিন্তা ও ভাবনার সহিত পরিচিত হলেন।

জেমস ওয়াকার (James Walker) ছিলেন প্রফুল্লচন্দ্রের সহপাঠী বন্ধু। তাঁর গবেষণাগার দেখার জন্য গেলেন ডান্ডী (Dundy)। তারপর দক্ষিণ লন্ডনের দিকে যাত্রা করে লীডস, ম্যনচেস্টার ও বার্মিংহামস্থিত গবেষণাগারগুলি পরিদর্শন করলেন। বহু বিশিষ্ট রসায়নবিদদের সহিত তাঁর সাক্ষাৎ ও আলোচন হলো। এঁদের মধ্যে আছেন স্মীথেলস (Jr. Smithells), কোহেন (Cohen), ডিক্সন (Dixon), পার্কিন (Perkin), ফ্রাঙ্কল্যান্ড (Frankland) প্রমুখ। অ্যানিলিন গোষ্ঠীর রং আবিষ্কারক উইলিয়াম পার্কিন তখনো জীবিত ছিলেন এবং উল্লেখযোগ্য যে, তিনি বিখ্যাত 'পার্কিন বিক্রিয়া'-র (Perkin's Reaction) প্রবক্তা। ওই সময় তাঁর পুত্র উইলিয়াম হেনরী পার্কিন খুব সম্ভব ম্যানচেস্টারে অধ্যাপক ছিলেন। এই জুনিয়র পার্কিনও রসায়নবিদ হিসাবে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তিনিই কৃত্রিম (synthetic) কর্পূর প্রস্তুত করেন এবং স্ট্রিকনিন, তার্পিন ইত্যাদি সংশ্লেষণ বিক্রিয়ার সহিত তাঁর নাম বিজড়িত হয়ে আছে। প্রফুল্লচন্দ্রের সহিত এই অধ্যাপকের যোগাযোগ ছিল। যাই হোক, তিনি পুনরায় লন্ডনে ফিরে এসে গবেষণায় মনোনিবেশ করলেন। অতঃপর ইউরোপ ভ্রমণের জন্য মনস্থির করলেন। স্যার উইলিয়াম রামজের পরিচিতিপত্র নিয়ে তিনি বার্লিনের নিকটবর্তী চার্লোটেনবার্গে পৌঁছলেন।

বার্লিনে 'টেখ্‌নিশে হোখ্‌শুলে' (Technische Hochschule) ও 'রাইখ্‌আনস্টাল্ট' (Reichsanstalt) পরিদর্শন করলেন। বিখ্যাত অজৈব রসায়নবিদ এর্ডম্যানের সহিত তাঁর সাক্ষাৎ ও আলোচনা করে গবেষণাগার পরিদর্শন করলেন। ভ্যান্ট হফ ছিলেন ভৌত রসায়নের তত্ত্ব সংগঠনের ক্ষেত্রে বিশ্বখ্যাত। কার্বন পরমাণুঘটিত বস্তুর অপ্রতিসম

(asymetric) গঠন তাঁরই পরিকল্পনা। তা ছাড়া রাসায়নিক বিক্রিয়ার গতি-প্রকৃতি বোঝার জন্য তিনিই প্রথম তাপ গতিতত্ত্বের প্রয়োগ করেন। এখানে প্রফুল্লচন্দ্র ভ্যান্ট হফের মুখে অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নাম শোনেন। প্রফুল্লচন্দ্রের পরিদর্শন কালে ভ্যান্ট হফ 'জালজবিলডুং' (salzbildung) নিয়ে গবেষণা করছিলেন। স্টাসফুর্টে "সামুদ্রিক লবণ হইতে যে অবস্থায় পটাশিয়াম ও সোডিয়াম লবণের বিপুল স্তর সৃষ্টি হইয়াছে, তাহারই নাম 'সাল্‌জালিডাং'।" এমিল ফিসারের সহিত সাক্ষাৎকার, আলোচনা ও তাঁর গবেষণাগার পরিদর্শন আর এক উল্লেখযোগ্য বিষয়। তখন ফিসার পিউরিন গোষ্ঠী (Purine group) সম্বন্ধে গবেষণা শেষ করে অ্যামাইনো অ্যাসিড নিয়ে গবেষণা করছিলেন।

অতঃপর বার্ন, জেনেভা ও জুরিখ পরিদর্শন। জুরিখে পলিটেকনিক দেখলেন। এখানে অধ্যাপক রিচার্ড লোরেঞ্জ ছিলেন। লোরেঞ্জ ছিলেন জার্মান জার্নাল অফ ইনঅরগ্যানিক কেমিস্ট্রির সম্পাদক। ওই জার্নালে প্রফুল্লচন্দ্রে কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ার সুবাদে তাঁর সহিত পূর্ব থেকে পত্র বিনিময়ে যোগাযোগ ছিল। লোরেঞ্জ তড়িৎ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন।

এলেন ফ্রান্সের প্যারিসে যা নব্য রসায়নের তীর্থক্ষেত্ররূপে পরিগণিত। এখানেই গবেষণা করেন লাভোয়াসিয়ে যাঁর সত্য আবিষ্কারে পুরোনো 'ফ্লজিস্টন মতবাদ' পরিত্যক্ত হয়। এখানে বহু কৃতী রসায়নবিদের কর্মক্ষেত্র। বার্থেলো, ফোবক্রয়, গ্যয়টন, ডি. মার্ভৌ, গে-লুসাক, থেনার্ড, ক্যাভেন্টো, পেলেটিয়ার প্রমুখ এখানেই অসাধারণ আবিষ্কার করে রসায়নের উন্নতি ও সমৃদ্ধি ঘটিয়েছেন। এঁদের অনন্যসাধারণ অবদানের জন্য রসায়নবিদ্যা অর্থে ফরাসী বিজ্ঞান বোঝাতো।

দুই মনস্বীর সহিত সাক্ষাৎ

প্রথমে প্রফুল্লচন্দ্র সিলভ্যাঁ লেভির সহিত সাক্ষাৎ করলেন। বহু ভাষায় পারদর্শী ও বিশেষজ্ঞ ছিলেন সিলভ্যাঁ লেভি। বৌদ্ধ শাস্ত্রে তাঁর পাণ্ডিত্য গভীর ও বিস্তারিত। অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র বাগচী তাঁর স্নেহধন্য হয়ে চীনা ভাষা শিক্ষা করে ডক্টরেট করেন। লেভির সহিত প্রফুল্লচন্দ্রের পত্রযোগে আলাপ-পরিচয় ছিল। হিন্দু রসায়নশাস্ত্রের ইতিহাসে তাঁকে বৌদ্ধ সাহিত্যে বিশেষজ্ঞ ও প্রামাণিক ব্যক্তি বলে উল্লেখ করেছিলেন প্রফুল্লচন্দ্র। সাক্ষাতের সময় লেভি পতঞ্জলির 'মহাভাষ্য' অধ্যয়ন করছিলেন। কথা মত, প্রফুল্লচন্দ্র পরের দিন সকালে তাঁর সঙ্গে কলেজ দ্য ফ্রান্সে দেখা করলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই বার্থেলো গবেষণাগারে এলেন, এবং লেভি প্রফুল্লচন্দ্রে সহিত পরিচয় করিয়ে দিলেন। প্রথম পরিচয়ের অনুভূতি প্রফুল্লচন্দ্র বর্ণনা করে বলেছেন,—"আমার সর্বাঙ্গে যেন বিদ্যুৎ প্রবাহ বহিয়া গেল। মনে হইল আমি অবশেষে সেই বিখ্যাত মনীষী এবং বিজ্ঞান-আচার্যের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছি যিনি সমস্ত জীবন পাশ্চাত্য রসায়ন বিজ্ঞানের উৎপত্তি ও ইতিহাসের রহস্য ভেদ করিতে ব্যয় করিয়াছেন এবং যিনি "সিনথেটিক রসায়ন শাস্ত্রের"—অন্যতম প্রধান প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া গণ্য।"[1]

1. *আত্মচরিত*, পৃ—১০৪-১০৫

বার্তেলোর সহিত গবেষণাগার দেখলেন প্রফুল্লচন্দ্র। সিনথেটিক যৌগ বিশ্লেষণের জন্য যে-সব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করেছিলেন বার্তেলো, তাও দেখলেন। বার্তেলোর কেম্ব্রিজ শিক্ষিত পুত্রের সাহায্যে দীর্ঘ এক ঘন্টা কথাবার্তা বললেন প্রফুল্লচন্দ্র। 'অ্যাকাডেমী অফ সায়েন্স'-এর অধিবেশনে উপস্থিত রইলেন, এবং ওই অ্যাকাডেমীর সভাপতি ট্রুস্টের সহিতও পরিচিত হলেন। এই সাক্ষাৎ ও পরিচয়ের ফলে প্রফুল্লচন্দ্র গবেষণায় উৎসাহ ও প্রেরণা লাভ করলেন, সন্দেহ নেই।

বিশ্বখ্যাত রসায়নবিদ ও পাশ্চাত্য রসায়নশাস্ত্রের ইতিহাসকার মঁশিয়ে বার্তেলো সম্বন্ধে প্রফুল্লচন্দ্রে শ্রদ্ধার অন্ত ছিল না। 'শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানম্'-এর এমন দৃষ্টান্ত আর দেখা যায় না বললেই চলে। বার্তেলো প্রফুল্লচন্দ্রের ভাবনা ও চিন্তায় অনেকখানি স্থান জুড়ে ছিলেন বলে মনে হয়। তাই তাঁর সম্বন্ধে দীর্ঘ বর্ণনা করে লিখেছেন,—"বার্থেলো এবং তাঁহার বহুমুখী প্রতিভার কিঞ্চিৎ পরিচয় না দিলে আমার প্যারী দর্শনের বিবরণ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। অর্ধশতাব্দীরও অধিককাল তিনি রসায়ন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রধান কর্মী ছিলেন এবং তাঁর লিখিত গ্রন্থসমূহের নামের তালিকা প্রকাশ করিতেই ফরাসী "জার্নাল অব কেমিস্ট্রীর" এক সংখ্যা পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তিনি অক্লান্তকর্মী ছিলেন এবং জ্ঞানেও অগাধ ও সর্বতোমুখী ছিলেন। 'সিনথেটিক কেমিস্ট্রীর' তিনি একজন প্রধান প্রতিষ্ঠাতা এবং তাঁহাকে থার্মো-কেমিস্ট্রীরও অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা বলা যাইতে পারে। এ বিষয়ে তিনি তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী কোপেনহেগেনের প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক টমসনের সঙ্গে সমান গৌরবের অধিকারী। রসায়ন শাস্ত্রের ইতিহাস সম্বন্ধেও তিনি একজন প্রামাণিক আচার্য এবং এই বিষয়ে তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। কৃষি-রসায়ন সম্বন্ধেও তিনি অনেক মূল্যবান গবেষণা করিয়াছেন। ... সমগ্র রসায়ন জগতে আমি এমন একজন ব্যক্তিকেও দেখি না, যাঁহার জ্ঞানের পরিচয় এত বিপুল, প্রতিভা এমন বহুমুখী এবং মানবসভ্যতার ভান্ডারে যিনি এত বিচিত্র দান করিয়াছেন।"[2]

প্রফুল্লচন্দ্র যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে বিদেশ যাত্রা করেছিলেন, তা যে সম্পূর্ণ সফল হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। নতুন উৎসাহ, নতুন উদ্দীপনা ও প্রেরণা নিয়ে কলকাতায় ফিরে এসে তিনি গবেষণায় নিমগ্ন হলেন। একের পর এক গবেষণাপত্র প্রকাশিত হতে থাকল। অজৈব, জৈব ও ভৌত রসায়নের সর্বত্র তাঁর স্বচ্ছন্দ বিহার লক্ষ করা গেল। সেই সঙ্গে বেঙ্গল কেমিক্যাল নিয়ে ভাবনা-চিন্তা ও *A History of Hindu Chemistry*-র দ্বিতীয় খন্ডও রচিত হতে লাগল। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করতে না পারলেও বিজ্ঞানের জন্যই বিজ্ঞানের সাধনা জাতির সম্মুখে উপস্থিত করতে থাকলেন।

তৃতীয়বার বিলাত যাত্রা

1912 সাল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের কংগ্রেসের (Congress of the Universities of Empire) প্রথম অধিবেশন হচ্ছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে

2. *আত্মচরিত,* পৃ—১০৫-১০৬

ওই কংগ্রেসে যোগদানের জন্য দু-জন প্রতিনিধি মনোনীত হলেন : প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী। উল্লেখ্য যে, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হয়েছিলেন। এই যাত্রায় গোখলেও প্রফুল্লচন্দ্রের সহযাত্রী ছিলেন।

কংগ্রেসের উদ্বোধন করেন লর্ড রোজবেরি এবং প্রথম দিনের আলোচনা শুরু করেন স্যার জোসেফ টমসন। কয়েক জন প্রখ্যাত ব্যক্তিত্বের ভাষণের পর সর্বাধিকারী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে প্রফুল্লচন্দ্রকে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করলেন। কিন্তু "আমি ইতস্ততঃ করিতে লাগিলাম এবং বলিলাম যে বৃহৎ সভায় বক্তৃতা করিতে উঠিলে আমি সঙ্কুচিত হইয়া পড়ি। তাঁহার (সর্বাধিকারীর) বাগ্মিতা আছে, সুতরাং তিনি বক্তৃতা দিবার ভার গ্রহণ করুন, আমি নীরব হইয়াই থাকিব।" দেবপ্রসাদ একথায় কর্ণপাত না করে সুযোগ্য ব্যক্তি হিসাবে প্রফুল্লচন্দ্রের নাম এক টুকরো কাগজে লিখে সভাপতির নিকট পাঠালেন। অগত্যা প্রফুল্লচন্দ্রকে বক্তৃতা দিতে হলো, কিন্তু অল্প সময়ের জন্য—মাত্র পাঁচ মিনিট। এই অল্প সময়ের বক্তৃতায় তিনি একটি গুরুতর সমস্যার প্রতি সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। ভারতীয় স্নাতক ও ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর ছাত্ররা ইংলন্ডে অধ্যয়ন ও গবেষণা করতে এলে তাদের নিকৃষ্ট বলে গণ্য করা হয়। এর প্রধান কারণ হলো তারা ভারতীয়। অথচ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর অধ্যয়নকালেও বহু ছাত্র মৌলিক গবেষণাপত্র প্রকাশ করেছেন। সুতরাং ভারতীয় ছাত্রদের উৎকৃষ্টতা বিষয়ে সন্দিহান হওয়ার কথাই ওঠেনা। অথচ ওইসব কৃতী ছাত্ররা ইংলন্ডে অধ্যয়ন ও উপাধিলাভের জন্য যখন আসে, তখন তাদের প্রাথমিক পরীক্ষা দিয়ে যোগ্যতার প্রমাণ দিতে হয়। এই পুরাতন রীতির অবসান হওয়া দরকার। ইংলন্ডের শিক্ষাব্যবস্থা ও ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা ও সুযোগের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে সত্য, কিন্তু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমন আইনজ্ঞ ও চিকিৎসক বেরিয়েছেন যাঁদের খ্যাতি সারা ভারতে পরিব্যাপ্ত। এই প্রসঙ্গে তিনি তৎকালীন উপাচার্য স্যার আশুতোষের নাম উল্লেখ করেন। ভাষণ শেষে প্রফুল্লচন্দ্র বলেন, "মাননীয় সভাপতি মহাশয়, আমি আসন গ্রহণ করিবার পূর্বে পুনর্বার আমাদের দেশের কলেজ সমূহে যে শিক্ষা দেওয়া হয়, আপনাদিগকে তাহার অধিকতর সমাদর করিতে অনুরোধ করিতেছি।" (আত্মচরিত, পৃ—১৩৫)

প্রফুল্লচন্দ্রের এই স্বল্পকালীন ভাষণ বৃথা যায়নি। মাস্টার অফ ট্রিনিটি ডঃ বাটলার প্রফুল্লচন্দ্র ও দেবপ্রসাদের সহিত সাক্ষাৎ করে কেম্ব্রিজে তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করার আমন্ত্রণ জানালেন।*

কেমিক্যাল সোসাইটিতে বক্তৃতা

আমরা ইতিপূর্বে প্রফুল্লচন্দ্রের গবেষণার বিবরণ দিতে গিয়ে অ্যামোনিয়াম নাইট্রাইটের বাষ্পীয় ঘনত্ব নির্ণয়ের উল্লেখ করেছি। এই গবেষণা ছিল যেমন কৌতূহলপ্রদ

* বর্তমানে নোবেল জয়ী অমর্ত সেন 'মাস্টার অফ ট্রিনিটি।

তেমনি চমকপ্রদ। প্রতিদিন প্রায় দশ-বারো ঘন্টা অক্লান্ত পরিশ্রম করে এ-বিষয়ে সাফল্য আসে। এই গবেষণার সহিত যুক্ত ছিলেন তাঁর দুই উজ্জ্বল ছাত্র—নীলরতন ধর ও তিনকড়ি দে। লন্ডন কেমিক্যাল সোসাইটিতে প্রফুল্লচন্দ্রের বক্তৃতাদান কালে ওই দুই জন ছাত্রও উপস্থিত ছিলেন। যাই হোক, এই গবেষণা রসায়ন জগতে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে এবং প্রখ্যাত রসায়নবিদগণ এর ভূয়সী প্রশংসা করতে থাকেন। তাঁদের মধ্যে আছেন রামজে, ভেলি, রস্কো প্রমুখ। *The Chemist and Druggist* ডঃ ভেলির বক্তব্য প্রকাশ করে লেখে যে, "অধ্যাপক রায় অ্যামোনিয়াম নাইট্রাইট সম্বন্ধে যে সত্য প্রমাণ করিয়াছেন, তাহা প্রচলিত মতবাদের বিরোধী।"

বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন ও সম্মান লাভ

এই যাত্রায় তিনি কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। কেম্ব্রিজে ডঃ বাটলারের আতিথ্য গ্রহণ করলেন। নিউটন যে-সব যন্ত্রপাতি নিয়ে জ্যোতির্বিজ্ঞানের গবেষণা করতেন, তাও একটি মানমন্দিরে রক্ষিত অবস্থায় দেখলেন। ছুরি ও কাঁচির জন্য বিখ্যাত শেফিল্ড। প্রফুল্লচন্দ্র ওই বিশ্ববিদ্যালয় দেখার বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করলেন। ওই সময় ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রফুল্লচন্দ্রকে ডি. এস-সি. উপাধি প্রদান করে। এই সাম্মানিক ডিগ্রী প্রদানকালে উপাচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের মৌলিক গবেষণার প্রশংসা করেন, এবং তাঁর *A History of Hindu Chemistry*-র উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। এই সময়েই ব্রিটিশ সরকার প্রফুল্লচন্দ্রকে C. I. E. (Companion of the Indian Empire) উপাধি প্রদান করে।

কংগ্রেসের অধিবেশন চলাকালে বিখ্যাত রয়াল সোসাইটির (Royal Society) আড়াইশ' বৎসর পূর্তি উৎসব চলছিলন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরূপে তিনি ওই উৎসবে যোগদান করেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, ওই সোসাইটি প্রফুল্লচন্দ্রকে সদস্য মনোনীত করেননি। এর অন্যতম প্রধান কারণ বোধ হয়, তিনি অপ্রিয় সত্য কথনে কখনো বিরত হননি। ব্রিটিশ সরকারের অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে *India before and after the Mutiny)* লেখার আগে থেকেই সোচ্চার ছিলেন। খবু সম্ভব, বঙ্গ ভঙ্গ আন্দোলনে (1905 সাল) তাঁর নৈতিক সমর্থন শ্বেতাঙ্গদের অবিদিত ছিল না। প্রায়ই দেখা যায়, সম্মান ও পুরস্কার পাওয়ার পিছনে থাকে রাজনীতির পঙ্কিল হস্তাবলেপ। নোবেল পুরস্কার নিয়েও এরকম অদৃশ্য হস্তের কারসাজি ইদানীং কালে প্রকট হয়ে উঠেছে। পুরস্কার প্রাপ্তি ও সম্মান লাভের জন্য শক্তিশালী 'লবি' চাই।

আশুতোষের ঐতিহাসিক পত্র

তখনো ইংলণ্ডে অবস্থান করছেন প্রফুল্লচন্দ্র এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণাগার পরিদর্শন করে চলেছেন। সম্মানিত হচ্ছেন ও আতিথ্য গ্রহণ করে চলেছেন। এমন সময় তিনি স্যার আশুতোষের একটি পত্র পেলেন। প্রফুল্লচন্দ্র স্বয়ং এটিকে ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করতেন। কারণ ওই পত্রে বিজ্ঞান কলেজ প্রতিষ্ঠার পূর্বাভাষ

ছিল। আমরা এখানে 'আত্মচরিত', পৃ—১৩৮-১৩৯ থেকে পত্রটি উদ্ধৃত করলাম।

"সিনেট হাউস, কলিকাতা
২৫শে জুন, ১৯১২

প্রিয় ডাঃ রায়,

আপনার স্মরণ থাকিতে পারে যে, গত ২৪ শে জানুয়ারি তারিখে সিনেটের সম্মুখে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদের প্রশ্ন উপস্থিত হয়, তখন আপনি দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, বিজ্ঞানের অধ্যাপকের জন্য কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই। তখন আমি আপনাকে আশ্বাস দিয়াছিলাম যে,—শীঘ্রই হয়ত বিজ্ঞানের অধ্যাপকের জন্য ব্যবস্থাও হইবে। আপনি শুনিয়া সুখী হইবেন যে, আমার ভবিষ্যৎ বাণী সফল হইয়াছে এবং আপনার ও আমার উচ্চাশা পূর্ণ হইয়াছে। আমরা একটি পদার্থবিদ্যার, ও আর একটি রসায়নশাস্ত্রের—দুইটি অধ্যাপক পদের প্রতিষ্ঠা করিয়াছি। মিঃ পালিতের মহৎ দান এবং তাহার সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের রিজার্ভ ফন্ড হইতে আরও আড়াই লক্ষ টাকা দিয়া, আমরা এইসব ব্যবস্থা করিতে সক্ষম হইয়াছি। গত শনিবার আমি সিনেটের সম্মুখে যে বিবৃতি দিয়াছি, তাহাতে এইসব বিষয় পরিষ্কাররূপে বলা হইয়াছে। উহার একখানি নকল আপনাকে পাঠাইলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম রসায়নাধ্যপকের পদ গ্রহণ করিবার জন্য আমি আপনাকে এখন মহানন্দে আহ্বান করিতেছি। আমার বিশ্বাস আছে যে আপনি এই পদ গ্রহণ করিবেন। বলা বাহুল্য, আমি এরূপ ব্যবস্থা করিব যাহাতে আর্থিক দিক হইতে আপনার কোন ক্ষতি না হয়। আপনি ফিরিয়া আসিলেই, আপনার সহায়তায় আমরা প্রস্তাবিত গবেষণাগারের পরিকল্পনা গঠন করিব এবং যতশীঘ্র সম্ভব উহা কার্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিব। আপনি যদি ফিরিবার পূর্বে গ্রেট-ব্রিটেন ও ইউরোপের কতকগুলি উৎকৃষ্ট গবেষণাগার দেখিয়া আসেন, তবে কাজের সুবিধা হইবে।

আপনাকে "সি. আই. ই" উপাধি দেওয়া হইয়াছে দেখিয়া আমি সুখী হইয়াছি, কিন্তু আমি মনে করি যে, ইহা দশ বৎসর পূর্বেই দেওয়া উচিত ছিল।

আশা করি আপনি ভাল আছেন এবং ইংলন্ড ভ্রমণে আপনার উপকার হইয়াছে।

ভবদীয়
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়"

প্রফুল্লচন্দ্রের প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে অবসর গ্রহণের তখনো চার বছর বাকী ছিল। কিন্তু তার পূর্বেই দেশে ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা না করে আশুতোষ কেন তাঁকে অধ্যাপকপদ গ্রহণের আমন্ত্রণ জানালেন? প্রফুল্লচন্দ্রের কি অন্য কোথাও নিয়োজিত হওয়া সম্ভাবনা ছিল? স্মরণ করা যেতে পারে যে, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য তাঁকে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের জন্য অনুরোধ করেছিলেন। যাই হোক, প্রফুল্লচন্দ্র বিজ্ঞান কলেজে যোগদানের সম্মতি জানিয়েছিলেন : "I look upon the proposed College of Science as the realization of the dream of my life and it will not only be my duty but a source of gratification to me to join it and place my humble services at its disposal."[3]

3. *Acharya Prafulla Chandra Ray,* C.U., p. 59

কলকাতায় ফিরে এলেন প্রফুল্লচন্দ্র এবং আশুতোষের সহিত সাক্ষাৎ করলেন। প্রফুল্লচন্দ্র মিত্রকে ভারতের প্রধান প্রধান গবেষণাগারগুলি দেখে পরিকল্পনা রচনার ভার দেওয়া হলো। আর প্রফুল্লচন্দ্র যথারীতি তাঁর গবেষণাকর্ম চালিয়ে যেতে লাগলেন।

চতুর্থবার ইংলন্ড যাত্রা

1920 সালে প্রফুল্লচন্দ্র চতুর্থবার ইংলন্ড যাত্রা করলেন। বলাই বাহুল্য, পান-ভোজন, আমোদ-প্রমোদ বা ঘুরে বেড়ানোর মধ্যে তাঁর সময় অতিবাহিত হতো না। বিখ্যাত রসায়নবিদ ও পুরোনো বন্ধুদের সহিত রসায়ন বিষয়ে নানা আলোচনা করতেন। এছাড়া বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগারে যে-সব ছাত্ররা কাজ করতেন, সেখানে বিনা নোটিশে ঢুকে পড়তেন। তাঁর অন্যতম এক উজ্জ্বল ছাত্র বীরেন্দ্রনাথ দে এরকম একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন : "In January 1905, one day, without any warning, I saw Dr. P. C. Ray walking into my room in St. John's College. I could hardly believe my eyes, but my delight knew no bounds and I considered myself singularly fortunate in welcoming my highly respected and beloved teacher who had always been a guide, philosopher and friend in my Presidency College days and who even now, when on leave, harboured a soft corner for me in his heart. ... He was extremely delighted to hear that I was keeping up my studious habits and giving a goods account of myself, having won a college scholarship after topping the list of scholars in my class in the first year's annual examination held in May 1904."[4]

ইন্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটি

1921 সাল। তখন জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শান্তিস্বরূপ ভাটনগর লন্ডনে অধ্যাপক ডোনানের (Donnan) গবেষণাগারে কাজ করছেন। তিনি ভোজন পর্বে সেখানে ঢুকে পড়লেন। কথায় কথায় গবেষণাপত্র প্রকাশের বিষয়টি এসে গেল। তখন ভারতে রসায়ন বিষয়ক গবেষণাপত্র প্রকাশের কোন উপায় ছিল না। সবই বিদেশী জার্নালে প্রকাশের জন্য পাঠাতে হতো। এতে অসুবিধা ও বিড়ম্বনার অন্ত ছিল না। কারণ, কোন গবেষণাপত্র প্রত্যাখ্যাত হতো, অথবা প্রকাশে অযথা বিলম্ব করা হতো। ফলে, গবেষক উপযুক্ত মর্যাদা, সম্মান ও স্বীকৃতি পেতেন না। এরূপ একটি বঞ্চনার শিকার হতে হয়েছিল সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে যখন *Philosophical Magazine* তাঁর গবেষণাপত্র অপ্রকাশিত রাখে। আরো স্মরণ করা যায় যে, জগদীশচন্দ্র তাঁর কেহেরার সম্পর্কে গবেষণা *JASB*-তে প্রকাশ করেন, এবং প্রফুল্লচন্দ্রও তাঁর মারকিউরাস নাইট্রাইট আবিষ্কার ওই একই জার্নালে প্রকাশ করেন। এদিকে রসায়ন গবেষণায় গবেষকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছিল এবং 'পেপার' প্রকাশের অসুবিধা তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছিল। এই সমস্যা

4. *Ibid*, P. 152-153

সমাধানকল্পে ইন্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করার বীজ ডোনানের গবেষণাগারে অঙ্কুরিত হতে থাকল। যথাসময়ে ঘোষ, মুখার্জী ও ভাটনগর দেশে ফিরে এলেন, এবং 1924 সালে সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হলো।

সোসাইটির জন্য তহবিল গঠন প্রভৃত সমস্যার সৃষ্টি করল। বিজ্ঞান কলেজে দুটি গৃহ নির্মাণে সাহায্য করলেন প্রফুল্লচন্দ্র। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 1000 পৃষ্ঠা জার্নাল ছাপার দায়িত্ব গ্রহণ করল ;অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছ থেকেও সাহায্য এল। বর্তমানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসের ব্যস্ততার জন্য বিনা পয়সার জার্নাল ছাপার পরিবর্তে গ্র্যান্ট (grant) দেবার ব্যবস্থা করা হয়।

সোসাইটির সদস্য শুরুতে ছিল 109 জন ; 1961 সালে বেড়ে দাঁড়াল 731 ; ইউরোপ ও আমেরিকা থেকে বহু সদস্য অন্তর্ভুক্ত হলেন। বিনিময়ের মাধ্যমে সোসাইটিতে বহু জার্নাল আসতে থাকে। গবেষণাপত্র দ্রুত প্রকাশের লক্ষ্য নিয়ে যে সোসাইটির প্রতিষ্ঠা তা অনেকাংশেই সাধিত হলো। এমন কি বিদেশ থেকেও নানা গবেষণাপত্র এই জার্নালে প্রকাশিত হতে থাকল।

লন্ডন কেমিক্যাল সোসাইটির সভাপতি ও কর্মকর্তাগণ ভারতীয় কেমিক্যাল সোসাইটির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে যে টেলিগ্রাম পাঠান তার প্রত্যুত্তরে সোসাইটির সভাপতি হিসাবে প্রফুল্লচন্দ্র অধ্যাপক উইনকে একটি পত্র লেখেন। ওই পত্রের অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত হলো :

"বিজ্ঞান কলেজ

৯২, আপার সার্কুলার রোড, কলকাতা (ভারতবর্ষ)

২৩শে অক্টোবর, ১৯২৪

প্রিয় অধ্যাপক উইন,

আপনার 17ই অক্টোবরের (1924 সাল) টেলিগ্রামের জন্য ধন্যবাদ। আপনার নিজের এবং কেমিক্যাল সোসাইটির কাউন্সিলের অভিনন্দন ও সদিচ্ছা আমরা কত মূল্যবান মনে করি, বলা নিষ্প্রয়োজন। লন্ডন কেমিক্যাল সোসাইটিকেই আমরা আমাদের সোসাইটির জনক মনে করি। এতদিন পর্যন্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে কেমিক্যাল সোসাইটির জার্নালেই রাসায়নিকদের একমাত্র মুখপত্র ছিল। এই কারণে উক্ত পত্রিকাতে ক্রমবর্ধমান মৌলিক গবেষণামূলক প্রবন্ধগুলি যতদূর সম্ভব সংক্ষেপ করিবার জন্য অনুরোধ করিতে হইত। একখানি মুখপত্রসহ ভারতে স্বতন্ত্র কেমিক্যাল সোসাইটির প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে।

"মূল সোসাইটির সঙ্গে আমাদের সোসাইটির সৌহার্দ্য রক্ষা করিবার জন্য আমি সর্বদা চেষ্টা করিব এবং তাহার উৎসাহ ও প্রেরণা মূল্যবাদ সম্পদরূপে গণ্য করিব। ...স্বভাবতঃই সেই 23 শে ফেব্রুয়ারি (1841 সাল) কথা আমার মনে পড়িতেছে— যে দিন আদি সদস্যেরা মিলিত হইয়া লন্ডন কেমিক্যাল সোসাইটির প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে পরামর্শ ও আলোচনা করেন। আমি সানন্দচিত্তে আরও স্মরণ করিতেছি যে, লন্ডন কেমিক্যাল সোসাইটির আদি সদস্যদের মধ্যে লর্ড প্লেফেয়ারকে (তিনি কিছুকাল

এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও প্রতিনিধি ছিলেন) জানিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল, আমার শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক ক্রাম ব্রাউন লর্ড প্লেফেয়ারের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়া দিয়াছিলেন।

আপনার সদিচ্ছার জন্য পুনর্বার বহু ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

ভবদীয়

(স্বাঃ) পি. সি. রায়"[5]

পঞ্চম বারের জন্য ইংলন্ড যাত্রা*

লর্ড বালফুরের (Balfour) সভাপতিত্বে 1926 সালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। প্রফুল্লচন্দ্র প্রতিনিধিরূপে প্রেরিত হলেন। প্রথম দিনের আলোচনার বিষয় ছিল 'রাষ্ট্র ও বিশ্ববিদ্যালয়'। আলোচনায় অংশগ্রহণ করে প্রফুল্লচন্দ্র বাংলা দেশের শোচনীয় শিক্ষাব্যবস্থার চিত্র তুলে ধরেন। তিনি বলেন 1919 সালে মন্টেগু চেমসফোর্ড শাসন সংস্কার নীতির ফলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি প্রাদেশিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভারত সরকারের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করলে তারা বাংলা সরকারের কাছে যেতে বলেন, আবার বাংলা সরকার মেস্টনি ব্যবস্থার দোহাই দেন। এ এক উভয় সঙ্কট অবস্থা। তারকনাথ পালিত ও রাসবিহারী ঘোষের বদান্যতায় বিজ্ঞান শিক্ষা চলছে। ভারত সরকার বা বাংলা সরকারের কাছে অর্থ সাহায্য চাইলেই তারা অর্থাভাবের অজুহাত তোলেন, অথচ ইম্পিরিয়াল স্কীমের জন্য জলের মত অর্থ ব্যয় করতে তাদের বাধে না। তিনি বলেন, "I have had occasions to critisize the niggardly parsimony of the Government. We are treated like so many Oliver Twists."[6] তিনি ম্যাক্সমূলারের উল্লেখ করে বলেন হিন্দুরা আর কিছু না করে দশগুণোত্তর পদ্ধতিতে সংখ্যা লিখন দান করলেই ইউরোপকে ভারতের নিকট অসীম ঋণে আবদ্ধ থাকতে হতো। ভারতীয় প্রতিভা সুযোগ ও উৎসাহ লাভ করলে উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে কি বিস্ময়কর অবদান রাখতে পারে, তা রামানুজন, জগদীশচন্দ্র, পরাঞ্জপের ক্ষেত্রে প্রমাণিত। অথচ সরকারের কাছে মাত্র 2% সাহায্য পাওয়া যাচ্ছে, বাকী 98% দেশবাসীর কাছ থেকে। অতঃপর বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী অধ্যাপক ও ছাত্রদের নাম উল্লেখ করে তিনি ভারত ও বাংলা সরকারের অর্থ সাহায্যের দিকটি বিবেচনা করার জন্য সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

আচার্যদেব মোট পাঁচবার (?) ইংলন্ড ও ইউরোপ ভ্রমণ করেছেন। কখনো রসায়ন শাস্ত্রের গতি-প্রকৃতি, অগ্রগতি ও উন্নতি সম্বন্ধে সম্যক অবহিত হওয়ার জন্য, কখনো বা গবেষণাগার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মনস্বী রসায়নবিদদের সঙ্গে চিন্তা-ভাবনা বিনিময়ের জন্য, আবার কখনো বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি উদাসীন ব্রিটিশ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য। এ-বিষয়ে তাঁর বড় ইংরেজদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করাই মূল

5. *আত্মচরিত*, পৃ—১৪৯-১৫০

* অমিতাভ সেন চতুর্থ বার বলেছেন। দ্রষ্টব্য: *Acharya Prafulla Chandra Ray*, 1986, p. 64

6. *Autobiography*, pp. 166-167

উদ্দেশ্য ছিল। তিনি ভেবেছিলেন, আবেদন-নিবেদনের মধ্য দিয়ে ভারত ও বাংলা সরকারের দৃষ্টি ও মনোযোগ আকর্ষণ করা যাবে। কিন্তু এই ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গীর অবসান হতে তাঁর বেশীদিন সময় লাগেনি। ব্রিটিশ সরকারের কুশাসন, অপশাসন, অন্যায় ও অবিচার ও বিমাতৃমূলক দৃষ্টিভঙ্গীর কঠোর সমালোচক হলেও এই সরকার আচার্যদেবকে 1919 সালে 'নাইট' উপাধি প্রদান করেন। স্মরণ করা যায় যে, ওই সময় জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ 'নাইটহুড' ত্যাগ করেন। এই প্রসঙ্গে নিমাইদাস রায়চৌধুরীর বক্তব্য উদ্ধৃতিযোগ্য : "কিন্তু আচার্য রায় তা করলেন না—এটা যে তাঁর বৈজ্ঞানিক দূরদৃষ্টির বিশেষ পরিচায়ক, তাহা উত্তর কালে নানারূপে প্রমাণিত হয়েছে। কারণ, দেখা যায় তিনি ঐ প্রচ্ছন্নভাবেই দিনের পর দিন কত বিপ্লবীকে কত ভাবে সাহায্য করে গেছেন ও আশ্রয় দিয়েছেন।"[7]

7. *Acharya Prafulla Chandra Ray,* C.U. p. 279

পঞ্চম অধ্যায়

প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপনা ও গবেষণা করার তীব্র আকাঙ্খা নিয়ে প্রাদেশিক শিক্ষা বিভাগে নির্দিষ্ট আড়াইশ' টাকা বেতনে যোগদান করতে দ্বিধা করলেও প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর নিম্নতর অস্থায়ী পদ ও তৎকালীন ডি. পি. আই. আলফ্রেড ক্রফটের রসিকতা কখনো ভুলতে পারেননি। ব্রিটিশ সরকার 1896 সালে শিক্ষা বিভাগের পুনর্গঠন করে প্রাদেশিক কেডার সৃষ্টি করে। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস দ্বাদশ অধিবেশনে এই কেডার সৃষ্টির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানালেও তার কোন ইতিবাচক ফল দেখা গেল না। আনন্দমোহন বসু প্রফুল্লচন্দ্রের প্রতি অবিচারের ইঙ্গিত দিয়ে বললেন,— "We know of the discoveries which also in the present year of grace have rewarded the genius and the patient toils of another countryman of ours in the realm of chemical research. The present year then, when India has shown that she has not forgotten the traditions of her glorious past, when the Indian mind has awakend to the conscioussness of the desting before it, and not only awakened to that consciousness, but has taken the first practical steps towards obtaining its recognition from the generous scholars of the West, surely is not the time or the season of ushering into existence a policy of this retrograde character."[1] এই নীতির ফলে প্রফুল্লচন্দ্রের অস্থায়ী পদটি স্থায়ী হলো, এবং তিনি 400-700 স্কেলে বেতন পাবার অধিকারী হলেন। কিন্তু এতে নতুন বিঘ্ন উপস্থিত হলো ঃ তাঁকে রাজশাহী কলেজের অধ্যক্ষ করে পাঠানোর শমন জারি হলো। কিন্তু প্রফুল্লচন্দ্র এই নতুন পদে যোগদানে অস্বীকৃত হলেন। কারণ, তখন তিনি ***A History of Hindu Chemistry***-র দ্বিতীয় খণ্ডের ওপর কাজ করছিলেন, এবং এশিয়াটিক সোসাইটির লাইব্রেরী ছাড়া একাজ করা অন্যত্র সম্ভব ছিল না। প্রফুল্লচন্দ্র তৎকালীন ডি. পি. আই. ডঃ মার্টিনের (Martin) সাহয্যপ্রার্থী হলেন। ডঃ মার্টিন জানতেন প্রফুল্লচন্দ্র প্রেসিডেন্সী কলেজে মৌলিক গবেষণায় ব্যাপৃত আছেন। তাই তাঁকে রাজশাহীতে বদলির সিদ্ধান্ত পরিত্যক্ত হলো। এ বিষয়ে 1897 সালে 26 মার্চ কলকাতা গেজেট প্রকাশিত হলো ঃ "The Lt. Governor agrees in thinking that no hard and fast rule can be laid down in the case of several of offers referred to."

আরো দীর্ঘ পনেরো বছর কেটে গেল। কি মৌলিক গবেষণা, কি হিন্দু রসায়নের অসামান্য ইতিহাস রচনা করলেও, এবং তা বিশ্বের সর্বত্র প্রশংসিত ও স্বীকৃত হলেও তিনি কখনোই ভারতীয় শিক্ষা বিভাগের পদ (IES) পেলেন না। 1911 সালে তাকে

1. Acharya Prafulla Chandra Ray. C. U, 1961, p.52

IES -এর ভারপ্রাপ্ত পদ দেওয়া হলো প্রথমে একশ'টাকা ও পরে দেড়শ' টাকা ভাতা দিয়ে। অথচ বয়সে ছোট ও নিম্নযোগ্যতা সম্পন্ন শ্বেতাঙ্গদের IES পদে নিয়োগ করা হলো। মি. কানিংহামের (Cunningham) নিয়োগ তার একটি উদাহরণ; যদিও তিনি প্রফুল্লচন্দ্রের পদপ্রান্তে বসে রসায়ন শিক্ষার কথা স্বীকার করতেন। শিক্ষাব্যবস্থা পরিদর্শনের জন্য লর্ড আইলিংটন (Islington) এলেন কমিশন নিয়ে 1913-14 সালে। শিক্ষা বিভাগের অন্যায়-অবিচার ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রফুল্লচন্দ্র নিজের বিষয়টি উত্থাপন করলেন। শাসক শ্বেতাঙ্গদের পক্ষপাতিত্ব ও নির্লজ্জ স্বার্থপরতার হীন মনোবৃত্তি জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্ত তুলে ধরলেন। কোন প্রতিক্রিয়া ও ইতিবাচক ফল দেখা না গেলেও প্রফুল্লচন্দ্র সমগ্র জীবনব্যাপী তাঁর এডিনবার্গের দিনগুলি থেকে ব্রিটিশ শাসনের তীব্র সমালোচনা করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেননি। এই কারণেই সম্ভবত তাঁকে IES পদ দেওয়া হয়নি, সরকারী সম্মান প্রাপ্তিতে তাঁর বিলম্ব হয়েছে, এবং সর্বোপরি তিনি কখনো F.R.S. হতে পারেন নি। তাই যখন স্যার আশুতোষ তাঁকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নের অধ্যাপকপদ গ্রহণের আমন্ত্রণ জানালেন, তখন সম্মতি জ্ঞাপনে তিনি বিলম্ব করেননি এবং সরকারী কাজ থেকে অবসর গ্রহণের সময়ের পূর্বেই তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করলেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজ

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে প্রফুল্লচন্দ্রের গবেষণা ও কর্মতৎপরতার বিবরণ দেওয়ার পূর্বে এই কলেজ প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে কিছু বলার প্রয়োজন। বর্তমানে যেখানে বিজ্ঞান কলেজ সেখানে ছিল স্যার তারকনাথ পালিতের একটি বাড়ী আর বাগান। 1905 সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে সারা বাংলা ঝাঁপিয়ে পড়ে, ছাত্ররাও দূরে থাকেনি। জাতীয় ঐক্য ও সংহতির এমন নিদর্শন পূর্বে দেখা যায়নি। কিন্তু ইংরেজ সরকার এই স্বাদেশিকতা ও স্বদেশপ্রেমকে সুনজরে দেখেনি। তারা সর্বপ্রকারে এই স্বদেশ-জাগরণের বিরুদ্ধে নানা অপকৌশল প্রয়োগ করার চেষ্টা করেছিল। ফলে, স্কুল-কলেজ থেকে বহু ছাত্র আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করার জন্য বিতাড়িত হলো। দেশের নেতৃবৃন্দ তখন এই ছাত্রদের পড়াশোনা করার ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য 'ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশন' প্রতিষ্ঠা করলেন 1906 সালে। জাতীয় শিক্ষা পরিষদের অধীনে নানা প্রতিষ্ঠানও গড়ে উঠল। এরকম একটি প্রতিষ্ঠান হলো 'বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউশন'। স্যার তারকনাথ পালিত তাঁর 92 নং আপার সারকুলার রোডের বাড়ীটির একাংশ ইনস্টিটিউট স্থাপনের জন্য অনুমতি দিলেন।

1904 সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন আইন বিধিবদ্ধ হয়। এই আইনের সুপারিশক্রমে 1909 সালে স্নাতকোত্তর শিক্ষা প্রবর্তিত হয়, এবং বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর শিক্ষা প্রবর্তিত করার বিষয়েও আলোচনা চলতে থাকে। ইতিমধ্যে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সহিত স্যার তারকনাথ পালিতের মতবিরোধ হয়, এবং তিনি বাড়ী ছাড়ার জন্য পরিষদের নিকট দাবী জানান। স্যার আশুতোষের সমৃদ্ধ কল্পনা, সুসংগঠিত

পরিকল্পনা ও অদম্য উৎসাহে বিজ্ঞান কলেজ রূপ পরিগ্রহ করতে থাকে। তাঁরই প্রচেষ্টায় তারকনাথ পালিত 92 নং আপার সারকুলার রোডের বাড়ী, এবং 35 নং বালিগঞ্জ সারকুলার রোডের বসতবাড়ী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করলেন। শুধু তাই নয়, এক কালীন পনেরো লক্ষ টাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করলেন প্রস্তাবিত বিজ্ঞান কলেজের রসায়ন ও পদার্থবিদ্যা বিভাগের দুটি অধ্যাপকপদ ও গবেষণা বৃত্তির ব্যয় নির্বাহের জন্য। এভাবে 'পালিত অধ্যাপক' পদের সৃষ্টি হয়। স্যার তারকনাথের এই মহৎ দান স্মরণ করে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর আত্মচরিতে (পৃ-১৫৭) লিখেছেন,— "তিনি আইনজীবী এবং এই দানের দ্বারা তিনি তাঁহার সন্তানদিগকে তাহাদের প্রাপ্য অংশ হইতে বঞ্চিত করিয়াছিলেন, কেননা বলিতে গেলে তাঁহার সর্বস্বই তিনি বিজ্ঞান কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য দান করেন।"

বিজ্ঞান কলেজ প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে এলেন আর এক মহান ব্যক্তিত্ব—ডঃ রাসবিহারী ঘোষ। তিনি বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য প্রায় দেড় লক্ষ পাউন্ড দান করলেন। এতে পাঁচটি অধ্যাপক পদের সৃষ্টি হলো যা 'ঘোষ অধ্যাপক' নামে পরিচিত। যে পাঁচটি বিষয়ে অধ্যাপকপদ সৃষ্টি হলো তা হলো রসায়ন, ফলিত রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, ফলিত পদার্থবিদ্যা ও ফলিত গণিত। কিছু পরে অধ্যাপক পদ সৃষ্টির জন্য খয়রার মহারাজকুমার গুরুপ্রসন্ন সিংহ বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে পাঁচ লক্ষ টাকা তুলে দেন। এই পদগুলি 'খয়রা অধ্যাপক' নামে পরিচিত।

স্যার আশুতোষের অনুপ্রেরণা ও প্রচেষ্টায় অধ্যাপক পদ সৃষ্টি ও গবেষণা বৃত্তির ব্যবস্থা হলো; বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগৃহীত ফি বাবদ টাকা নিঃশেষ করে গৃহও নির্মিত হলো; কিন্তু যন্ত্রপাতি সংগ্রহ ও গবেষণাগারের খরচ চালানো প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠল। অবশ্য আশুতোষ হতোদ্যম হবার পাত্র নন। তিনি নানা উপায় সন্ধান করতে থাকলেন। তিনি জানতে পারলেন কাশিমবাজারের মহারাজা স্যার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী তাঁর নিজের বহরমপুর কলেজে পদার্থবিদ্যায় অনার্স কোর্স খোলার জন্য কতকগুলি মূল্যবান যন্ত্রপাতি কিনেছিলেন, কিন্তু পরে অনার্স কোর্স খোলার প্রস্তাব পরিত্যক্ত হয়। আশুতোষের অনুরোধে মহারাজা সানন্দে যন্ত্রপাতিগুলি বিশ্ববিদ্যায়কে দান করলেন। শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যাপক ব্রুলও যন্ত্রপাতি ধার দিলেন। স্বয়ং আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে একটি কন্ডাকটিভিটি (Conductivity) যন্ত্র ধার করে আনলেন। এইসব সামান্য যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করেই পদার্থবিদ্যা ও ভৌত রসায়ন বিভাগ খোলা হলো। তথাপি অধ্যাপক ও গবেষক ছাত্ররা পদে পদে বাধার সম্মুখীন হতে লাগলেন; মৌলিক গবেষণা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠল।

স্যার আশুতোষ সরকারী সাহায্য আদায়ের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু সরকারের বিমাতৃসুলভ মনোভাব। অথচ ব্রিটিশ সরকার বাঙ্গালোর 'ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স'-কে (Institute of Science) লক্ষাধিক টাকা অনুদান দিচ্ছেন, এবং বোম্বাই-এর 'রয়েল ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স'-কে (Royal Institute of Science) পাঁচ লক্ষেরও বেশী টাকা সাহায্য করেছেন, কিন্তু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মাত্র বারো হাজার টাকা

সাহায্য পাচ্ছে। রবীন্দ্র কথিত এই 'ছোট ইংরেজদের' নির্লজ্জ আচরণের কারণগুলি অস্পষ্ট নয় ঃ

(i) বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় গভর্নর বামফিল্ড ফুলারের আমলে হেনরী শার্প ছিলেন শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টার। ওই সময় সিরাজগঞ্জ হাই স্কুলের ছাত্ররা 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি দিয়ে শার্পের কোপদৃষ্টিতে পড়ে। ওই স্কুল রাজদ্রোহের আড্ডা ও ছাত্রদের বিদ্রোহী আখ্যা দিয়ে ফুলার ও শার্প কঠোর শাস্তিবিধানের জন্য বদ্ধপরিকর হন। কিন্তু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট তাঁদের হাতের পুতুল হতে অস্বীকার করায় ক্রোধান্ধ ফুলার পদত্যাগের হুমকি দেখিয়ে বড়লাট মিন্টোকে সিন্ডিকেটকে শায়েস্তা করার প্রস্তাব দেন। কিন্তু বড়লাটের ধমনীতে তখনো নীল রক্তস্রোত ছিল। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটে হস্তক্ষেপ করতে অস্বীকার করায় ফুলার পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। শার্প অপমানের জ্বালা ভুলেননি। তাই যখন হার্ডিঞ্জের আমলে তিনি ভারত সরকারের শিক্ষা বিভাগের সচিব পদে অধিষ্ঠিত হলেন, তখন প্রতিশোধ নিতে দ্বিধা করলেন না। তিনি আশুতোষ ও বিজ্ঞান কলেজের বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন। লর্ড হার্ডিঞ্জ বিজ্ঞান কলেজের পক্ষপাতী হলেও শার্পের প্রভাবে তাঁর মতের পরিবর্তন হলো। 1915 সালের কনভোকেশনে বক্তৃতাকালো হার্ডিঞ্জ এমন ভাব দেখালেন যে, বিজ্ঞান কলেজের সুবিশাল গৃহ নির্মার্ণের বিষয় যেন তিনি কিছুই জানেন না। প্রতিশোধকামী শার্পের প্রভাবে বিজ্ঞান কলেজ সরকারী সাহায্য থেকে বঞ্চিত হলো।

(ii) দূরদর্শী স্যার আশুতোষের উদ্যোগে পালিত ও ঘোষের দানশর্তের একটি ধারা ছিল *"none but Indians, born of Indian parents, should be eligible for the professorship".* এই ধারাটি পড়েই হার্ডিঞ্জের ভ্রূকুঞ্চন হয়েছিল;এবং সেইজন্যই তিনি সমাবর্তন উৎসবে প্রাসাদোপম বিজ্ঞান কলেজের অস্তিত্বে অনবহিত হওয়ার ভান করেছিলেন। শুধু ছড়ি ঘোরাবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়াই নয়, এই ধারার জন্য স্বার্থান্ধ ইংরেজদের শোষণ বিঘ্নিত হয়েছিল।

(iii) ইংরেজ বণিকের জাত। শাসনের মধ্যে তাদের বণিক-প্রবৃত্তি, অর্থোপার্জনের সর্বপ্রকার কুকৌশল তাদের রক্তে; স্বার্থসাধনের এমন উলঙ্গ প্রকাশ কখনো কোনো ইতিহাসের পাতায় দেখা গিয়েছে বলে মনে হয় না। কেবল মাছের তেলে মাছ ভাজা নয়, সেই তেল আত্মসাৎ করার হীন মনোবৃত্তি ছিল ইংরেজ শাসকদের। ভারত সরকার বাঙ্গালোরের 'ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স' ও বোম্বাই-এর (বর্তমানে মুম্বাই) 'রয়েল ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স'-এর জন্য যে উদার হস্ত প্রসারিত করেছিল, তা তাদের বিনা স্বার্থে নয়। ওই দুটি ইনস্টিটিউটেই বড় বড় পদগুলি অধিকার করে রেখেছিল শ্বেতাঙ্গরা, আর ভারতীয়দের জন্য ছিল নিম্নপদ। ইংলণ্ডের 'ন্যাশনাল ফিজিক্যাল লেবরেটরী'-র ডাইরেক্টর ও সহকারী অধ্যাপকদের বেতনের অনুপাত ছিল 1 : 5, কিন্তু ভারতে শ্বেতাঙ্গ ডাইরেক্টরদের ও সহকারী অধ্যাপকদের অনুপাত ছিল 1 : 30। সুতরাং দেখা যাচ্ছে সরকারী সাহায্যের অধিকাংশই বেতন দেওয়ার জন্যই ব্যয়িত হচ্ছে;গবেষকদের জন্য প্রায় কিছুই অবশিষ্ট থাকছেনা। শুধু তাই নয়, ওই দুটি

ইনস্টিটিউটের নিজস্ব আরও এভাবে 'ড্রেইন্ড' (drained) হয়ে যাচ্ছে।[2] কিন্তু আশুতোষের সদাসতর্ক দৃষ্টির ফলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এরূপ হওয়ার কোন উপায় ছিল না।

কর্মক্ষেত্র বিজ্ঞান কলেজ

প্রথমে ডেপুটেড হয়ে, পরে শীঘ্রই নির্দিষ্ট সময়ের প্রয় এক বছর পূর্বেই অবসর গ্রহণ করে 1916 সালের 2রা নভেম্বর কলকাত বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন বিভাগের পালিত অধ্যাপকরূপে যোগদান করলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র। পেলেন অনুকূল পরিবেশ— মানসিক শান্তি, সম্মান ও মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠা; নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা ও পরিকল্পনা রূপায়িত করার স্বাধীনতা। শুধু বিজ্ঞান কলেজ প্রতিষ্ঠাতেই নয়, গবেষণাগার গড়ে তেলার একক ও অনন্য অধিকর। তাঁর সহায় হলেন প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র, তাঁর এক উজ্জ্বল ছাত্র। তিনি ভারতের অন্যান্য গবেষণাগার পরিদর্শন করে বিজ্ঞান কলেজের গবেষণাগার নির্মাণে সাহায্য করলেন আচার্যদেবকে। দুই প্রফুল্লচন্দ্র স্যার আশুতেষের পাশে দাঁড়িয়ে সর্ববিধ প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে বিজ্ঞানসাধনায় আত্মনিয়োগ করলেন। আচার্যদেবের সুপারিশক্রমেই প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র হলেন ঘোষ অধ্যাপক। সি. ভি. রমন অল্প কিছুদিনের মধ্যে পদার্থবিদ্যার পালিত অধ্যাপকরূপে যোগদান করলেন।

প্রেসিডেন্সী কলেজে যোগদানের সময় থেকেই 91নং আপার সারকুলার রোডের ভাড়া বাড়ীতে বাস করতেন প্রফুল্লচন্দ্র। কখনো জমি-জায়গা কিনে নিজস্ব বাড়ী নির্মাণের কথা ভাবেননি, কল্পনাও করেননি। ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসী মনুষ, তাঁর নিজস্ব বাড়ীর কি প্রয়োজন ; এই উপলব্ধি হতে তার খুব বেশীদিন সময় লাগেনি। গিলক্রাইস্ট বৃত্তি পেয়ে মায়ের নিকট বিদায় নেবার প্রাক্কালে তাঁর পিতার আর্থিক অবস্থার ক্রমশ অবনতি হচ্ছিল; দেনার দায়ে একটির পর একটি তালুক বিক্রী হয়ে যাচ্ছিল। এই সময় মাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন,—"আমি যদি জীবনে সাফল্য লাভ করি, তবে আমি প্রথমেই পরিবারিক সম্পত্তির পুনরুদ্ধার এবং ভদ্রাসন বাটীর সংস্কার করিব। আমি স্বীকার করি, যে আমার আদর্শ তদানীন্তন সামাজিক আবহাওয়ার প্রভাবে সঙ্কীর্ণ ছিল। বিধাতা অন্যরূপ ব্যবস্থা করিলেন এবং পরবর্তী জীবনে আমি এই শিক্ষাই লাভ করিলাম যে, ভূসম্পত্তিতে আবদ্ধ রাখা অপেক্ষা উপার্জিত অর্থ ব্যয় করিবার নানা উৎকৃষ্টতর উপায় আছে।"[3] পরে এ-বিষয়ে আমর আলোচনা করব। যাই হোক, 1917 সালেই 91 নং-এর বাসা ছেড়ে প্রফুল্লচন্দ্র 92 নং বিজ্ঞান কলেজের দক্ষিণ দিকের লম্বা বারান্দার সামনে একটি ঘরে এসে স্থায়ীভাবে বাস করতে লাগলেন। একেবারেই একা মনুষ, কিন্তু একা নন। সঙ্গে আছেন তাঁর কয়েকজন ছাত্র। সবারই উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। এদের নিজস্ব বাসা ভাড়া করে থাকার সঙ্গতি নেই, মফঃস্বল থেকে আগত। তাই তাঁর থাকেন আচর্যদেবের আশ্রয়ে—গুরুকুল প্রথায়। আচার্যদেব সজাগ দৃষ্টিত্রে তাঁদের

2. *বিস্তরিত বিবরণের জন্য আত্মচরিত, পৃ-১৫৩-১৫৬ দ্রষ্টব্য*

3. *আত্মচরিত,* পৃ-৪০ (40)

লালন ও পালন করেন। তাদের মধ্যে কেউ আচার্যের কেষাধ্যক্ষ, কেউ বা বাজার সরকার, কেউ বা প্রহরী যাতে আচার্যদেবকে কেউ অসময়ে বিরক্ত করতে না পারে। কেউ বা 'গনেশ', আচার্যদেব মুখে মুখে বলে যান, আর 'গনেশ' তা লিখে প্রবন্ধের আকার দেন। এরকম দু-জন 'গনেশ' হলেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় ও রতনমণি চট্টোপাধ্যায়। রতনমণি অবশ্য আচার্যদেবের সাক্ষাৎ ছাত্র নন।

বিপুল কর্মপ্রবণতা ও তৎপরতা

ক্ষীণ তণু, অজীর্ণ রোগের শিকার ও অনিদ্রায় আক্রান্ত আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র কিভাবে বিপুল কর্মপ্রবণতা ও তৎপরতার মধ্যে সহস্রহস্ত হয়ে কর্মসম্পাদন করেছিলেন ভাবলে বিস্ময়ের অবধি থকেনা। এই রহস্যের পিছনে ছিল তাঁর সময়ের সদ্ব্যবহার। বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের জীবনের সফল্যের পিছনেও ছিল এই সময়ের সদ্ব্যবহার। ফ্রাঙ্কলিনের জীবনী তাঁর অন্যতম প্রিয় পাঠের বিষয় ছিল। ফ্রাঙ্কলিন বলতেন,—"আমার প্রত্যেকটি কাজের জন্য সময় নির্দিষ্ট থাকিত এবং সেই শৃঙ্খলা অনুসারে আমি কাজ করিতাম।" তাঁর দৈনন্দিন কার্যপ্রণালী এরূপ ঃ

সকল প্রশ্নঃ আজ আমি কি ভাল কাজ করব?	5 টা-7 টা	ঘুম থেকে ওঠা, হাতমুখ ধোওয়া, পোষাক পরা। দিনের কাজ সম্বন্ধে চিন্তা করা,বর্তমানের কাজ ও প্রাতর্ভোজন।
	8 টা- 11 টা	কাজ
দুপুর	12 টা- 2 টা	অধ্যয়ন, হিসাব পরীক্ষা ও মধ্যাহ্ন ভোজন।
বিকাল	3 টা- 5 টা	কাজ
সন্ধ্যা	6 টা- 12 টা	ঠিক জায়গায় জিনিসপত্র রাখা, সান্ধ্য ভোজন, সঙ্গীত ও বিশ্রাম অথবা কথাবার্তা, দিনের কাজ নিয়ে ভাবা
রাত্রি	1 টা- 4 টা	ঘুমানো।

আচার্যদেব কেবল ফ্রাঙ্কলিনের জীবনী পাঠেই অনুরাগী ছিলেন না, তিনি ফ্রাঙ্কলিনের দ্বারা অনুপ্রাণিত ও প্রভাবিতও হয়েছিলেন। কাউপারের (Cowper) 'Time and tide wait for none' মর্মে মর্মে অনুধাবন করেছিলেন। রজেন্দ্রলাল মিত্রের রহস্য-সন্দর্ভে অনূদিত এই কবিতা তিনি বাল্যকলেই পড়েছিলেন।[4] দ্বিতীয় ফ্রাঙ্কলিন প্রফুল্লচন্দ্রের দৈনন্দিন সময় বিভাগ (15 ই জুন, 1920) তাই এরূপ ছিল ঃ

"সকাল ৭-৮$\frac{১}{২}$—কেমিক্যাল সোসাইটির জার্নাল পাঠ ;৯-১২টা- লেবেরেটরীতে গমন; ১$\frac{১}{২}$-২$\frac{১}{২}$ টা— পুনরায় লেবেরেটরীতে গমন। মোটরে করিয়া পটারী কারখানায় যাই; ৪$\frac{১}{২}$টায় ফিরিয়া আসি। পুনরায় লেবরেটরী দেখি ৫-৬—জোলা লিখিত গ্রন্থ মানি (Money)। ৬-১৫—৭$\frac{১}{২}$ সিটি কলেজ কাউন্সিল সভা। ৮-৯টা-ময়দান ক্লাব।"[5]

4. আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের চিন্তাধারা, পৃ-৩৫
5. আত্মচরিত, পৃ—১৬৩-১৬৮

আচার্যদেবের জীবন এমনই ছিল শৃঙ্খলাপরায়ণ। তাই তিনি বহু ও বিবিধ কর্মসম্পাদন করতে সক্ষম হয়েছিলেন জীবনে। অধ্যাপনা করেছেন, গবেষণা করেছেন, গবেষণা প্রদর্শক হয়েছেন, শিল্প-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠা ও বিকাশে কার্যকর ভূমিকা পালন করেছেন, জনহিতকর কর্মে আত্মনিয়োগ করেছেন, আর বাঙালীর বিবিধ সমস্যার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিরবচ্ছিন্ন লেখনী চালনা করেছেন। তিনি দানে কর্ণ, স্বদেশ ও স্বদেশপ্রীতিতে আত্মনিমগ্ন। দুর্ভিক্ষ, বন্যা, ত্রাণে সর্বত্র আচার্যদেবের বিচরণ; বিপ্লবী রাজনৈতিক কর্মীদের সি. আই. ই ও নাইট হুডের আড়ালে আবৃত করে রেখেছেন। কোথায় নয় তিনি খুঁজতে গেলে বিরল নজীর উপস্থাপনা হবে। শিক্ষা, সমাজ, অর্থনীতি, সাহিত্য, সমবায়, নারীকল্যাণ ইত্যাদি কত কত না তাঁর অবাধ বিচরণ ভূমি। বস্তুতপক্ষে, এই বাংলা দেশে তথা ভারতে এমন পরিপূর্ণ মানুষের আবির্ভাব ক্বচিৎ দেখা যায়।

স্কটিশ মিতব্যয়িতা ও এক বৈপরীত্য

বিশ্বে স্কটিশদের মিতব্যয়িতা, কৃচ্ছ্রসাধন তথা কৃপণতা প্রবাদ-প্রসিদ্ধ। গিলক্রাইস্ট বৃত্তি লাভ করে ঘটনাক্রমে তাঁকে স্কটল্যান্ডের এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়েই পড়াশোনা করতে হয়েছিল। সুতরাং স্কটিশদের জীবনযাপন প্রণালীর সহিত তাঁর সম্যক পরিচিতি ছিল। স্কটিশ ছাত্ররা কিরূপ মিতব্যয়িতার সহিত লেখাপড়া করত তার বিবরণ আত্মচরিতে (পৃ-৪৬) বর্ণনা করে লিখেছেন,—"তখনকার দিনে টুইড নদীর উত্তর দিকের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে কোন আর্থিক পুরস্কার, ফেলোসিশপ বা বৃত্তির ব্যবস্থা ছিল না—ছিল শুধু বিদ্যা শেখার ব্যবস্থা এবং আত্মত্যাগ ও দারিদ্র্যের ব্রত।....... ছাত্রেরা জানিত কত কষ্ট করিয়া তাহাদের পড়িবার খরচ পিতামাতারা যোগাইতেন। এবং ছাত্রজীবনের সদ্ব্যবহার তথা জ্ঞানার্জনের দৃঢ়সঙ্কল্প লইয়াই তাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাইত। বৎসরে পাঁচ মাস মাত্র তাহারা ক্লাসে পড়িতে পারিত, বাকী সময় ছেলে পড়াইয়া অথবা গ্রামের ক্ষেতের কাজ করিয়া নিজের পড়িবার ব্যয় সংগ্রহ করিত।" ছেলেবেলা থেকেই প্রফুল্লচন্দ্র ছিলেন মিতব্যয়ী, বলা যায় এ-বিষয়ে তিনি তাঁর পিতার বিপরীত চরিত্রের ছিলেন। বাড়ী সংলগ্ন বাগানে শাক-সব্জী ফলিয়ে বাজারে গিয়ে বিক্রী করতে তাঁর দ্বিধা ছিলনা। সম্ভ্রান্ত অভিজাত বংশে জন্মগ্রহণ করেও লোকভয়ের তোয়াক্কা তিনি করতেন না। পড়ার ব্যয় নির্বাহের জন্য উইলসনের সংস্কৃত-ইংরেজী অভিধানের ফর্মাগুলি বাঁধিয়ে বিক্রী করার কথা তো আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। স্মরণ করা যেতে পারে, গিলক্রাইস্ট বৃত্তির ওপর নির্ভর করেই তাঁকে এডিনবার্গে পড়াশোনা করতে হয়েছে। আহার-বিহার, পান-ভোজন, পোষাক-পরিচ্ছদে, গবেষণাগারে সর্বত্রই তিনি মিতব্যয়ী। তৎকালে মিতব্যয়িতার একমাত্র উদাহরণ ছিলেন গান্ধীজী। বস্তুতপক্ষে, প্রফুল্লচন্দ্রের জীবনে গান্ধীজীর প্রভাব পড়তে দেখা যায়। গান্ধীজী বলতেন, —"রেলে ভ্রমণ করিবার সময় আমি সর্বদা তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে চড়ি, উদ্দেশ্য—যাহাতে আমার দেশের সাধারণ লোকদের সংস্পর্শে আসিয়া তাহাদের দুঃখ-দুর্দশার কথা জানিতে পারি।"

এডিনবার্গে ছিলেন, কোট-প্যান্ট পরতেন। শীতের দেশে এছাড়া উপায় নেই। *While in Rome behave as Romans*—যস্মিন্ দেশে যদাচার। কিন্তু কলকাতায় প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কোট-প্যান্ট ছাড়লেন। ধুতি-চাদর ধরলেন। যদিও বা অধ্যাপনাকালে কোট-প্যান্ট পরতেন, বেয়ারা ও অধ্যাপকের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকত না। এই প্রসঙ্গে তাঁর ছাত্র চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যের লেখা থেকে একটি উদ্ধৃতি খুবই চিত্তাকর্ষক ঃ "১৯০১ সালে আচার্যদেবকে প্রথম দেখলুম। প্রেসিডেন্সী কলেজে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছি। রুটিনে দেখলুম প্রফুল্লচন্দ্র রায় আমাদের ক্লাস নেবেন। প্রথম দিনের ক্লাস, ছুটতে ছুটতে গিয়ে গ্যালারিতে এসে বসলুম। দ্বিতীয় ঘন্টা পড়ল; বেয়ারা এসে রেজেষ্টারি দিয়ে গেল, দেখি, বেয়ারার গায়ে চৌখুপি ছিটের সুতির একটা কোট। এবার প্রবেশ করলেন আচার্যদেব। দেখি, তাঁর গায়ে অবিকল সেই ধরণের এক কোট। এটা কেমন করে হল ঠিক বুঝাতে পারলুম না।

"বিকেলে প্রাক্টিক্যাল ক্লাসে ডিমন্সট্রেটর গুপীবাবুকে কথাটা জিজ্ঞাসা করলুম। তিনি বললেন,—একটা থান কিনে চারটা কোট করান। দুটো বেয়ারাটাকে দিয়েছেন, দুটো নিজে পরেন।"[6]

গ্রীষ্মকাল। জৈষ্ঠ মাসের গুমোট গরম। চারুচন্দ্র একদিন এলেন সতীশ মিত্রকে আচার্য দর্শন করাতে। ঘরে কোন পাখা নেই দেখে মিত্র প্রস্তাব দিলেন আচার্যদেবের ঘরে একটি পাখা লাগিয়ে দিতে। চারুচন্দ্র আচার্যদেবের সম্মতি প্রার্থনা করা মাত্র "গুম্ করে আমার পিঠের ওপর একটা কিল পড়ল। দরজাটার দিকে আঙ্গুল বাড়িয়ে বললেন, —এটা কোন্ দিক?

—কেন, দক্ষিণ দিক।

—তবে?

....

—প্রচুর হাওয়া আসে ঘরে, পাখার কোনো দরকার নেই।"[7]

আচার্যদেবের খাওয়া-দাওয়া যৎসামান্য। সাধারণত সিরাপ-মুড়ি, কখনো কখনো অল্প দামের কাঁঠালি কলা। অল্প ভাত, মুসুর ডাল, আলু সেদ্ধ, কখনো কখনো মাছের ঝোল। এই খাওয়া ও পরার জন্য ক'টি টাকা আর ব্যয় হতো! বাকী টাকা সম্বন্ধে মহাত্মাজী বলেছেন,—"Devoted to public uses and particularly for helping poor students."

অচার্যদেবের আর এক বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ছাত্র জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়ের ওপর নির্দেশ ছিল তিনি যেন মাসে চল্লিশ টাকার বেশী বাজার খরচ না করেন।

আচার্যদেবের আর এক ছাত্র ভবেশচন্দ্র রায় 'তিনি একা, কিন্তু একা নন' সংসারের জীবন্ত বর্ণনা করেছেন। এতে আচার্যদেবের চরিত্রের নানা দিক প্রকটিত হয়েছে বলে আমরা একটি দীর্ঘ উদ্ধৃতি তুলে ধরলাম ঃ "নিজে তিনি চিরকুমার। কিন্তু তাঁর কাছে

6. Acharya Prafulla Chandra Ray, C.U., P.232
7. Ibid, p. 233

সব সময় আমার মত আট দশটি ছেলে থাকতো। তারা আচার্যদেবের কাছেই থাকত, তাঁর ওখানেই খেত, আর বিজ্ঞান কলেজের বারান্দায় শুয়ে রাত কাটাত। দিনের বেলায় কলেজের ঘরে ঘরে যার যার নিজের কাজ কর্ম নিয়ে থাকতো। মধ্যে মধ্যে আচার্যদেব প্রত্যেকের কাছে যেয়ে খোঁজ নিতেন কে কি কাজ করছে, কার কি অসুবিধা এই সব। হয়তো কোন যন্ত্রপাতির অভাবে কাজ কর্মে অসুবিধা হচ্ছে, একবার কোন মতে কথাটা তাঁর কানে তুলতে পারলেই হ'ল। ব্যস, যেখান থেকে হোক যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা হয়ে যাবে। কলেজ থেকে যদি সম্ভব না হয়, নিজের পেন্‌শনের টাকা থেকে নিজেই দিতেন সে সব কিনে। এইভাবে ছেলের দল কাজ করে যেতো। তাদের কাজ হয়ে যখন কোন কিছু ফল পাওয়া গেল তখন তাঁর কি আনন্দ, কি উল্লাস! যাকে পান তাকেই ডেকে বলবেন—"দেখ, অমুক এই কাজটা করেছে, কি খেটেছে"—ইত্যাদি।

"আচার্যদেবের সংসারে যে ছেলেরা থাকতো তাদের তিনি রীতিমত সংসারের কাজ করতে বাধ্য করতেন। কাউকে ঘর ঝাঁট দিতে হত, কেউ পাক করতো। কেউবা পরিবেশন করতো। নিজে তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত নিজের কাপড় কাচতেন, নিজে মেলে দিতেন, আবার নিজেই সেটা যথাসময়ে গুছিয়ে তুলে রাখতেন। কোন দিন এর ব্যতিক্রম হ'তে দেখি নি। একটি কাজের লোক ছিল, সে পাক করতো এবং সংসারের কাজকর্ম করতো। মাঝে মাঝে তিনি তাকে গোপনে আগাম মাইনে দিয়ে ছুটি দিয়ে দিতেন। তখন সংসারে যারা থাকতো, তাদেরকেই পাক-শাক করতে হত। এইভাবে তিনি এম. এ., এম. এম্-সি. পাশ ছেলেদের সংসারের কাজ শেখাতেন, ঠিক যেমন করে মা সংসারের বড় বয়স্থা মেয়েদের কাজ শেখান।"[৪]

এ কিসের চিত্র অঙ্কন করেছেন ভবেশচন্দ্র তাঁর 'আচার্য স্মরণে'? প্রাচীন ভারতের তপোবনের এক ঋষির আশ্রম। যেখানে শিষ্যগণ গাভী নিয়ে মাঠে যাচ্ছে, হোমাগ্নির জন্য বনে কাষ্ঠ আহরণে যাচ্ছে। গুরুপত্নীর গৃহস্থালীতে সাহায্য করছে, সন্ধ্যার পর আচার্যের বাণী মনে ও প্রাণে গ্রহণ করে শিক্ষালাভ করছে। তাই তো দেখি আচার্যদেবের শিষ্যগণ পরবর্তীকালে কেউ উদ্দালক আরুণি, যাজ্ঞবল্ক্য, শ্বেতকেতু, কণাদ, গোতমের ন্যায় সিদ্ধসাধনক্ষম দিকপাল বিজ্ঞানী হয়ে উঠেছেন। আর আচার্যদেব উল্লাস ও স্ফূর্তিতে গেয়ে উঠেছেন ঃ **সর্বত্র জয়মন্বিষেৎ পুত্রাৎ(শিষ্যাৎ) ইচ্ছেৎ পরাজয়ম্**—সর্বত্র জয় অনুসন্ধান করবে, কিন্তু পুত্র ও শিষ্যের নিকট পরাজয় ইচ্ছা করে সুখী হবে।

আচার্যদেবের আর এক ছাত্র নদীয়াবিহারী অধিকারী দীর্ঘ দিন প্রায় ন'বছর তাঁর আশ্রয়ে থেকেছেন, এবং তাঁর বৃহৎ সংসারের আয়-ব্যয়ের হিসাবে রেখেছেন। তাঁর স্মরণ থেকে জানা যায় আচার্যের পেনসনের 430 টাকার * 200 টাকার মধ্যে সব খরচের সঙ্কুলান হতো, এতে আচার্যের যাতায়াত বাবদ খরচও চলে যেত। বাকী টাকা

8. Acharya Prafulla Chandra Ray, C.U., pp.266-67

* আচার্যের আর এক ছাত্র নৃপেন্দ্রনাথ ঘোষ বলেছেন ৪১১ টাকা। দ্রষ্টব্যঃ'পশ্চিমবঙ্গ', পৃ-২৯

ব্যাঙ্কে জমা হতো। "সঞ্চয় হাজার টাকার বেশি হলেই ভাবতে শুরু হল। শেষে অনেক ভেবে ব্রাহ্মসমাজকে দিলেন টাকাটা।"[9]

একদিকে স্কটিশ মিতব্যয়িতা, আর তার বিপরীতে মহারাজ বলি, বা মহাভারতের কর্ণ বা বিদ্যাসাগরের ন্যায় দানশীলতা—এই দুই বিরুদ্ধ গুণের সমাবেশ আচার্যদেবের চরিত্রে দেখা যায়। মিতব্যয়িতা ও কৃচ্ছ্রসাধন কেবল নিজের বেলায়, অন্যত্র তিনি প্রকৃতপক্ষেই দ্বিতীয় বিদ্যাসাগর। এই দুই বিপরীত গুণের একত্র সমাবেশ সম্পর্কে আর একটি ঘটনার উল্লেখ খুবই প্রাসঙ্গিক হবে। আচার্যদেবের দৈনিক বরাদ্দ ছিল এক পয়সা দামের দুটি চাঁপা কলা। কিন্তু এক দিন নদীয়াবিহারী বাজারে গিয়ে হৃষ্টপুষ্ট চাঁপাকলা দেখে তিন পয়সায় দুটি কিনে আনলেন। কলা দেখে আচার্যদেব বেজায় খুশী। কিন্তু তিনপয়সা দাম জেনে রেগে আগুন। "কি? আমার জন্যে এত খরচ, নবাবী করতে আরম্ভ করেছ?"[10] অতঃপর শাস্তিবিধানের পালা শুরু হলো; চুলের মুঠি ধরে নদীয়াবিহারীকে কিল-চড়, ঘুঁসি মারতে লাগলেন। এই ঘটনার ঘন্টাখানেক পরে এলেন ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। তিনি তাঁর অভয়াশ্রমের কাজের জন্য সাহায্য চাইলেন। মাত্র দুটি পয়সা অতিরিক্ত ব্যয়ে যিনি মাত্র ঘন্টাখানেক আগে কুণ্ঠিত, তিনিই নদীয়াবিহারীকে দিয়ে তিন হাজার টাকার চেক লিখিয়ে ডঃ ঘোষের হস্তে সমর্পণ করলেন। এই হলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র। তিনি ব্রহ্মর্ষি, মহর্ষি ও রাজর্ষি।

কত জনে কত দান! তার হিসাব পাওয়া কঠিন। মনোরঞ্জন গুপ্ত তাঁর প্রবন্ধে[11] আচার্যদেবের আয় ও ব্যয়ের একটি মোটামুটি হিসাব তুলে ধরেছেন, কিন্তু তার বাইরে বহু রেকর্ডহীন হিসাব রয়ে গেছে। প্রেসিডেন্সী কলেজে দীর্ঘ 27 বছর অধ্যাপনা করে তাঁর আয় হয়, 1,62,000 টাকা (= 500 × 12 × 27); পেনসন বাবদ আয় 1,44,480 টাকা (= 430 × 12 × 28); পালিত অধ্যাপকরূপে আয় 2,40,000 টাকা (= 1000 × 12 × 20)। সব নিয়ে সারা জীবনে মোট আয়ের পরিমাণ,—5,46,480 টাকা।

এছাড়া তাঁর আয়ের অন্য উৎস ছিল। বিভিন্ন যৌথ নির্মাণ সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে তাঁর কিছু শেয়ার ছিল। এইসব শেয়ারের ফেস ভ্যালু (face value) অন্ততপক্ষে 50,000 টাকা। ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষণ থেকে সম্মান মূল্য ও বিজ্ঞান পরীক্ষক হিসাবেও তাঁর আয় ছিল। তা ছাড়া তাঁর বিভিন্ন পুস্তকের 'রয়ালটি' (Royalty) বাবদ আয় অল্প হলেও ছিল। সমগ্র জীবনে এইসব উৎস থেকে মোট আয়ের পরিমাণ নির্ণয় করা কঠিন। কিন্তু তা কি দেড় লক্ষ বা তার বেশী হবে না? সুতরাং তাঁর মোট আয়ের পরিমাণ সাত লক্ষ টাকা বা তার বেশী ছিল।

প্রফুল্লচন্দ্র 1889 থেকে 1892 পর্যন্ত মাত্র 800 টাকা সঞ্চয় করতে পেরেছিলেন যা দিয়ে তিনি বেঙ্গল কেমিক্যাল প্রতিষ্ঠার কাজে অগ্রসর হন। এই সময়ে বেতন বাবদ 9000 টাকা উপার্জনের মধ্যে তাঁর নিজস্ব খরচ ও পিতৃঋণ পরিশোধ করতে 8,200

9. নৃপেন্দ্রনাথ ঘোষ, 'পশ্চিমবঙ্গ', পৃ-৩০

10. অচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, পৃ-৭৬

11. Acharya Prafulla Chandra Ray, C.U., P.189-92

টাকা ব্যয় হয়েছে। আরো কত দিন তাঁর পিতৃঋণ পরিশোধ করতে সময় লেগেছিল তার সঠিক কোন হিসাব পাওয়া যায় না।

ইতিপূর্বে তাঁর পিতৃদেব কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের উল্লেখ করেছি। আচার্যদেব ওই বিদ্যালয়টিকে উচ্চস্তরে উন্নীত করেন, এবং গ্রামে শিক্ষা বিস্তারের জন্য একটি 'শিক্ষা পরিষদ' গঠন করে 10,000 টাকা সমর্পণ করেন। এই প্রসঙ্গে আচার্যদেবের সামাজিক ও জনহিতকর কার্যাবলীর ঘনিষ্ঠ সহযোগী নিমাই দাস রায়চৌধুরীর সাক্ষ্য প্রণিধানযোগ্য : "১৯০০ সালে অর্থাৎ ৩৯ বৎসর বয়সে তাঁহার সমস্ত অর্জিত ও ভবিষ্যতের সম্ভাব্য অর্জেয় সম্পত্তি ট্রাস্টিদের হাতে সমর্পণ করেন। এডুকেশন সোসাইটি নামে একটি প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করে খুলনা জেলার নিরক্ষরতা দূর করার প্রয়াস করেছিলেন। যখন দেশে যেতেন পল্লীর ও তন্নিকটবর্তী গ্রামসমূহের পাঠশালার শিক্ষকদের পড়ুয়াসহ আহ্বান করে দিনের পর দিন খাওয়ানার ব্যবস্থা করা ও শিক্ষকদের নূতন বস্ত্র ও অর্থ দিয়ে তাদের উৎসাহিত করা তাঁহার এক বিশেষ আনন্দকর আয়োজন ছিল। গ্রামবাসীরা এই দিনগুলির অপেক্ষায় থাকত।"[12]

খুলনা জেলায় বাগেরহাট কলেজ স্থাপিত হয় 1928 অথবা 1927 সালে। বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী ও আদর্শ চরিত্র কামাখ্যাচন্দ্র মিত্র আচার্যের নামে আকৃষ্ট হয়ে দৌলতপুর কলেজ ছেড়ে এই কলেজে অধ্যক্ষরূপে যোগদান করেন। পাকাবাড়ী নয়, ছেঁচা বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘর আর গোলপাতার ছাউনি। আচার্যদেবের গ্রামের প্রতি বিশেষ টান তো ছিলই, তার ওপর অধ্যক্ষ মিত্রের ঐকান্তিক আগ্রহে তিনি বছরে একবার করে বাগেরহাটে যেতেন। নিমাইদাস তাঁর 'আচার্য স্মরণে' বর্ণনা করে বলেছেন, — "সে কি দুর্দিন গেছে। অধ্যাপকদের নিয়মিত মাহিনা নাই—ছাত্রদের দেওয়া যায় না ঠিক মত আশ্রয়। সকলে যেন আচার্যদেবের যাওয়ার দিনের প্রতীক্ষায় উন্মুখ আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকতেন। তিনি গেলে সবাই টাকা পাবেন কিছু কিছু—এই ভাব।"[13] তারপর শিশুসুলভ কৌতুক ও সারল্যে অর্থ প্রদান করতেন। ব্যক্তিগত কোন কারণে এক রাজকর্মচারী ওই কলেজের প্রতি বিরূপ হওয়ায় কলেজটি আর্থিক অনটনে ভুগতে থাকে। আচার্যদেব ওই রাজকর্মচারীকে ডেকে পাঠিয়ে ব্যক্তিগত বিরূপতার জন্য কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি করা শোভনীয় ও উচিত নয় বলে বোঝানোর ফলে কলেজটি আর্থিক অনটনের হাত থেকে রেহাই পায়। পরে এই কলেজের নামকরণ হয় 'আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র কলেজ'।

সতীশচন্দ্র মিত্র ছিলেন বৈষ্ণব সাহিত্যে সুপণ্ডিত ও কবি। মিত্র ছিলেন দৌলতপুর কলেজের অধ্যাপক। আচার্যদেবের অনুপ্রেরণায় সতীশচন্দ্র কবি থেকে ঐতিহাসিকে পরিণত হলেন : তিনি 'যশোহর-খুলনা জেলার ইতিহাস' রচনা করলেন। শুধু তাই নয়, ওই পুস্তকের প্রকাশনার সব ব্যয়ভার বহন করলেন আচার্যদেব।

1921 সালে আচার্যদেব ষাট বৎসর বয়স অতিক্রম করলেন। সঙ্গে সঙ্গে কলকাতা

12. 'Acharya Prafulla Chandra Ray, C.U., P. 275
13. Ibid, P.275

বিশ্ববিদ্যালয়কে জানিয়ে দিলেন তিনি আর অধ্যাপকদের বেতন গ্রহণ করবেন না। 1922 সালে প্রাচীন ভারতের বিখ্যাত রসায়নবিদ নাগার্জুনের নামে একটি বার্ষিক পুরস্কারের জন্য 10,000 টাকা দান করলেন। 1921 থেকে 1936 পর্যন্ত এই পনেরো বছরে তাঁর পালিত অধ্যাপকের বেতন হয় 1,80,000 টাকা। এই টাকা থেকে মাসিক 200 টাকার দুটি রিসার্চ ফেলোশিপের ভাতাও প্রদান করা হয়। 'ইন্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটি'র জন্য তিনি 10,000 টাকা প্রদান করেন; তাঁরই উদ্যোগে ও উৎসাহে 'সায়েন্স নিউজ অ্যাসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠিত হয়। এই অ্যাসোসিয়েশনও তাঁর সাহায্যে পুষ্ট হয়। স্যার অশুতোষের নামে প্রাণীবিজ্ঞান ও উদ্ভিদবিজ্ঞানে অবদানের জন্য পুরস্কার হিসাবে তিনি 10,000 টাকা দান করেন।

গোপন দান—হিসাববিহীন

ইতিপূর্বে আমরা আচার্যদেবের হিসাব বহির্ভূত সাহায্য ও দানের উল্লেখ করেছি। যেমন,—রাঢ়ুলি গ্রামের পাঠশালার শিক্ষকদের বস্ত্রদান ও আর্থিক সাহায্য, বাগেরহাট কলেজের অধ্যাপকদের আর্থিক সাহায্য ইত্যাদি। এ-সব সাহায্যের পরিমাণ নির্ণয় যেমন দুরূহ, তেমনি আরো বহুবিধ সাহায্য রয়েছে যার পরিমাণ নির্ণয়ও অসম্ভব। প্রতি মাসের প্রথম রবিবার বিজ্ঞান কলেজের বারান্দায় দরিদ্র ও সহায়সম্বলহীন ছাত্ররা ভিড় করত। তাদের নাম ও ধাম খাতায় লেখা থাকত। এদের সকলকেই পড়াশোনায় সাহায্যের জন্য মাসিক দানের বরাদ্দ থাকত। কখনো কখনো আচার্যদেব স্বয়ং উপস্থিত থেকে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করতেন ও পড়াশোনায় উৎসাহিত করতেন ও অনুপ্রেরণা যোগাতেন। খুবই দুঃখের বিষয়, এই খাতাটি সম্পর্কে কোন হদিশ পাওয়া যায় না।

বালবিধবাদের চোখের জল করুণাসাগর বিদ্যাসাগরের হৃদয় বিগলিত করেছিল। তিনি বিধবা বিবাহ প্রবর্তন করে ও তাদের অনেকের বিবাহ দিয়ে যথাসর্বস্ব ব্যয় করেছেন। সমাজ সংস্কারক বিদ্যাসাগরের এটি যে সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি তাতে কোন সন্দেহ নেই। বিদ্যাসাগরের ন্যায় আচার্যদেব সমাজ সংস্কারক ছিলেন না সত্য, কিন্তু নির্যাতিত, নিপীড়িত, সম্বলহীন অসহায় বিধবাদের প্রতি সমবেদনা ও সহানুভূতির অন্ত ছিল না তাঁর। সমাজপতিদের অশাস্ত্রীয় আচরণ ও হুকুম ও নারীজাতির অবমূল্যায়নের বিরুদ্ধে সর্বদা কঠিন ও কঠোর ছিলেন আচার্যদেব। স্পষ্ট বক্তা আচার্যদেব তাই বলেন,—"...........১৫-২০ বৎসর বয়সে অনেকে বিধবা হন। পরন্তু সহস্র সহস্র বাল-বিধবাগণ সামাজিক রীতি অনুসারে পুনর্বিবাহ করিতে পারে না। উপপত্নী ও রক্ষিতানারী সমাজের ভিতর ছড়াইয়া পড়িতেছে— পাপস্রোত ও ভ্রূণহত্যা পাতকে দেশ প্লাবিত। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা বিবাহ...........কর্ণকুহরে ধ্বনিত হইতেছে। আমি জানি অনেক হিন্দু বিধবা এই প্রকার কলঙ্কময় জীবন যাপন করা অপেক্ষা ইসলামধর্ম গ্রহণ করিয়া উদ্বাহসূত্রে আবদ্ধ হওয়া শ্রেয়ঃ জ্ঞান করেন।"[14] তাই বিধবাদের আশাহীন, দিশাহীন,

14. *'প্রফুল্লচন্দ্রের চিন্তাভাবনায় নারীসমাজ', নিবেদিতা দত্ত, 'পশ্চিমবঙ্গ', পৃ-১১৩*

করুণ ও মলিন মুখগুলি দেখলে আচার্যদেব অন্তরে গভীর আঘাত পেতেন। তাদের জন্য মাসিক বরাদ্দের ব্যবস্থা করেছিলেন। তা ছাড়া ট্রাষ্টী গঠনের মধ্যে দিয়েও বিধবাদের সাহায্যের ব্যবস্থা করেছিলেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে যোগদানের পর থেকেই আচার্যদেব বিভিন্ন পরীক্ষার পরীক্ষক ছিলেন। এই বাবদ তাঁর যে আয় ছিল তা ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র মিত্রের জিম্মায় থাকত। এই অর্থ থেকে ছাত্রদের সাহায্য করা হতো। তা ছাড়া বেঙ্গল কেমিক্যাল ও অন্যান্য শিল্পসংস্থায় তাঁর শেয়ার ছিল। এই শেয়ার থেকে আয় সাহায্য করা হতো বিভিন্ন বিধবাশ্রমে, অনাথ সেবাসংস্থায়, খদ্দরের প্রচার ব্যবস্থার জন্য। এ জন্য ট্রাস্ট গঠন করে ট্রাস্টীদের হাতে সব ভার অর্পিত হয়। তাঁর বই ও ভাষণ (লেকচার) থেকে আয় হিসাবে বহির্ভূত কোন খাতে ব্যয় হয়েছে, তার কোন লিখিত বিবরণ নেই। আচার্যদেব বেঙ্গল কেমিক্যালসহ অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠানের ডাইরেক্টর ছিলেন। এই বাবদ তাঁর অর্থাগম হওয়ার কথা। কিন্তু তা তিনি গ্রহণ করতেন না। শিল্প সংস্থার কর্মীদের কল্যাণে তা ব্যয় হতো। ভাষণ থেকে আয়ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতিতে প্রত্যর্পিত হতো।

আচার্যদেব ছিলেন দানে মহারাজা বলি ও দানবীর কর্ণ, দয়া ও মায়ায় মধুসূদন কথিত বিদ্যাসাগরের ন্যায় mother of a Bengali heart-এর অধিকারী, আর দেহে ও আত্মত্যাগে তপস্বী দধীচি। দেবতারা দধীচির অস্থি দিয়ে বজ্র নির্মাণ করে অশুভ অসুর শক্তির নিধন করেছিলেন। কিন্তু বাঙালীরা প্রফুল্লের অস্থি দিয়ে কি নির্মাণ করেছে তার কৈফিয়ৎ দেবার সময় কি তাঁর তিরোধানের প্রায় পঞ্চাশ বছর পরেও আসেনি?

বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার রূপরেখা

আচার্যদেব 1916 সালের 2রা নভেম্বর প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে অবসর গ্রহণ করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে পালিত অধ্যাপকরূপে যোগদান করলেন। তাঁর অবসর গ্রহণ উপলক্ষে প্রেসিডেন্সীর ছাত্রগণ সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করে যা প্রত্যাশা করেছিল তা বর্ণে বর্ণে সত্যে পরিণত হয়েছিল। তাঁদের আশা ও আকাঙ্খা এইভাবে ব্যক্ত হয়েছিলঃ " জীবন-সায়াহ্নে লোকে সাধারণতঃ যখন অবসর অন্বেষণ করেন, তখনও আপনি কার্যক্ষেত্রে থাকিতেই সঙ্কল্প করিয়াছেন। এক যুগ পূর্বে আপনি যে বিজ্ঞানের আলোক প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন, তাহা অনির্বাণ রাখিবার জন্য আপনি আগ্রহান্বিত। বিজ্ঞান কলেজ এবং রাসায়নিক গবেষণা যেন দীর্ঘকাল ধরিয়া আপনার অক্লান্ত সেবা ও উৎসাহে শক্তি লাভ করে। আপনার আশীর্বাদে আরও বহু বিজ্ঞান অনুসন্ধিৎসু যেন এই পথে অগ্রসর হয়..........।[15] বিজ্ঞান কলেজে আচার্যদেব নিজের গবেষণা করেছেন ও ছাত্রদের সহযোগিতায় গবেষণা করে অনেক গবেষণাপত্র রচনা করেছেন। 1936 সাল পর্যন্ত নানা বিষয়ে বহু গবেষণাপত্র JASB, JCS, JICS, Z. anorg. allgen. Chem., Nature ইত্যাদি খ্যাতনামা জার্নালে প্রকাশিত হতে দেখা যায়।

15. আত্মচরিত, পৃ—১৪৫

আচার্যদেবের বহুবিধ বিষয়ে গবেষণার বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়, এবং এই জীবনী গ্রন্থে তা অভিপ্রেতও নয়। তাই আমরা কেবল তাঁর কয়েকটি বিষয়ের গবেষণার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করব।



বিজ্ঞান কলেজের গবেষণাগার

ইতিপূর্বে আচার্যদেবের প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপনা কালে গবেষণা সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা করেছি। বিজ্ঞান কলেজেও তাঁর পূর্ববর্তী গবেষণার ধারা অব্যাহত থাকে, এবং আরো নতুন নতুন বিষয় সংযুক্ত হয়ে সম্প্রসারিত হতে থাকে। অজৈব নাইট্রাইট, জৈব নাইট্রাইট ইত্যাদির ওপর যেমন কাজ করেছিলেন, তেমনি পারদের নানা রকমের জটিল লবণ প্রস্তুতিও করেছিলেন।

বিজ্ঞান কলেজে যোগ দানের পর পারদ সংক্রান্ত গবেষণায় তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান হলো নানা রকমের মারক্যাপটন প্রস্তুতি ও এইসব মারক্যাপটনের ধর্মাবলী সম্বন্ধে বিশদ জ্ঞান আহরণ। বিভিন্ন প্রকার মারক্যাপটনের সঙ্গে মারকিউরিক লবণের বিক্রিয়া ঘটিয়ে মারক্যাপটাইড ধরনের যৌগ প্রস্তুত করেন।

মারকিউরিক নাইট্রাইট মারক্যাপটনের সহিত বিক্রিয়া ঘটিয়ে মারকারি মারক্যাপটাইড নাইট্রাইট উৎপন্ন করে যাদের সঙ্কেত $RSHgNO_2$ ও $RSH.Hg(NO_2)_2$।

অ্যালকিল আয়োডাইডের সহিত এগুলির বিক্রিয়ায় সালফোনিয়াম যৌগ উৎপন্ন করে যাদের সাধারণ সঙ্কেত নিম্নরূপ :

```
        I   I
        |   |
    R – S – S –R
        |   |
      HgI  R'
```

I – Hg – S – S – Hg – I —এই যৌগটির লক্ষণীয় আলোকানুবর্তিতা (phototropism) গুণ বর্তমান।

সত্যিকার মারক্যাপটন যাতে SH গ্রুপ বর্তমান ও 'টটোমেরিসম' (tautomerism)* দ্বারা উদ্ভূত মারক্যাপটনিক গ্রুপের যৌগগুলির মধ্যে পার্থক্য করার প্রচেষ্টা করেছিলেন আচার্যদেব। পরবর্তী যৌগগুলিকে তিনি ফলদায়ক বা কার্যকর (potential) মারক্যাপটন বলে অভিহিত করেন। 2, 5 ডাইথায়ো-1, 3, 4-থায়াডিয়াজোল-এর সহিত তিনি ট্রাইনিউক্লীয় ঘনীভূত উপজাত দ্রব্য উৎপন্ন করেন যার সঙ্কেত $(C_2N_2S_3)x$, Hg_2O, $x = 2, 3, 4$ বা 6. এইগুলি অ্যালকিল অয়োডাইডের সহিত বিক্রিয়ায় দীর্ঘশৃঙ্খল সালফার যৌগ উৎপন্ন করে। এই যৌগগুলি সম্বন্ধে আরো গবেষণার প্রয়োজন। এ-বিষয়ে আমাদের অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে, তখনো পলিমার সম্পর্কীয় জ্ঞানের উদয় হয়নি। এ-বিষয় জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় লিখেছেন,—"The idea of folding chains and cross linkage formation had yet to be advanced. In view of recent advances in knowledge, it is necessary that long-chain sulphur compouds described by him should receive further investigation."[16]

ফিনাইল মারক্যাপটন $Ph_2 S_3 Hg$ সঙ্কেতের মারক্যাপটাইড প্রদান করে যা আবার নিম্নরূপ সঙ্কেতের সালফোনিয়াম যৌগ উৎপন্ন করে :

```
        I   I   I
        |   |   |
    R – S – S – S – Ph
        |   |   |
      HgI   R   R
```

এই জটিল মারক্যাপটনগুলির অধ্যয়ন থেকে তিনি কোন কোন সরল সালফাইড ও মারক্যাপটনের প্রস্তুতি ও ধর্মাবলী সম্বন্ধে গবেষণায় প্রবৃত্ত হলেন। তিনি লক্ষ করলেন ক্লোরোপিরিন (Chloropierin) বিকারক (reagent) ব্যবহার করে প্রকৃত ও কার্যকর মারক্যাপটনের মধ্যে পার্থক্য করা যায়। এই বিকারকের সহিত কার্যকর মারক্যাপটন বিক্রিয়া করে প্রাথমিক আকারের সালফার ত্যাগ করে। তিনি প্রমাণ

*. Tautomer : A substance that exists as two mutually convertible isomers in equilibrium.

16. J.N.Ray, op. cit. P. 425; আচার্যদের গবেষণার বিবরণ অধ্যাপক রায়ের প্রবন্ধ থেকেই গৃহীত।

করলেন থায়োঅ্যাসিটামাইড ও থায়োকার্বামাইড প্রকৃত মারক্যাপটনের ন্যায় আচরণ করে। তিনি আরো দেখালেন যে ইথিলিন ডাইব্রোমাইড ও অ্যালকোহলীয় পটাশিয়াম সালপহাইড্রেট এক জটিল যৌগ উৎপন্ন করে যা থেকে তিনি পৃথক করলেন

$HS\text{-}(C_2H_4S)_2\text{-}C_2H_4$ এবং অনুরূপ টেট্রাসালফাইড $(C_2H_4)_3S_4$, তার সাথে ট্রাইসালফাইড $(C_2H_4S)_3$।

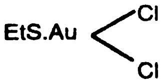
ইথিলিন ডাইব্রোমাইড ও ডাইথায়োগ্লাইকলের বিক্রিয়ায় $Br\text{-}C_2H_4\text{-}(S\text{-}C_2H_4)n\text{-}Br$ ধরনের দীর্ঘশৃঙ্খলযুক্ত সালফার যৌগের শ্রেণী তৈরী করেন। এই সম্বন্ধে জ্ঞানেন্দ্রনাথের মূল্যায়ন হলো "These macro-molecular compounds are certainly worth further investigation by the newer methods of physical-organic chemistry."[17]

সালফার ঘটিত যৌগ সম্বন্ধে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো—সোনা, প্লাটিনাম ও ইরিডিয়ামের বিভিন্ন ধরনের যৌগের সংশ্লেষ। এ যৌগগুলিতে উপস্থিত ধাতুর অপ্রচলিত যোজ্যতা লক্ষ করা গেছে। এই গবেষণার সূত্র ধরেই পরবর্তীকালে অনেক বিজ্ঞানী অস্বাভাবিক যোজ্যতা সম্পন্ন নানা ধাতুর যৌগ প্রস্তুত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আমরা এখানে সোনার পরিবর্তনশীল যোজ্যতা সম্বন্ধে একটু বিস্তারিত বিবরণ দিতে চাই পাঠক-পাঠিকাদের আচার্যদেবের গবেষণার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য।

সোনার পরিবর্তনশীল যোজ্যতা

সোনার পরিবর্তনশীল যোজ্যতা সম্বন্ধে গবেষণার পূর্বে আচার্যদেব প্লাটিনামের পরিবর্তনশীল যোজ্যতা সম্বন্ধে গবেষণা করেন। সোনার যোজ্যতা সম্পর্কে তাঁর গবেষণাপত্র—'Varying Valency of Gold with respect to Mercaptinic Radicals', JICS 1, pp. 63-73, 1924 প্রকাশিত হয়। এই পত্রে তিনি মারক্যাপটিনিক পরমাণুপুঞ্জের পরিপ্রেক্ষিতে সোনার যৌগের দ্বি, ত্রি, চতুঃ ও পঞ্চ যোজ্যতার কথা বলেন। তিনি দেখান যে প্লাটিনামের ন্যায় সোনার যোজ্যতাও পরিবর্তনশীল।

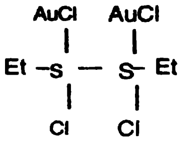
এই উদ্দেশ্যে তিনি গোল্ড ক্লোরাইডের (Chlorauric acid) সহিত ডাই-ইথাইল-ডাই-সালফাইডের বিক্রিয়া ঘটিয়ে একটি কেলাসিত যৌগ উৎপন্ন করেন যার সঙ্কেত $EtS.AuCl_2$। এই যৌগের গঠনমূলক সঙ্কেত



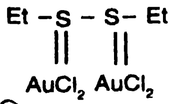
, এখানে সোনার যোজ্যতা 3।

কিন্তু প্লাটিনামের সহিত অনুরূপ বিক্রিয়ায় প্রাপ্ত সঙ্কেতের সহিত এই সঙ্কেতের মিল না থাকায় এবং উভয়ের তুলনা করে আচার্যদেব $Et_2S.\ 2AuCl_2$ এই সঙ্কেত গ্রহণ করেন। হিমাঙ্ক পদ্ধতিতে আণবিক গুরুত্ব নির্ণয় করে আচার্যদেব তাঁর সিদ্ধান্তের যথার্থতা প্রমাণ করেন। অতঃপর তিনি যৌগটির নিম্নরূপ গঠনমূলক সঙ্কেত প্রদান করেন।

17. J. N. Ray, *op.cit*, p.425



অথবা



উপরের সঙ্কেত সোনার দ্বিযোজী বা চতুর্যোজী প্রকৃতি ও স্বরূপ অনুসারে বলে আচার্যদেব সিদ্ধান্ত করেন।

এইভাবে বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন উৎপন্ন দ্রব্য (products) প্রস্তুত করে আচার্যদেব সোনার পরিবর্তনশীল যোজ্যতা প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর গবেষণাপত্রের শেষে দুই ছাত্র ইন্দুভূষণ সেনগুপ্ত ও ক্ষিতীশচন্দ্র রায়ের পরীক্ষাকার্যে সহায়তার জন্য স্বীকৃতি জানিয়ে ধন্যবাদ প্রদান করেন।

পরিবর্তনশীল যোজ্যতা

1927 সালের 5 ই জানুয়ারী ইন্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটির তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলন লাহোরে অনুষ্ঠিত হয়। ওই সম্মেলনে আচার্যদেব সোসাইটির সভাপতিরূপে 'On the Variability of Valency' শীর্ষক একটি দীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। গুরুত্বপূর্ণ এই বক্তৃতার কিছু অংশ এখানে উল্লেখ করা হলো।

তিনি বলেন, বার্জেলিয়াস (Berzelius) কর্তৃক প্রথম যোজ্যতা ধরণা প্রদান করার পর এই ধারণার বহু পরিবর্তন হয়েছে। কার্বন যৌগের আচরণ থেকে যোজ্যতার নির্দিষ্টতার ধারণা ও কেকুলে (Kekule) কর্তৃক সমর্থিত হয়ে অবশেষে পরিবর্তনশীল যোজ্যতা নিজস্ব পথ করে নিয়েছে। তিনি বলেন, "Valency may now be regarded as a variable function of several factors". এই বিভিন্ন বিষয়ের পরিবর্তনশীল ক্রিয়াশীলতাগুলি আচার্যদেব উল্লেখ করেন ঃ

1) কোন পদার্থের পরমাণুর যোজ্যতা সংযোজী পরমাণুর প্রকৃতি অনুসারে পরিবর্তিত হয়। নাইট্রোজেন পরমাণুর যোজ্যতা অক্সিজেন পরমাণুর প্রেক্ষিতে 1, 2, 3, 4 এবং 5 ; কিন্তু ক্লোরিনের প্রেক্ষিতে 3 ; অক্সিজেনের সহিত সালফার ষড়যোজী—SO_3 আবার ফ্লোরিনের সহিত ষড়যোজী—SF_6 ; কিন্তু ক্লোরিনের সহিত সালফারের সর্বাধিক যোজ্যতা 4 (চার)—SCl_4 । লোহা ক্লোরিনের সহিত দ্বি ও ত্রিযোজী, কিন্তু অক্সিজেনের সহিত ষড়যোজী।

2) মৌলের যোজ্যতা আবার নানা বহিঃ শর্তের ওপর নির্ভরশীল ঃ

i) যোজ্যতা কখনো কখনো উষ্ণতার ওপর নির্ভর করে। সাধারণত উষ্ণতা বৃদ্ধির সহিত যোজ্যতা হ্রাস পায়। CO_2, SO_3, PCl_5 ইত্যাদি বিয়োজন ক্ষেত্রে এরূপ দৃষ্ট হয়।

ii) চাপের প্রভাবে অনেক যৌগের বিযোজন মন্দীভূত হয় ; ফলে কেন্দ্রীয় পরমাণুর উচ্চ যোজ্যতা নিম্নতর যোজ্যতায় পরিণত হয়।

iii) কোন কোন ক্ষেত্রে মাধ্যমের (medium) ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হয়। যেমন, কোন কোন

যৌগ দ্রবণ অথবা কঠিন অবস্থায় থাকতে পারে। যেমন,—HI_3, HBr_3, $HCl\ I_2$ ইত্যাদি দ্রবণ, কিন্তু $KICl_2$, $KIBr_2$, NH_4IBr_2 ইত্যাদি কঠিন অবস্থায় থাকতে পারে।

iv) মাধ্যমে কোন কোন পদার্থের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতিও যোজ্যতার শর্ত নিরূপণ করে। যেমন,—হাইড্রোজেন পারঅক্সাইডের (H_2O_2) চতুর্যোজ্যতা জলীয় দ্রবণে অস্থিত হয়ে পড়ে, কিন্তু হাইড্রোজেন আয়নের স্থিতি বৃদ্ধি পায়। অধ্যাপক বেকার (Baker) দেখিয়েছেন যে, অতি অল্প পরিমাণ জলীয় বাষ্পও বিক্রিয়া সংঘটনে বা মন্দীকরণে প্রভাববিস্তার করে।

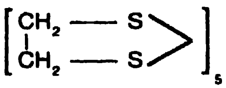
v) বিক্রিয়াশীল পরমাণুর আপেক্ষিক ঘনতা (concentration) কেন্দ্রীয় পরমাণুর সংযোজী ক্ষমতার ওপর প্রভাববিস্তার করে। ফসফরাস অতিরিক্ত ক্লোরিনের সহিত বিক্রিয়া করে PCl_5 উৎপন্ন করে, কিন্তু অতিরিক্ত ফসফরাস ক্লোরিনের সহিত বিক্রিয়া করে PCl_3 উৎপন্ন করে।

ওপরের বিষয়গুলি বিবেচনা করে আচার্যদেব বলেন, "A consideration of all these facts led to the doctrine of Variable Valency which formulates that it is not an inherent property of the atom as such but depends upon the nature of the atoms with which it combines and also upon external physical conditions."[18]

ব্লমস্ট্রান্ড (Blomstrand), জোরগেনসেন (Jorgensen) প্রমুখের যোজ্যতা ধারণার অবসান ঘটিয়ে আলফ্রেড ভেরনার (Alfred Werner) অগ্রবর্তী ধারণা প্রদান করলেন। ভেরনারকে সমযোজী রসায়নের জনক বলা হয়। তাঁর সমযোজ্যতা তত্ত্বের একটি মুখ্য ধারণা হলো "...the central combining atom possesses a maximum co-ordination value of 4, 6 or 8 according as it is di-, tri- or tetra-valent. The atom always tends to satisfy the maximum co-ordination value."[19]

আচার্যদেবের সময় অ্যাস্টন (Aston) কর্তৃক আইসোটোপ আবিষ্কৃত হওয়ায় পরমাণবিক গুরুত্বও স্থির নয় বলে প্রমাণিত হয়েছে। আচার্যদেবও দেখালেন যোজ্যতা কোন মৌলের পরমাণুর অচল চরিত্র বা প্রকৃতি নয়। অতঃপর তাঁর নিবন্ধে তিনি পূর্ববর্তী গবেষণা—সোনা ও প্লাটিনামের যোজ্যতার সবিশেষ উল্লেখ করেন।

তিনি দেখান, সোডিয়াম ডাইথায়োইথিলিন গ্লাইকোল ও অউরিক ক্লোরাইড অ্যাসিটোন দ্রবণে বিক্রিয়া করে পঞ্চযোজী সোনার যৌগ উৎপন্ন করে যার সঙ্কেত নিম্নরূপ ঃ

 Au_2 বা $(C_2H_4S_2)_5Au_2$

অবশ্য বিক্রিয়াটি ইথিরিয় দ্রবণে সংঘটিত হলে $Au_3Cl.(C_2H_4S_2)_4$ যৌগ পাওয়া যায় যেখানে সোনা ত্রিযোজ্যতা রক্ষা করে।

উপসংহারে আচার্যদেব বলেন "It thus can be concluded that valency is

18. 'On variability of Valency', JICS, 4, 1927, p. 90

19. Ibid, p. 90

variable, and it is significant that two of the most noble metals platinum and gold exhibit the greatest possible variation in this respect."[20]

আচার্যদেব তাঁর গবেষণা পর্বের শেষে দিকে ফ্লুরো যৌগ নিয়ে অনেক কাজ করেছেন। আমরা জানি, ক্লোরিন অত্যন্ত সক্রিয় মৌল। ফলে ক্লোরিন নিয়ে সেই সময় গবেষণায় বিশেষ অগ্রগতি না হলেও তিনি এই মৌলটি নিয়ে নানা রকমের বিক্রিয়ার কথা চিন্তা-ভাবনা করেছেন। এবং ক্লোরিনঘটিত জৈব যৌগ প্রস্তুত করেছেন। যেমন, ক্লোরোঅ্যাসিটন, ক্লোরোঅ্যাসিটাল, ক্লোরোঅ্যাসিটো-ফেনোন, ক্লোরোফরমেট অন্যতম কয়েকটি যৌগ। এই যৌগগুলি ক্লোরোকার্বন শিল্পের আদি পর্বের উল্লেখযোগ্য কাজ। এই গবেষণা তাঁর ছাত্রদের সহিত একত্রে পরিচালিত হয়।

মূল্যায়নের প্রয়াস

প্রেসিডেন্সী কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে আচার্যদেব যে-সব বিষয়ে একক ও ছাত্রসহযোগে গবেষণা করেছিলেন তার সংক্ষিপ্ত রূপরেখা প্রদান করার প্রচেষ্টা করেছি। তাঁর গবেষণার বিস্তারিত বিবরণ জানতে আগ্রহী সুধী পাঠকগণ এই গ্রন্থের পরিশিষ্ট অবশ্যই দেখবেন। সমকালীন রসায়ন শাস্ত্রের বিকাশ ও অগ্রগতির সহিত তুলনামূলক আলোচনা করার ক্ষমতা ও ধৃষ্টতা আমাদের নেই,—একথা পূর্বেই স্বীকার করতে আমার কোন দ্বিধা নেই। তথাপি জীবনীকার হিসাবে আচার্যদেবের রাসায়নিক গবেষণার মূল্যায়নের একটি দায় ও দায়িত্ব অবশ্যই থেকে যায়। বলাই বাহুল্য, আচার্যদেবের সাক্ষাৎ ছাত্রগণ ও রসায়নে সুপন্ডিত অধ্যাপকগণ এই দুরূহ বিশ্লেষণ করে মূল্যায়ন করতে সমর্থ। কিন্তু আচার্যের সাক্ষাৎ ছাত্র প্রখ্যাত বিজ্ঞানী জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় ছাড়া আর কাউকে এই কর্মে প্রবৃত্ত হতে দেখা যায় না। জ্ঞানেন্দ্রনাথের মূল্যায়ন সংক্ষিপ্তাকারে হলেও প্রামাণিক ও মূল্যবান।[21] কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থেও অতিসংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন দেখা যায়।[22] অমিতাভ সেন অপেক্ষাকৃত বিস্তারিত আলোচন করেছেন [23] ; বিমলেন্দু মিত্র প্রধানত অমিতাভ সেনের অনুসরণ করে মূল্যায়নের চেষ্টা করেছেন। [24]

আচার্যদেবের বিজ্ঞানী ছাত্রগণ ও জীবনীকারগণ তাঁর একক গবেষণাকর্মের প্রকৃত মূল্যায়ন করতে বহু ক্ষেত্রে কুণ্ঠাবোধ করেছেন। এমন অভিযোগ উঠেছে যে, আচার্য সারা জীবন ধরে নাইট্রাইট নিয়েই গবেষণা করে গেলেন, সমকালীন আন্তর্জাতিক মানের গবেষণা দেখা গেল না তাঁর কাজে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম তিন দশকে গবেষণার গতিপ্রকৃতির সহিত তাঁর গবেষণার সাদৃশ্য দেখা যায় না। সুতরাং সমকালীন রসায়নবিদদের মধ্যে তাঁর স্থান নির্ণয় করতে গেলে আমাদের হতাশ হতে হবে। এই

20. Ibid, p.95
21. J. N. Ray, op. cit, JICS, 38, no. 8., 1961
22. Acharya Prafulla Chandra Roy, C. U., 1962, p. 66
23. Acharya Prafulla Chandra Ray, Indian Science News Association, 1968, pp. 60-63
24. রসায়নাচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, পৃ—98-99

অভিযোগের সত্যতা উড়িয়ে দেওয়া যায় না যদি আমরা আচার্যদেবের কাজ আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে বিচার-বিশ্লেষণ করি। কিন্তু তা করা কি আমাদের উচিত হবে, না দায়িত্বশীলতার পরিচায়ক হবে? আচার্যদেবের কাজের মূল্যায়ন করতে হলে তাঁর সময়ে আমাদের দেশে রসায়ন চর্চা, গবেষণাগারের সুযোগ-সুবিধা ও এ-বিষয়ে জ্ঞানের আদান-প্রদানের কথাটি বিস্মৃত হলে চলবে না। কি ছিল তখন এই ঔপনিবেশিক দেশে? রসায়ন চর্চার অ আ কখ তখন শুরু, গবেষণাগার বলতে প্রেসিডেন্সী কলেজের লেবরেটরী, অন্য কলেজে কেবল লেকচারের মাধ্যমে রসায়ন শিক্ষা। শূন্য, প্রায় শূন্য থেকে শুরু করেছেন প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর গবেষণা। তিনি সামসনের লম্বা চুল পাননি, তখন প্রায়-দেখা-যায়না-চুল গজাচ্ছে। এহেন পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে তাঁর গবেষণা। 1904 সালে প্রেসিডেন্সীর নতুন লেবরেটরী সামান্য আনুকূল্য করলেও লন্ডন, কেম্ব্রীজ, এডিনবার্গ, প্যারী, জার্মান প্রভৃতি গবেষণাগারের তুলনায় তার কি কোন স্থান নির্দিষ্ট করা যায়? প্রেসিডেন্সীতে তো ইংরেজ আমলাদের লাল ফিতার বন্ধন ছিলই যা পদে পদে বাধার হিমালয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল, আর বিজ্ঞান কলেজে মাত্র 12000 টাকার সরকারী অনুদান বরাদ্দ ছিল। স্মরণ রাখতে হবে, নায়াগ্রার জলপ্রপাতের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়েছিল প্রফুল্লচন্দ্রকে। প্রফুল্লচন্দ্র গীতার 'কর্মেই তোমার অধিকার, তার ফলে নয়' এই বাণী মনেপ্রাণে গ্রহণ করে একনিষ্ঠ থেকে গবেষণা করে যে কৃতিত্ব লাভ করেছিলেন, তার মূল্য কোন নিক্তি দিয়েও পরিমাপ করা সম্ভব নয়।

প্রেসিডেন্সী কলেজের ম্যাগাজিনে (1914-15) প্রকাশিত বিশিষ্ট বিজ্ঞানী হেনরী আর্মস্ট্রং-এর উক্তিটি উদ্ধৃত করা যায় ঃ The way you have made yourself a 'master of nitrites' is very interesting and the fact that you have established that as a class they are far from being unstable bodies, chemists supposed, is an important addition to our knowledge." জ্ঞানরাজ্যে সামান্যতম দান করা বড়ই কঠিন। তাঁর নাইট্রাইট গবেষণায় কি জ্ঞনরাজ্যে অবদান রাখেনি? 'বিসম ধাতুর মিলন ঘটায়ে' বিশ্বের রসায়নবিদদের ধ্যান-ধারণায় বিপ্লব সৃষ্টি করে প্রফুল্লচন্দ্র কি বিশ্ব-স্বীকৃতি লাভ করেন নি? রসায়নশাস্ত্র মূর্খেরা লেখে বলে প্রসিদ্ধি আছে। রসায়ন এগিয়ে চলে, এগিয়ে চলে, নতুন তথ্য ও তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয় ; পুরোনো তথ্য ও তত্ত্ব হয় সংস্কৃত ও পরিমার্জিত, নতুবা হয় প্রত্যাখাত। রসায়ন শাস্ত্রের এই চরিত্র ও প্রকৃতি বিবেচনা করলে আচার্যদেবের মাস্টার অফ নাট্রিাইটের কোন গরিমা লাঘব হয় না।

আচার্যদেব স্বয়ং তাঁর গবেষণাকর্মের কৃতিত্ব কখনো দাবী করেননি। এ-বিষয়ে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ নিরাসক্ত, ফলাকাঙ্খাহীন সন্ন্যাসী, ঋষিতুল্য। তিনি কেরিয়ার লোভী বিজ্ঞানী ছিলেন না, ছিলেন দেশ ও জাতির উন্নতিকল্পে নিবেদিত প্রাণ। হিন্দু রসায়নের ইতিহাস না লিখে তিনি অবশ্যই কেরিয়ার তৈরী করতে পারতেন—আন্তর্জাতিক মানের গবেষণা করে র‍্যালে, রামজে, রাদারফোর্ড, সীড, ডেওয়ার, কুরী প্রমুখের পাশে স্থান করে নিতে পারতেন বলে আমাদের বিশ্বাস। আত্মচরিতে (পৃ—৯৩-৯৪)) তিনি লিখেছেন—"হিন্দু রসায়ন শাস্ত্রের ইতিহাসের প্রথম ভাগ প্রণয়ন করিতে আমাকে এত কঠোর ও

দীর্ঘকালব্যাপী পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল যে, আধুনিক রসায়ন শাস্ত্র অধ্যয়ন ও গবেষণা করিতে আমি সময় পাই নাই। অথচ আধুনিক রসায়ন শাস্ত্র ইতিমধ্যে দ্রুতবেগে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছিল। এই সময়ে রেলে ও রামজে Argon আবিষ্কার করেন এবং তাহার পরই Neon, Xenon ও Krypton আবিষ্কৃত হয়। বেকেরেল, রাদারফোর্ড ও সডী কতকগুলি কম্পাউন্ড ও খনিজ পদার্থের আলোক বিকিরণের ক্ষমতা সম্বন্ধে পরীক্ষা ও আলোচনা করেন এবং কুরী-দম্পতী রেডিয়াম আবিষ্কার করিয়া এই বিষয়ে গবেষণার পূর্ণতা সাধন করেন। রামজে দেখাইলেন যে, রেডিয়াম হইতে বিকিরণই গ্যাস হিলিয়ামে রূপান্তরিত হয় এবং পদার্থের রূপান্তরের ইহাই অকাট্য প্রমাণ। ডেওয়ার এই সময়ে বায়ুকে তরল পদার্থে পরিণত করিলেন। হাইড্রোজেনকে তরলীকৃত করা আর এক বিস্ময়কর ব্যাপার। যখন একটির পর একটি এই সমস্ত যুগান্তরকারী আবিষ্কার হইতেছিল, সেই সময়ে আমি প্রাচীন হিন্দুদের রসায়নজ্ঞানের গবেষণা লইয়া ব্যস্ত ছিলাম। সুতরাং আধুনিক রসায়ন শাস্ত্রের সঙ্গে সংযোগ হারাইয়াছিলাম। ...এখানে বলা যাইতে পারে যে, আমার গবেষণাগারের কাজ কখনও স্থগিত হয় নাই। বস্তুতঃ এই সময়ে, বৈজ্ঞানিক পত্রিকাসমূহে, বিশেষভাবে লন্ডন কেমিক্যাল সোসাইটির পত্রে, 'নাইট্রাইট' সম্বন্ধে আমার বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল।"

আচার্যদেব কেন প্রধানত নাইট্রাইট নিয়ে গবেষণা করলেন ও সমকালীন রসায়নের বিকাশ ও সমৃদ্ধির সহিত নিজেকে যুক্ত করলেন না, তার দু-একটি কারণ দেখিয়েছেন বিজ্ঞানী আর্মস্ট্রং। তিনি বলেন—"তাঁর প্রথম শিক্ষক, Pedler, নিজে খুব 'প্র্যাকটিক্যাল' জ্ঞানের মধ্য দিয়ে মানুষ হয়েছিলেন। Crum Brown (তাঁর এডিনবরার শিক্ষক) তাঁর মানসিক গঠনের ওপরে হয়ত কিছুটা দার্শনিকতার ছায়াপাত ঘটিয়েছিলেন। রসায়নশাস্ত্রকে একটা ধর্মীয় বিশ্বাসের মত 'যথাবিহিত তথা কর্তব্যম' এর গন্ডি থেকে মুক্তি দিয়ে 'পরীক্ষা করলে দেখা যাবে', এমন অটল বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপরে প্রতিষ্ঠা করবার সময় তখনও আসেনি (অর্থাৎ রায়ের বিদেশে শিক্ষাকালে)। সুতরাং বর্তমানকালের যে সব রসায়নবিদ্ তত্ত্বীয় যুক্তি-চিন্তার ওপরে নির্ভরশীল, রায় তাঁদের মত ছিলেন না, ছিলেন খুঁত খুঁতে, 'হাতে-কলমে না করে মেনে না নেওয়া' গোষ্ঠির অস্তিত্বকালের অন্তিম লগ্নের এক নবাগন্তুক।"[25] আর্মস্ট্রং আরো কারণ দর্শন করিয়ে বলেন,—"যখন প্রফুল্লচন্দ্র এডিনবরা ছাড়লেন, তখনও কেমিস্ট্রির ইলেকট্রন তত্ত্ব-নির্ভর থিওরির বহু কিছুই স্বীকৃত হয়নি, —যেমন Arrhenius-এর Electrolytic Dissociation Hypothesis বা Ostwald বা Vant Hoff-এর কার্যাবলী। প্রফুল্লচন্দ্র Co-ordinate যৌগ নিয়ে কাজ করেছেন কিন্তু এরকম সংযুতির কারণ যে অণুর ত্রিমাত্রিক গঠন-বৈশিষ্ট্য ও গ্রুপের মধ্যে covalent linkage-এর দরুন ইলেকট্রনের আদান-প্রদান—এসব তত্ত্বের প্রাঞ্জলতা তাঁর শিক্ষার মধ্যে কখনও পরিস্ফুট হয়নি। তিনি পুরনো ধরনের রসায়নবিদ্‌ই রয়ে গিয়েছিলেন।"[26]

25. রসায়নাচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, বিমলেন্দু মিত্র, পৃ—৭৫
26. তদেব, পৃ—৭৫

খোদ ইংলন্ডে গবেষণার আনুকূল্যের মধ্যে বসে আর্মস্ট্রং আচার্যদেব সম্পর্কে যে মূল্যায়ন করেছেন, তা আংশিক সত্য মাত্র। তৎকালীন প্রেসিডেন্সীর গবেষণাগার, সরকারী সাহায্যের অপ্রতুলতা ও প্রতিকূলতার সহিত তাঁর প্রত্যক্ষ পরিচয় থাকলে এবং ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকদের অপকৌশলের অভিজ্ঞতা থাকলে তিনি হয়তো অন্যরূপ মূল্যায়ন করতেন। বস্তুতপক্ষে, নিজের যশ, খ্যাতি ও কৃতিত্বের চেয়ে আচার্যদেবের কাছে তাঁর দেশ ও জাতি অনেক অনেক বড় ছিল। দেশের সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি ও বিশ্বরসায়নে ভারতের অবদান তুলে ধরার জন্যই তাঁকে বহু সময় ব্যয় করতে হয়েছে। 1896-1909 পর্যন্ত তিনি হিন্দু রসায়ন শাস্ত্রের ইতিহাসের জন্য তথ্য সংগ্রহ ও লেখায় নিয়োজিত ছিলেন, আবার 1892 থেকেই বেঙ্গল কেমিক্যালকে দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করার চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা পর্যন্ত করেছেন। বাঙালীর আর্থিক দুর্গতি, বাঙালীর অন্নসমস্যা, তাদের বেকারত্ব, তাদের স্বভাব ও প্রকৃতিই প্রফুল্লচন্দ্রকে একাগ্রমনে গবেষণায় নিযুক্ত থাকতে দেয়নি। গজদন্ত মিনারের বসে সুবিধাভোগী কেরিয়ার তৈরীতে ব্যস্ত কারুর পক্ষে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রকে প্রকৃত মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়। এসব সত্ত্বেও তাঁর কোন কোন গবেষণা—মারকিউরাস নাইট্রাইট, অ্যামাইন নাইট্রাইট ও হাইপোনাইট্রাইট ভবিষ্যতের মানদণ্ডে অবশ্যই উল্লেখযোগ্য।

দীর্ঘশৃঙ্খলযুক্ত সালফার যৌগ সম্বন্ধে আচার্যদেব কয়েকটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন। এই ধরনের যৌগের একটি উদাহরণ হলো $Br\text{-}C_2H_4\text{-}(S\text{–}C_2H_4)n\text{-}Br$। তখনো কিন্তু পলিমার আবিষ্কৃত হয়নি এবং "The idea of folding chains and cross linkage had yet to be advanced."[27] এই গবেষণার তাৎপর্য ও প্রাসঙ্গিকতা সম্বন্ধে ইতিপূর্বেই আমরা জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়ের অভিমত উল্লেখ করেছি।

আচার্যদেব সোনা, প্লাটিনাম ও ইরিডিয়ামের অপ্রলচলিত যোজ্যতা বিষয়ে গবেষণা করেন যার উল্লেখ আমরা ইতিপূর্বে করেছি। কিন্তু তাঁর গবেষণা সবিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেনি। উল্লেখ করা যায় যে, জে. জে. টমসন (Thomson) 1889 সালে ইলেকট্রন আবিষ্কার করেন; রাদারফোর্ডের পরমাণুর গঠন সম্পর্কীয় মডেল 1911 সালে প্রকাশিত হয়; আর নীলস বোরের মডেল 1913 সালে প্রকাশিত হওয়ার পর বিজ্ঞানী মহলে স্বীকৃত ও গৃহীত হতে থাকে। বিজ্ঞানী কোসেল (Kossel) ও জি. এন. লুইস (Lewis) 1916 সালে যথাক্রমে তড়িৎ যোজ্যতা ও সমযোজ্যতার তত্ত্ব উপস্থিত করে যৌগ গঠনের ব্যাখ্যা দেন। কিন্তু এইসব যুগান্তরকারী আবিষ্কারের গুরুত্ব ও তাৎপর্য উপলব্ধ হতে সময় লাগে, অন্তত 1920-25 সালের পূর্বে পরমাণুর যোজ্যতা বিষয়ে সুস্পষ্ট জ্ঞানের অভাব পরিলক্ষিত হয়। তখনো পরমাণুর যোজ্যতার পুরোনো ধারণাই প্রচলিত ছিল : **কোন পদার্থের একটি পরমাণু কতগুলি হাইড্রোজেন পরমাণুর সহিত যুক্ত হতে পারে, সেই সংখ্যা দ্বারাই পরমাণুর যোজ্যতা নির্ণীত হতো।** পরমাণুর বাইরের খোলের আলগা ইলেকট্রনের আদান-প্রদান ও জোটবদ্ধ হয়ে যৌগ গঠনের ধারণা পরিপূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বেই প্রফুল্লচন্দ্র এ-বিষয়ে

27. Achary Prafulla Chardra Ray, ISNA, p. 62

গবেষণা করেন এই গরীব দেশের গরীবতর গবেষণাগারে, যেখানে উন্নত দেশের আবিষ্কারের খবর পেতে দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে হতো। তত্রাচ আচার্যদেবের প্রয়াস বৃথা যায়নি। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, বর্তমানে রূপার দ্বি ও ত্রি ধনাত্মক যৌগ সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সুতরাং প্রফুল্লচন্দ্রের অপ্রচলিত যোজ্যতা বিষয়ে পুনরায় গবেষণা করার প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়নি। কারণ, এই একবিংশ শতাব্দীতেও পরমাণুর যোজ্যতার সব রহস্য ও বৈচিত্র্য যে জানা গেছে, তা নয়।

অনিদ্রায় আক্রান্ত, অজীর্ণ রোগের শিকার, স্বল্পাহারী, ক্ষীণ তণু আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের কর্মধারা গবেষণা ছাড়াও বহুধা ক্ষেত্রে বিস্তারিত। বন্যা ও প্লাবনে ছুটে গেছেন পীড়িতদের পরিত্রাণের জন্য, দুর্ভিক্ষে ক্লিষ্ট মানুষের পাশে অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন, শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন, ছাত্রদের friend, philosopher ও guide হয়ে রসায়ন স্কুলের সৃজন করেছেন ; আবার প্রাচীন ভারতীয় রসায়নের উত্তরাধিকার পুনরাবিষ্কার ও উদ্ধার করে 'ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লভে' এই আত্মশক্তি ও আত্মবিশ্বাস সঞ্চার করে সুদূরপ্রসারী সম্ভাবনার পথ প্রদর্শন করেছেন। আবার গবেষণাগারে তাঁর পরীক্ষার পারদর্শিতা ও নৈপুণ্য ছাত্রদের মধ্যে সঞ্চারিত করতে সমর্থ হয়েছেন। তাঁর অন্যতম প্রিয় ছাত্র জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় সাক্ষ্য প্রদান করে লিখেছেন—"Those who were privileged to see him in the laboratory could not fail to notice his remarkable skill in separating mixtures. His experimental skill was comparable to that W. H. Perkin (Jr). There may be many views as to the mechanism of formation of these compounds—he did everything he could to establish their constitutions. All the physico-chemical methods known at that time were pressed into service to prove the structures he assigned to these compounds. He studies the permanganate oxidation of trimethylene tetrasulphide which seemed to support the view he held about this compund."[28]

উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে অজৈব রসায়ন মৃতবৎ হয়ে পড়েছিল। বায়ুমণ্ডলে দুর্লভ গ্যাসগুলির আবিষ্কার, তেজস্ক্রিয়তা ও রেডিয়াম বিকিরণের প্রকৃতি এই রসায়নে প্রাণের সঞ্চার করল। ভার্নারের (Werner) কোঅর্ডিনেশন যৌগের তত্ত্ব, কোসেল ও লুইসের তত্ত্বে রসায়নের নবদিগন্ত উদ্ঘাটিত হলেও এসবের পটভূমিতে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের অবদান পুরোনো, অচল ও তুচ্ছ বলে উড়িয়ে দেবার নয়। "To appreciate the uphill work he did, one has to remember the meagre grant and fafilities he had, yet he was able to accomplish so much."[29]

দেশ স্বাধীন হয়েছে। নানা গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ; কোটি কোটি টাকা ঢালা হচ্ছে। আধুনিক যন্ত্রপাতি, কম্পিউটার ইত্যাদিতে পূর্ণ সমৃদ্ধ গবেষণাগার থেকে আন্তর্জাতিক মানের কেমন আবিষ্কার হয়েছে! গবেষণাগারগুলি তো রাজনীতি, দলাদলি ও কেরিয়ার গোছানোর অকুস্থল হয়ে উঠেছে। রসায়নবিদগণ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রকে ভুলে গেছেন, দেশ ও জাতিকেও বিস্মৃত হয়েছেন।

28. J. N. Roy, op. cit, p. 425
29. Acharya Prafulla Chandra Roy, C. U. , p. 66

ষষ্ঠ অধ্যায়

রসায়নবিদ্যা গোষ্ঠী ঃ আচার্যের নক্ষত্রমন্ডলী

মারকিউরাস নাইট্রাইট সচেতনভাবে আবিষ্কৃত হয়নি, হঠাৎ আবিষ্কৃত হয়েছে। ভারতে রসায়নবিদ্যা গোষ্ঠী আচার্যদেবের সচেতন ও সুপরিকল্পিত প্রয়াসের ফলে গড়ে উঠেছিল—এরূপ মনে করার কোন কারণ নেই। এই গোষ্ঠী ধীরে ধীরে বিকশিত হয়ে উঠেছিল। এই বিকাশের পশ্চাতে যে আচার্যদেব স্বয়ং তাতে সন্দেহ করার বিন্দুমাত্র হেতু নেই। তাঁর শিক্ষাদান প্রণালী, গবেষণায় একান্ত অনুরাগ ও নিষ্ঠা, ছাত্রদের অনুপ্রাণিত ও উদ্দীপিত করার ক্ষমতা, স্নেহ ও বাৎসল্যে তাঁদের আপন সন্তান-স্নেহে লালন-পালনের আন্তরিক প্রয়াস ও সর্বোপরি দেশ ও জাতির সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধিতে উৎসর্গীত প্রাণ,—এইসব বিরল গুণাবলীর রসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে রসায়নবিদ্যা গোষ্ঠী যেন অলক্ষ্যে গড়ে ওঠে। 1912 সালের আগে আচার্যদেব এ-সম্পর্কে বিশেষ কিছু অবগত ছিলেন না। বরাবরই তিনি কামনা করতেন ছাত্রদের সাফল্যই তাঁর সাফল্য, ছাত্রদের গৌরবেই তাঁর গৌরব। ছাত্রদের গবেষণাপত্রগুলি যখন বিদেশী জার্নালে প্রকাশিত হয়ে প্রশংসিত হতো, তখন তাঁর খুশী ও আনন্দের অবধি থাকত না। তাঁর আজীবন কামনা, আকাঙ্খা ছিল ছাত্ররা তাঁকে অতিক্রম করে যাক ; পুত্র ও শিষ্যদের কাছে তিনি সর্বদা পরাজয় কামনা করতেন, অন্যত্র নিজস্ব জয় আকাঙ্খা করতেন। প্রেসিডেন্সী কলেজে গবেষণা করে যখন রসিকলাল দত্ত, জিতেন রক্ষিত ও নীলরতন ধরের গবেষণাপত্রগুলি ইংলন্ড, জার্মানী ও আমেরিকায় বিশেষজ্ঞদের. দ্বারা উল্লিখিত হতে থাকল তখন তিনি "মনে মনে বেশ আনন্দ অনুভব" করতেন।

1912 সালে প্রফুল্লচন্দ্র বিদেশ সফর করে ফিরে আসার কিছুদিন পরে বিহারের শিক্ষাবিভাগের ডাইরেক্টর মি. জেনিংস এলেন প্রেসিডেন্সীর রসায়ন বিভাগ পরিদর্শনে। নানাবিধ বিষয়ে উভয়ের মধ্যে কথাবার্তা ও আলোচনার পর মি. জেনিংস বললেন, —"আমার বিশ্বাস, আপনি রসায়ন বিদ্যাগোষ্ঠী প্রতিষ্ঠার মূল কারণ।"[1] আচার্যদেব এই প্রথম স্কুল অফ কেমিস্ট্রীর বিষয়ে অবহিত হলেন, এবং এই বিষয়ে আকৃষ্ট হলেন এবং চিরকালের জন্য এই বিষয়টি তাঁর স্মৃতিপটে চিত্রায়িত হয়ে গেল। বিখ্যাত 'নেচার' পত্রিকাও বিষয়টি লক্ষ করে 1916 সালের 23 শে মার্চ লিখেছিল :[2]

In conncetion with the University of Calcutta, 'extension lectures' are being delivered and that on Jan. 10, P.C. Ray, the Dean of the Faculty of Science of

1. *আত্মচরিত,* পৃ—১৪৩
2. উদ্ধৃতটি *Acharya Prafulla Chandra Ray,* C.U. pp. 59-60 থেকে।

the University is before us. The lecture consists of a brief resume of original chemical researches carried out in Bengal in the last twenty years, and as an appendix a list of 126 papers contributed to various societies such as the *Chemical Society, Journal of the American Chemical Society*, and others, is given. Some of these papers are of very considerable value and interest, and indicate enthuiastic work on the part of this newly created shcool, which is mainly due to the example and work of Professor Ray himself."

আচার্যদেব স্বয়ং তাঁর 'আত্মচরিত'-এ 'নেচার' পত্রিকার উদ্ধৃত অংশটির অনুবাদ প্রদান করেছেন। সাধারণ পাঠকদের অবগতির জন্য আমরা সংশ্লিষ্ট অংশটিও উদ্ধৃত করলাম :

"কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে, বিশেষজ্ঞদের দ্বারা বিবিধ বিষয়ে বক্তৃতা প্রদত্ত হইতেছে। গত ১০ই জানুয়ারি তারিখে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের 'ডীন' যে বক্তৃতা করেন, তাহা আমাদের হস্তগত হইয়াছে। গত ২০ বৎসরে বাংলাদেশে রসায়ন সম্বন্ধে যে সব মৌলিক গবেষণা করা হইয়াছে, এই বক্তৃতায় তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। পরিশিষ্টে ১২৬টি গবেষণার নাম দেওয়া হইয়াছে ; কেমিক্যাল সোসাইটি, জার্নাল অব দি আমেরিকান সোসাইটি প্রভৃতিতে এই সকল মৌলিক গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। এই সমস্ত প্রবন্ধের মধ্যে অনেকগুলি খুব মূল্যবান এবং নব প্রতিষ্ঠিত রসায়নবিদ্যাগোষ্ঠীর কার্যাবলীর পরিচয় এইগুলিতে পাওয়া যায়।" (পৃ—১৪৩)

এই পত্রিকায় আচার্যদেবের বক্তৃতার একটি লাইন উদ্ধৃত করে লেখা হয়েছিল যে, তিনি স্বপ্নেও কখনো ভাবেন নাই যে, দশ বছরের মধ্যে জাতির জীবনে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হবে, এবং তাঁর দেশবাসীর শক্তি সম্বন্ধে তাঁর ধারণার পরিবর্তন হবে। পরিশেষে পত্রিকাটি মন্তব্য করে : "বাংলাদেশে বর্তমানে যে সব মৌলিক রাসায়নিক গবেষণা হইতেছে, তাহাতে নিশ্চয় বলা যায় যে একটি নূতন ভাব জাগ্রত হইয়াছে এবং আশা করা যায় যে এই ভাব ক্রমশঃ ভারতের অন্যান্য অংশেও বিস্তৃত হইবে এবং বিজ্ঞানের অন্যান্য বিভাগ সম্বন্ধেও এই মৌলিক গবেষণা-স্পৃহার উদ্ভব হইবে।"

বলা বাহুল্য, 'নেচার' পত্রিকার এই পর্যবেক্ষণ ছিল দূরদৃষ্টিপূর্ণ। রসায়নে জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, নীলরতন ধর, পুলিনবিহারী সরকার, শান্তিস্বরূপ ভাটনগর প্রমুখ ও পদার্থবিজ্ঞানে নোবেলজয়ী সি. ভি. রমন, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, মেঘনাদ সাহা, শিশিরকুমার মিত্র, গণিতে শ্রীনিবাস রামানুজন প্রমুখ জাতির ও বিশ্বের সম্মুখে নব দিগন্ত উন্মোচিত করে নতুন অধ্যায় সৃষ্টি করলেন। পরাধীন দেশে এরূপ বৈজ্ঞানিক কর্মচাঞ্চল্য, তাৎপরতা ও সাফল্য নজীরবিহীন। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, এইসব উজ্জ্বল ও স্বতঃভাস্বর বিজ্ঞানীদের উত্তরাধিকারিগণ পূর্বসূরীদের সাফল্যের প্রবহমানতা বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়েছেন। পরমাণু বোমা নির্মাণে সাফল্য বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে সাফল্যের পরিমাপক নয়,—একথা ভুললে চলবে না।

বিদ্যাগোষ্ঠী প্রতিষ্ঠার পথে

ভারতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন মূলত অত্যাচার, নিপীড়ন ও আর্থিক শোষণের ইতিহাস। ছোট ইংরেজদের শাসনে নির্লজ্জ স্বার্থপরতা থাকলেও কখনো কখনো দেশহিতৈষী নেতৃবৃন্দের অসন্তোষ অবদমনে অথবা নিজেদের স্বার্থে তারা দু-একটি ভাল কাজ করেছে। এমন একটি কাজ হলো বাংলা সরকার কর্তৃক 'গবেষণাবৃত্তি', প্রদান। এই বৃত্তি প্রদান আলেকজাণ্ডার পেডলার বা অন্য কারুর সুপারিক্রমে হয়েছিল কিনা জানা যায় না। যাই হোক, প্রফুল্লচন্দ্র 1900 সাল থেকে একজন গবেষক ছাত্র রাখার সুযোগ লাভ করলেন।* এই 100 টাকার মাসিক বৃত্তি লাভ করত যদি কেউ এম.এস-সি পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হয় এবং বিজ্ঞানচর্চায় বিশেষ অনুরাগ প্রদর্শন করে ও অধ্যাপকের সুপারিশ লাভ করে। তিন বৎসর ধরে এই বৃত্তি চালু থাকত। গবেষক ছাত্র প্রথমে অধ্যাপকের গবেষণায় সাহায্য করত এবং পরে নিজস্ব মৌলিক গবেষণা করতে পারত। এইসব বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্ররা অনেকে ডক্টরেট উপাধি লাভ করে সহজেই শিক্ষাবিভাগ বা ইম্পিরিয়াল সার্ভিসের কোন টেকনিক্যাল বিভাগে নিযুক্ত হতে পারত। এই গবেষণাবৃত্তি প্রবর্তন ভারতে রসায়ন চর্চায় সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের Birth Centenary Souvenir Volume-র একটি উদ্ধৃতি উল্লেখযোগ্য— "This helped in the development of critical faculty in the scholar and he gained self-confidence in being able to carry on research work without spoon-feeding. It will be seen that a very sound principle was adopted. In most laboratories in Europe this kind of 'independence' did not usually exitst."[3]

আচার্যদেবের প্রথম গবেষক ছাত্র ছিলেন যতীন্দ্রনাথ সেন। 1900 সাল থেকেই প্রথমে তিনি মারকিউরাস নাইট্রাইটের গবেষণায় প্রফুল্লচন্দ্রের সহিত সহযোগিতা করেন। 1903 সালে প্রফুল্লচন্দ্রের সহিত যৌথভাবে তাঁর 'তাপের দ্বারা মারকিউরাস নাইট্রাইটের বিযোজন' (*Decomposition of Mercurous Nitrite by heat*) গবেষণাপত্রটি JCS, 83 তে প্রকাশিত হতে দেখা যায়। যতীন্দ্রনাথ 'প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ' বৃত্তিও লাভ করেন, এবং পুসার কৃষি ইনস্টিটিউটে যোগদান করে পরে ইম্পিরিয়াল সার্ভিসে স্থান লাভ করেন।

1904 সালে এম.এ. পাশ করে পঞ্চানন নিয়োগী রিসার্চ স্কলার হিসাবে আচার্যদেবের নিকটে এলেন 1905 সালে। নাইট্রাইট যৌগ বিষয়ের গবেষণায় তিনিও আচার্যদেবকে সহযোগিতা করলেন। আচার্যদেবের সহিত যৌথভাবে তাঁর গবেষণাপত্রটির শিরোনাম 'অ্যালকিল আয়োডাইড ও মারকিউরাস নাইট্রাইটের বিক্রিয়ায় অ্যালিফ্যাটিক নাইট্রোযৌগ প্রস্তুতি'। এটি লন্ডনের প্রোসিডিং অফ কেমিক্যাল সোসাইটির 23 সংখ্যায়

* 'Obituary', JICS, 21, 1944, P. 254-তে বলা হয়েছে 1901 সাল থেকে, কিন্তু 'আত্মচরিত'-এ 1900 সাল বলা হয়েছে; দ্রষ্টব্য, পৃ—১২৬

3. *Acharya Prafulla Chandra Ray*, C.U., p. 50

প্রকাশিত হয়। নাইট্রোজেনের স্টেরিও রসায়নে তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য। তা ছাড়া প্রাচীন ভারতে লৌহ ও তামার metallurgy-র ইতিহাস রচনা করে আচার্যদেবের ন্যায় অবদান রেখেছেন। ইনি IES পদেও উন্নীত হন।

নিয়োগীর কিছুদিন পরে রিসার্চ স্কলাররূপে যোগদান করলেন আচার্যদেবের ছাত্র অতুলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। অতুলচন্দ্র সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন এবং তাঁর কঠোর পরিশ্রম করার প্রবণতা ছিল। আচার্যদেব 'আত্মচরিত'-এ লিখেছেন—"তিনি অপরাহ্ন ৪.৩০টার সময় আমার সঙ্গে কাজ করিতে আরম্ভ করিতেন এবং সন্ধ্যার পর পর্যন্ত তাহা করিতেন। ছুটির সময়েও তিনি প্রায়ই আমার সঙ্গে থাকিয়া কাজ করিতেন।" অতুলচন্দ্রের সহিত আচার্যদেবের অন্তত পাঁচটি গবেষণাপত্র JCS-এ প্রকাশিত হতে দেখা যায়। প্রথম গবেষণাপত্রটির শিরোনাম 'ক্ষারীয় ধাতু ও ক্ষারীয় মৃত্তিকা ধাতুর নাইট্রাইট ও তাদের গঠন' (*The Nitrites of the Alkali metals and metals of the Alkaline Earths and their composition,* JCS, 87, 1905)। অতুলচন্দ্র কটকে চলে গেলেন। এই সময়েই আর এক অতুল—অতুলচন্দ্র ঘোষ রিসার্চ স্কলার হলেন। তিনিও গুরুর সহিত অন্তত দুটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করলেন। দ্বিতীয়টির শিরোনাম "তাপের দ্বারা ডাইমারকিউরিঅ্যামোনিয়ামের বিযোজন" (Decomposition of Dimercuriammonium Nitrite by heat, JCS, 97, 1910)। ইনি চলে গেলেন সুদূর লাহোরে দয়াল সিং কলেজের অধ্যাপক হয়ে। অতুলচন্দ্রের অকালে মৃত্যু হয়। কিন্তু অসামান্য গৌরবের অধিকারী হন যে, শান্তিস্বরূপ ভাটনগর তাঁর ছাত্র ছিলেন। পরবর্তীকালে ভাটনগর বলতেন যে, তাঁর আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সাক্ষাৎ ছাত্র হওয়ার সৌভাগ্য হয়নি বটে, কিন্তু তিনি অবশ্যই তাঁর প্রশিষ্য (grand pupil)। কারণ, তিনি আচার্যের ছাত্র অতুলচন্দ্রের ছাত্র ছিলেন। এখানে ভাটনগরের 1928 সালে বিজ্ঞান কংগ্রেসের রসায়ন শাখার সভাপতিরূপে ভাষণটি 'আত্মচরিত' (পৃ-১২৫, পাদটীকা-১) থেকে উদ্ধৃত হলো : "আমি একটা গুরুতর অপরাধ করিয়াছি যে স্যার পি. সি. রায়ের ছাত্র হইতে পারি নাই। স্যার পি.সি.রায় সেজন্য নিশ্চয়ই আমাকে ক্ষমা করেন নাই। কিন্তু আত্মপক্ষ সমর্থনার্থ আমি বলিতে পারি যে আমি অনেক পরে এ পৃথিবীতে আসিয়াছি, সুতরাং আমি তাঁহার রাসায়নিক 'প্রশিষ্য' হইয়াছি। স্যার পি. সি. রায়ের ভূতপূর্ব ছাত্র মিঃ অতুলচন্দ্র ঘোষের নিকট আমি রসায়নশাস্ত্রে শিক্ষালাভ করিয়াছি।" আচার্যদেবের সহিত অতুলচন্দ্রের শেষ গবেষণাপত্র 1910 সালে প্রকাশিত হয়। একই বছরে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ও আচার্যদেবের সহিত যৌথভাবে গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন।। শিরোনামঃ 'ক্রায়োস্কোপিক পদ্ধতিতে নাইট্রাইটের আয়নন পরিমাপ' (Ionisation of the nitrites as measured by the cryoscopic method, Proc. Chem. Soc., 26, 1910)।

ভারতে পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নবিজ্ঞানের গবেষণার ইতিহাসে 1909 সাল এক নতুন অধ্যায়ের সূচনার কাল। আচার্যদেব তাঁর 'আত্মচরিত' (পৃ—১২৯) গ্রন্থে স্মৃতিচারণা করে চমৎকার বর্ণনা করেছেন— "...ঐ বৎসর কয়েকজন মেধাবী ছাত্র প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রবেশ করেন। তাঁহারা সকলেই পরে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধি লাভ

করিয়াছিলেন। জ্ঞানেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, মানিক লাল দে, সত্যেন্দ্র নাথ বসু এবং পুলিন বিহারী সরকার আই. এস-সি. ক্লাসে ভর্তি হন, রসিক লাল দত্ত এবং নীলরতন ধর বি. এস-সি. উপাধির জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। মেঘনাদ সাহাও ঢাকা কলেজ হইতে আই. এস-সি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এই সময়ে ঘোষ, মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির সঙ্গে বি. এস-সি. ক্লাসে যোগদান করেন। রসিক লাল দত্ত, মানিক লাল দে এবং সত্যেন্দ্র নাথ বসু কলকাতাতেই পৈতৃক গৃহে লালিত পালিত। ঘোষ, মুখোপাধ্যায়, সরকার, সাহা এবং ধর মফঃস্বল হইতে আসিয়াছিলেন এবং প্রেসিডেন্সি কলেজের সংলগ্ন ইডেন হিন্দু হোস্টেলে থাকিতেন। তাঁহাদের মধ্যে এমন প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হইয়াছিল, যাহা সচরাচর দুর্লভ। ...তাঁহাদের চরিত্রে এমনই একটা বৈশিষ্ট্য ছিল যে আমি তাঁহাদের প্রতি আকৃষ্ট হইলাম। আমার সঙ্গে তাঁহাদের একটি সূক্ষ্ম যোগসূত্র স্থাপিত হইল।"

প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র 1905 সালে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করার পর উচ্চতর শিক্ষার জন্য জার্মানী যাত্রা করলেন। সেখানে ডক্টরেট ডিগ্রী অর্জন করে দেশে ফিরলেন। নব নির্মিত বিজ্ঞান কলেজের গবেষণাগার নির্মাণের জন্য তিনি ভারতের গবেষণাগারগুলি পরিদর্শনের জন্য প্রেরিত হলেন। এই গবেষণাগার নির্মাণ ও রসায়নচর্চা সম্পর্কে সত্যেন্দ্রনাথ বসুর অভিজ্ঞতা স্মরণযোগ্য ঃ "তিনি চেয়েছিলেন, ৯২, সারকুলার রোডে সারা বাড়ী জুড়ে মাত্র রসায়ন চর্চা হবে। এদিকে আমরা বেকার, কাজ চাই। শেষ অবধি ছলে, কৌশলে বন্ধুরা সকলে মিলে ডাঃ রায়ের পরিকল্পনা পাল্টে দেওয়া গেল। স্বয়ং স্যার আশুতোষ আমাদের দিকে ঝুঁকলেন। তাঁর অনুরোধে ডাঃ রায় মত বদ্‌লালেন।"[4] অধ্যাপক মিত্র 1914 সাল থেকে রসায়নের ঘোষ অধ্যাপক ছিলেন, এবং আচার্যদেবের অবসর গ্রহণের পর পালিত অধ্যাপক পদে বৃত হন। সংশ্লেষী জৈব রসায়নের (synthetic organic chemistry) সংগঠন ও বিকাশে তাঁর অবদান অবশ্যই উল্লেখযোগ্য।

আচার্যদেবের কাছে যাঁরা গবেষণা করেছিলেন তাঁরা সবাই বৃত্তিধারী গবেষক ছিলেন না। এরকম গবেষক ছিলেন রসিকলাল দত্ত, নীলরতন ধর, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ ও জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। কিন্তু এঁরা সকলেই আচার্যদেবের অধীনে প্রেসিডেন্সী কলেজে গবেষণা করার সুযোগ পেয়েছিলেন। তৎকালীন প্রেসিডেন্সীর অধ্যক্ষ জেমস সাহেব মনে করতেন কৃতী ছাত্রদের কলেজের সহিত কিছুদিনের জন্য সংশ্লিষ্ট থাকা সৌভাগ্যের বিষয়। তিনি কলেজের এইসব ছাত্রদের গবেষণা কর্মে গৌরব অনুভব করতেন। যাই হোক, রসিকলাল এম. এস-সি. পড়ার সময়েই আচার্যদেবের গবেষণা কার্যে সহায়তা করতে থাকেন। সবই নাইট্রাইট সম্বন্ধে। আচার্যদেবের সহিত তাঁর যৌথ গবেষকপত্রের সংখ্যা কমপক্ষে চারটি। প্রথম গবেষণাপত্রের শিরোনাম ঃ 'নাট্রাইটস অফ বেঞ্জাইলঅ্যামোনিয়াম সিরিজ ঃ বেঞ্জাইলঅ্যামোনিয়াম নাইট্রাইট অ্যান্ড সাবলিমেসন অ্যান্ড ডিকম্পোজিসন বাই হিট'। এই পত্রটি JCS 99, 1911 সালে প্রকাশিত হয়। রসিকলাল শীঘ্রই নিজস্ব পন্থায় মৌলিক গবেষণায় প্রবৃত্ত হলেন। 1910 সালে তাঁর নানা

4. 'সত্যেন্দ্রনাথ বসু রচনা সঙ্কলন', বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, পৃ—২৩৮

মৌলিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে থাকে। তিনিই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ডি. এস-সি.।

রসিকলালের অধীনে শিক্ষণপ্রাপ্ত গবেষকদের মধ্যে আছেন বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুলদেও সহায় ভার্মা, কলকাতা ট্রপিক্যাল স্কুলের নীহাররঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, কটকের র‍্যাভেনশ কলেজের লোকনাথ মিশ্র। তাঁর ছাত্র বিভুচরণ চট্টোপাধ্যায় রবিনসনের অধীনে গবেষণা করে পি. এইচ-ডি. ডিগ্রী অর্জন করেন। এবং কলকাতা কর্পোরেশনের কেমিক্যাল লেবরেটরীতে রাসায়নিক হিসাবে নিযুক্ত হন। রসিকলাল শিল্প রসায়নবিদ (Industrial Chemist) হিসাবে বাংলা সরকারে যোগদান করে এই রাজ্যে শিল্প প্রতিষ্ঠায় কাজ করেছেন। পরিতাপের বিষয়, তাঁর অকাল মৃত্যুতে দেশের প্রভূত ক্ষতি হয়েছে।

তিন উজ্জ্বল প্রতিভা

1909 সালের কাছাকাছি সময়ে তিন উজ্জ্বল প্রতিভার উদয় হয়। এঁরা হলেন হেমেন্দ্রকুমার সেন, বিমানবিহারী দে ও প্রিয়দারঞ্জন রায়। তাঁরা ছিলেন একই ক্লাসের ছাত্র এবং গভীর ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বে আবদ্ধ। সেন ও দে পরস্পর অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন যদিও উভয়ের চরিত্র ও প্রকৃতিতে বৈপরীত্য লক্ষ করা যায়। এঁদের চরিত্র ও প্রকৃতির তুলনা করে বলা হয়েছে— "Dey was shy, reserved, a man of few words, silent and determined. He gave the impression of being reserved, but those who knew him well found he had a very warm heart. H. K. Sen was genial, compassionate, full of spirits, loud in his assertions and extremely soft-hearted, kind man"[5] আচার্যদেব এঁদের বন্ধুত্বে মুগ্ধ হয়ে রহস্য করে বলতেন 'হ্যামলেট ও হোরাশিও' অথবা 'ডেভিড ও জোনাথন'।

হ্যামলেট বিমানবিহারী

প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে এম. এস-সি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বিমানবিহারী লন্ডনের ইম্পিরিয়াল কলেজ অফ সায়েন্সে গবেষণা করে ডি. এস-সি. উপাধি প্রাপ্ত হন। আচার্যদেবের তৃতীয় বার বিলাত গমন কালে ইনি আচার্যদেবকে প্রভূত সাহায্য করেন। 1916 সালে আচার্যদেব প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে অবসর গ্রহণ করলে তিনি ওই পদে যোগদান করেন। তারপর তিনি মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী কলেজে বদলি হন। তাঁর গবেষণাকর্ম তিনটি দিকে বিকশিত হয়ঃ সংশ্লেষণী রসায়ন, (synthetic chemistry), বায়োকেমিস্ট্রী ও তড়িৎরাসায়নিক বিক্রিয়া (electrochemical reaction)। চমৎকার বক্তৃতা করতে পারতেন, আর ছাত্রসমাজে খুবই জনপ্রিয় ছিলেন। সাইমনসেন (Simonsen) কর্তৃক মাদ্রাজ কলেজে রাসায়নিক গবেষণার সূত্রপাত হলেও তিনি দীর্ঘদিন ওখানে অবস্থান না করায় কার্যকর গবেষণা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের

5. Acharya Prafulla Chandra Ray, C. U. p. 55

সময় অধ্যাপক দে-এর লেবরেটরী থেকে আড্রেনালিন (adrenalin), পিটুইট্রিন (pituitrin), ইনসুলিন ইত্যাদি সৈন্যবিভাগে সরবরাহ করা হয়। তড়িৎরাসায়নিক গবেষণায় বিশেষজ্ঞতার জন্য অধ্যাপক দে কড়াইকুড়ির (Karaikudi) CSIR-এর ডাইরেক্টর নিযুক্ত হন। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন টি. আর. শেষাদ্রি, কে. ভেঙ্কটরমন ও টি. আর গোবিন্দচারী। কটক, পাঞ্জাবের পর সুদূর দক্ষিণ ভারতে আচার্যদেবের এক উজ্জ্বল ছাত্র রসায়ন গবেষণায় কার্যকর ভূমিকা পালন করলেন।

হোরাশিও—হেমেন্দ্রকুমার

হেমেন্দ্রকুমার সেন স্নাতক শ্রেণী পর্যন্ত প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র ছিলেন না,—সিটি কলেজ থেকে রসায়নসহ বি. এ. পাশ করেন। কিন্তু রসায়ন বিজ্ঞান পাঠে তাঁর সবিশেষ অনুরাগ ও আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। রসায়নে এম. এ. পড়তে লাগলেন প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে। খুবই তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন ; তাই রসায়নের গভীরে প্রবেশ করতে তাঁর কোন অসুবিধা হয়নি। হেমেন্দ্রকুমারের আর্থিক অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না ; ছাত্র পড়িয়ে তাঁকে ব্যয় নির্বাহ করতে হতো। এম. এ.-তে তিনি প্রথম শ্রেণী পান ও প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিও লাভ করেন। আচার্যদেব তাঁর আর একটি গুণের উল্লেখ করেছেন : "বাংলা ও ইংরাজী সাহিত্যে তাঁহার দখল ছিল এবং টেস্ট টিউবের মত লেখনী ধারণেও তিনি সুপটু ছিলেন।" আচার্যদেবের সাহিত্যচর্চাতেও তিনি সহায়তা করেন। এই উজ্জ্বল ছাত্রটির প্রতি যে আচার্যের কেবল স্নেহ ও ভালবাসা ছিল তা-ই নয়, তিনি প্রতিমাসে চল্লিশ টাকা করে কয়েক বছর আর্থিক সাহায্য করে গেছেন। আচার্যদেবের এইসব আর্থিক সাহায্যের কোন হিসেব নেই। অপর এক জ্যোতিষ্ক-ছাত্র নীলরতন ধরও তাঁর আর্থিক সাহায্য লাভ করেছিলেন।

হেমেন্দ্রকুমার আচার্যদেবের গবেষণায় সহায়তা করেন। যৌথভাবে তাঁদের 'টেট্রামিথাইল অ্যামোনিয়াম হাইপোনাইট অ্যান্ড ইটস ডিকম্পোজিসন বাই হিট' গবেষণাপত্রটি *JCS 99*, 1911 সালে প্রকাশিত হয়। এই পদার্থটি বিশ্লেষণের জন্য একটি নতুন পদ্ধতি হেমেন্দ্রকুমার উদ্ভাবন করেন। উজ্জ্বল শিক্ষাগত যোগ্যতা ও প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভের জন্য তিনি লন্ডনের ইম্পিরিয়াল কলেজ অফ সায়েন্সে অধ্যাপক জে. এফ. থর্পের (J. F. Thorpe) গবেষণাগারে উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণার সুযোগ পান। বিমানবিহারী দেও তাঁর কয়েক মাস আগে এখানে গবেষণার জন্য আসেন। হ্যামলেট ও হোরাশিও আবার মিলিত হলেন এবং গবেষণা করতে লাগলেন। একই সময়ে দুই অকৃত্রিম বন্ধু ডি. এস-সি উপাধি লাভ করলেন। তাঁর অতি উচ্চাঙ্গের থিসিস *JCS*-এ প্রকাশিত হলে বিজ্ঞানী মহলে প্রশংসিত ও সমাদৃত হয়।

কলকাতায় ফিরে এসে তিনি টাটা অ্যান্ড স্টীল কোম্পানীতে যোগদান করলেন, পরে রেঙ্গুনের স্টীল ব্রার্দার্স-এ। কিন্তু শীঘ্রই তিনি কলকাতায় ফিরে এসে ফলিত রসায়নের নবপ্রতিষ্ঠিত অধ্যাপকপদে যোগদান করলেন। অসীম উৎসাহী ও অপরাজেয় হেমেন্দ্রকুমার তাঁর গবেষণাকর্ম বিভিন্ন দিকে বিস্তারিত করলেন : উচ্চচাপে বিক্রিয়া,

গ্লাস প্রযুক্তি, উৎসেচক রসায়ন (enzyme chemistry), তাপগতিবিদ্যা (thermodynamics) ও আরো বহুবিধ বিষয়ে। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন পাটনায় বায়োকেমিস্ট্রীর অধ্যাপক মহেন্দ্রনাথ রুদ্র, অপর আর একছাত্র ইউ. পি. বসু শিল্প রসায়নে শিক্ষণপ্রাপ্ত হয়ে বেঙ্গল ইম্যুনিটি কোং লিমিটেডের রসায়ন গবেষণা বিভাগের প্রধানের পদ লাভ করেন। পরে হেমেন্দ্রকুমার ভারতীয় লক্ষা গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (Indian Lac Research Institute) ডাইরেক্টর হিসাবে যোগদান করেন এবং বিহার সরকারের শিল্প বিভাগের ডাইরেক্টর হন। তাঁর অকাল মৃত্যুতে ভারতীয় শিল্প ও বিজ্ঞানের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে, সন্দেহ নেই।

ভাবশিষ্য—প্রিয়দারঞ্জন

চট্টগ্রাম জেলার নয়াপড়া গ্রাম থেকে প্রিয়দারঞ্জন রায় বি. এ. পড়তে এলেন প্রেসিডেন্সী কলেজে 1906 সালে। 1911 সালে রসায়নে এম. এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবর্ণ পদক ও মতিলাল মল্লিক সুবর্ণ পদক লাভ করলেন। এম. এ. পাশের পরই আচার্যদেবের তত্ত্বাবধানে গবেষণা শুরু করলেন। উষ্ণ সালফিউরিক অ্যাসিড নিয়ে কাজ করছিলেন, হঠাৎ বিস্ফোরণ ঘটল, আর প্রিয়দারঞ্জন চিরদিনের জন্য বাঁ চোখটি হারালেন 1912 সালে। ফলে, দু-বছর তাঁকে গবেষণাকর্ম থেকে দূরে থাকতে হয়। 1914-18 পর্যন্ত সিটি কলেজে অধ্যাপনা করার পর আচার্যদেব ও স্যার আশুতোষের আমন্ত্রণে বিজ্ঞান কলেজে 1919 সালে সহকারী পালিত অধ্যাপকের পদে যোগদান করলেন। নয় বছর এই পদে থেকে তিনি বহু গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাপত্র প্রকাশ করলেও কোনদিন ডি. এস-সি-র মোহ তাঁকে পেয়ে বসেনি। 'আত্মচরিত'-এ (পৃ—১৪৭) আচার্যদেব তাঁর এই প্রিয় শিষ্যটি সম্বন্ধে বলেছেন,—"তিনি বহু মৌলিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার যে কোন একটির জন্য পৃথিবীর যে কোন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে "ডক্টর" উপাধি দিতে পারেন। কিন্তু এখনও তিনি এ বিষয়ে মনস্থির করেন নাই।" আমাদের মনে হয়, প্রিয়দারঞ্জন তার পূর্বেই মনস্থির করে ফেলেছিলেন—ডিগ্রীর প্রতি মোহ তাঁর ছিল না ;ছিল কেবল জ্ঞান ও গবেষণার গভীরতার প্রতি। নীরব ও নিঃশব্দে কর্ম করাই ছিল তাঁর জীবনের ব্রত।

বিদেশ ভ্রমণেও তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল না ; বিদেশে গিয়ে অধ্যয়ন ও গবেষণাকর্মাদির সহিত পরিচিত হওয়ার আকাঙ্খাও তাঁর ছিল না। এসম্পর্কে আচার্যদেব লিখেছেন,—"ইউরোপে গিয়া অধ্যয়ন শেষ করিবার জন্য অতিকষ্টে তাঁহাকে সম্মত করা হয়। ... 'রাসবিহারী ঘোষ ট্রাভেলিং ফেলোশিপ বৃত্তি' তাঁহার উপর একরকম জোর করিয়াই চাপাইয়া দেওয়া হয়।" 1929 সালের বিদেশ ভ্রমণে সুইজারল্যান্ডের বার্ন-এ অধ্যাপক ইমফ্রের সহিত কাজ করেন, কাজ করেন মাইক্রোকেমিষ্ট্রীর ওপর অস্ট্রিয়ার অধ্যাপক এমিকের সঙ্গে। অতঃপর নানা অভিজ্ঞতা অর্জন করেন জার্মানী, ফ্রান্স, চেকোশ্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরী, হল্যান্ড ও ইংলন্ডের নানা গবেষণাগারে। 1937 সালে খয়রা অধ্যাপক ও 1946 সালে পালিত অধ্যাপক পদে বৃত হন।

সহকারীদের সহিত যৌথভাবে তাঁর গবেষণাপত্রের সংখ্যা প্রায় দু-শ'। ম্যাগনেটো কেমিস্ট্রী, মাইক্রোকেমিস্ট্রী, কেমিস্ট্রী অফ কো-অরডিনেশন কম্পাউন্ডস এবং মেটাল বাইগুয়ানাইডস-এর ওপর তাঁর গবেষণা আন্তর্জাতিক মানের। তাঁর প্রথম গবেষণা হাইড্রাজিন ও ফেরিসাইনাইড পরিমাপের ওপর। তাঁর গবেষণা সম্পর্কে আচার্যদেব বলেন,—"Complexes & Valency এবং মাইক্রো-কেমিস্ট্রী সম্বন্ধে তিনি একজন প্রামাণিক বিশেষজ্ঞ বলিয়া গণ্য। ... তাঁহার অন্য সমস্ত গবেষণার কথা ছাড়িয়া দিলেও, সম্প্রতি তিনি "থায়োসালফিউরিক অ্যাসিড" সম্বন্ধে যে নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাতেই প্রকাশ যে তিনি একজন উচ্চশ্রেণীর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কর্তা।" তাঁর এক সফল ছাত্রের নাম অধ্যাপক দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় যিনি ঘোষ অধ্যাপকপদে বৃত।*

আচার্যদেবের *History of Hindu Chemistry* সম্পাদনার ভার প্রিয়দারঞ্জনের ওপর ন্যস্ত হয়। কাজটি আন্তরিকতার সহিত তিনি অবশ্যই সম্পন্ন করেছিলেন, কিন্তু তাঁর বর্জন ও অনুপ্রবেশ নীতি সমর্থনে আমরা যে পৃথক অভিমত পোষণ করি, তার আলোচনা ইতিপূর্বেই করেছি। যাই হোক, আচার্যের ভাবশিষ্য তাঁরই মত চিরকুমার, সাধ্যমত দানেও আচার্যানুসারী; আর আচার্যের অজৈব রসায়নের ধারক, বাহক ও সম্প্রসারক ছিলেন।

ভৌত রসায়নে পথিকৃৎ—নীলরতন ধর

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সহিত নীলরতন ধরের প্রথম সাক্ষাৎ 1907 সালে তখন তিনি রিপন কলেজে—বর্তমান সুরেন্দ্রনাথ কলেজে ইন্টারমিডিয়েট শ্রেণীর ছাত্র। 1909 সালে প্রেসিডেন্সীতে বি. এস-সি পড়ার সময় থেকে আচার্যদেবের সহিত তাঁর পরিচয় নিবিড় হতে থাকে। আচার্যদেব অজৈব রসায়নে গবেষণা শুরু করে জৈব ও ভৌত রসায়নেও গবেষণা আরম্ভ করেন। উনবিংশ শতাব্দীর একেবারে প্রথমে ভৌত রসায়ন ভ্রূণাবস্থায় ছিল। তিনি সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সহিত এই বিষয়ে যে প্রথম গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন তার উল্লেখ আমরা আগেই করেছি। এম. এস-সি পড়ার সময় নীলরতন এই বিষয়ে আকৃষ্ট হয়ে আচার্যদেবের সহিত গবেষণা শুরু করেন এবং এম. এস-সি-তে তাঁর থিসিসও ছিল এই বিষয়ে। ইতিপূর্বে অ্যামোনিয়াম নাইট্রাইটের বাষ্পীয় ঘনত্ব নির্ণয় সম্পর্কে আমরা উল্লেখ করেছি। আচার্যদেবের সহিত তিনি অন্তপক্ষে পাঁচটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন। যেমন, পটাশিয়াম নাইট্রাইট, মারকিউরিক নাইট্রাইট ও পটাশিয়াম মারকিউরিনাইট্রাইটের আণবিক পরিবাহিতা, তুল্য পরিবাহিতা ও নাইট্রাইটের আয়নন (Equivalent conductance and ionization of Nitrites) ইত্যাদি।

1915 সালে লন্ডনের ইম্পিরিয়াল কলেজে ভৌত বিজ্ঞানে গবেষণায় নিযুক্ত হলেন। বিষয় : অনুঘটক সংক্রান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা। এই বিষয়ে উৎকৃষ্ট গবেষণার জন্য ডি. এস-সি উপাধি লাভ করলেন। তারপর ফ্রান্সের সোরবন বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা

* অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় এই লেখকের অনুরোধে প্রিয়দারঞ্জন সম্বন্ধে একটি পুস্তিকা পাঠিয়ে অশেষ উপকার সাধন করেছেন। তাঁকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

করে 1919 সালে Dr. es. Sc. উপাধিতে ভূষিত হলেন। ডঃ ধরের IES পেতে বেগ পেতে হয়নি। তিনি এলাহাবাদের মুইর সেন্টাল কলেজে যোগদান করলেন ভৌত ও অজৈব রসায়নের অধ্যাপক হিসাবে। উল্লেখ্য যে, এই কলেজই 1924 সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়,—এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়।

ভারতে ভৌত রসায়নের গবেষণার পথিকৃৎ তিনি। তাঁর সম্পর্কে আচার্যদেব লিখেছেন,—"ভারতে এই বিজ্ঞানের অনুশীলন ও অধ্যাপনার প্রবর্তক হিসাবে নীলরতন ধরই গৌরবের অধিকারী। তিনি কেবল নিজেই এই বিজ্ঞানের গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন নাই ; জে. সি. ঘোষ, জে. এন মুখার্জী এবং আরও কয়েক জনকে তিনি ইহার জন্য অনুপ্রাণিত করেন।"[6] 1928 সালে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে রসায়ন শাখার সভাপতিরূপে প্রখ্যাত শান্তিস্বরূপ ভাটনগরও অধ্যাপক ধরকে সম্মানিত করে একই কথা বলেন।

নীলরতন ধরের গবেষণার প্রধান প্রধান দিকগুলি হলো মৃত্তিকা রসায়ন, সালোক-রসায়ন (Photo-chemistry), কলোয়েড রসায়ন, কৃষি রসায়ন—ভূমির উর্বরতা বিষয়ে। এইসব গবেষণা আন্তর্জাতিক মানের ও দেশ-বিদেশে বহু প্রশংসিত। এখানে তাঁর একটি গবেষণা সম্বন্ধে দু-চার কথা বলা খুবই প্রাসঙ্গিক হবে। বর্তমানে উচ্চ ফলনশীল ধান, গম ইত্যাদির উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য রাসায়নিক সারের বিপুল ও ব্যাপক চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে। আগে যে কৃষককুল গোবর, আগাছা ইত্যাদির ওপর নির্ভর করে জৈব সারের দ্বারা মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করত, তার বদলে অধিক ফলনের লোভে অপরিমিত পরিমাণে রাসায়নিক সার ব্যবহার করে জমির উর্বরতা বিনষ্ট করে চলেছে। যেভাবে রাসায়নিক সারের ব্যবহার হচ্ছে, তাতে একদিন যে জমির মাটি বন্ধ্যাত্ব প্রাপ্ত হবে,—এই সতর্কবাণী বিজ্ঞানীরা দিয়ে চলেছেন। কিন্তু বেওসাদারদের অত্যঙ্গু মুনাফার ও অঘটন-পটিয়সী বিজ্ঞাপনের ফলে জমির সর্বনাশা পরিণতির কথা কেউ কানে তুলছেন না। এই আত্মঘাতী পথ থেকে সরে আসার একমাত্র উপায় অধ্যাপক ধরের গবেষণার বাস্তব প্রয়োগের মাধ্যমে। অধ্যাপক ধর ও তাঁর ছাত্রগণ প্রমাণ করেছেন যে, 'ফার্ম-ইয়ার্ড ম্যানুওর'-এর মাধ্যমে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করা যায় অর্থাৎ ঘাস, খড়, কচুরিপানা, আগাছা, ঝোপঝাড়, গোবর, হাঁস-মুরগীর মলমূত্র, ঝাঁটানো পাতা যা তৈরী হয়, তার সঙ্গে কারখানার ধাতুমল (slag) গুঁড়িয়ে সার তৈরী করে জমিতে দিলে তার উর্বতা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায় ও 'সবুজ বিপ্লব' ত্বরান্বিত করে। এবং অল্প অর্থব্যয়ে কৃষক অধিক ফলন পায়।

অনেকের কাছে সার তৈরীর এই ব্যাপারটি সেকেলে ও বৈজ্ঞানিক তাৎপর্যহীন বলে মনে হতে পারে, কিন্তু ব্যাপারটি আদৌ সতা নয়, বরং বৈজ্ঞানিক তাৎপর্যে অতিসমৃদ্ধ। ঘাস, খড়, কচুরিপানা, কচি ধঞ্চে গাছ ইত্যাদিতে থাকে সেলুলোজ, লিগনিন ও নানা রকমের কার্বোহাইড্রেড। জারণের ফলে এইসব বস্তু থেকে কার্বোলিক অ্যাসিড ও জল নির্গত হয়। আবার এই বিক্রিয়া থেকে যে শক্তি নির্গত হয়, তা জলকে বিশ্লিষ্ট করে হাইড্রোজেন

6. *আত্মচরিত*, পৃ—১৩৩

পরমাণু ও হাইড্রকসিল পরমাণুপুঞ্জ (radical) উৎপন্ন করে ;হাইড্রকসিল পরমাণুপুঞ্জ আবার হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড (H_2O_2) উৎপন্ন করে যা জৈব পদার্থগুলিকে জারিত করে। আবার, হাইড্রোজেন পরমাণু মাটিতে মিশে থাকা নাইট্রোজেনের সহিত বিক্রিয়া ঘটিয়ে অ্যামোনিয়া উৎপাদন করে। অতঃপর জারণের মাধ্যমে অ্যামোনিয়া গ্যাস থেকে প্রথমে নাইট্রাইট ও পরে নাইট্রেট উৎপন্ন হয়। বলা বাহুল্য, নাইট্রেটই হলো গাছের খাদ্য। এই বিক্রিয়ায় সূর্যের আলো ও তাপের ভূমিকা কম নয়। এই যে বিক্রিয়ায় কথা বলা হলো তাকেই ইংরেজীতে বলে—*thermal and photo fixation of Nitrogen.*[7]

তাঁর তত্ত্বাবধানে গবেষণা করে ডক্টরেট হয়েছেন প্রায় একশ' জন। ডি. এস. কোঠারী, আত্মারাম, পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন রাজ্যপাল ধর্মবীর প্রমুখ তাঁর ছাত্র। 1960 ও 1978 সালে দু-বার নোবেল পুরস্কারের জন্য তাঁর নাম সুপারিশকৃত হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে এই সম্মান জানানো হয়নি।

এলাহাবাদে শীলা ধর ইনস্টিটিউট তাঁর এক স্থায়ী কৃর্তি। ব্যক্তিগত লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে স্ত্রীর নামে এই গবেষণা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত করেন। চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার হসপিটালের নার্সদের বসবাসের গৃহ নির্মাণে দু লক্ষ টাকা দান করেন। গুরুর ন্যায় ট্রেনের দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করেছেন। বিজ্ঞানের জন্য যেমন গবেষণা করেছেন, তেমনি দেশ ও জাতির জন্যও মৃত্তিকার উর্বরতা বৃদ্ধির ন্যায় গবেষণা বিদ্যমান।

1910 সালে জিতেন্দ্রনাথ রক্ষিত এলেন আচার্যদেবের সহকারী হিসাবে। বি. এস-সি. পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলেও রাসায়নিক যন্ত্রপাতি নির্মাণে ও গবেষণাকার্যে তাঁর নৈপুণ্য ছিল। আচার্যের স্নেহধন্য রক্ষিত 'রত্ন' বলে অভিহিত হয়েছেন। আচার্যদেবের সহিত তিনি অন্তত আটটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। প্রথম প্রবন্ধ JCS, 99, 1911 সালে প্রকাশিত হয় : 'Nitrites of alkylammonium bases : ethyl ammonium nitrite, dimethyl ammonium nitrite, and trimethyl ammonium nitrite.' রক্ষিত গাজীপুর আফিম কারখানায় যোগদান করেন। বৈশ্লেষিক রসায়ন গ্রন্থে তাঁর মরফিন ও কোডিন (Codeine) নির্ণয় পদ্ধতি স্থানলাভ করতে সমর্থ হয়েছে।

প্রফুল্লচন্দ্র গুহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এস. সি. পাশ করেন। প্রথানুযায়ী ওইখানে অধ্যাপক ওয়াটসনের (Watson) অধীনেই তাঁর গবেষণা করার কথা। কিন্তু ওয়াটসনের অনুপস্থিতির জন্য আচার্যের নিকট আবেদন করে কলকাতা চলে এসেন। এম. এস-সি পরীক্ষায় প্রথম হয়ে ডক্টরেট করলেন এবং প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করলেন। আচার্যদেবের সহিত তাঁর অন্তত চারটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে দেখা যায়। মারকারি মারক্যাপটাইড নাইট্রাইট ও সালফারের শৃঙ্খল যৌগের ওপর তাঁর গবেষণা। পরে বিজ্ঞান কলেজে ফলিত রসায়ন বিভাগে যোগদান করেন, তারপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। জৈব রসায়নের অধ্যাপক হয়ে বাঙ্গালোরে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্সে নানাবিধ বিষয়ে গবেষণা করেন: মনোতার্পিন সেসকুইতার্পিন (sesquiterpenes), বাইসাইক্লিক, হেটেরোসাইক্লিক, স্টেরিওকেমিস্ট্রী ও জিওমেট্রিক আইসোমেরিজম ইত্যাদি।

---

7. *অগ্রজ বিজ্ঞানী,* পৃ—১০৬-১০৭

কত উজ্জ্বল ছাত্র আচার্যদেবের। সবাই অতি উজ্জ্বল না হলেও ভারতে রসায়ন গবেষণা ও চর্চায় তাঁদের অবদান কম নয়। নিঃসন্দেহে তাঁরা সকলেই ইন্ডিয়ান স্কুল অফ কেমিস্ট্রীর সদস্য। মানিকলাল দে, এফ. ডি. ফার্নান্ডেজ, রাজেন্দ্রলাল দে, গোপালচন্দ্র চক্রবর্তী, প্রফুল্লকুমার বসু, যোগেন্দ্রচন্দ্র বর্ধন, সুশীলকুমার মিত্র প্রমুখের রসায়নে অবদান অবশ্যই স্মরণযোগ্য। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ওয়াটসন ও তাঁর ছাত্রগণ ভারতে রসায়ন চর্চায় অবদান রেখেছেন। এঁদের মধ্যে আছেন অনুকূলচন্দ্র সরকার, প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, ব্রজেন্দ্রনাথ ঘোষ, সুধাময় ঘোষ ও শিখিভূষণ দত্ত।

রসায়নের বাইরে

সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও মেঘনাদ সাহা প্রকৃতপক্ষে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের রসায়নমন্ডলীর অন্তর্গত না হলেও পদার্থবিজ্ঞানে তাঁদের অবদান নিয়ে গুরুর আনন্দ ও গর্বের অন্ত ছিল না। উভয়েই গুরুর প্রতি অনুরক্ত ছিলেন, বিশেষত মেঘনাদ সাহা তো গুরুর বহু কর্মযজ্ঞে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ 'আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র স্মরণে' প্রবন্ধে আচার্যদেবের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের বিষয়টি নিয়ে লিখেছেন,—"শান্তশিষ্ট সুবোধ বালকের সুনাম কলেজে আমার ছিল না...। তাই কোনদিন বিশেষ কোন কারণে যা আমার মনে হৈ—ডাঃ রায়ের মনে হয়েছিল, ক্লাশের বক্তৃতা নিজে যথেষ্ট মনোযোগ দিয়ে শুনছিনা এবং নিকটের বন্ধুদেরও চিত্তবিক্ষেপ ঘটিয়েছি। তাতে আদেশ জারী হলো—বক্তৃতার সময় সকলের থেকে পৃথক হয়ে বসতে হবে মঞ্চের রেলিং-এর উপরে—সেখানে উপরকরণ বোঝাই ক্লাসের টেবিল, যেখানে গুরুদেব স্বয়ং দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দেন প্রত্যহ। শাস্তির ফল আমার পক্ষে ভালই দাঁড়িয়ে গেল সবদিক থেকে। চোখ খারাপ, তাই কাছ থেকে এখন পরীক্ষাপর্বের প্রত্যেক অঙ্গটি নিখুঁতভাবে দেখতে পেতাম।"[৪]



উজ্জ্বল ছাত্রদের মধ্যে প্রফুল্লচন্দ্র

৪. *সত্যেন্দ্রনাথ বসু রচনা সঙ্কলন*, পৃ—২৩৭

ওই প্রবন্ধের অন্যত্র লিখেছেন,—"রসায়ন-মন্ডলীতে ছিল আমার ধূমকেতুর মত আসা-যাওয়া—হয়তো বা তাই রসিকতা করতেন আচার্য আমাকে নিয়ে যে, আমি তাঁর বর্ণিত "বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক ও তার অপব্যবহারের" চলমান উজ্জ্বল উদাহরণ।"

সত্যেন্দ্রনাথের ডক্টরেট ডিগ্রীর প্রতি কোন মোহ ছিল না। তাঁর অধীনে গবেষণা করে অনেকে ডক্টরেট হয়েছেন, অনেকে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করে ডক্টরেটের পথ সুগম করেছেন, বস্তুতপক্ষে, যিনি 'বোস সংখ্যায়ন' উদ্ভাবন করে পদার্থবিজ্ঞানে নতুন দিক উন্মোচন করেছেন, তাঁর ডক্টরেট ডিগ্রীর কী দরকার! সত্যেন্দ্রনাথের চরিত্র ও প্রকৃতির এই দিকটি আচার্যের দৃষ্টি এড়ায়নি। তিনি 'আত্মচরিত'-এ (পৃ—২৪৩) লিখেছেন,—"সত্যেন্দ্রনাথ বসু (বোস-আইনস্টাইন তত্ত্বের জন্য বিখ্যাত) যদিও বিদেশে গিয়া তথাকার প্রসিদ্ধ গণিতজ্ঞ পদার্থতত্ত্ব-বিদ্‌গণের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, তথাপি ঐ একই মনোভাবের বশবর্তী হইয়া কোন বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উপাধি গ্রহণ করেন নাই।"

অনেকে সত্যেন্দ্রনাথকে বোস সংখ্যায়নের জনক ও প্রখ্যাত গণিতজ্ঞ বলেই জানেন, কিন্তু রসায়ন নিয়েও তাঁর গবেষণা কম নয়। পরিতোষ দত্ত তাঁর তত্ত্বাবধানে ঢাকাতে রসায়নে গবেষণা করে ডক্টরেট হন। অসীমা চট্টোপাধ্যায় 1946 সালের পর থেকে তাঁর সঙ্গে 'structure and stereo-chemistry of several alkaloids and other organic substances' নিয়ে কাজ করেন। অধ্যাপিকা চট্টোপাধ্যায় স্বয়ং লিখেছেন,—"অধ্যাপক বোসের আর একটি প্রধান অবদান inorganic complex salt এবং clay minerals নিয়ে কাজ। ... অধ্যাপক বোস ও তাঁর ছাত্ররা কাজ আরম্ভ করার আগে আমাদের দেশে এই নিয়ে বিশেষ কাজ হয়নি। বিভিন্ন প্রকৃতিক অবস্থায় clay সৃষ্টি হয় তাই যেসব অঞ্চলে আগে পরীক্ষা করে দেখা হয়নি সেই সব জায়গা থেকে তথ্য সংগ্রহ করা ছিল তাঁদের কাছের পক্ষে খুই জরুরী। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগ্রহ করা এইসব নমুনা বিশ্লেষণের জন্য তাঁরা নিজেরাই ল্যাবরেটরীতে microfocus X-ray tube এবং differential analyser তৈরি করেন।"[9]

আচার্যদেব স্মরণে সত্যেন্দ্রনাথ লিখেছেন,—"সত্য বলতে কি, গুরুর বিরাগভাজন হইনি কোন দিন—তাঁর সস্নেহ কিল-চড়-ঘুষি সর্বদাই জুটেছে!" আচার্যদেবের এই বিশেষ স্নেছায়ায় যাঁরা এসেছেন তাঁরাই পরে দিকপাল বিজ্ঞানী হয়ে উঠেছেন। পদার্থবিজ্ঞান ও গণিত চর্চা করেও সত্যেন্দ্রনাথ রসায়ন-গবেষণা করে এমনভাবে যে আচার্য-ঋণ পরিশোধ করবেন তার দৃষ্টান্ত নেই বললেই চলে। সেইজন্য আমাদের মনে হয় সত্যেন্দ্রনাথও তাঁর স্কুল অফ কেমিস্ট্রীয় অন্যতম উজ্জ্বল নক্ষত্র।

প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে অবসর গ্রহণের সময় আচার্যদেবকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হলে তিনি প্রত্যুত্তরে এক মর্মগ্রাহী ভাষণ প্রদান করেন। ওই ভাষণের একটি অংশে তিনি বলেন,—"যদি কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করেন যে প্রেসিডেন্সি কলেজে আমার কার্যকাল শেষ হইবার সময় আমি কি মূল্যবান সম্পত্তি সঞ্চয় করিয়াছি, তাহা হইলে প্রাচীন কালের কর্নেলিয়ার কথায় আমি উত্তর দিব। আপনারা সকলেই

9. *সত্যেন্দ্রনাথ বোস,* শান্তিময় ও এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়, ১৯৮৫, পৃ—৮৭

সেই আভিজাত্য-গৌরব-শালিনী রোমক মহিলার কাহিনী শুনিয়াছেন। জনৈক ধনী গৃহিণী একদিন তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া নিজের রত্ন অলঙ্কার প্রভৃতি সগর্বে দেখাইলেন এবং কর্ণেলিয়াকে তাঁহার নিজের রত্নালঙ্কার দেখাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। কর্ণেলিয়া বলিলেন—'আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমার মণি-মাণিক্য আমি দেখাইব। কিছুক্ষণ পরে কর্ণেলিয়ার দুই পুত্র বিদ্যালয় হইতে ফিরিলে তিনি তাহাদিগকে দেখাইয়া সগর্বে বলিলেন,—'এরাই আমার রত্নালঙ্কার।' আমিও কর্ণেলিয়ার মত, রসিকলাল দত্ত, নীলরতন ধর, মেঘনাদ সাহা, জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখার্জী প্রভৃতিকে দেখাইয়া বলিতে পারি, 'এরাই আমার রত্ন'।"[10]

কী ভবিষৎদ্বাণী! তখনো ঘোষের সূত্র, সাহার তাপ আয়নন তত্ত্ব ইত্যাদি ভ্রূণাবস্থাতেও ছিল না। মেঘনাদ সাহা একেবারেই আচার্যের রসায়নমন্ডলীর সদস্য নন। সত্যেন্দ্রনাথ রসায়নের গবেষণা করেছেন, এবং করিয়েছেন, কিন্তু মেঘনাদ সাহা এসব কিছুই করেননি, তত্রাচ তিনি আচার্যের নক্ষত্রমন্ডলীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ *লুব্ধক*। জ্যোতিঃপদার্থবিদ্যায় তাঁর শ্রেষ্ঠ গবেষণা ;আয়নমন্ডল, নিউক্লীয় পদার্থবিদ্যা, পঞ্জিকা সংস্কার ইত্যাদিতে তাঁর অসামান্য অবদান। আর ভারতে গবেষণাগার ও নানা বৈজ্ঞানিক সংগঠনে তাঁর অনন্য কৃতিত্ব ;ডি. ভি. সি. পরিকল্পনায় তাঁর কৃতিত্ব প্রবাদে পরিণত হয়েছে।

কি দেশে, কি বিদেশ ভ্রমণকালে, বন্যার ত্রাণকার্যে সদা সর্বদা মেঘনাদ আচার্যের পাশে ছায়ার ন্যায় অবস্থান করেছেন। যন্ত্রপাতির অভাবে প্রতিকূল গবেষণাবস্থার মধ্যে কিভাবে মেঘনাদ সাফল্যলাভ করেছিলেন তার বর্ণনা 'আত্মচরিত'-এ দেখা যায় : "মেঘনাদ সাহা গণিত ও জ্যোতিষ সম্পর্কীয় পদার্থবিদ্যায় (Astro-physics) অসাধারণ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাকেও এই দুর্দশায় পড়িতে হইয়াছিল। উপযুক্ত যন্ত্রপাতির অভাবে পদার্থবিদ্যা সম্বন্ধে গবেষণা করিতে না পারিয়া তিনি খুব মনঃকষ্ট ভোগ করিতেছিলেন। তৎসত্ত্বেও ... অবশেষে বিখ্যাত Saha's Equation আবিষ্কার করেন।"[11]

এক্সপেরিমেন্টালিস্ট পুলিনবিহারী সরকার

ইন্ডিয়ান স্কুল অফ কেমিস্ট্রীর অন্যতম সক্রিয় সদস্য হলেন পুলিনবিহারী সরকার। এম. এস-সি. পাশের পর বিজ্ঞান কলেজে লেকচারার নিযুক্ত হয়ে প্রতিকূল গবেষণা-সুযোগের মধ্যেও বৈশ্লেষিক ও খনিজ রসায়নে গবেষণা করে প্রভূত পরিমাণ কাজ করেছেন। ফ্রান্সের সোরবন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক আরবেঁর অধীনে স্কানডিয়াম, গাডোলিনিয়াম এবং ইউরোপিয়াম ধাতুর ওপর গবেষণা করে স্টেট ডক্টরেট অফ ফ্রান্স উপাধি লাভ করেন। তাঁর পরীক্ষাকার্যের হাত ছিল বিস্ময়করভাবে নিপুণ। বৈশ্লেষিক রসায়নে প্রায় পনেরোটি মৌলিক পদ্ধতির প্রবর্তক তিনি ; জটিল যৌগ, কয়েকটি বিচিত্র যৌগের সমাকৃতি কেলাস তৈরী এবং বিরল ধাতুর প্রকৃতি অনুসন্ধান ইত্যাদি নিয়ে তাঁর গবেষণাপত্রের সংখ্যা প্রায় দু-শ'। ছাত্রদের গবেষণার সঙ্গে তিনি

10. *আত্মচরিত*, পৃ—১৪৫-১৪৬

11. *তদেব*, পৃ—১৩২

নিজের নাম জড়াতে চাইতেন না। আচার্যদের তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন,—"ঘোষ, মুখার্জী ও সাহার অন্যতম সহাধ্যায়ী পুলিনবিহারী সরকার এদেশে তাঁর অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া প্যারীতে যান এবং সোরবোনে অধ্যাপক উরবেনের গবেষণাগারে তিন বৎসরকাল "Rare Earths" (দুষ্প্রাপ্য মৃত্তিকা) সম্বন্ধে গবেষণা করেন। 'কেমিক্যাল হোমলজি' সম্বন্ধে তাঁহার নূতনতম গবেষণা তাঁহার কৃতিত্বের পরিচায়ক।"

জ্ঞান-ত্রয়ী

কত বিভিন্ন দিকে আচার্যদেবের গবেষণা পরিচালিত হতো ভাবলে অবাক হতে হয়। নীলরতন ধর, প্রিয়দারঞ্জন রায়, পুলিনবিহারী সরকার, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, জ্ঞনেন্দ্রনাথ রায়, বীরেশ্বচন্দ্র গুহ প্রমুখের গবেষণার প্রধান প্রধান দিকের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে তা সহজেই উপলব্ধ হয়। স্নেহ ও গর্বভরে জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও জ্ঞনেন্দ্রনাথ রায়কে তিনি বলতেন "জ্ঞান-ত্রয়"—"trio of knowledge". জ্ঞানচন্দ্র আচার্যদেবের কর্ণেলিয়া কথিত 'রত্ন'।

যে যুগে উপযুক্ত যন্ত্রপাতি নেই, রাসায়নিক দ্রব্যাদি কেনার জন্য অর্থের সংস্থান নেই, বিদেশে রাসায়নিক গবেষণার গতি ও প্রকৃতির সহিত পরিচিত হওয়ার জন্য জার্নালের অভাব, সেই একান্ত প্রতিকূল অবস্থা কাটিয়ে ওঠার একমাত্র উপায় হলো বুদ্ধি, মেধা ও দূরদৃষ্টি। এই প্রতিকূল অবস্থা কিভাবে আশীর্বাদস্বরূপ হয়েছিল আচার্য তাঁর 'আত্মচরিত'-এ উল্লেখ করে বলেছেন,—"বিজ্ঞান ও সাহিত্যের ইতিহাসে দেখা গিয়াছে যে, মৌলিক প্রতিভার অধিকারী কোন ব্যক্তিকে যদি বাহিরের সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইয়া সম্পূর্ণরূপে নিজের উপরে নির্ভর করিতে হয়, তবে জ্ঞানজগতে সম্পূর্ণ নূতন জিনিস দিবার সৌভাগ্য তাঁহার ঘটে। জন বুনিয়ানের কোন সাহিত্যিক শিক্ষা ও সংস্কৃতি ছিল না। কিন্তু বেডফোর্ডের কারাগারে বসিয়া তিনি তাঁহার অমর গ্রন্থ The Pilgrim's Progress লিখিয়াছিলেন। নিউটনের বয়স যখন মাত্র ২৩ বৎসর তখন লন্ডনে প্লেগ মহামারী হয় এবং তাঁহাকে বাধ্য হইয়া ট্রিনিটি কলেজ ছাড়িয়া স্বগ্রাম উলসথর্প যাইতে হয়। সেইখানেই যন্ত্রপাতির সাহায্য ব্যতীত তিনি তাঁহার মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব আবিষ্কার করেন।"[12]

ঘোষের ক্ষেত্রেও তাই হলো। গবেষণার অভাবে ভৌত রসায়নের রাশি রাশি বই আর জার্নালের মধ্যে ডুবে গেলেন জ্ঞানচন্দ্র। নির্মাণ করলেন **তীব্র তড়িৎ-বিশ্লেষ্যের পরিবাহিতা সংক্রান্ত ঘোষের সমীকরণ**। অধ্যাপক নার্নেস্ট, অধ্যাপক হাবের, অধ্যাপক ডোনান এই সূত্রের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন। যদিও জ্ঞানচন্দ্রের গবেষণাসমূহের গুরুত্ব ও তাৎপর্য নিয়ে আলোচনার সুযোগ ও অবকাশ আমাদের নেই, তবুও তাঁর তত্ত্ব ও সূত্রটি সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা প্রয়োজন।

ঘোষের তত্ত্ব বা সূত্র আবিষ্কারের আগে রসায়নে তড়িৎ-বিশ্লেষ্যের পরিবাহিতা সম্বন্ধে আরহেনিয়াসের তত্ত্ব প্রচলিত ছিল। কিন্তু তখন এই তত্ত্বের সাহায্যে তীব্র তড়িৎ-বিশ্লেষ্য দ্রবণের অস্বাভাবিক আচরণের ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছিল না। আরহেনিয়াসের

12. *আত্মচরিত*, পৃ—১৫১-১৫২

মতে দ্রবণে তড়িৎ-বিশ্লেষ্যের অণুগুলি আয়নে বিয়োজিত হয়। তিনি বলেন, এই *বিয়োজনের মাত্রা দ্রবণে লঘুকরণের মাত্রার সমানুপাতিক*। কিন্তু তীব্র তড়িৎ-বিশ্লেষ্যের (strong electrolytes) ক্ষেত্রে আরহেনিয়াসের তত্ত্ব কার্যকর হলো না। ঘোষের তত্ত্ব এই সমস্যা সমাধানে অগ্রসর হয়ে রসায়নে একটি বিশিষ্ট মাত্রা সংযোজিত করল। ঘোষের মতে, তীব্র তড়িৎ-বিশ্লেষ্যে কেবল আধানযুক্ত অণু ও আয়ন থাকবে। এই আয়নগুলির মধ্যে আকর্ষণী বা বিকর্ষণী বল ব্যস্তবর্গসূত্র মেনে চলবে। তিনি অনুমান করলেন যে, ঘনকাকৃতি কেলাসে যেভাবে আয়ন সজ্জিত থাকে, এখানেও সেরকম সজ্জা থাকবে। আর অতি অল্প দূরত্বে থাকা পরস্পর বিপরীত আধানযুক্ত দুটি আয়ন একটি তড়িৎ-নিরপেক্ষ দ্বিমেরু ব্যবস্থা গড়ে তুলবে। এই যে তড়িৎনিরপেক্ষ দ্বিমেরু ব্যবস্থা, তা থেকে কোন আয়নকে বিচ্ছিন্ন করতে যে শক্তির প্রয়োজন তার অর্ধেক শক্তির সমান গতিশক্তি সম্পন্ন আয়নগুলি তীব্র তড়িৎ-বিশ্লেষ্য দ্রবণে অবাধে চলাচল করতে পারবে। স্বীকার্য হিসাবে তিনি ম্যাক্সওয়েলের বেগবন্টন নীতি গ্রহণ করেন। এই হলো ঘোষের তত্ত্ব।

কিন্তু ঘোষের সূত্র আদর্শ নয়, তার ত্রুটি-বিচ্যুতি ছিল। কয়েক বছর পরে জার্মানীর ডিবাই ও হুকেল এই তত্ত্বের ওপর গবেষণা করে নোবেল প্রাইজ পান। পরিতাপের বিষয়, ওই দুই বিজ্ঞানীর নোবেল পাবার পিছনে যিনি তাঁকে এই সম্মান জানানো হলো না। সত্যেন্দ্রনাথ নোবেল পেলো না, পেলেন না মেঘনাদ, নীলরতন আর জ্ঞানচন্দ্রও পেলেন না। রাজনৈতিক কলুষতা, সঙ্কীর্ণ স্বার্থপরতা বিজ্ঞান জগতে নানা সম্মান ও পুরস্কারের ক্ষেত্রে যে দৃষ্ট হয়, তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে একবার নীলরতন ধর রয়াল সোসাইটির নির্বাচন সম্পর্কে বলেছিলেন, "ইহারা হারামজাদা"। তা না হলে সত্যেন্দ্রনাথকে দীর্ঘদিন F.R.S. হতে অপেক্ষা করতে হয়? আর আচার্যদেব কখনো F.R.S. নির্বাচিত হলেনই না!

তীব্র তড়িৎ-বিশ্লেষ্যের ওপর গবেষণা 'বড় জ্ঞানকে' ডি. এস-সি ডিগ্রী এনে দিল ; অতঃপর পি. আর এস. হয়ে 1919 সালে ডোনানের গবেষণাগারে যোগদান করলেন। এই সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্যার ফিলিপ হর্টগ লন্ডনে গিয়ে জ্ঞানচন্দ্রকে অধ্যাপকপদ গ্রহণ করার প্রস্তাব করেন। কিন্তু স্যার আশুতোষ বিধিনিষেধের প্রসঙ্গ তুলে জ্ঞানচন্দ্রের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে ঢাকায় যাওয়াতে বাধ সাধলেন। কিন্তু আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের হস্তক্ষেপের ফলে জ্ঞানচন্দ্রের ঢাকায় যাওয়া আটকান গেল না। এই সময় 'ছোট জ্ঞান' অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে লেখা আচার্যের চিঠির প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করা হলো :

"UNIVERSITY COLLEGE OF
SCIENCE & TECHNOLOGY
92, Upper Circular Road, Calcutta
The 20th April, 1921

My dear Jnan,

তোমার ২৪ শে মার্চ তারিখের পত্র যথাসময়ে পাইয়াছি। 'বড়' জ্ঞানকে লইয়া

স্যার আশুতোষ তোলপাড় করিতেছেন—breach of faith, contract, ethical principles, etc. গত শনিবার Governing Body-এর মিটিং-এ আমার সহিত exchange of high words হইয়াছে। কারণ, তিনি আমাকে মূলীভূত কারণ ধরেন। আমি বলিলাম, I stand in the *loco parentis.* আমার ছেলেদের উন্নতির পথে কাঁটা দিতে পারি না। সর্ত্তে আছে যে College of Science join করিতে না পারিলে টাকা ফিরাইয়া দিতে হইবে। আমাদের Univ. একপ্রকার দেউলিয়া—তাহাদের সামান্য বেতন দিয়া আটকাইয়া রাখা ন্যায়গর্হিত etc.? অর্থাৎ Dr. Seal চলিয়া গিয়াছেন। রমেশ মজুমদার, হরিদাস ভট্টাচার্য্য, সত্যেন প্রভৃতি ঢাকায় যাইতেছেন। ইহাদিগকে ধরতে ছুঁতে পারেন না ; কেবল জ্ঞানদ্বয় ও মেঘনাদকে moral obligation ও ethics-এর দোহাই দিয়া আটক করিতে চান। তোমরা যে College of Science-এর Staff-এ রহিয়াছ আর on deputation leave, অতএব অনুমতি ব্যতিরেকে যেতে পারনা। Lord Ronaldshay-কে সমস্ত file দেখাইয়া বুঝাইতেছেন। তোমার উপরেও দেখিলাম খাপ্পা। যাহা হউক, কিছুমাত্র বিচলিত হইও না। দরকার যদি হয় আমি Lord Ronaldshay-এর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বড় জ্ঞানের বিষয় বলিব। .... ফল কথা, আশুবাবুর সহিত বনিবনাও হইয়া চলা অসাধ্য হইতেছে। আমার বোধ হয় ক্রমে ক্রমে open revolt দরকার হইবে।"[13]

প্রকাশ্যে বিদ্রোহ না হলেও জ্ঞানচন্দ্র 1921 সালে ঢাকা চলে গেলেন এবং দীর্ঘ আঠারো বছর পরে 1939 সালে বাঙ্গালোরে 'ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স'-এর ডাইরেক্টর পদে যোগদান করলেন। জ্ঞানচন্দ্র বহু গুরুত্বপূর্ণ পদ অলঙ্কৃত করেছেন : খড়্গপুর আই. আই টির ডাইরেক্টর, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, প্ল্যানিং কমিশনের সদস্য ইত্যাদি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আলোকরসায়ন, টেকনিক্যাল গ্যাস বিক্রিয়া, বায়োকেমিস্ট্রী ও কৃষ্টি রসায়ন বিষয়ে গবেষণা-স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন জ্ঞানচন্দ্র। তাঁর সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে বাঙ্গালোরে পাওয়ার ইঞ্জিনিয়ানিং, এরোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, হাইপ্রেসার টেকনোলজি ও কেমিস্ট্রী, কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, মেটালারজি, ফার্মাকলজি প্রভৃতি বিভাগ গড়ে ওঠে। তিনি স্বয়ং ফিসার ট্রপস পদ্ধতিতে তরল জ্বালানী সংশ্লেষ বিষয়ে গবেষণা করে কয়েকটি নতুন অনুঘটক আবিষ্কার করেন। সেই 1917 সালে আচার্যদেবের সহিত যৌথভাবে প্রকাশ করেছিলেন 'The Velocity of decomposition and the dissociation constant of nitrous acid', তারপর তাঁর গবেষণার কত ভিন্ন ভিন্ন দিক, কত বৈচিত্র্য!

দ্বিতীয় জ্ঞান

কলা বিভাগে ভর্তি হয়ে মামাদের ইচ্ছানুসারে হতে চেয়েছিলেন উকিল, কিন্তু শেষে বিজ্ঞানে এসে হয়ে উঠলেন বিজ্ঞানী—আচার্যের স্নেহধন্য 'ছোট' জ্ঞান। জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সহপাঠী জ্ঞানচন্দ্রের সহিত অধ্যাপক ডোনানের

13. *Acharya Prafulla Chandra Ray,* C.U., p. 288

গবেষণাগারে কাজ করেন। এম. এস-সিতে তাঁর থিসিস ছিল : 'ইলেকট্রিক সিনথেসিস অফ কলোয়েডস'—'কলোয়েডের তড়িৎ সংশ্লেষণ'। ডোনানের গবেষণাগারে কাজ করে তিনি 'কলোয়েড বিজ্ঞানের দ্বিস্তর তড়িৎ তত্ত্ব' (theory of electrical double layer of colloids) উদ্ভাবন করেন। আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানে তাঁর প্রথম প্রবেশ 1920 সালের 25 শে অক্টোবর। তিনি ওই সময় 'দি ফ্যারাডে অ্যান্ড ফিজিক্যাল সোসাইটি'-র কলোয়েড সংক্রান্ত আলোচনায় যোগদান করে 'কলোয়েডীয় কণার আধানের উৎস ও তড়িৎ-বিশ্লেষ্যের দ্বারা তার প্রশমন' ('The origin of the charge of a colloidal particle and its neutralization by electrolytes') বিষয়ে ভাষণ প্রদান করেন। ওই আলোচনাচক্রে বিশ্বের বহু খ্যাতনামা ও বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানী উপস্থিত ছিলেন এবং আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।. যেমন, অধ্যাপক এফ. জি. ডোনান, অধ্যাপক এইচ. আর. প্রোকটার, স্যার রবার্ট জ্যাকসন, স্যার রবার্টসন, ই. হ্যাৎশেক প্রমুখ। সেদিনের সেই আলোচনাচক্রে জ্ঞানেন্দ্রনাথ কিরূপ কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন 1920 সালের 4 ঠা নভেম্বরের 'নেচার' পত্রিকার প্রতিবেদন থেকে স্পষ্ট হয় : "Perhaps the most important paper of the whole discussion, in that it represented a distinct advance in theory was that by Mr. J. N. Mukherjee in section (5)."

কলোয়েড বিজ্ঞানে জ্ঞানেন্দ্রনাথের বহুল অবদান। মৃত্তিকার ধর্মাবলী জানতে ও বুঝতে কলোয়েড বিজ্ঞানের প্রয়োগ জ্ঞানেন্দ্রনাথের দৃষ্টিতেই ধরা পড়েছিল। ভারতে কলোয়েড বিজ্ঞান, খনিজ মৃত্তিকা, মৃত্তিকা সংক্রান্ত তড়িৎ রসায়ন ইত্যাদি কয়েকটি শাখার প্রবর্তন করে তিনি পথিকৃৎ-এর সম্মান অর্জন করেছেন। বিশিষ্ট বিজ্ঞানী সিগমন্ডী (R. Zsigmondy) ও স্যার জন রাসেল প্রমুখ তাঁর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। রাসেলের মন্তব্য : 'Dr. Mukherjee's work was clearing up a lot of difficulties in regard to chemical constitution of clay substances in the soild, which was of fundamental importance for its study.' জ্ঞানেন্দ্রনাথের গবেষণাপত্র ও গ্রন্থের সংখ্যা শতাধিক।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খয়রা অধ্যাপক থেকে ঘোষ অধ্যাপক হয়ে কলোয়েড, ইলেকট্রোকেমিস্ট্রী ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রে গবেষক গোষ্ঠী তৈরী করেন। অতঃপর ভারতীয় কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (IARI) ডাইরেক্টর পদে যোগদান করেন। পরবর্তীকালে রুরকীর সেন্টাল বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউটের ডাইরেক্টর হন। UPSC-এর সদস্য ছিলেন এবং পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হন। তাঁর উল্লেখযোগ্য ছাত্রদের মধ্যে আছেন এস. পি. রায়চৌধুরী, আর. পি. মিত্র, বি. চট্টোপাধ্যায়, জে. কে. বসু প্রমুখ। এঁরা সবাই স্বাধীনভাবে গবেষণা করে ভারতে রসায়নচর্চায় অমূল্য অবদান রেখেছেন।

ইন্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম কর্মসচিব ছিলেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ। তাঁরই গৃহে সোসাইটির প্রথম পত্তন হয়।

তৃতীয় জ্ঞান

তৃতীয় জ্ঞান অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়ের কোন বিশেষণ নেই 'বড়' বা 'ছোট'-র ন্যায়। আমরা তাঁকে 'গনেশ' জ্ঞান বলতে পারি। কারণ আচার্যদেব তাঁকে 'গণেশ' অ্যাখ্যা দিয়েছিলেন। আচার্যদেবের বহু প্রবন্ধের অনুলেখক ছিলেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ। জ্ঞানেন্দ্রনাথের ওপর প্রফুল্লচন্দ্র অনেক দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন : তাঁর বৃহৎ পরিবারের দায়িত্ব, আয়-ব্যয়ের হিসাব, প্রহরার দায়িত্ব আর তাঁর বইগুলির রক্ষণাবেক্ষণের কাজ।

আচার্যদেবের অধীনে কিভাবে তাঁর ছাত্ররা 'মানুষ' হয়ে উঠত তার বর্ণনা দিয়েছেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ। 1915 সালে জ্ঞানেন্দ্রনাথ একদিন আচার্যের ল্যাবরেটরীর করিডোরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। তখন আচার্য গ্যাস বিশ্লেষণের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। অযথা সময়ের অপব্যবহার করায় তিনি অসন্তুষ্ট হয়ে জ্ঞানেন্দ্রকে ধরে ফেললেন। তাঁকে ডেকে তখনই বছরের পর বছর ধরে সঞ্চিত অবশেষ (residue) থেকে রূপা উদ্ধারের কাজে লাগিয়ে দিলেন। দুপুরের খাবারের আগে পর্যন্ত খুবই শ্রম স্বীকার করে জ্ঞানেন্দ্র কাজ করে চললেন। দিনের শেষে কয়েক আউন্স রূপা উদ্ধার করে জ্ঞানেন্দ্র আচার্যের প্রীতিভাজন হলেন। তাঁর হুকুম ছিল না কোন দ্রবণের অবশেষ ফেলে দেবার। সব বোতলে জমা হতো। জুনিয়র ছাত্রদের কাজ ছিল এই অবশেষ থেকে খাঁটি ধাতু বা রসায়নটি উদ্ধার করার। এভাবে তাদের শিক্ষণ চলত এবং লেবরেটরীর খরচও বাঁচত।

আচার্যদেব কঠোরভাবে নিয়মশৃঙ্খলা ও তাঁর রুটিন মেনে চলতেন। কোন ছাত্রই তা ভঙ্গ হতে কোনদিন দেখেনি। কিন্তু একবার এই রুটিন ও শৃঙ্খলা ভঙ্গ হলো। হেমেন্দ্রকুমার সেন বিলাত যাচ্ছেন, সব গবেষককর্মীরাই হাওড়া স্টেশনে যাবে তাঁকে বিদায় জানাতে। জ্ঞানেন্দ্রনাথও যাবেন, কিন্তু তাঁর ওপর অর্পিত কেলাসন কাজটি করে। ট্রেনের সময় হয়ে আসছে, আচার্যদেব তাড়া দিলেন কাজটি শেষ করতে। তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে জ্ঞানেন্দ্র টলিউইন (toluene) নিহিত ফ্লাসকটি শিখার ওপরে ধরলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাতে আগুন ধরে গেল। অগ্নি নির্বাপনের জন্য জ্ঞানেন্দ্র ফ্লাস্কের মুখ হাত দিয়ে চেপে ধরলেন, কিন্তু ফ্লাস্কটি বিস্ফোরিত হয়ে গরম রাসায়নিক তাঁর গায়ে পড়ল। এক বন্ধু তাড়াতাড়ি ট্যাক্সি ডেকে জ্ঞানেন্দ্রকে ক্যাম্বেল হাসপাতালে ভর্তি করলেন। আচার্যদেব তখন ছিলেন না ; একটু রাত্রে ফিরে এসেই প্রায় 11 টার সময় জ্ঞানেন্দ্রকে দেখতে হাসপাতালে গেলেন। অতঃপর জ্ঞানেন্দ্রর ভাষায় : "I requested him to go back as I knew that he went to bed early but he would not leave till I had fallen asleep. Next morning he was back at the hospital very early to enquire how I was. This meant a complete upset of his time-table and I told him so very apologetically, but he assumed me that occasion demanded a breaking of the rules."[14]

---

14. *Acharya Prafulla Chandra Ray,* C.U., p. 202

পালিত স্কলার হিসাবে কিছুদিন কাজ করার পর জ্ঞানেন্দ্রনাথ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে লেকচারার হিসাবে নিযুক্ত হলেন। ওই সময় জনৈক ইংরেজ রসায়নবিদ ভারতীয় রাসায়নিকরা কেবল বিক্রিয়া রসায়নে তাত্ত্বিক কর্ম করছে বলে অভিযোগ করেন এবং উদ্ভিদ রসায়নে কোন কাজ হচ্ছে না বলে পরিতাপ করেন। এই কারণে জ্ঞানেন্দ্রনাথ ম্যাঞ্চেস্টারে গিয়ে অধ্যাপক রবিনসনের অধীনে অ্যালকালয়েড (alkaloids) নিয়ে গবেষণা করার অনুমতি ভিক্ষা করেন। রবিসন ও প্রেগলের (Pregl) নিকট গবেষণা করে শেষে লাহোরে জৈব রসায়নের পদ লাভ করেন। এখানে জীব-রসায়নের উন্নতি ঘটান জ্ঞনেন্দ্র ও ভারতে প্রথম মাইক্রোকেমিক্যাল গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করেন। আচার্যের অনুমতিক্রমেই তিনি ডাইরেক্টর অফ প্রোডাকসন-এর পদ গ্রহণ করেন। অতঃপর ডেপুটি ডাইরেক্টর জেনারেল অফ ইন্ডাস্ট্রির পদ গ্রহণ করেন এবং ভারত সরকারের উপদেষ্টাপদে নিযুক্ত হন। জ্ঞানেন্দ্রনাথ যখন ডাইরেক্টরেট অফ ড্রাগ অ্যান্ড ড্রেসিং-এ ছিলেন তখনকার একটি ঘটনার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে ভারতীয় বিজ্ঞানে স্বার্থপরতা ও কলুষতার ক্রমঅনুপ্রবেশের চিত্রটি জ্বলজ্বল করতে থাকে। উদ্ধৃতিটি দীর্ঘ হলেও জ্ঞানেন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যাক :

"Once there was an indent for bandages, the cloth requirement of which if put end to end would stretch from Bombay to Southampton, i.e., over 6700 miles. The mills were fully booked, and it was an urgent demand. I discussed with him if I should get khaddar (hand-spun and hand-woven) approved as a bandage cloth. He was enthusiastic. Specifications were duly drawn up and the Army approved the material. Orders started pouring in. I met him after about a year. He remembered what had been done about khaddar, but felt a bit dejected, Khaddar dealers were making good profit and some evils of capitalism were creeping into pollute the sanctity of khaddar. We started talking about insincerity which had even invaded the field of the scientists. I mentioned as instance. It happened in 1938 on 1939. Jawaharlal Nehru was a *persona non-grata* with the Government at that time. He visited Lahore. I did not know him personally, hence I did not feel enthusiastic. But a brother scientist came to my house late one night in his car and asked me if I would accompany him to see Nehru ; as I did not know Punditji personally and I was not very well that evening. I declined to go. This gentleman tried to persude me but I was really not well enough. Then he asked me if he could borrow my car. I let him use my car. He left his own car in my compound which he collected late in the night. My wife thought it very strange that my car was taken when his was in a running condition. The mystry was cleared up next day when the police came to enquire what I was doing last night. Acharya Ray burst out laughing when he heard this story. He became

afterwards grave and told me that the danger of Indian science lay in these sumworshippers."[15]

নতুন নতুন প্রজন্ম এসেছে, আরো আসবে যারা জোসেফকে (Joseph) জানবে না। ভারতে কয়েক প্রজন্ম এসেছে, আসবে সন্দেহ নেই। কিন্তু তারা প্রফুল্লচন্দ্রকে ভুলে গেলে অজ্ঞাত পিতার কলঙ্কে কি লিপ্ত হবে না?

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ছাত্রের সংখ্যা নির্ণয় করা কঠিন। তাঁদের সকলের অতিসংক্ষিপ্ত উল্লেখও এখানে সম্ভব নয়। তথাপি এখানে আরো কয়েকজনের উল্লেখ না করলে তাঁর স্কুল অফ কেমিস্ট্রী অসম্পূর্ণ হয়ে পড়ে।

বীরেশচন্দ্র গুহ

এম. এস-সি-র ছাত্রাবস্থাতেই বীরেশচন্দ্র আচার্যের গবেষণাগারে যোগদান করেন এবং যাতায়াতে প্রায় দু-ঘন্টা সময় অপচয়ের কারণে আচার্যের ইচ্ছায় তাঁর বৃহৎ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হন। আচার্যের সহিত যৌথভাবে তিনি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন। তাঁর প্রথম গবেষণাপত্র "Synthesis of Condensed heterocylic systems. Interaction between 2, 5 dithiol—1, 3, 4 thiodiazole and some organic dihalides', *JICS*, 3, 1926. প্লাটিনামের পরিবর্তনশীল যোজ্যতা নিয়েও তাঁর কাজ আছে। টাটা স্কলার হয়ে তিনি লন্ডনের ইউনিভারসিটি কলেজে অধ্যাপক ড্রামন্ড (Drummond) ও কেম্ব্রিজে অধ্যাপক হপকিনসের (Hopkins) গবেষণাগারে কাজ করেন। তাঁর অধ্যায়ন ও গবেষণার বিষয় ছিল বায়োকেমিস্ট্রী। লন্ডনে পি. এইচ-ডি. ও ডি. এস-সি. ডিগ্রী লাভ করে তিনি ভিয়েনা ও বার্লিন যান। ভিটামিন-সি বিষয়ে তাঁর গবেষণা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে হেমেন্দ্রকুমার সেনের শূন্যপদে ফলিত রসায়নের ঘোষ অধ্যাপক পদে তিনি যোগদান করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে তিনি ভারত সরকারের খাদ্য বিভাগের টেকনিক্যাল উপদেষ্টা হন। তিনি ডি. ভি. সি-এরও সদস্য ছিলেন। ভারতে বায়োকেমিস্ট্রী বিষয়ে গবেষণায় তাঁর অসামান্য ভূমিকা অবশ্যই স্মরণযোগ্য।

আচার্যদেবের জটিল যৌগ বিষয়ে গবেষণায় নদীয়াবিহারী অধিকারী, অমরেন্দ্রনাথ রায়, রনজিৎ ঘোষ সহযোগিতা করেন। প্লাটিনামের জটিল যৌগ গবেষণায় সহকারী ছিলেন শৈলেশচন্দ্র সেনগুপ্ত ও পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়; সোনার জটিল যৌগ ও যৌজ্যতা সংক্রান্ত গবেষণায় দীনেশচন্দ্র সেনকে দেখা যায়। সরকারের বিভিন্ন পদে থেকে অবসর গ্রহণের পর তিনি কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার হন। হরিশচন্দ্র গোস্বামী ফ্লোরিন সংক্রান্ত গবেষণায় অংশগ্রহ করেন। তা ছাড়া অনিলচন্দ্র রায়, ক্ষিতিশচন্দ্র বসু রায় প্রমুখ আচার্যের সহিত যৌথ গবেষণা করে প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।

1936 সাল পর্যন্ত আচার্যদেব যৌথভাবে তাঁর ছাত্রদের সহিত গবেষণাপত্র

15. *Acharya Prafulla Chandra Ray,* C.U., p. 205-6

প্রকাশ করেন। অতঃপর তাঁর বৈজ্ঞানিক গবেষণার সমাপ্তি ঘটে। এই শেষ পর্বে যাঁরা তাঁর গবেষণার সহিত যুক্ত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে নদীয়াবিহারী অধিকারী, শৈলেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, সুশীলকুমার মিত্র, হরিশচন্দ্র গোস্বামী, অনিলচন্দ্র রায়, নৃপেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। আচার্যের শেষ যৌথ গবেষণাপত্র নৃপেন্দ্রনাথের সহিত 1936 সালে প্রকাশিত হয়।

নৃপেন্দ্রনাথ 1930 সাল থেকেই আচার্যের অধীনে গবেষণা করতে থাকেন। আচার্যের সহিত তাঁর প্রথম গবেষণাপত্র প্লাটিনামের যৌগ সম্বন্ধে 1933 সালে *Zeit anorg allgem Chem* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তাঁর প্লাটিনামের পরিবর্তনশীল যোজ্যতা সম্পর্কে গবেষণা *JICS*-এ 1934 সালে প্রকাশিত হয়। আচার্যের সহিত নৃপেন্দ্রনাথের শেষ গবেষণাপত্র ইরিডিয়ামের জটিল যৌগ সম্বন্ধে। আচার্যদেব সম্বন্ধে নৃপেন্দ্রনাথ স্মৃতিচারণায় বলেছেন,—'দেখে মনে হত না যে কেমিস্ট্রি নিয়ে চর্চা করেন বা কিছু মনে আছে। কিছু না, স্মৃতিশক্তি ও ইনট্যুইশন ছিল প্রখর। একবার আমি $IrCl_3$ ও Et_2S যৌগটি তৈরী করতে গিয়ে দেখলাম এর দু'টি রকমফের আছে। একটি একেবারে টুকটুকে ruby-red রঙের স্বচ্ছ কেলাস, আর একটি oragnce রঙের। লাল কেলাসগুলি রেখে দিলে অস্বচ্ছ হয়ে যায়। কিন্তু কিছুতেই quantitaltive analysis মেলাতে পারছিলাম না। এদিকে পেপার লেখার তাগাদা দিচ্ছেন। বাধ্য হয়ে অসুবিধার কথা বলতে হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে বল্লেন "ও, ওতে ক্লোরোফর্ম অব্ ক্রিস্টালাইজেশন আছে।"[16]

নৃপেন্দ্রনাথ এই নির্দেশে 'চমৎকৃত' হয়েছিলেন। গভীর সমুদ্রে তরঙ্গের উথালি-পাতালি নেই, আচার্যদেবের জ্ঞানেরও প্রচারধর্মিতা ছিল না। সে-কারণে অনেকে বুঝতে ভুল করেছেন তাঁকে। •

16. *পশ্চিমবঙ্গ*, পৃ—২৯

সপ্তম অধ্যায়

শিল্প ও বাণিজ্য

ভারতের শিল্প-বাণিজ্যের ইতিহাস অতিপ্রাচীন; সিন্ধুসভ্যতার সময় থেকেই আরম্ভ কাল। উৎখননে সিন্ধুসভ্যতার যে-সব প্রত্নসামগ্রী পাওয়া গেছে তাতে দুটি নৌকার প্রতিমূর্তি দেখা যায়। এই নৌকা দুটি ছোট, নদীপথে চলাচল করার মত। সিন্ধুসভ্যতার যুগের বণিকরা যে সমুদ্রপথে বা স্থলপথে মেসোপটেমিয়া ও ব্যাবিলনের সহিত ব্যবসা-বাণিজ্য করত তার প্রমাণ ইরাকের বিভিন্ন স্থানে খননে প্রাপ্ত বিভিন্ন শীল মোহরে। সুমের-এ প্রাপ্ত শীলমোহর থেকে বাশাম মন্তব্য করেছেন,— "The finding of Indus seals suggests that merchants from India actually resided in Mesopotemia; thier chief merchandise was probably cotton, which was always been one of Indis'a staple exports, and which is known to have been used in later Babylonia."[1] ইরাকের ফারাতে কম্পাসরূপী পাখীর (compass-bird) প্রতিকৃতিসহ একটি নৌকা শীলমোহরে অঙ্কিত হয়েছে। বভেরু জাতকে অনুরূপ বর্ণনা দেখতে পাওয়া যায়; গল্পে দিক নির্ণয়ের জন্য কাক উড়িয়ে স্থলের নির্দেশ পাওয়া যেত।[2] সিন্ধুসভ্যতার ধ্বংসের পর থেকে বুদ্ধদেবের আবির্ভাব পর্যন্ত প্রায় দেড় হাজার বছর অন্ধকার যুগ বলে অভিহিত। অতঃপর দ্বিতীয় নগরায়ণের শুরু। মৌর্যযুগে ভারতের সমৃদ্ধি কম ছিল না। সম্রাট অশোকের সময় কেবল প্রতিবেশী দেশগুলির সহিতই নয়, মধ্য এশিয়ার সঙ্গে নানা যোগাযোগ স্থাপিত হয়। এই সূত্রে ভারতের বহির্বাণিজ্যের বিষয়টি সহজেই অনুমিত হয়। খ্রীটীয় প্রথম শতকে প্লিনি তো ভারতের শিল্পজাত সামগ্রী কেনার জন্য রোম সাম্রাজ্যকে বছরে দশ লক্ষ সেস্টার (sestarces) ব্যয় করতে হতো বলে উল্লেখ করেছেন। 'হৌ হান শু'-তে (হান রাজবংশের ইতিহাস) কুশানদের প্রভূত ধনসম্পদের উল্লেখ আছে। কুশান শাসনকালে ভারতের আমদানী-রপ্তানী বাণিজ্য অগ্রগণ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। এই পর্বে চীন, মধ্য এশিয়া, পশ্চিম এশিয়া ও রোমের সহিত ব্যবসা-বাণিজ্যের দৃঢ় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কুশান স্বর্ণ মুদ্রাও বিদেশে গৃহীত হতে থাকে। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে ভারতীয় ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা অতি সুবিদিত। আবহমন কাল থেকেই বৈদেশিক বাণিজ্যে ভারত বিপুল পরিমাণ অর্থ উপার্জন করেছে; রপ্তানী বাণিজ্যের মধ্যে সুতি ও রেশম-কাপড়, চিনি, লবণ, পাট, সোরা প্রভৃতি বিশেষ স্থান অধিকার করেছিল।

দারিয়ুস, আলেকজাণ্ডার এদেশ আক্রমণ করে লুটপাট করে ফিরে গেছে; শক-

1 The Wonder that was India, P.19
2. The Culture and Civilization of Ancient India in Historical Outline, P.60

পার্থিয়ান কুশানরা আক্রমণ করে শাসন করেছে। আবার পতনে কেউ অন্যত্র ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু বেশীর ভাগ ভারতীয় জীবনের অঙ্গীভূত হয়েছে; হুনেদের ক্ষেত্রেও তাই। মুসলমানরা প্রথমে আক্রমণ করে লুটপাঠ করে ফিরে গেছে। পরবর্তীকালে তারা এদেশে শাসন করে ভারতবাসী হয়েছে—পাঠান-মোগল একদেহে লীন হয়েছে। ফলে, ভারতের সম্পদ ও ঐশ্বর্য বাইরে কোথাও পাচার হয়নি; শিল্প-বাণিজ্য ধ্বংস হয়নি। কিন্তু পলাশীর যুদ্ধের (1757) পর ভারতের আর্থিক অবস্থার ক্রমাবনতি হতে থাকে, দেশের ছোট-বড় সব ধরনের শিল্প মায় কুটিরশিল্প পর্যন্ত বিপর্যস্থ হতে থাকে। 1757 থেকে 1780 পর্যন্ত মাত্র তেইশ বছরে 380 কোটি টাকা আদায় করেছে ইংরেজরা, আর সেই টাকায় সস্তায় এদেশের কাঁচামাল কিনে দেশ থেকে জিনিসপত্র তৈরী করে আমাদেরকেই বিক্রী করে শোষণের কুচক্রান্ত করেছে। ভারতের সুতিবস্ত্র রসাতলে গেল, মসলিন আর তৈরী হতে পারল না, রেশম শিল্পও মৃত্যুর প্রহর গুণতে থাকল। 1790 থেকে 1800 পর্যন্ত এই দশ বছরে ইংরেজরা 18 কোটি পাউন্ড লুট করল ইংলণ্ড থেকে কাপড় আমদানী করে। এ ছাড়া ইংরেজদের নগ্নশোষণের আরো কিছু উদাহরণ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের *India before and after the Mutiny* -র আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছি।

বাংলাদেশকে কিভাবে শোষণ করে জীর্ণসার করে তুলল ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী তার বিস্তারিত বর্ণনা 'আত্মচরিত'-এ দেখা যায়। উদাহারণস্বরূপ, এখানে সামান্য কিছু পরিবেশিত হলো। পলাশীর যুদ্ধের পর কার্যত কোম্পানীর হাতে ক্ষমতা এল, আর রোমের প্রিটোরিয়ান গার্ডদের মত তারাও মুর্শিদাবাদের মসনদ নিলামে বিক্রী করতে আরম্ভ করল। 1757-1765 পর্যন্ত বাংলার ওয়ারউইকরা নতুন নতুন নবাবকে মসনদে বসিয়ে অন্ততপক্ষে পাঁচ-ছ' কোটি টাকা উপার্জন করল। আচার্যদেব একটি ছোট উদাহরণ দিয়ে শোষণের আর একটি দিক দেখিয়েছেন : "বীরভূম ও বিষ্ণুপুর এই দুই জেলার নিট রাজস্ব এক লক্ষ পাউণ্ডেরও বেশি হইত, এবং গবর্ণমেন্টের শাসন ব্যয় ৫ হাজার পাউন্ডের বেশি হইত না। অবশিষ্ট ৯৫ হাজার পাউন্ডের কিয়দংশ কলিকাতা বা অন্যান্য স্থানের তোষাখানায় পাঠানো হইত এবং কিয়দংশ জেলায় জেলায় কোম্পানির কারবার চালাইবার জন্য ব্যয় করা হইত।'[3] রাজস্বের উদ্বৃত্তাংশ মূল্যধনরূপে খাটানো হত।

কোম্পানী ব্যবসার সার্থে বৎসরে প্রায় আড়াই লক্ষ পাউন্ড বাংলা থেকে চীনে পাঠাত; মাদ্রাজের মূলধন বাংলা থেকে যেত; বোম্বাই-এর শাসন-ভার বাংলা থেকেই যোগানো হত। পলাশী যুদ্ধের পর বাংলা হলো কামধেনু; পলাশী শোষণে লণ্ডনের চেয়েও ঐশ্বর্যশালী মুর্শিদাবাদ হলো **গজভুক্ত কপিত্থবৎ**। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলার মনস্বীকুল ইংরেজ কুশাসনের বিরুদ্ধে কিছু কিছু প্রতিবাদ করেছিলেন বটে, বিশেষত কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর, কিন্তু ইংরেজদের শোষণ, দমন ও নিপীড়নের নগ্নতা আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের ন্যায় কেউ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন বিনা সন্দেহ।

---

3. আত্মচরিত, পৃ ৩৩৩

বস্তুতপক্ষে, তাঁর এডিনবার্গে পড়ার সময় থেকেই তিনি ইংরেজ কুশাসন ও নানা জাতীয় সমস্যা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত হয়েছিলেন যা তাঁর *India before and after the Mutiny* এবং Essays on India এই দুটি পুস্তিকায় বিধৃত হয়েছে।

ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি ঝোঁক প্রফুল্লচন্দ্রের ছেলেবেলা থেকে দেখা যায়। বাজারে গিয়ে কাঁচাআনাজ বিক্রী করতে তাঁর বাধত না; ছাত্রাবস্থায় পুস্তক ব্যবসায়ী হবেন বলেও একবার মনে করেছিলেন। অতঃপর এডিনবার্গের শিক্ষা তাঁর ব্যবসা-বাণিজ্যের ধারণা গঠন ও সুদৃঢ় করণে অসামান্য প্রভাব বিস্তার করে। লাভ করে ধনী হওয়ার জন্য নয়, দেশ ও জাতির দারিদ্র্য মোচনে ও বেকার সমস্যা সমাধানের আদর্শ নিয়েই প্রফুল্লচন্দ্রের শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠায় নানা উদ্যোগ দেখা যায়। আমরা এই অধ্যায়ে তাঁর নানা উদ্যোগ ও প্রচেষ্টার সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করার প্রয়াস পাব।

বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস (BCPW)

সভ্যতার ইতিহাসে দেখা যায় শিল্পের উদ্ভব হয়েছে বিজ্ঞানের আবির্ভাবের পূর্বেই। বিজ্ঞানের আবির্ভাবের আগেই মানুষ সাবান ও কাচ তৈরী করেছে; রং প্রস্তুত করেছে আর খনিজ থেকে ধাতু নিষ্কাশন করেছে। পরে বিজ্ঞান এই সব শিল্পের উন্নতিতে অসামান্য সহায়তা করেছে। মানুষ ক্রমশ বুঝতে পেরেছে শিল্প ও বিজ্ঞানের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ। পরীক্ষাগারে গবেষণালব্ধ ফল শিল্পে প্রযুক্ত হয়ে শিল্প বিপ্লব ঘটল। এডিনবার্গে রসায়ন নিয়ে পড়তে গিয়ে কেবল একটি উত্তম ডিগ্রী অর্জন করাই প্রফুল্লচন্দ্রের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়নি; তিনি তাঁর অধীত বিষয়ের সম্ভাব্য সকল রকম প্রয়োগও নিরীক্ষণ করেছিলেন। এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেমিক্যাল সোসাইটির সহসভাপতিরূপে তিনি বিভিন্ন কারখানা পরিদর্শন করার সুযোগ পেয়েছিলেন, যেমন, পার্থে 'পুলরস ডাই ওয়ার্কস,' এডিনবার্গে 'ম্যাক ইউয়েনস ব্রুয়ারী,' বার্নটিসল্যাণ্ডে "ডিসটিলেশন অব শেলস' ইত্যাদি। কিন্তু তিনি কোন ওষুধ তৈরীর কারখানা পরিদর্শনের সুযোগ পাননি, পাছে তাদের গুপ্তকথা —বাণিজ্যিক গোপনীয়তা ফাঁস হয়ে যায়। যাই হোক, এই পরিদর্শনে শিল্প ও বিজ্ঞানে হরিহর আত্মাটি সম্যক উপলব্ধি করতে তাঁর কোন অসুবিধা হয়নি। বস্তুতপক্ষে, ইউরোপ ও আমেরিকার শিল্পের বিরাট উন্নতির পশ্চাতে যে পরীক্ষাগারে গবেষণার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তা তাঁর দৃষ্টিতে সহজেই ধরা পড়েছিল। দেশে ফিরে 1889 সালে প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপনা করার চিন্তা-ভাবনায় মগ্ন হলেন। কলেজে শিক্ষিত বাঙালী যুবকদের সাহস নেই, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব নেই, কর্মকৌশল নেই; তারা কেবল অন্যের হাতের পুতুল হতে চায় বা যন্ত্রদাসে পরিণত হতে চায়; কেরানীগিরি করাই তাদের ব্রত, কেরানীর পদ লাভই তাদের মোক্ষ। ডিগ্রী ফার্স্ট, ডিগ্রী লাস্ট বাঙালী যুবকের বেকারত্ব প্রফুল্লচন্দ্রকে শিল্প প্রতিষ্ঠায় পথপ্রদর্শকের সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে প্রেরণা যোগাল।

"মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের অনাহারক্লিষ্ট যুবকদের মুখে অন্ন যোগাইবার ব্যবস্থা করা যায় কিরূপে?" প্রশ্ন প্রফুল্লচন্দ্রের, আর উত্তরটিও তাঁর : শিল্পোদ্যোগ। কিন্তু শিল্প

প্রতিষ্ঠা সহজ নয়; প্রভূত মূলধন চাই, বিশেষজ্ঞ ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কর্মী চাই। তখন প্রফুল্লচন্দ্রের এ-সব কিছুই ছিল না। সহকারী অধ্যাপকরূপে মাসে আড়াই শ' টাকা বেতন। তা থেকেই খেপে খেপে পিতৃ ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করা। সুতরাং তাঁকে এমন পরিকল্পনা করতে হলো যাতে মূলধন কম লাগবে, এবং তিনি স্বয়ং প্রায় একক হস্তে কর্মটি সম্পাদন করতে পারেন। রসায়নপ্রেমী রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুতির দিকে ঝুঁকলেন। সাইট্রিক অ্যাসিড প্রস্তুত করার মনস্থ করলেন। কিন্তু কাজে নেমেই পদে পদে বাধা অনুভব করলেন। প্রথমত, পর্যাপ্ত পরিমাণ লেবুর অভাব। আর দ্বিতীয়ত, তা এমন সস্তা নয় যে, সাইট্রিক অ্যাসিড প্রস্তুত করে বিক্রয়মূল্য থেকে লাভের মুখ দেখা যেতে পারে। পরিকল্পনাটি পরিত্যক্ত হলো। সন্ধান চলল "হেথা নয় হোথা নয় অন্য কোনখানে।"

ভেষজ বা ঔষধ প্রস্তুতি

অনেক ভাবনা-চিন্তার পর প্রফুল্লচন্দ্র ঔষধ সংক্রান্ত রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত করা বিষয়ে সঙ্কল্প করলেন। কিন্তু এইসব দ্রব্য প্রস্তুত করলেই তো আর হয় না, বাজারে শীঘ্র বিক্রী হওয়া চাই। তা না হলে স্বল্প মূলধনে উৎপাদন অসম্ভব হয়ে পড়ে। সুতরাং ঝানু ব্যবসায়ীর ন্যায় তিনি বাজার সমীক্ষায় নামলেন। বাজারে উৎপাদিত দ্রব্যের চাহিদা কিরূপ, বিদেশ থেকে কি পরিমাণ ওষুধ আমদানি করা হয়, আমদানিকারকরা কি ধরনের ওষুধ অধিক পরিমাণে রাখতে চায় ইত্যাদি বিষয়ে তথ্যাদি সংগ্রহ করলেন। ওই সময় মেসার্স বটকৃষ্ণ পাল অ্যাণ্ড কোং ছিল সবচেয়ে বড় ওষুধ ব্যবসায়ী। ওই ফার্মের কর্ণধার ভূতনাথ পাল প্রফুল্লচন্দ্রকে আশ্বাস ও ভরসা দিলেন সঠিক গুণমানযুক্ত ওষুধ হলে ক্রেতার অভাব হবে না। ব্রিটিশ ফার্মাকোপিয়ার (BP) ওষুধগুলির আমদানি সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণভাবে অবহিত হলেন।

লোহার কুচির (scrap iron) সহিত সালফিউরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়া ঘটিয়ে সালফেট অফ আয়রন প্রস্তুতির মধ্য দিয়ে প্রথম কাজ শুরু করলেন। কিন্তু তার গুণগত মান বজায় রাখতে হবে। তাই অবসর সময়ে প্রেসিডেন্সী কলেজের লেবরেটরীতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে লাগলেন। প্রফুল্লচন্দ্রের ন্যায় একজন রসায়নবিদের পক্ষে এই কাজটি ছিল সহজ এবং তিনি B.P. কর্তৃক নির্দিষ্ট মান সহজেই নির্ণয় করলেন। প্রভূত পরিমাণ দ্রব্যাদি প্রস্তুতিতে আর কোন বাধা রইল না। তিনি প্রস্তুত করলেন *Syrup Ferri Iodidi, Liquor Arsenicalis, Liguor Bismuth* ইত্যাদি।

আমাদের দেশে অনেক কাল ধরেই জামা-কাপড় পরিষ্কার করার জন্য সাজিমাটির ব্যবহার ছিল। উত্তর প্রদেশে স্মরণাতীত কাল থেকেই এই ব্যবহার দেখা যায়। প্রফুল্লচন্দ্র সাজিমাটি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা আরম্ভ করলেন এবং কার্বনেট অফ সোডা প্রস্তুত করলেন। কিন্তু এতে খরচ বেশী। ব্রানার মণ্ড অ্যাণ্ড কোম্পানী সোডা প্রস্তুত করত। এবং সমগ্র এশিয়াতেই তাদের একচেটিয়া বাজার ছিল; জাপানে ও চীনেও তাদের সোডার বাজার ছিল।

"ইয়া ক্যা লাস জলতা হ্যা"

কত বাধা-বিঘ্ন, পদে পদে প্রতিকূলতা ও বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে ধৈর্য ধরে চলতে হয়েছে আচার্যদেবকে, তবেই না বেঙ্গল কেমিক্যালের মত শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার সম্ভব হয়েছে। অথচ সেই প্রতিষ্ঠানেই একদিন তাঁকে নিজ দেশে পরবাসী হতে হয়েছে। থাক সে-কথা এখন, পরে আলোচনায় আসবে। প্রফুলচন্দ্র দেখলেন যে আমাদের দেশের কাঁচামালের অভাব নেই, আর এই কাঁচামাল বিদেশেও রপ্তানী হচ্ছে, অথচ ওইসব কাঁচামালকে কাজে লাগিয়ে কোন রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত করা হচ্ছে না। সেই রকম একটি কাঁচামাল— গবাদি পশুর হাড় থেকে তিনি ফসফেট অফ সোডা ও সুপার ফসফেট অফ লাইম প্রস্তুত করার দিকে আকৃষ্ট হলেন। মূলধনের অভাবে স্বাভাবিকভাবেই তাঁর কাজ ছিল ছোট, মাত্র দশ-পনেরো মণ হাড়ের গুড়ো হলেই চলে। প্রফুল্লচন্দ্রের বাসা 91নং আপার সারকুলার রোডের পাশেই মুসলমান অধ্যুসিত রাজাবাজার। খোঁজ নিয়ে জানলেন, কসাইখানা থেকে গবাদি পশুর হাড় গাড়ী বোঝাই করে চালান যায়। তিনি কসাইখানা থেকে কয়েক বস্তা কাঁচা হাড় সংগ্রহ করে বাড়ীর ছাদে শুকোতে দিলেন। তখন শীতকাল, কিন্তু হলে কি হবে, জানুয়ারী মাসে পনেরো দিন ধরে ক্রমাগত বৃষ্টি হতে থাকল। "তার ফলে হাড়ের সংলগ্ন মাংস পচিয়া দুর্গন্ধ বিকীর্ণ করিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে সেই পচা মাংসে সূতার মত পোকা দেখা দিল। সন্ধান পাইয়া ঝাঁকে ঝাঁকে কাকের দল আমার গৃহ আক্রমণ করিল এবং মনের আনন্দে পচা মাংস ও পোকা ভোজন করিতে লাগিল এবং হাড়গুলি টানাটানি করিয়া আমার প্রতিবাসীদের গৃহেও ছড়াইতে লাগিল।"[4] নিষ্ঠাবান হিন্দুকুল অব্রহ্মণ্যম্ করে তারস্বরে ত্রাহি ত্রাহি রব করতে লাগল। হাড়গুলি সরাবার সানুনয় অনুরোধের সহিত কর্পোরেশনের স্বাস্থ্যবিভাগের অফিসারের কাছে অভিযোগ পেশ করার হুমকীও দিলেন। এই নিদারুণ সমস্যা সমাধানে এগিয়ে এলেন তাঁর পরিচিত এক নাইট্রিক অ্যাসিড ব্যবসায়ী। তাঁর মুরারীপুকুরের কাছে মানিকতলায় একখণ্ড জমি ইজারা নেওয়া ছিল। হাড়গুলি চলল সেখানে। তারপর ইটের পাজার মত স্তূপীকৃতভাবে সাজিয়ে অগ্নিসংযোগ করা হলো। মধ্যরাত্রে পোড়া হাড়ের দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়তেই দৌড়ে এল পুলিশ : 'ইয়া ক্যা লাস জলতা হ্যা।'? লাশ নয়, হাড় জ্বলছে বোঝাতে তাকে স্তূপ থেকে হাড় বার করে দেখানো হলো। ওহো, হাড় ভস্মীভূতকরণে এত ঝামেলা কে জানত! প্রফুল্লচন্দ্র ছাড়া এই হিমালয় প্রমাণ বাধা অতিক্রম করার দৃঢ়তা ও প্রত্যয় আর কারই বা ছিল! যাই হোক, হাড়ভস্ম পাওয়া গেল;আর সালফিউরিক অ্যাসিডের সহিত বিক্রিয়া করে 'উনি' নতুন পদার্থ সুপার ফসফেট অফ লাইমে রূপান্তরিত হলেন; অতঃপর সোডার সহিত প্রক্রিয়া ঘটিয়ে ফসফেট অফ সোডা উৎপন্ন হলো। হাড়ভস্ম হাড় নয়, একটি রাসায়নিক পদার্থ, একেবারে নতুন যার সঙ্গে হাড়ের কোন সম্বন্ধ নেই;একটি ক্যালসিয়াম ফসফেট। এখানে অতি পরিচিত একটি সহজ উদাহরণের উল্লেখ করা যায়। দুই আয়তন হাইড্রোজেন

---

4. *আত্মচরিত*, পৃ-৭৬

ও এক আয়তন অক্সিজেন মিশ্রিত করে তাতে তড়িৎস্ফুলিঙ্গ চালনা করলে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে জল উৎপন্ন হয় :

$$2H_2 + O_2 = 2H_2O$$

হাইড্রোজেনের বিশিষ্ট ধর্ম আছে, আর অক্সিজেনেরও আছে, কিন্তু উভয়ে মিলে যখন জল উৎপন্ন করছে তখন জলে আর এদের নিজস্ব ধর্ম বর্তমান্ নেই; তখন জল তার নিজস্ব ধর্ম লাভ করেছে। সে-রকম হাড় থেকে ভস্ম হলে তখন আর হাড়ের কোন ধর্ম নেই।

সালফিউরিক অ্যাসিড প্রস্তুতি

কোন রাসায়নিক দ্রব্য বা ওষুধ ইত্যাদি প্রস্তুতিতে সালফিউরিক অ্যাসিড অপরিহার্য। সালফিউরিক অ্যাসিড এদেশে তখন আমদানী করার প্রয়োজন ছিল না। কাশীপুরস্থ ডি ওয়াল্ডি অ্যাণ্ড কোং (D Waldie & Co) প্রচুর পরিমাণে এই অ্যাসিড প্রস্তুত করত। তা ছাড়া আরো তিন-চারটি ছোট কারখানা ছিল। এসবের মালিক ছিলেন কার্তিকচন্দ্র সিংহ, মাধবচন্দ্র দত্ত প্রমুখ। এক একটি কারখানায় গড়ে তোরো হন্দরের মত সালফিউরিক অ্যাসিড উৎপাদন হতো। হাইড্রোক্লোরিক ও নাইট্রিক অ্যাসিড মাটির কলসীতে চুইয়ে উৎপন্ন করা হতো। এই অ্যাসিড ব্যবসা বেশ লাভজনক ছিল। কারণ, বিপজ্জনক এই অ্যাসিড বিদেশ থেকে আনতে অনেক খরচ পড়ত। প্রফুল্লচন্দ্র প্রয়োজনীয় সালফিউরিক অ্যাসিড ডি ওয়াল্ডি থেকে ক্রয় করতেন। এই সময় একটি ঘটনায় তাঁর কাজের পরিধি বিস্তারিত হলো।

রাচুলি নিবাসী যাদবচন্দ্র মিত্র আলিপুরের ফৌজদারী আদালতে মোক্তারী করতেন। তিনি জনৈক আসগর মণ্ডলের কাছ থেকে সোদপুরস্থ সালফিউরিক অ্যাসিডের একটি কারখানা ক্রয় করেন। যাদবচন্দ্র প্রফুল্লচন্দ্রকে কারখানাটি পরিদর্শনের আমন্ত্রণ জানান এবং তার উন্নতিকল্পে পরামর্শ দেবার অনুরোধও করেন। প্রফুল্লচন্দ্র প্রেসিডেন্সী কলেজের ডেমনোস্ট্রেটার চন্দ্রভূষণ ভাদুড়ী ও তাঁর ভাই কুলভূষণকে সঙ্গে নিয়ে সোদপুরে কারখানা দেখতে গেলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, চন্দ্রভূষণের রাসায়নিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এ সহজাত প্রবৃত্তি ছিল, আর কুলভূষণও রসায়নে স্বর্ণপদক প্রাপ্ত এম. এ। কারখানাটিতে 10' × 10' × 7' উঁচু দুটি সীসাকক্ষ (Lead Chamber) ছিল। এখানে চেম্বার পদ্ধতিতে অ্যাসিড প্রস্তুত করা হতো। এতে গ্লোভার বা গে-লুসাক স্তম্ভ বসাবার কোন উপায় ছিল না। যাদবচন্দ্র মিত্র কিন্তু কারখানা চালাতে না পেরে প্রফুল্লচন্দ্রকে এক হাজার টাকায় কিনে নেবার প্রস্তাব দিলেন। কিন্তু তাঁর টাকা নেই, তিন বছর চাকরী করে মাত্র আটশ' জমিয়েছিলেন। তা প্রাথমিক উদ্যোগ পর্বেই নিঃশেষ। যাদবচন্দ্র হ্যাণ্ডনোটের পরিবর্তে কারখানা দিতে রাজী হলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক হিসাবে দু-এক মাসের মধ্যে ছ-শ' টাকা পাবেন, আর বাকী টাকা কিস্তিতে শোধ করে দেবেন বলে কারখানা অধিগ্রহণ করলেন প্রফুল্লচন্দ্র।

রাজাবাজার থেকে সোদপুরের বাঁশবনে অবস্থিত কারখানাটি অন্ততপক্ষে ছ'মাইল। দূরত্বের বাধা কাটাতে এগিয়ে এলেন চন্দ্রভূষণ, কুলভূষণ ও তাঁদের একজন আত্মীয়। কাছে পীঠে বাজার নেই। সুতরাং চাল ও আলু নিয়ে 1893 সালের মে -জুনের গ্রীষ্মের ছুটিতে ভাদুড়ী ভ্রাতৃদ্বয় বাঁশবনে একটি মাটির ঘরে আশ্রয় নিলেন। আচার্যদেব সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রসিকতায় পরিপূর্ণ ছিলেন। তিনি লিখলেন,— "এই দিয়া বাঁশবনে তাঁহারা মহানন্দে চড়ুইভাতি করিতে লাগিলেন।" যাই হোক, কলেজ খুলল; ভাদুড়ীরা ফিরে এলেন, আর রিপোর্ট পেশ করলেন। লাভজনক করে তোলার পিছনে প্রায়াজনীয় মূলধন না থাকায় আচার্যদেব ওষুধ তৈরীর দিকেই মনোযোগ নিবিষ্ট করলেন।

ওষুধ তৈরীতে সমস্যা—নতুন মাত্রা ইত্যাদি

ওষুধ তৈরী করতে গিয়ে যে-সব সমস্যার উদ্ভব হতে তার সমাধান প্রফুল্লচন্দ্র নিজেই করতেন। অবশ্য 'ফার্মাসিউটিক্যাল জার্নাল', 'কেমিস্ট অ্যাণ্ড ড্রাগিস্ট' ইত্যাদি সাময়িক পত্রিকাগুলি খুবই সাহায্য করত। যেমন, তাঁর সিরাপ অফ আয়োডাইড অফ আয়রন প্রস্তুতির পর কিছুদিন রেখে দিলে ঈষৎ পীতাভ হয়ে যেত। কিন্তু আমদানী করা ওষুধে ঈষৎ সবুজ রং বজায় থাকত। জার্নালগুলি থেকে সমাধানের পথ পেয়ে ফেরাস আয়োডাইডের সহিত অল্প পরিমাণ হাইপো-ফসফরাস অ্যাসিড যুক্ত করে সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। ওষুধ বাজারে ভালই চলতে লাগল। অমূল্যচরণ বসুর প্রচেষ্টায় ও রাধাগোবিন্দ করের সহযোগিতায় নীলরতন সরকার, সুরেশপ্রসাদ সর্বাধিকারী প্রমুখ চিকিৎসকগণ প্রফুল্লচন্দ্রের উদ্যোগে ইতিবাচক সাড়া দিয়ে অ্যাটকিনস সিরাপ, সিরাপ অফ হাইপোফসফাইট অফ লাইম, টনিক গ্লিসেরোফসফেট, প্যারিস কেমিক্যাল ফুড ইত্যাদি ব্যবহারের ব্যবস্থা দিতে লাগলেন। বাঙালী মানসে বিদেশী জিনিসের প্রতি মোহ পরিত্যক্ত হলো না সত্য, কিন্তু স্বদেশপ্রেমী উপরোক্ত চিকিৎসকগণের প্রচেষ্টায় ওষুধগুলি ভালই চলতে লাগল।

এই সময় ডাঃ অমূল্যচরণ তাঁর সহপাঠী বন্ধুর উদ্যোগে একটি নতুন মাত্রা সংযোজন করলেন। তাঁর ও ডাঃ রাধাগোবিন্দ করের দেশীয় ভেষজ ব্যবহারের প্রতি বিশেষ আস্থা ও বিশ্বাস ছিল। অমূল্যচরণ কয়েকজন কবিরাজের সঙ্গে আলোচনা করে আয়ুর্বেদীয় ওষুধের প্রস্তুত প্রণালী সংগ্রহ করলেন। ফলে, কালমেঘের সার, কুর্চির সার, বাসকের সিরাপ (Syrup Adhatoda Vasika), জোয়ানের আরক (Aqua ptychotis) প্রস্তুত হলো। সর্বত্র প্রচলিত টলুর সিরাপের চেয়ে বাসকের সিরাপের উপযোগিতা অধিক পরিমাণে উপলব্ধ হতে থাকল। 1898 সালে ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল কংগ্রেস অধিবেশনে ডাঃ কানাইলাল দে-এর প্রচেষ্টায় দেশীয় ভেষজ ব্রিটিশ ফার্মাকোপিয়ার পরিশিষ্টে স্থান পেল।

তখনকার দিনে ওষুধের বাজার ছিল প্রধানত অশিক্ষিত স্থানীয় ও পশ্চিমা মুসলমানদের হাতে। তাদের না ছিল সততা, না ছিল স্বদেশপ্রীতি। 'দেশী চিজ' কম দামে না দিলে তারা রাখবে না, আবার কম দামে দিলেও দাম না দিয়ে ফেলে রাখবে।

এ হেন পরিস্থিতিতে দু-একটি বাঙালী ফার্ম সাহায্যের হাত প্রসারিত করল। এই প্রসঙ্গে মেসার্স বটকৃষ্ণ পাল অ্যান্ড কোম্পানীর ভূতনাথ পালের বদান্যতা স্মরণ করা যেতে পারে। একদা সিরাপ ফেরী আয়োডাইড প্রস্তুত করার জন্য প্রফুল্লচন্দ্র সাত পাউন্ড আয়োডিন কেনেন। বছরে যেখানে এক পাউন্ডও আয়োডিন বিক্রী হয় না, সেখানে এত আয়োডিন কেনার কারণ জানতে পেরে ভূতনাথ পাল স্বদেশী উদ্যোগের সমর্থনে এক হন্দর সিরাপ ফেরী আয়োডাইড ও এক হন্দর ফেরী সালফের অর্ডার দিলেন। এই অর্ডার সরবরাহের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে চললেন প্রফুল্লচন্দ্র। সাড়ে চারটেয় কলেজ থেকে ফিরে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা পর্যন্ত কাজ করে চললেন।

বিষম অনর্থপাত

সতীশচন্দ্র সিংহ ছিলেন ডাঃ অমূল্যচরণের ভগিনীপতি। 1890 সালে রসায়নে এম.এ. পাশ করে আইন পড়াও শেষ করেন। উদ্দেশ্য ওকালতি করে উপার্জন করা। কিন্তু অমূল্যচন্দ্রের প্রেরণা ও উৎসাহে 1892 সালে সতীশচন্দ্র আচার্যের ওষুধ প্রস্তুতিতে যোগদান করেন। তখন 1892 সালে 'বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস' জন্মলাভ করল। সতীশচন্দ্রের ছিল সৎসাহস ও আত্মবিশ্বাস। তিনি কিছু মূলধনও বিনিয়োগ করেন। শিক্ষিত রাসায়নিক হিসাবে তাঁর কাজ করতে কোন অসুবিধা হয়নি ; তিনি আচার্যদেবের ডান হাত হয়ে উঠলেন। প্রায় দেড় বছর ধরে তিনি আচার্যের সঙ্গে একত্রে কাজ করেছিলেন। কিন্তু সতীশচন্দ্র ভুলক্রমে হাইড্রোসায়নিক অ্যাসিড পাত্রে জল গড়িয়ে খেয়ে মারা গেলেন। এই ঘটনার কথা স্মরণ করে আচার্যদেব লিখেছেন— "সেই ভীষণ দুর্ঘটনার পর ৩২ বৎসর অতীত হইয়াছে, কিন্তু এখনও এই সমস্ত কথা লিখিতে আমার সমস্ত শরীর যেন বিদ্যুৎস্পর্শে শিহরিয়া উঠিতেছে।" [পৃ-৮৩]

চরৈবেতি—চরৈবেতি

শোকোচ্ছ্বাস প্রশমিত হলে দুই বন্ধু আবার এগিয়ে চলার দৃঢ় সঙ্কল্প গ্রহণ করলেন। আচার্যদেব নিজের কাঁধে সব গুরু দায়িত্ব তুলে নিলেন। অর্ডার আসছে, সরবরাহ করতে হবে ; বড় বড় অর্ডারে আচার্যের উৎসাহ আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে। রবিবার ও ছুটির দিনে একাদিক্রমে দশ-বারো ঘন্টা ধরে কাজ করে চলেছেন। বাঁধাধরা কাজ বলে মস্তিষ্ক চালানোর দরকার হতো না। দু-একজন কম্পাউন্ডার থাকত, তারাই বিভিন্ন উপাদান ওজন করে একত্র মিশিয়ে আচার্যের নির্দেশে ওষুধ প্রস্তুত করত। মাঝে মাঝে নমুনা পরীক্ষা করে বিশ্লেষণ দ্বারা গুণগত মান বজায় রাখতেন। কাজটি সহজ করার জন্য বিপুল পরিমাণ অধ্যয়ন করে কতকগুলি প্রয়োজনীয় তরল সার ও সিরাপ প্রস্তুত করে রাখতেন। রসায়নে অসামান্য জ্ঞান ও পরীক্ষা কর্মে নৈপুণ্য থাকা সত্ত্বেও প্রফুল্লচন্দ্র সব সুযোগ কাজে লাগাতে পারছিলেন না। নতুন নতুন কার্যপ্রণালী আবিষ্কার করে ব্যবসায়ে গুহ্যকথার অধিকারী হতে গেলে যে যথেষ্ট পরিমাণ মূলধনের প্রয়োজন, তা আচার্যদেবের ছিল না। তখন পর্যন্ত মাত্র তিন হাজার টাকা মূলধন ; মাইনে থেকে

কিছুই জমানো যাচ্ছে না, আর বৃহৎ হিন্দু পরিবার চালাতে গিয়ে ডাঃ অমূল্যচরণও সঞ্চয় করতে পারছেন না। যন্ত্রপাতি, শিশি, বোতল, মালমসলা ইত্যাদিতেই মূলধন শেষ; তার ওপর সোদপুরের সালফিউরিক অ্যাসিডের কারখানা লাভজনক হয়ে উঠছেনা। 1894 সালে কারখানা ছেড়ে না দিয়ে আর কোন উপায় দেখা গেল না। পুরাতন সিসার পাত বিক্রি করে তিন-চার শ' টাকা মাত্র পাওয়া গেল।

আবার বিপত্তি

1895 সালে গ্রীষ্মের ছুটির সময় প্রফুল্লচন্দ্রের পিতৃদেবের তিরোধান ঘটল। তখন তিনি রাড়ুলি গিয়ে পিতৃঋণ সম্বন্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা করে এক সপ্তাহের মধ্যেই কলকাতায় ফিরে এসে সোদপুরের সালফিউরিক অ্যাসিড কারখানার অবস্থা নিরীক্ষণের জন্য যাতায়াত করতে লাগলেন। অতঃপর এ-সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা নিলেন তা আগেই বলা হয়েছে।

সতীশচন্দ্র সিংহের মৃত্যুর পর ডাঃ অমূল্যচরণ ছিলেন প্রফুল্লচন্দ্রের অতি নির্ভরযোগ্য সহকর্মী। কিন্তু 1898 সালের 4ঠা সেপ্টেম্বর বিউবনিক প্লেগে আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসা গিয়ে ওই রোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁরও মৃত্যু হলো। একেবারেই একা হয়ে পড়লেন তিনি। বেঙ্গল কেমিক্যাল চালাতে হলে আরো মূলধন চাই। 1901 সালে বেঙ্গল কেমিক্যাল লিমিটেড কোম্পানীতে পরিণত হলো। কোম্পানীর অংশীদার হলেন প্রফুল্লচন্দ্র, চন্দ্রভূষণ ভাদুড়ী, ভূতনাথ পাল, ডাঃ কার্তিকচন্দ্র বসু, ডাঃ চারুচন্দ্র বসু, অমূল্যচরণের পত্নী ও সতীশচন্দ্রের পত্নী। ম্যানেজিং ডাইরেক্টর হলেন ডাঃ কার্তিকচন্দ্র বসু, এবং ভূতনাথ পালের সহিত একত্রে তিনি ম্যানেজিং এজেন্টও হলেন। 1910 সালে ম্যানেজিং এজেন্সী ব্যবস্থা বন্ধ হলে কার্তিকচন্দ্র কোম্পানীর সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করেন।

1903 সালে কোম্পানীতে রাজশেখর বসুর যোগদান এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। অল্পকালের মধ্যে ম্যানেজার হয়ে 1933 সালে অবসর নেন, এবং 1960 সাল পর্যন্ত আজীবন ডাইরেক্টর বোর্ডের সদস্য ছিলেন। রাজশেখরের পর সুপারিনটেনডেন্ট হয়ে যোগদান করলেন সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত, কিন্তু 1925 সালে গান্ধীজীর আহ্বানে সামাজিক ও খাদি ইত্যাদি কর্মে যোগদান করলেন।

1905 সাল পর্যন্ত বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস-এর ঠিকানা ছিল 91 নং সারকুলার রোডের আচার্যদেবের ভাড়া বাড়ীটি। এ বছরেই মানিকতলায় 3.3 একর জমি গ্রহণ করে সালফিউরিক অ্যাসিড প্লান্ট এবং অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রস্তুত করার ব্যবস্থা করা গেল। কোম্পানীর আরো সম্প্রসারণ ঘটল 1931 সালে; পানিহাটীতে নতুন সালফিউরিক অ্যাসিড প্লান্ট নির্মিত হলো 45 একর জমি অধিগ্রহণ করে;নানা ধরনের ওষুধ ও জীবজ্ঞিান সম্বন্ধীয় দ্রব্যাদি প্রস্তুত হতে থাকল— মুদ্রণ কালী, শল্যচিকিৎসার জন্য ড্রেসিং, অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র, চা পাতার গুঁড়ো থেকে ক্যাফিন (caffeine) প্রস্তুত হলো; কেমিক্যাল ব্যালান্সও প্রস্তুত হলো; যুদ্ধের সময় কোম্পানী তুলো-গজ-ব্যাণ্ডেজের প্রচুর অর্ডার পেল।

প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হলে ইংরেজ সরকার বেঙ্গল কেমিক্যালের ন্যায় ছোট কারখানাকে অর্ডার দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা বোধ করল না। যুদ্ধের আগে ইংরেজরা



বেঙ্গল কেমিক্যালে ডাইরেক্টর বোর্ডের সহিত প্রফুল্লচন্দ্র

তাদের নিজেদের শিক্ষা গ্রহণ করে তারা নিজেদের দেশেই সেইসব দ্রব্যাদি তৈরী করতে শুরু করল। শুধু তাই নয়, আমদানী বন্ধ করার উদ্দেশ্যে বিদেশী জিনিসে মোটা শুল্ক চাপাল। কিন্তু ভারতে এই নিয়ম চালু হলো না। ফলে, দেশী শিল্পকে বিলেতী শিল্পের সহিত অসম প্রতিযোগিতায় নামতে হলো। এতে দেশী শিল্প মার খেলেও বেঙ্গল কেমিক্যাল বেড়ে উঠতে লাগল। আলকাতরার পাতন প্রক্রিয়ায় বহুবিধ রাসায়নিক দ্রব্য, রং, বিপুল পরিমাণ ফটকিরি তৈরী শুরু হলো; সেরাম ও অসুখের প্রতিরোধী টীকাও তৈরী হতে লাগল। 1937 সালে আচার্যের নামে 'স্যার প্রফুল্লচন্দ্র গবেষণাগার' স্থাপিত হলো। স্পর্শ পদ্ধতিতে 1941 সালে সালফিউরিক অ্যাসিড উৎপাদিত হতে থাকল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বেঙ্গল কেমিক্যালের আরো শ্রীবৃদ্ধি লক্ষ করা যায়। এই সময় কোম্পানী যে সব দ্রবাদি তৈরী করতে সমর্থ, তা সবই সরবরাহ করার অর্ডার পায়। প্রচুর ড্রেসিং-এর অর্ডার এল; ক্লোরোফর্ম, ইথার স্যান্টেনিন, গ্যালিক অ্যাসিড, ট্যানিক অ্যাসিড, পারম্যাঙ্গানেট, ডাইক্রোমেট ইত্যাদির অর্ডার এল। কলকাতা আক্রমণের আশঙ্কায় সরকারী সাহায্যে পাঞ্জাবে একটি ছোট কারখানা স্থাপিত হলো। ইতিপূর্বে স্থাপিত বোম্বাই-এর (বর্তমানে মুম্বাই) কারখানাটিকে (1934) পুর্ণোদ্দমে চালানোর ব্যবস্থা করা হলো। স্বাধীনতার পর BCPW -এর আর একটি শাখা কানপুরে স্থাপিত হলো (1949)।

1894 সালে প্রফুল্লচন্দ্র ও অমূল্যচরণের উদ্যোগে মূলধন বিনিয়োগ হয়েছিল মাত্র তিন হাজার টাকা। লিমিটেড কোম্পানীর হবার পর 1902 সালে মূলধন দাঁড়াল সাড়ে তেইশ হাজার টাকা। 1915 সালে বিক্রী দাঁড়াল পাঁচ লাখ টাকায়, 1926-27 সালে পঁচিশ লাখ, 1943-44 সালে এক কোটি সাত লাখ টাকায়। আর 1963-64 সালে 2.34 কোটি টাকা। টাকার অঙ্কে ব্যবসা চলল; লক্ষণীয় মুনাফা হলো। জোঁকের মত রক্তশোষণে নামল ডাইরেক্টরবর্গ। আচার্যদেবের সহিত মতান্তর ও মনান্তর বেড়ে চলল।

নিজ দেশে পরবাসী

বেঙ্গল কেমিক্যাল প্রতিষ্ঠার পিছনে প্রভূত অর্থোপার্জন করে বিলাস-ব্যসনে প্রাসাদে বসবাস করে জীবনযাপনের যে কোন উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল না প্রফুল্লচন্দ্রের তা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে না। বেঙ্গল কেমিক্যাল ছিল বাঙালী তথা ভারতীয়দের আত্মশক্তি, আত্মনির্ভরতা ও আত্মসম্মানের প্রতীক; দেশীয় প্রতিভার বিকাশ ও কর্মোৎসাহের জীবন্ত প্রতিমূর্তি। টেকনোলজিক্যাল ইনস্টিটিউটে লব্ধ জ্ঞান অপেক্ষা কারখানায় হাতে কলমে জ্ঞান লাভ করা যে অধিকতর ফলপ্রদ, তার একটি

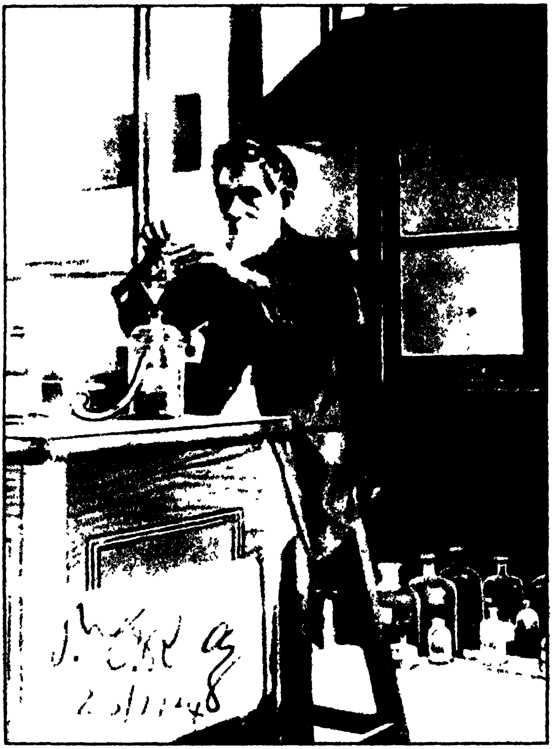


সালফিউরিক অ্যাসিড প্ল্যান্ট : পাণিহাটী

উদাহরণ আচার্যদেব তাঁর 'আত্মচরিত'-এ (পৃ-২৫৭-৫৮) প্রদান করেছেন: "কিছুদিন হইল, আমাদের একটি সালফিউরিক অ্যাসিড তৈরির যন্ত্র বসাইতে হয়। সাধারণতঃ

যন্ত্রনির্মাতা কোন ইংরাজ শিল্পীকেই যন্ত্রটি বসাইবার জন্য ডাকা হইত এবং তিনি কোন বিশেষজ্ঞকে ঐ উদ্দেশ্যে পাঠাইয়া দিতেন। বিশেষজ্ঞকে অনেক টাকা পারিশ্রমিক, পাথেয় এবং হোটেলের ব্যয় দিতে হইত। ১৫ বৎসর পূর্বে আমরা একজন যুবককে কারখানার কাজে নিযুক্ত করি। তিনি তখন কেবল জাতীয় শিক্ষা পরিষদের ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে 'জুনিয়ার কোর্সে' শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন।....... আমরা বিনা দ্বিধায় তাঁহার হস্তে নূতন অ্যাসিড প্ল্যান্ট তৈরির ভার ন্যস্ত করিলাম।.............এই কার্যে কৌশল ও দক্ষতা প্রদর্শন করিয়া তিনি আমাদের সকলেরই প্রশংসা অর্জন করেন।"

লিমিটেড কোম্পানী হওয়ার পর অন্যান্য ডাইরেক্টরগণ আচার্যদেবকেও অন্যতম একজন ডাইরেক্টর বলে মনে করতে লাগলেন। বেঙ্গল কেমিক্যালের জন্মদাতা হলেন সামান্য একজন ডাইরেক্টর! স্বপ্নেও এরূপ ভাবনা কখনো উদয় হয়নি তাঁর। বিংশ



BCPW ল্যাবে

শতাব্দীর চতুর্থ দশক এক ভয়াবহ অর্থসঙ্কটের সম্মুখীন হয়। বিশ্বব্যাপী এই অর্থ সঙ্কট সভ্যতার সঙ্কট বলে অভিহিত হতে থাকে। কেবল সামাজিক ও আর্থিক

ক্ষেত্রেই নয়, মনোজগতেও এর ঝড় বয়ে যায়। "প্রখ্যাত জন স্ট্রেচি এই সঙ্কট সম্বন্ধে লিখেছেন ঃ চিন্তাশীল কারও পক্ষে আছে মাত্র তিনটি পথ ঃ ক্যাথলিক চার্চে যোগ দেওয়া, কম্যুনিস্ট হওয়া কিংবা আত্মহত্যা করা"[5]। অচার্য প্রফুল্লচন্দ্র এই তিনটি উপায়ের কোনটিই গ্রহণযোগ্য মনে না করে প্রকৃত ইতিবাচক চিন্তাধারা অবলম্বন করে বেঙ্গল কেমিক্যালকে সঙ্কটের মোকাবিল করার পন্থা উদ্ভাবন করলেন; নতুন নতুন গবেষণার মাধ্যমে পণ্য উৎপাদনে পরিকল্পনা করলেন। বলা বাহুল্য, এতে প্রচুর অর্থ ব্যয়ের পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু এই বিষয়ে ডাইরেক্টর ও অংশীদারদের সহিত তাঁর মতবিরোধ ঘটতে লাগল। অংশীদাররা লাভের মুখ দেখেছেন, আর আরো বেশী ডিভিডেন্ট পেতেই আগ্রহী। ব্যবসায় যে অন্য প্রতিযোগীর উদয় হতে পারে, পণ্যের চাহিদা হ্রাস পেতে পারে, সেই কথা মাথায় রেখে যে দুর্দিনের মোকাবিলা করার জন্য মজুত ভাণ্ডার গড়া একান্ত অপরিহার্য ও প্রয়োজনীয় তা বারবার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেও ডাইরেক্টরদের উপলব্ধি করাতে পারেন নি প্রফুল্লচন্দ্র। সম্প্রতি ইউটিআই (UTI) স্ক্যামের কথা চিন্তা করলেই পাঠকগণ আচার্যদেবের সুদূরপ্রসারী চিন্তাধারার সারবত্তা উপলব্ধি করতে পারবেন। যাই হোক, আচার্যের কথায় কান না দিয়ে লভ্যাংশ বাড়িয়ে চললেন ডাইরেক্টরগণ, আর আচার্যদেব প্রতিবাদ করে চললেন। প্রতিযোগিতার বাজারে টিকে থাকতে হলে পণ্য সৃষ্টির নতুন নতুন দিকের উদ্ভাবন করতে হবে, কিন্তু মজুত ভাণ্ডার না থাকলে মূলধনের অভাবে সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। অবশেষে, এমন অবস্থা দাঁড়াল যে, আচার্যদেবকেই বোর্ড অফ ডাইরেক্টরস থেকে সরিয়ে দেবার চক্রান্ত হতে লাগল। কথায় বলে, কাক কাকের মাংস খায় না, কিন্তু বাঙালী বাঙালীর সর্বনাশ করে। এই লজ্জা ও কলঙ্ক বাঙালী ঢাকবে কি দিয়ে? এখনো তো সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলছে। আত্মঘাতী বাঙালীর সম্বিৎ ফেরার কোন ইঙ্গিত তো আচার্যদেবের পর এই পঞ্চাশ বছরেও দেখা গেল না।

মতপার্থক্যের বিবরণ (Note of Dissent)

বেঙ্গল কেমিক্যালের ডাইরেক্টরদের সহিত তাঁর যে মত পার্থক্য চলছিল এবং নিজস্ব অপোষহীন ন্যায় ও নীতির পক্ষে অবশেষে 1939 সালের 11 ই জুলাই স্বেচ্ছায় পদত্যাগের পূর্বে তিনি একটি 'Note of DIssent' পাঠান। এই Note থেকেই সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায় ".......inspite of his advancing years Ray was still a level headed man and understood the workings of the joint-stock company very well."[6]

আচার্যদেব দু-বছর ধরে ডাইরেক্টরদের এই কথাটি বোঝাতে পারেন নি যে, অংশীকারীদের লভ্যাংশ দেওয়ার পরিবর্তে মজুত ভাণ্ডার গড়ে তোলা অতীব প্রয়োজন, এবং প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য একান্ত অপরিহার্য। আচার্যদেবের মতে, ডিভিডেন্ট দেওয়াটাই তখন ছিল আত্মহননকারী নীতি। যথেষ্ট পরিমাণ

5. আদর্শ শিক্ষক সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ, পৃ-৭৪

6. *Acharya Prafulla chandra Ray, p. 26*

মজুত ভাণ্ডার থাকলে তিন-চারটি ভিন্ন ভিন্ন শিল্প গড়ে তোলা যেত, কিন্তু মূলধনের অভাবে তা হয়নি। কেবল বোনাস দাও, বোনাস দাও। এর ফলে "For the last 3 or 4 years the directors had to pacify the bonus-demanding clamour of some of the share holders and had to explain to them that the various funds under the headings of Fire Insurance, Dividend Equalizing Fund etc., have all been utilited in extending the business."[7]

ব্যক্তিমুখী চিন্তাধারা ছিল আচার্যদেবের প্রকৃতি ও স্বভাবের পরিপন্থী; তত্ত্ব ও তথ্যের সংযোগে বস্তুমুখী ভাবনার দ্বারাই তিনি পরিচালিত হতেন। তাই তাঁর Note-এ তিন-চারটি লব্ধপ্রতিষ্ঠ ইউরোপীয় ও ভারতীয় শিল্পপতিদের পরিচালনা, মজুত ভাণ্ডার ও লভ্যাংশ প্রদানের চিত্র তুলে ধরে তাঁর অভিমতের যথার্থতা প্রমাণ করেছিলেন ঃ

I. Anglo India Jute Mills Ltd.

Managing Agent-Duncun Brothers

মূলধন	মজুত ভাণ্ডার	ডিভিডেন্ট
Rs. 49, 26, 700/- সাধারণ শেয়ার)	Rs. 118,00,000/-	(1938) শূন্য
Rs. 27, 62,200 (প্রেফারেন্সিয়াল শেয়ার)		

II Central India Weaving Cotton Mills Ltd.

Managing Agent-Tata & Sons

মূলধন	মজুত ভাণ্ডার	ডিভিডেন্ট
Rs. 46,87,500/-	Rs. 1, 64, 48,224/-	11%

III Delhi Cotton Mills

মূলধন	মজুত ভাণ্ডার	ডিভিডেন্ট
Rs. 31,29,797/-	Rs.1,02,64,860/-	5%

আচার্যদেব ব্রিটানিয়া বিস্কুট কোম্পানীর উদাহরণেরও উল্লেখ করেছেন ইত্যাদি। অতঃপর সিদ্ধান্তে এসে বলেছেন,— "It would thus appear that the creation of reserve fund has been the esential thing like the proverbial ants—they lay by a big portion of their accumulation for the winter season i.e. against the adverse days."[8]

আচার্যদেব পদত্যাগ করলেন। তারপর বেঙ্গল কেমিক্যালের পক্ষ থেকে লোকদেখানো ভণ্ডামী শুরু হলো পদত্যাগ পত্র প্রত্যাহারের জন্য। একে একে তাঁর প্রস্তাবিত জিঙ্ক ক্লোরাইড প্ল্যান্ট বানচাল হলো, তাঁর সাবধান বাণী উপেক্ষিত হলো

7. *Ibid. P.29*
8. Ibid, P.30

ও নতুন নতুন গবেষণা অবহেলিত হলো। তিনি হলেন 'An evicted and a homeless stranger in the land (i.e.B.C.P.W.) he once called his own." 1940 সালের 8 ই জুন পদত্যাগপত্র গৃহীত হলো। আচার্যদেব নিজ দেশে পরবাসী হলেন, বাস্তুচ্যুত ও বিতাড়িত হলেন!

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কোম্পানীর কিছু শ্রীবৃদ্ধি হলো বটে, তারপরেই প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে এক পা এক পা করে পিছু হটতে লাগল। ঋণের আষ্টোপাশে আবদ্ধ হয়ে রুগ্ন শিল্পে পরিণত হলো। সরকারী অধিগ্রহণেও এই শিল্পের সতেজ পুনরুজ্জীবন সম্ভব কিনা বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে তা ঘোরতর সন্দেহের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পলিটিক্সিক্র্যাট-ব্যুরোক্র্যাট-টেকনোক্রাটে দেশকে গ্রাস করল, B.C.P.W.-এর অন্তর্জলি আর কতক্ষণ!

অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠান

কেবল বেঙ্গল কেমিক্যাল নয়, অন্যান্য অনেকগুলি শিল্প প্রতিষ্ঠান ও ব্যবসার সহিত ঘনিষ্টভাবে জড়িত ছিলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র। বস্তুতপক্ষে, তাঁরই উৎসাহ ও প্রচেষ্টায় এসব গড়ে ওঠে; সে সবের উন্নতি ও সমৃদ্ধির মূলেও তাঁর অসামান্য অবদান পরিলক্ষিত হয়। ক্যালকাটা পটারি ওয়ার্কস, বেঙ্গল এনামেল, পণ্যবাহী জাহাজের ব্যবসা, ভারতী ইঞ্জিনিয়ারিং কোং, ন্যাশনাল ট্যানারি ওয়ার্কস, আর্যস্থান ইন্সিওরেন্স কোম্পানী, চক্রবর্তী, চ্যাটার্জি অ্যাণ্ড কোং ইত্যাদি তার কয়েকটি উদাহরণ। এইসব প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রীয় শক্তি তিনি, প্রেরণার উৎসও তিনি। সাম্য ও সমাজতন্ত্রে ছিলেন বিশ্বাসী; শ্রমিকদের প্রতি ছিল তাঁর অপার সহানুভূতি ও গভীর ভালবাসা, আর শিল্পে পুঁজিবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর ঘোরতর বিরোধী ছিলেন।

বেঙ্গল পটারিজ

এই শিল্পের প্রধান কাঁচামাল চীনামাটি। 1901 সালে সাঁওতাল পরগণার রাজমহলের কাছে মঙ্গলহাটে পোর্সিলেন ও মৃৎশিল্পের উপযোগী চীনামাটি আবিষ্কৃত হয়। এই চীনামাটি কাজে লাগিয়ে কাশিমবাজারের মহারাজা প্রখ্যাত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী ও বহরমপুরের হেমেন্দ্রনাথ সেন ও বৈকুণ্ঠনাথ সেন একটি প্রাইভেট কোম্পানী গঠন করেন। অতি ক্ষুদ্র প্রয়াস। একটি পুকুরের ধারে কয়েকটি কুটীর নির্মাণ করে কয়েক জন কুমোরদের নিয়ে প্রাথমিক প্রয়াস। তখন মৃৎশিল্পের কোন বিশেষজ্ঞ পাওয়া যায়নি। নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামে জনৈক ব্যক্তি অল্প-স্বল্প মৃৎশিল্পের কাজ জানতেন বটে, কিন্তু তাঁর কোন বৈজ্ঞানিক জ্ঞান না থাকায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে করতেই সাতাশ হাজার টাকা ব্যয় হয়ে গেল। খেলনা আর মাটির পুতুল বিক্রী করে টাল-মাটাল অবস্থায় কারখানা চলতে লাগল।

1903 সাল সিটি কলেজের ছাত্র সত্যসুন্দর দেব *Society of Theists*-এর বৃত্তি প্রাপ্ত হয়ে জাপানে চীনামাটির কাজে প্রশিক্ষণের জন্য যান, এবং তিনি 1905 সাল

দেশে ফিরে এসে 1906 সালে ক্যালকাটা পটারি ওয়ার্কস-এ যোগদান করেন। তখন সফট গ্লেজ পটারি (Soft glazed pottery) হাতে তৈরী হতো বলে সত্যসুন্দর আধুনিক যন্ত্রপাতি ও পদ্ধতি অবলম্বনে জাপানীদের ন্যায় নতুন কারখানা নির্মাণের পরিকল্পনা করে জিনিসপত্র তৈরী করতে লাগলেন। তখন ছোট কারখানাটি ওয়ার্ডস ইনস্টিটিউশনের মাঠে অবস্থিত ছিল। কিন্তু ব্যবসাটির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল, অথচ জায়গাটি ক্ষুদ্র পরিসর বলে মালিকরা বেলেঘাটা রেলওয়ে স্টেশনের নিকট 45 নং ট্যাংকরা রোডে তিন একর জমি ইজারা নিয়ে কারখানা নির্মাণের ব্যবস্থা করলেন। যন্ত্রপাতি বসানা হলো, চুল্লী নির্মিত হলো ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কাজও চলতে লাগল, কিন্তু ক্রমশই সুদক্ষ কারিগরের অভাব অনুভূত হতে থাকল। সত্যসুন্দর চললেন জাপানে দু-জন সুদক্ষ কারিগর আনার জন্য। 1909 সালে জাপানী কারিগরা এসে এক বছর ধরে সন্তোষজনকভাবে কাজ করে গেলেন। এই বাবদ কোম্পানীর ব্যয় হলো দশ হাজার টাকা। ব্যবসায় ক্রমশ উন্নতি হতে লাগল; মালিকরা মূলধনের যোগান নিয়ে চললেন।

ব্যবসায় প্রতিযোগিতা আসে এবং তাতে টিকে থাকার পূর্ব পরিকল্পনা করতে হয়, আর বাজারের চাহিদা ও মূল্যমানের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে না পারলে রুগ্ন হতে হতে মৃত্যু অবধারিত। জাপান ও জার্মানী সস্তা ও উন্নত ধরনের মাল দিয়ে বাজার ছেয়ে দিল, ক্যালকাটা পটারিজ প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হলো। 1913 সালে সত্যসুন্দরকে ইংল্যাণ্ড ও জার্মানী পাঠানো হলো আধুনিক পোর্সিলেন ও মৃৎশিল্প প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষা করার জন্য। তিনি প্রয়োজনীয় কলকব্জা ও উন্নত ধরনের চুল্লীর অর্ডার দিয়ে প্রথম মহাযুদ্ধের আগেই দেশে ফিরলেন।

1906-1916 পর্যন্ত বিবরণীতে দেখা যায় যে, 2,02,952/- টাকা মূল্যের জিনিস উৎপন্ন হয়, আর 1,92,827/- টাকা মূল্যের জিনিস বিক্রী হয়। 1916-17 সালের বাজেটে কাজ বাড়াবার জন্য সত্যসুন্দর আড়াই লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করার জন্য মালিকদের অনুরোধ করেন। এতদিন নানা প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কোম্পানী লাভজনক না হওয়ায় অবশেষে 1919 সালে লিমিটেড কোম্পানী করার সিদ্ধান্ত করা হলো। 'ক্যালকাটা পটারিজ ওয়ার্কস' তখন 'বেঙ্গল পটারিজ লিমিটেড'-এ পরিণত হলো।

আচার্যদেবের সহিত সংযোগ

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র সর্বদাই যে কোন শিল্পোদ্যোগ-এ উৎসাহ ও প্রেরণা দান করেছেন। কেবল বেঙ্গল কেমিক্যালই নয়, ক্যালকাটা পটারিজও তাঁর সহযোগিতা ও সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত হয়নি। এই সম্পর্কে সত্যসুন্দর বলেছেন,—"Practically speaking, Acharya Ray was the central moving force and source of inspiration in both these national enterprises."[9] কারখানাটি তখন ওয়ার্ডস ইনস্টিটিউশনের মাঠে। সেই সময় প্রায়ই সামনের রাস্তা দিয়ে তৃতীয় শ্রেণীর ছ্যাকরা গাড়ীতে চন্দ্রভূষণ

9. Acharya Prafulla Chandra Ray, C.U, P.157

ভাদুড়ী, নন্দলাল ব্যানার্জিসহ বেঙ্গল কেমিক্যালে মিটিং করতে যেতেন প্রফুল্লচন্দ্র। গাড়ী থামিয়ে পটারি ওয়ার্কস দেখতে ভুলতেন না তিনি। সত্যসুন্দর লিখেছেন,— "From 1906 to 1919 I aways kept myself in touch with Acharya Ray. During this period he regularly helped me to tide over many difficulties I had to face in running the factory and thus saved the infant industry"[10] সত্যসুন্দরের অনুরোধেই আচার্যদেব কোম্পানীর অন্যতম একজন ডাইরেক্টর হতে সম্মত হন।

এক সময় 1922-23 সালে কোম্পানী আর্থিক দুরবস্থার সম্মুখীন হলো। ম্যানেজিং এজেন্টগণ প্রয়াজনীয় অর্থের সুব্যস্থা করতে পারল না। এক বন্ধুর পরামর্শে সত্যসুন্দর ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের গভর্নিংবোর্ডের সদস্য রাজা হৃষিকেশ লাহার দ্বারস্থ হলেন। ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নেওয়ার ব্যবস্থা হলো, কিন্তু দুজন জামিনদার চাই। মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র বহুবিধ গুণের অধিকারী। সুতরাং তিনি জামিনদার হলেন। কিন্তু আর একজন চাই। কলকাতাস্থিত দুজন ডাইরেক্টর জামিদনার হতে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করলেন। তিতিবিরক্ত ও হতাশাগ্রস্থ হলেন সত্যসুন্দর। উপয়ান্তর না দেখে ছুটলেন আচার্যদেবের কাছে। সব শুনে আচার্যদেব বললেন,— "........he was not a man of means but only a poor teacher, and that the bank would never accept him as a guarantor." সত্যসুন্দর বললেন, তিনি প্রাসাদোপম বিল্ডিং-এ থাকেন এবং তাঁর নানা খেতাব আছে। সুতরাং ব্যাঙ্ক অবশ্যই তাঁকে জামিনদার হিসাবে গ্রহণ করবে। কেবল অনুসন্ধানকালে তিনি চারপেয়ে খাটটি অন্যত্র সরিয়ে রাখবেন। হো হো করে হেসে উঠে আচার্যদেব জামিনপত্রে স্বাক্ষর করে দিলেন। আড়াই লক্ষ টাকা ঋণ মঞ্জুর হলো।

অতঃপর সত্যসুন্দরের ভাষায়—"I came straight from the Bank to the Science College and saw Acharya Ray and exclaimed : who said that he was a poor teacher? He was now worth $2^1/_2$ lakh of rupees and a man of means. He stood up, laughed and gave me a few of his affectionate slaps and blows. Later on he said to Rajsekhar Bose—" Look what Dev has done to me. I am now worth $2^1/_2$ lakh of rupees."[11]

শিশুর সারল্য, বৃদ্ধের পরিপক্কতা, সন্ন্যাসীর সর্বত্যাগ, শিক্ষকের আদর্শনিষ্ঠা, চাণক্যের বাণী ও উপদেশ, দেশপ্রেমিকের আত্মোৎসর্গ—'আমার মরণে লভিয়া জীবন জাগ রে আমার দেশ'— অসংখ্য গুণরাজির আশ্রয়স্থল আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। এখানে 'স্মরণে-বিস্মরণে প্রফুল্লচন্দ্র' প্রবন্ধের লেখক অধ্যাপক ক্ষেত্র প্রসাদ সেনশর্মার একটি মন্তব্য খুবই প্রাসঙ্গিক ঃ "তাঁর সারা জীবন উদ্যমহীন অসল কর্মভীরু বাংলার যুবক। কৌতুক লাগে—২৭,০০০ কলকারখানা যখন এ প্রদেশে বন্ধ, যখন অনাবাসী হবু লখীকার শিল্পপতিদের ছিপে গেঁথে তুলতে দেশবিদেশে আমাদের ভাবিত মন্ত্রীরা ছোটাছুটি করছেন তখন আদিতে যাঁর নাম যথোচিত গুরুত্বে উচ্চারিত হওয়ার প্রয়াজন

10. Ibid, P.156
11. Ibid, P.158

ছিল, তাঁর নামটাই নিরুচ্চার।'[12] বাঙালী কেবল আত্মঘাতীই নয়, পিতৃঘাতী; ভীষ্মঘাতী অর্জুন, দ্রোণঘাতী ধৃষ্টদ্যুম্ন।

বেঙ্গল এনামেল ওয়ার্কস

নারকেলডাঙ্গায় 1921 সালে ছোট কারখানার মধ্য দিয়ে এই কাজের সূত্রপাত। প্রথম দিকে যথেষ্ট স্থান ও অভিজ্ঞতার অভাব ছিল। বাঙালী যে ভদ্রলোককে কাজের ভার দেওয়ার কথা বিবেচিত হয়, তার সঙ্গে প্রবর্তকগণ এই মর্মে এই শর্ত আরোপ করত চেয়েছিলেন যে, তিনি কয়েকজন শিক্ষিত গ্রাজুয়েটকে এই কাজে সুশিক্ষিত করে তুলবেন। কিন্তু ওই ভদ্রলোক তো এই শর্তে রাজী হলেনই না, পরন্তু সঙ্কটমুহূর্তে কাজ ছেড়ে চলে গেলেন। কিন্তু কোম্পানীর একজন ডাইরেক্টর দ্বিজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ছিলেন অদম্য উৎসাহী। ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক হয়েও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা ও জার্মানী থেক এনামেল শিল্প সম্পর্কীয় নানা গ্রন্থ আনিয়ে যথেষ্ট জ্ঞান আহরণের প্রয়াস পান। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে 1921 সালের নভেম্বর মাসে কাজ আরম্ভ হয়। তখন ছিল কারখানায় ছোট একটি চুল্লী। ছোট ছোট বাসনপত্র ও বাড়ীর দরজার নম্বর প্লেট মাত্র তৈরী হতো।

এই সময় দ্বিজেন্দ্রনাথের ভাই দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন জাপানে; তিনি আবার আচার্যদেবের ছাত্রও বটে। দেবেন্দ্রনাথ জাপানে এনামেল শিল্প শিক্ষা করতে লাগলেন। তিনি ওই দেশের কারখানা ও লব্ধ অভিজ্ঞতা দিয়ে দ্বিজেন্দ্রনাথকে সাহায্য করতে লাগলেন। 1923 সালে দেশের ফিরে আসার সময় এই শিল্পের উপযোগী আধুনিক যন্ত্রপাতিও কিনে আনেন। ব্যবসার বৃদ্ধির হলো। নারকেলডাঙ্গ া ছেড়ে পলতায় দেবেন্দ্রনাথের তত্ত্বাবধানে আধুনিক কারখানা নির্মিত হলো। পাঁচ বৎসরে এই শিল্প প্রভূত পরিমাণ উন্নতি করায় সরকারী সরবরাহীর তালিকায় স্থান পেল।

ছোট একটি চুল্লীর স্থলে চারটি বড় মাফ্ল চুল্লী হলো; দক্ষ কারিগরের সংখ্যা বাড়ল, উৎপন্ন জিনিসের সংখ্যাও বাড়ল। এনামেল রং করার জন্য স্মেলটিং চুল্লীও স্থাপিত হলো। কিন্তু বাধা-বিঘ্নের আর শেষ হয় না। একটি যায় তো অন্য একটি এসে হাজির হয়। চুল্লীর পাশে তাপ সহ্য করে কাজ করার লোকের অভাব দেখা দিল। মধ্যবিত্ত বাঙালী যুবকদের ননীর শরীর গলতে লাগল। নোয়াখালির কর্মঠ মুসলমান আর নিম্নবর্ণের হিন্দুরা কাজের ভার গ্রহণ করল। শিল্পে ব্যবহৃত ইস্পাতের পাতের মূল্য ছিল অন্য একটি বাধা; টাটার ইস্পাতের পাতের মূল্যও কম ছিল না। তার ওপর বিদেশী পণ্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে প্রতিযোগিতা করা কঠিন হয়ে উঠল। এই শিল্প সংরক্ষণের কোন সরকারী আইন তখন ছিল না। এই সম্পর্কে আচার্যদেব 'আত্মচরিত'-এ (পৃ-২৬৮-৬৯) লিখেছন,—"........শিল্পপ্রধান ইলণ্ডেও এনামেল শিল্পের সংরক্ষণ জন্য ২৫শতাংশ শুল্কের ব্যবস্থা আছে। এদেশে এই শিশু শিল্পকে শক্তিশালী জার্মান

12. পশ্চিমবঙ্গ, পৃ—৮৩

ও জাপানী শিল্পের সঙ্গে প্রবল প্রতিযোগিতা করিতে হয় অথচ কোন প্রকার সরকারী বা ব্যাঙ্কের সাহায্যই সে পায় না।"

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এই শিল্পের উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। এবং স্বাধীনতার পর সুরক্ষার ব্যবস্থাও হয়। কিন্তু স্টেনলেস স্টীলের যুগে এই শিল্পের বাজার সঙ্কুচিত হয়েছে। আর আধুনিক পরিচালনা অভাবে রুগ্ন শিল্পের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বাঙালীর তো একে একে নিভিছে দেউটি। প্রদীপের তেল কতক্ষণ থাকবে ইতিহাসই বলতে পারে।

পণ্যবাহী জাহাজ ব্যবসা (Mercantile Marine)

প্রাচীন কাল থেকেই ভারতবর্ষ নৌ ও জাহাজ বাণিজ্যে স্বনির্ভর ছিল। সমুদ্রপথে ভারত ব্যাবিলনের সহিত বাণিজ্য করেছে, রোমের সহিত জলপথে বাণিজ্য অতিপরিচিত ঘটনা। তাম্রলিপ্ত, কলিঙ্গ, কৃষ্ণা ও গোদাবরীর মোহনা ও ভরুকচ্ছ ইত্যাদি থেক পণ্যবাহী জাহাজ জাভা, সুমিত্রা, বোর্ণিও, শ্রীবিজয় ইত্যাদি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় গিয়ে ভিড়ত। আমদানী-রপ্তানীর এমন সমৃদ্ধ ব্যবসা-বাণিজ্য দেশের আর্থিক অবস্থার ভিত্তি দৃঢ় ও মজবুত করত। অন্তঃ ও বহিঃ এই দুরকম বাণিজ্যে ভারতকে কখনো পরনির্ভর হতে হয়নি। কেবল কাব্য সাহিত্যে উল্লেখই নয়, নানা ঐতিহাসিক প্রমাণও বিদ্যমান। রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের *Indian Shipping* এক অতি প্রামাণিক দলিল।

মুসলমান বিজয়ের আগে পর্যন্ত বাংলার জাহাজ সিংহল(বর্তমান শ্রীলঙ্কা), জাভা, সুমাত্রা প্রভৃতি স্থান গেছে; চীনের সহিতও বাণিজ্য-সম্বন্ধ স্থাপন করেছে; মুসলমান শাসনেও নৌ ও জাহাজ ব্যবসায়ে ভারতের গৌরব ম্লান হয়নি। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলের প্রথম দিকে নৌ ও জাহাজ শিল্পের অবনতি পরিলক্ষিত হয় না। 1781-1800 সাল পর্যন্ত মোট 17,020 টনের 385 খানি জাহাজ হুগলী নদীর বন্দরে নির্মিত হয়, আর 1801-1821 পর্যন্ত হুগলী বন্দরে মোট 105, 693 টনের 237 খানি জাহাজ নির্মিত হতে দেখা যায়। বোম্বাই-এর (বর্তমান মুম্বাই) ড্রাই-ডকের সুবিধা ছিল অতি প্রশস্ত ও সুবিধাজনক। এক সময় 1800 সালে ওয়েলেসলি মন্তব্য করছিলেন, ".....বাংলার ব্রিটিশ বণিকদের পণ্য লন্ডন বন্দরে চালান দিবার জন্য যত টন জাহাজের প্রয়োজন হইবে, কলিকাতা বন্দর তাহা সমস্তই যোগাইতে পারিবে।" কিন্তু ব্রিটিশ জাহাজ ব্যবসায়ীদের কুচক্রে ওয়েলেসলির ভবিষ্যদ্বাণী সফল হলো না। এই সম্পর্কে আচার্যদেব টেলারের (Taylor) *History of India* থেকে একটি উদ্ধৃতি দিয়েছেন ঃ "লন্ডন বন্দরে যখন ভারতের নির্মিত জাহাজ ভারতীয় পণ্য বহন করিয়া উপস্থিত হইল, সেখানকার একছত্রী ব্যবসায়ীদের মধ্য তখন একটা হুলস্থুল পড়িয়া গেল। টেমস নদীতে যদি কোন শত্রুপক্ষের জাহাজ উপস্থিত হইত, তাহা হইলেও বোধ হয় এত চাঞ্চল্য হইত না। লন্ডন বন্দরের জাহাজ নির্মাতারা আতঙ্কসূচক চিৎকার শুরু করিয়া দিল; তাহারা প্রচার করিত লাগিল যে, তাহাদের ব্যবসা ধ্বংস হইবার উপক্রম এবং লন্ডনের যত জাহাজ ব্যবসায়ীদের পরিবারবর্গ না খাইয়া মরিবে"।[13] বোর্ড অফ ডাইরেক্টর ও কোম্পানীর

13. আত্মচরিত, পৃ—২৭১

মালিকদের চিৎকার ও প্রতিবাদে ওয়েলেসলির নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হলো। ব্রিটিশ একচেটিয়া ব্যবসায়ীরা ভারতীয় ব্যবসায়ীদের গলা টিপে ধরে অপমৃত্যু ঘটাতে লাগল।

শ্বাসরোধে মৃত্যুর কুচক্রান্ত

ভারতীয় জাহাজ কোম্পানীগুলির গলা টিপে হত্যা করার অপকৌশল ও কুচক্রান্তে নেমে পড়ল ব্রিটিশ সরকার, একচেটিয়ালোভী ব্রিটিশ জাহাজ কোম্পানীগুলি, শ্বেতকায় আমলা ও লালমুখো জনতা পর্যন্ত। সরকার ব্রিটিশ জাহাজ কোম্পানীগুলিকে আয়কর দায় থেকে মুক্তি দিয়ে আরো বহু সুবিধা প্রদান করল। যে-সব বাণিজ্যিক সুবিধা ছিল তার সিংহভাগ বিদেশী কোম্পানীগুলি লাভ করল ঃ দু-কোটি দশ লক্ষ পাউন্ডের ফাণ্ড থেকে বিদেশী কোম্পানীগুলি পেল $22^1/_4$ লক্ষ পাউন্ড, কিন্তু ভারতের একটি জাহাজ কোম্পানীও $2^1/_2$ লক্ষ পাউন্ড পেল না। East Bengal River Steamer Service Limited -এর প্রতিনিধিরূপে ভাগ্যকূলের যোগেন্দ্রনাথ রায়ের সাক্ষ্য থেকে জানা যায়, ভারতীয় জাহাজে আনীত মাল ইউরোপীয় কোম্পানীগুলি গ্রহণ করতে অস্বীকার করল। পাটকলের মালিক ও কোম্পানীগুলির যৌথ চক্রান্তে এভাবে EBRSSL পিছু হটতে থাকল। অতুল ধনশালী বিদেশী কোম্পানীগুলি অন্যায়ভাবে মালের ভাড়া হ্রাস করে প্রয়োজনের বেশী জাহাজ চালাত লাগল। এই প্রতিযাগিতায় স্বদেশী কোম্পানীগুলির আত্মরক্ষা করা কঠিন হতে হতে অনেকের মৃত্যু হলো। Bangal Burma Steam Navigation Co. 14 টাকার পরিবর্তে 4 টাকা ভাড়ায় চালাতে না পেরে উঠে গেল। এভাবে সিন্ধিয়া স্টীম নেভিগেশন কোম্পানী কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হলো। কুড়িটির অধিক কোম্পানী দশ কোটি টাকা মূলধন নিয়ে উপকূলে ব্যবসা করার চেষ্টা করেও মান্টিমিলিওনিয়ার কোম্পানীর চক্রান্তের শিকার হলো। ব্রিটিশ শাসকরা কিরূপ নির্লজ্জও নগ্নতা অবলম্বন করে শোষণের দূরপনের কলঙ্ক স্থাপন করছিল, তা 1789 সালের 14 ই জানুয়ারীর কলকাতা গেজেটের বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশিত ঃ

"এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি করা যাইতেছে যে কোন ব্যক্তি (জেলা ম্যাজিস্ট্রেটগণ-ব্যতীত) নিম্নলিখিতরূপ আকার ও আয়তনের বোটগুলি আগামী ১লা মার্চের পর তৈরী করিতে বা ব্যবহার করিতে পারিবে না।

'লুখা' (Luckha)—৪০-৫০ হাত লম্বা ও ২$^১/_২$ - ৪ হাত চওড়া,

'জেল্‌কিয়া' (Zelkia)—৩০-৭০ হাত লম্বা ও ৩$^১/_২$ - ৫ হাত চওড়া।

চাঁদপুরের 'পঞ্চওয়েস' যাহাতে দশ দাঁড়ের বেশী আছে

"যশোহর, ঢাকা, জালালপুর, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, ২৪ পরগণা, হিজলী, তমলুক, বর্ধমান ও নদীয়ার ম্যাজিস্ট্রেটগণকে আদেশ দেওয়া হইয়াছে যে, ১লা মার্চের পর তাঁহাদের এলাকার মধ্যে পূর্ববর্ণিত রূপ যে সমস্ত বোট তাঁহারা দেখিত পাইবেন, সেগুলি দখল ও বাজেয়াপ্ত করিবেন। যদি কোন জমিদার তাঁহার এলাকার মধ্যে

পূর্ববর্ণিত রূপ কোন বোট তৈরি করতে বা মেরামত করিতে দেন (জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ব্যতীত), তবে তাহা গবর্ণমেন্ট বাজেয়াপ্ত করিতে পারিবেন। যদি কোন সূত্রধর, কর্মকার বা অন্য কোন প্রকার শিল্পী এইরূপ বোট নির্মাণ বা মেরামত কার্যে নিযুক্ত থাকে (জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ব্যতীত), তবে তাহাকে একমাস পর্যন্ত ফৌজদারী জেলে অবরুদ্ধ করা হইবে অথবা ২০ ঘা পর্যন্ত বেত্র দণ্ড দেওয়া যাইতে পারিবে।"[14]

আচার্যদেবের প্রয়াস

স্বদেশী আন্দোলনের সময় এই হৃদগৌরব পুনরুদ্ধারে প্রয়াস দেখা যায়। কার ঠাকুর কোম্পানী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বদেশী স্টীমার চালানো তার দু-একটি উদাহরণ। আচার্যদেব এই উদ্যোগ ও প্রয়াসে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করছিলেন। তিনি একটি দেশীয় স্টীম নেভিগেশন কোম্পানীর অন্যতম ডাইরেক্টর ছিলেন। কপোতাক্ষ নদের ঝিকরগাছা থেকে যাত্রী চলাচল করত। এই স্টীমারের ভাড়া ছিল মাত্র এক টাকা। কিন্তু প্রতিযোগিতায় নামল এক ব্রিটিশ কোম্পানী। তারা ভাড়া ধার্য করল মাত্র এক আনা (16 আনা = 1 টাকা)। আচার্যদেবের ন্যায় দু-তিন জন স্বদেশী শিল্পানুরাগী ডাইরেক্টর থাকার দরুণ বাইশ বছরে দু-লক্ষ টাকা লোকসান হলো।

দেশের শিল্প, বাণিজ্য, অর্থনীতিকে ধ্বংস করার মূলে এদেশের চাকরবাবু ও দাসমনোবৃত্তির অধিকারী লোকের অভাব ছিল না। ইয়ং বেঙ্গল ছিল, ইয়ং পাঞ্জাব ছিল যারা গো মাংস ভোজন ও মদ্যপানে দেশীয় সব-কিছুকেই তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিত। অনেকে বিলেতে গিয়ে লেজ গজিয়ে এসে হুঁপহাঁফ করে লঙ্কাকাণ্ড বাধাত। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা বর্ণিত একটি ঘটনা স্মরণ করা যেতে পারে।

আচার্যদেব সপ্তমবার বিলেত যাচ্ছেন সিন্ধিয়া স্টীম নেভিগেশন কোম্পানীর *Loyalty* নামক জাহাজে। ওই জাহাজে জীবরাজ মেহতা, নির্মলকুমার সিদ্ধান্ত, বিরজাশঙ্কর গুহ প্রমুখও ছিলেন। বাংলা ও পাঞ্জাবের কিছু ছাত্রও পড়তে যাচ্ছিল বিলেতে। এডেনে পৌঁছাবার মুখে আমাদের দেশের সোনার ছেলেরা একটি অভিযোগ পত্র নিয়ে আচার্যদেবের কাছে হাজির হলো। অভিযোগ ছিল ঃ খাবারদাবার খারাপ, কেবিন অপরিষ্কার, যাত্রীদের যত্নের প্রতি কোম্পানীর অনীহা। সুতরাং কোম্পানীকে জাহাজ চালাতে দেওয়া যায় না। অনেক তর্কবিতর্কের পর জানা গেল, কোন এক ইউরোপীয় যাত্রীর 'কুপরামর্শে' চালিত হয়ে তারা এই 'সুকম্মটি' করেছে।

স্বাধীনতার পর এই শিল্পের প্রতি সরকারী নজর আসে. এবং তৃতীয় পরিকল্পনায় 1·2 লক্ষ টন মাল পরিবহনের পরিকল্পনা গৃহীত হয়। এখানে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, যোগেন্দ্রনাথ রায়, বালচাঁদ হীরাচাঁদ, ভি. জে. প্যাটেল প্রমুখের কৃতী অবশ্যই স্মরণযোগ্য।

14. আত্মচরিত, পৃ—২৭৮

ইনসিওরেন্স—জীবনবীমা

1930 সাল নাগাদ ভারতে অনেকগুলি বীমা কোম্পানী ছিল। তার মধ্য একুশটি দেশীয় কোম্পানী ছিল। এই একুশটির মধ্য খাঁটি বাঙালী কোম্পানী ছিল মাত্র তিনটি। বিদেশী কোম্পানীগুলি বছরে পাঁচ কোটি টাকার প্রিমিয়াম আদায় করে দেশের উন্নতির জন্য বিনিয়োগ করে রেলওয়ে, ইলেকট্রিক কোম্পানী, গ্যাস কোম্পানী, লোহা ও ইস্পাত কোম্পানী, কয়লা ব্যবসায়, জাহাজের ব্যবসায়, টেলিগ্রাফ ইত্যাদিতে। ব্রিটেনে বহু জাতিগঠনমূলক কাজে বীমা কোম্পানীর ফান্ডের টাকা এইভাবে খাটে ; আমাদের দেশের টাকা এভাবে প্রতি বছর ড্রেইন হয়ে যায়। অনেক দেশেই বিদেশী বীমা কোম্পানীর ওপর নানা বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়, কিন্তু ভারতে তেমন কোন বিধি-নিষেধ ছিল না। তার ওপর দেশী কোম্পানীগুলির অধিকাংশই ছিল বোম্বাই-এর। অথচ মোট প্রিমিয়ামের টাকার অধিকাংশই এই বাংলা দেশ থেকেই গৃহীত হতো। পলাশী শোষণের হাত থেকে রেহাই পাবার চেতনতার ফলে বাঙালী বীমা-প্রবণ ছিল। স্বদেশী আন্দোলনের ফলে ভারতীয় বীমা কোম্পানীগুলির বিশেষ সুবিধা হওয়ায় বাঙালীর টাকা বিদেশী ও বোম্বাই মিল ড্রেইন করতে শুরু করল। বাঙালীর এই দুরবস্থা ও দুর্দশার কথা চিন্তা করেই প্রফুল্লচন্দ্র বীমা ব্যবসায়ে বাঙালীর উৎসাহ-দাতা ও পৃষ্ঠপোষক হয়ে পড়েন। তাই যখন রায়বাহাদুর এ. সি. ব্যানার্জি, আই. বি. সেন, সুরেশচন্দ্র রায় ও জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী নতুন বীমা কোম্পানী প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন, তখন ওই প্রতিষ্ঠানে যোগদান করতে আচার্য ক্ষণকালের জন্য দ্বিধা করেননি। এই সম্পর্কে জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলীর ভাষায় বিবরণটি প্রকাশ করা যাক ঃ "It was conviction that it would be both good as a business proposition as well as a kind of social service for our people that make him accept the first presidentship of the new company. He had before this taken some interest—though not much—in the insurance business, writing occasionally articles for the *Insurance World.* I remember still the glow of interest in his eyes when he found that in other countries ravages of nature were also being covered by insurance."[15] এইভাবে আর্যস্থান ইনসিওরেন্স কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হলো।

সংসারের উপার্জনসক্ষম ব্যক্তির মৃত্যুতে বিধবা ও অনাথ শিশুদের দুর্দশা ; ছাপোষা বাঙালীর কর্মজীবনের শেষে সহায়-সম্বলহীনতা ও দুর্দিনের সহায় হওয়ার উপায় হিসাবে বীমার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেই 'আর্যস্থান'-এর প্রথম সভাপতি হলেন আচার্যদেব। স্বাধীনতার পর বীমা কোম্পানী ন্যাশনালাইজ হয়েছে, খুবই সুখের কথা। কিন্তু বর্তমানে যেভাবে ঢালাও গ্লোবালাইজেশন চলছে, এবং বীমা কোম্পনীকে প্রাইভেটাইজেশন করার চক্রান্ত চলছে, বিদেশী কোম্পানী অনুপ্রবেশের ছাড়পত্র দেওয়া হচ্ছে, তাতে আবার দেশের আর্থিক কাঠামো তাসের ঘরের মত ধসে পড়বে বলে সন্দেহ করার বহু বহু কারণ আছে।

15. Acharya Prafulla Chandra Ray, C.U., P 165

চক্রবর্তী, চ্যাটার্জী কোম্পানী

আচার্যদেব চাইতেন না তাঁর ছাত্ররা শিক্ষকতা বা অন্য কোন সরকারী চাকরীতে যোগদান করুক। শিল্প প্রতিষ্ঠা বা ব্যবসা-বাণিজ্যের মধ্যেই যে দেশের আর্থিক উন্নতি নিহিত, তা তিনি শতস্থানে সহস্রবার বলেছেন। 1910 সালে যাঁরা রসায়নে এম. এস-সি পাশ করলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন রমেশচন্দ্র চক্রবর্তী, মুকুন্দলাল চক্রবর্তী ও অহীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী। এঁদের উজ্জ্বল সহপাঠী ছিলেন, হেমেন্দ্রকুমার সেন, বিমানবিহারী দে, প্রিয়দারঞ্জন রায় প্রমুখ। আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, ছাত্রাবস্থায় প্রফুল্লচন্দ্র পুস্তক ব্যবসায়ী হবার ইচ্ছা পোষণ করতেন। কিন্তু বাস্তবে প্রফুল্লচন্দ্রের পক্ষে তা সম্ভব হয়নি। অথচ এই ইচ্ছা সর্বদাই সুপ্ত অবস্থায় ছিল। তাঁর ইচ্ছা পূরণে এগিয়ে এলেন দুই চক্রবর্তী—রমেশচন্দ্র ও মুকুন্দলাল, এবং এক চ্যাটার্জী—অহীন্দ্রনাথ। গুরুর উপদেশ ও পরামর্শক্রমে তাঁরা পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতারূপে কর্মে অবতীর্ণ হলেন। প্রতিষ্ঠিত হলো চক্রবর্তী, চ্যাটার্জী কোং। প্রকাশনা জগতে এখনো মর্যাদাসূচক নাম।

এই প্রকাশনা থেকে আচার্যদেবের অনেক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। *Life and Experiences of a Bengali Chemist*—আত্মচরিত গ্রন্থটি এখান থেকেই 1937 সালে প্রকাশিত হয়। তা ছাড়া দেশী রং (1922), মিথ্যার সহিত আপোষ ও শক্তিক্রয় (1925), খাদ্যবিজ্ঞান (1936), আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের প্রবন্ধ ও বক্তৃতাবলী, ১ম খণ্ড, 1938, ২য় খণ্ড, 1941, *Makers of Modern Chemistry,* (1925) ইত্যাদির প্রকাশকও চ্যাটার্জী, চক্রবর্তী কোং।

এই প্রকাশনার রমেশচন্দ্র চক্রবর্তী ছিলেন খুবই ধর্মপরায়ণ। এক সময় তিনি সব-কিছু ছেড়ে আসক্তিহীন জীবনযাপন করতে থাকেন। কিন্তু প্রকাশনার স্বার্থে আবার তাঁকে ফিরে এসে হাল ধরতে হয়। আচার্যদেব সর্বদাই তাঁর পরামর্শ ও সাহায্যের হস্ত প্রসারিত করে রেখেছিলেন, এবং প্রায়শ প্রকাশনালয়ে এসে সুবিধা-অসুবিধা ইত্যাদি বিষয়ে খোঁজ-খবর নিতেন।

আচার্যদেবের বহু গ্রন্থ এখন আর বাজারে পাওয়া যায় না। তাঁর আশীর্বাদ ও স্নেহধন্য এই প্রকাশনা কি মূল্যবান কিছু গ্রন্থ প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারেনা? আমাদের মনে হয়, এই উদ্যোগ গ্রহণ করলে তাঁরা আপামর জনসাধারণের অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হবেন।

ভারতী স্কেলস অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং কোং

আলামোহন দাস কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এই কোম্পানীর প্রতি ছিল প্রফুল্লচন্দ্রের সপ্রশংস প্রেরণা। প্রফুল্লচন্দ্র 'প্রবাসী' পত্রিকায় (38) 'শিল্প ব্যবসায়ে বাঙ্গালীর কৃতিত্ব' শীর্ষক প্রবন্ধে আলামোহন দাস সম্বন্ধে আলোচনা করেন। এই সংস্থায় Weighing machine তৈরী হতো যা তখনকার দিনে বিদেশীদের এক চেটিয়া ব্যবস্থা ছিল। এই কারখানার বিকাশ, উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির মূলে আচার্যদেবের প্রেরণা ও প্রচার প্রভূত পরিমাণ সাহায্য করেছিল। পরবর্তীকালে কারখানাটি নানা দিকে সম্প্রসারিত হয়। হাওড়ায় দাসনগরে কারখানা এখনো আচার্য-আর্শীবাদ প্রাপ্ত হয়ে সগৌরবে বিদ্যমান।

ন্যাশনাল ট্যানারি ওয়ার্কস

ইতিপূর্বে আমরা ডাঃ নীলরতন সরকারের নাম উল্লেখ করেছি। ডাঃ সরকার ছিলেন দেহহিতৈষী ও স্বদেশী ভাবনায় পরিপূর্ণ। প্রফুল্লচন্দ্রের আয়ুর্বেদিক ওষুধ প্রচলনে যেমন তাঁর বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল, তেমনি আবার শিল্প বাণিজ্যের প্রসারেও তাঁর মহৎ প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। 'ন্যাশনাল ট্যানারি ওয়ার্কস' প্রতিষ্ঠা করে তিনি নানা বাধা-বিঘ্নের সম্মুখীন হলে সর্বদাই তাঁর অকৃত্রিম সুহৃদ প্রফুল্লচন্দ্রের পরামর্শ গ্রহণ করতেন। নানা শিল্পোদ্যোগে তিনি প্রভূত পরিমাণ অর্থ ব্যয় করেন। মৃত্যুকালে তিনি শোচনীয় আর্থিক অনটনের সম্মুখীন হন। অথচ সেই সময়ে ডাক্তার হিসাবে তাঁর এমন খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ছিল যে, ডাক্তারীতে তিনি প্রভূত পরিমাণ অর্থ উপার্জন করতে পারতেন। কিন্তু দেশ ও জাতির উন্নতি ভাবনায় নিজেকে উৎসর্গ করে মহৎপ্রাণের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেলেন। নীলতরন সরকার মেডিক্যাল কলেজ তাঁর নাম বহন করে গৌরবান্বিত হয়েছে সত্য, কিন্তু এখান থেকে পাশ করা ডাক্তারগণ কি তাঁর প্রতি যোগ্য মর্যাদা ও সম্মান প্রদর্শন করতে পারছেন!

সাবান শিল্প

ইংরেজ বণিক, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি ও সরকারের বণিক বৃত্তি ও আর্থিক শোষণের বিভিন্ন দিকগুলি আচার্যদেবের ঈগল চক্ষু এড়িয়ে যেতে পারেনি। আত্মচরিতের পাতায় পাতায় কত তত্ত্ব ও তথ্য যে উপস্থাপিত হয়েছে, তা অনুধাবন করলে বিস্মিত হতে হয়। ইংরেজ শাসনকালে ভারতের আর্থিক মেরুদণ্ড ভেঙে চুরমার করে দেবার সর্ববিধ প্রচেষ্টাকে রোধ করে দেশের আত্মবিশ্বাস ও আত্মশক্তি অর্জনে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র অহোরাত্র চিন্তা-ভাবনায় নিমগ্ন ছিলেন। তারই ফলস্বরূপ বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠা, ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণে তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা, আনুকূল্য ও আন্তরিক প্রচেষ্টা ও সক্রিয় ভূমিকা দেখা যায়। তেমনই আর এক আগ্রহ ও প্রচেষ্টা হলো সাবান তৈরী।

সাবান আমাদের দেশে ছিল না। ঢাকায় এক ধরনের গোলা সাবান তৈরী হতো। প্রফুল্লচন্দ্র বলেন, খুব সম্ভব পোর্তুগীজদের কাছ থেকে লোকে সাবান তৈরী শেখে। তবে কাপড় কাচার জন্য সাজিমাটির ব্যবহার ছিল; আর দরিদ্র জনসাধারণ কলাপাতা পুড়িয়ে চুন মিশিয়ে গরম জলে সিদ্ধ করে কাপড় কাচত। আসলে, সাবান তৈরীর কাঁচামাল এদেশে প্রস্তুত হতো না। কস্টিক সোডা (NaOH) বিদেশ থেকে আমদানী করতে হতো। তাই যখন 1931 সালে বেঙ্গল কেমিক্যাল সাবান তৈরীর ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলো, তখন কাঁচামালের অভাব তীব্রভাবে অনুভূত হতে থাকল। তখন আচার্যদেব অধ্যাপক পি. এন. ঘোষকে তড়িৎ বিশ্লেষণ পদ্ধতির সাহায্যে কষ্টিক সোডা তৈরী সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে বললেন। ফলে, বেঙ্গল কেমিক্যালে কষ্টিক সোডা প্রস্তুতির সেল (cell) প্রতিষ্ঠিত হলো। কিন্তু ডায়াফ্রাম (diaphragm) ও তড়িৎদ্বার (electrode) সম্পর্কীয় অসুবিধার জন্য উৎপাদন খুবই সীমিত হলো। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় আমদানী ব্যাহত হলো, অবশ্য যুদ্ধের শেষের দিকে ভারতের জন্য

আমেরিকা থেকে চারটি কস্টিক সোডা ইউনিট নিশ্চিত করা হলো; টাটা সোডা অ্যাশ (Soda ash) উৎপাদন আরম্ভ করল, এবং হুগলীর রিষড়ায় কেমিক্যাল কর্পোরেশন কস্টিক সোডা ইউনিট স্থাপন করল। দেশের সার্বিক চাহিদা মেটাতে সমর্থ না হলেও সোডা অ্যাশ ও কষ্টিক সোডা উৎপাদিত হতে থাকল। আচার্যদেব এসব দেখে যেতে পারেননি, কিন্তু তাঁর অন্তর্দৃষ্টির সফল রূপায়ণ প্রাসাদ থেকে কুটীরে ঘোষিত হচ্ছে।

আমরা এতক্ষণ যে অল্প কয়েকটি শিল্প, বাণিজ্য ও ব্যবসায়ের উল্লেখ করেছি, তার মধ্য দিয়েই আচার্যদেবের দেশের দৈন্য ও দারিদ্র্য মোচনের জাজ্জ্বল্য দেশপ্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর সময়ে সব প্রচেষ্টায় সর্বত্র ছিল প্রতিকূল অবস্থা ও পরিবেশ ঃ "Foreign domination, the vested British interest, and lack of legislative power of his countrymen were handicaps which acted adversely all the time against India."[16]

ভারত স্বাধীন হয়েছে। রাসায়নিক শিল্পের অগ্রগতি ও উন্নতিও হয়েছে। শিল্প সুরক্ষার বিধি ও আইনও হয়েছে। প্ল্যানিং কমিশন স্থাপিত হয়েছে; আচার্যদেবের ছাত্র জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ সদস্য হয়েছিলেন। বড় বড় বাঁধ নির্মিত হয়েছে, তড়িৎশক্তি উৎপন্ন হয়েছে, সার কারখানাও গড়ে উঠেছে। বিদেশী সহযোগিতায় রাসায়নিক শিল্পও প্রতিষ্ঠা হয়েছে। কিন্তু সম্প্রতি যে বিশ্বায়নের ঝোড়ো হাওয়া বইতে শুরু হয়েছে এবং সরকারী ক্ষেত্রে যে 'দ্বার খুলে দাও দ্বার খুলে দাও' প্রবণতা চলছে, তাতে পুঁজিবাদের কুচক্র থেকে ভারত নিজেকে মুক্ত রাখতে পারবে কিনা, এ-বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। হাজারে হাজারে রুগ্ন শিল্প ও শিল্প বন্ধের চাপে অসংখ্য শ্রমিক বেকার হয়ে পড়ছে; PSUগুলি একের পর এক প্রাইভেটাইজেশন হচ্ছে; ব্যাঙ্ক, জীবনবীমা, বিমান পরিবহন, বিদ্যুৎ ইত্যাদি সুপরিকল্পিতভাবে বেসরকারীকরণের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। স্ক্যাম, স্ক্যাম, স্ক্যাম! দেশের সাধারণ মানুষের রক্ত ও রস নিঃশোষিত হচ্ছে। শাসকবর্গের মিথ্যাচার ও ধাপ্পাবাজিতে দেশের ভিত চোরাবালীর ওপর দাঁড়িয়ে আছে। দেশের কোন ছবি আজ আমাদের সামনে শোভা পাচ্ছে! IMF, WTO ইত্যাদির অঙ্গুলি হেলনে দেশের বাজেট তৈরী হচ্ছে। নিম, বাসমতী ইত্যাদি পেটেন্ট আইনের কবলে কব্জা হয়ে বিদেশী পণ্য বলে পরিগণিত হওয়ার অপেক্ষায় আছে। আর যাই হোক, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র এই ভারতের স্বপ্ন দেখেননি। দেশের স্বনির্ভরতা, দেশের সার্বিক উন্নতির জন্য তাঁর চিন্তা ভাবনার বহুলাংশ এখনো প্রাসঙ্গিক। অতীব পরিতাপের বিষয়, তাঁর উত্তরসূরীদের অধিকাংশই কেরিয়ার গোছানোয় ব্যস্ত হয়ে দেশ ও জাতিকে বিস্মৃত হয়ে অপরাধীর তালিকা বৃদ্ধি করেছেন।

16. Acharya Prafulla Chandra Ray, C.U., P 82

অষ্টম অধ্যায়

সেবাকার্য ও জনহিতকর কার্যাবলী

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সমগ্র জীবনই বহুজনহিতায় উৎসর্গীকৃত। কি বিজ্ঞান, কি শিল্পগঠন ক্ষেত্র, কি সমাজসেবা ও জনহিতকর কার্যাবলী সর্বত্রই তাঁর মূলমন্ত্র ও প্রেরণার উৎস হলো দেশসেবা। দেশসেবা ব্যতীত তাঁর জীবনের অন্য কোন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল না। 1921 সালে গান্ধীজীর নেতৃত্বে সারা দেশে অসহযোগ আন্দোলনের ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে; চিত্তরঞ্জন ব্যারিস্টারী ছেড়ে আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করে গ্রেপ্তার হয়ে দন্ডিত হন। এই সময় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র চিত্তরঞ্জনের সহধর্মিণী বাসন্তী দেবীকে একটি পত্র লেখেন; তার অংশ বিশেষ হলো : "... প্রিয় ভগিনী, আমি আপনাকে নিশ্চিতরূপে বলিতে পারি যে, যখন আমি বিজ্ঞান চর্চা করি, তখন বিজ্ঞানের মধ্য দিয়া দেশকেই সেবা করি। ... আমার জীবনের অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই।"[1] রতনমণি চট্টোপাধ্যায় আচার্যদেবের বিভিন্ন কার্যাবলীকে যথার্থই 'সূত্রে মণিগণা ইব' বলে অভিহিত করেছেন।[2] সূত্রে মণি গেঁথে গেঁথে যেমন মাল্যরচনা করা হয়, তেমনি দেশসেবারূপ সূত্রে আচার্যদেবের বসুধাবিস্তৃত কার্যসমূহ গ্রন্থিত হয়ে মণিপ্রভায় দশ দিক উদ্ভাসিত করে রেখেছে। তাঁর অসামান্য ও অনন্য জীবনবেদ রচনায় প্রতিটি মণির গুরুত্ব ও তাৎপর্য সীমাহীন, কিন্তু এ-সব একত্রে গ্রন্থিত করে সার্বিক আলোচনা অতীব দুষ্কর—প্রায় অসম্ভব বলেই মনে হয়। সে-কারণে এই অধ্যায়ে আমরা কয়েকটি মাত্র বিষয়ের ওপর আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব।

সুন্দরবন অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ

ইতিপূর্বে আমরা আচার্যদেবের 1921 সালে চতুর্থবার বিলাতযাত্রার বিবরণ দিয়েছি। বিলাত থেকে ফিরে এসে দুর্ভিক্ষের সংবাদ পেলেন বটে, কিন্তু তখন প্রকৃত অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারেননি। প্রতি বছর গ্রীষ্মের ছুটির সময় যেমন তিনি রাড়ুলি যেতেন, তেমনি গ্রামে গিয়ে নিজের চোখে দেখে তিনি দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতা উপলব্ধি করলেন। দুর্ভিক্ষের কারণ ছিল পরপর দু-বছরের অজন্মা। এই ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে সরকার নির্বিকার ;জনসাধারণের 'মা বাপ' ম্যাজিস্ট্রেট অবিচলিত—অন্নকষ্টের হাহাকার তার কর্ণে প্রবেশ করছিল না। সদর অফিস থেকে বিবৃতি প্রচারিত হলো : "প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই অপর্যাপ্ত ফল জন্মে, খাল হইতে ছোট ছোট ছেলেরাও মাছ ধরিতে

1. *আত্মচরিত*, পৃ—১৭৮

2. *আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের চিন্তাধারা*, পৃ—১৮৯

পারে এবং চাহিলেই একরূপ বিনামূল্যে দুধ পাওয়া যায়।"[3] কোন সন্দেহ নেই যে, ওই ম্যাজিস্ট্রেট 'দিব্যজ্ঞান'-এর অধিকারী ছিলেন। তা না হলে সুন্দরবন অঞ্চলের নোনা মাটিতে ফলের গাছ ও ফল দেখলেন কি করে! গ্রীষ্মকালে লাটেরা তখন শৈলাবাসে ; সেখানে সরকারী বিবরণ পৌছানো চাই। সংবাদ সংগৃহীত হয় সরকারী কায়দায় : চৌকিদার—>পঞ্চায়েত—>দারোগা—>জেলাম্যাজিস্ট্রেট—>কমিশনার—>সেক্রেটারিয়েট—> লাট-বেলাট। নিম্নপদস্থ কর্মচারীরা সবাই জানে কেমন রিপোর্ট দিলে সরকারের সন্তুটি অর্জন করে প্রমোশন পাওয়া যায়, আর রিপোর্টও হতো তদনুরূপ। আচার্য তখন বিশ্বাস করতেন যে, স্বাধীন দেশ হলে খুলনার তৎকালীন ম্যাজিস্ট্রেটের কঠিন শাস্তি হতো। কিন্তু তা আমরা এই স্বাধীন দেশে দেখতে পাচ্ছিনা। ব্যুরোক্রাটদের কঠিন শাস্তি কেবল বদলি—এ-দপ্তর থেকে সে-দপ্তর।

দুর্ভিক্ষের ন্যায় অভিশাপ মোচনে, বন্যার ন্যায় প্রাকৃতিক দুর্বিপাকে যে সরকার যথাযথ গুরুত্বের সঙ্গে এগিয়ে এসে সাহায্যের হস্ত প্রসারিত করবে না বিদেশী শাসন ও শোষণের এই চরিত্র বুঝতে প্রফুল্লচন্দ্রের কখনো বিলম্ব হয়নি। তাই বন্ধুবান্ধবদের অনুরোধে দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত মানুষদের সহায়তার ভার তিনি নিজের স্কন্ধেই তুলে নিলেন। 'খুলনা রিলিফ কমিটি' গঠিত হলো। তাঁর আবেদনে সর্বত্র সাড়া পড়ে গেল ; দুর্ভিক্ষ মোচনের জন্য অর্থ সংগৃহীত হলো। স্বেচ্ছাসেবক দল অক্লান্ত পরিশ্রম করে মানুষের দুর্দশা মোচনে এগিয়ে এল। তাঁর সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনায় দুঃস্থ নিরন্ন নরনারী দু-মুঠো অন্ন পেয়ে অকাল মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পেল। বেশ কয়েক মাস ধরে এই সেবাকার্য চলতে থাকল। বরিশাল, ফরিদপুরের সেবাদলের সহিত খুলনার নগেন্দ্রনাথ সেন, জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ এবং কুঞ্জলাল ঘোষ দুর্ভিক্ষ ত্রাণে নিজেদের উৎসর্গ করে দেশসেবার অনন্য নজীর সৃষ্টি করলেন। আচার্যদেব কঠিন কল্যাণব্রত উদ্‌যাপন করলেন।

উত্তর বঙ্গে বন্যা,—1922 সাল

খুলনা জেলার সুন্দরবন অঞ্চলের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের রেশ মিটতে না মিটতেই 1922 সালে 22শে সেপ্টেম্বর থেকে অবিরাম প্রবল বৃষ্টির ফলে আত্রাই নদী দুকূল ছাপিয়ে ও বাঁধ ভেঙে সর্বনাশা বন্যার সৃষ্টি করল। বগুড়া, পাবনা ও রাজশাহী এই তিনটি জেলা বন্যার প্রকোপে বিধ্বস্ত হলো। কিন্তু যথারীতি সরকারের কোন সাড়া নেই। 'ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান'-এ বন্যা বিধ্বস্ত অঞ্চল থেকে প্রেরিত পত্রে লেখা হলো : "এই বিপত্তি যখন ঘটে, তখন গভর্ণমেন্টের সদস্যগণ বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চল হইতে বহুদূরে দার্জিলিঙের শৈলশিখরে ছিলেন। তাঁহারা এখনও সেখানে আছেন। এই বিপত্তির যে প্রাথমিক সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল, তাহাতে বোধ হয়, তাঁহারা অবস্থার গুরুত্ব বুঝিতে পারে নাই। দুর্দশার প্রতিকারকল্পে কোনরূপ কার্যকরী পন্থা অবলম্বন করিতে তাঁহাদের বিলম্ব হইয়া গেল। যেটুকু তাঁহারা করিলেন তাহাও যথেষ্ট নহে, এবং

3. *আত্মচরিত*, পৃ—১৭৯

লোকমতের চাপে অত্যন্ত অনিচ্ছার সঙ্গেই যেন সেটুকু তাঁহাদের করিতে হইল।"[4] শ্বেতকায়রা কখনোই কোন বিষয়ের গুরুত্ব বুঝতে চায়নি—তৎকালীন ইংরেজ সরকারই হোক, আর বর্তমানের ইউরোপ ও আমেরিকার সরকারই হোক। ভারতের কাশ্মীর সীমান্তে প্রায় দশ-বারো বছর ধরে পাকিস্তানের মদতে সন্ত্রাসবাদ চলে আসছে। ভারত বার বার এই সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বজনমতের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করে আসছে। কিন্তু কি ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহ, কি প্রবল শক্তিশালী রাষ্ট্র আমেরিকা এই সর্বনাশা সমস্যার প্রতি কোন দৃষ্টি দেয়নি। কিন্তু যখন খোদ আমেরিকা গত 11 ই সেপ্টেম্বর, 2001 সালে সন্ত্রাসবাদের শিকার হলো, তখন তাদের দাদে জল লাগল—সন্ত্রাসবাদের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারল। সাম্রাজ্যবাদী ও পুঁজিবাদী শক্তিগুলির চরিত্র ও প্রকৃতি একই রকম আছে, কোন পরিবর্তন হয়নি।

যাই হোক, এই বিধ্বংসী বন্যার সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল এক অদ্ভুত উপায়ে। 25 শে সেপ্টেম্বর তারিখের দার্জিলিং মেল পরের দিন এসে পৌঁছল পার্বতীপুরে। কিন্তু ট্রেন আর অগ্রসর হলো না। দক্ষিণ দিকে তখন রেললাইন জলমগ্ন, এবং আক্কেলপুরের কাছে লাইন গেছে ভেঙে। চার দিন ধরে যাত্রীরা আটকে গেল। তারপর অন্য রাস্তা দিয়ে তারা কলকাতায় এসে পৌঁছল। ওই যাত্রীদের মধ্যে ছিলেন The Statesman-এর একজন সম্পাদক। তাঁর কলম ঝলসে উঠল : মর্মস্পর্শী ভাষায় ফটোগ্রাফসহ বিধ্বংসী বন্যার খবর প্রকাশিত হলো। খবর এলো আরো একটি সূত্র থেকে। সুভাষচন্দ্র ছুটলেন বন্যার অবস্থা পরিদর্শন করতে। তিনি টেলিগ্রাম করলেন আচার্যদেবকে, কংগ্রেস অফিসে ও বঙ্গীয় যুব সঙ্ঘের অফিসে। বন্যার ভয়াল রূপ ও ক্ষয়ক্ষতি সম্বন্ধে 15 ই অক্টোবর 1922 সালের The Statesman-এ যে সংবাদ প্রকাশিত হয় তার অংশবিশেষ : "বন্যার ফলে লোকের যে সম্পত্তি নাশ হইয়াছে, যে ক্ষতি হইয়াছে, গভর্নমেন্টের হিসাবে তাহার পরিমাণ খুবই কম ধরা হইয়াছে। সরকারী স্বাস্থ্য বিভাগের সহকারী ডিরেক্টরের হিসাবে বগুড়া জেলার ক্ষতির পরিমাণ এক কোটি টাকার উপরে। তালোরা গ্রামে প্রায় 200 শত বাড়ীর মধ্যে সাতখানি মাত্র চালাঘর অবশিষ্ট আছে।

"নওগাঁ মহকুমার অবস্থা পরিদর্শন করিবার ফলে আমি বলিতে পারি,—সরকারী হিসাবে যাহা বলা হইয়াছে, গো-মহিষাদি পশু ও অন্যান্য সম্পত্তি নাশের দরুন ক্ষতির পরিমাণ তদপেক্ষা অনেক বেশী। নওগাঁ মহকুমার লোকসংখ্যা প্রায় পাঁচ লক্ষ এবং এই মহকুমার এলাকায় প্রায় ৬০ হাজার গৃহ ধ্বংস হইয়াছে।"[5]

বন্যার কারণ

গঙ্গার ব-দ্বীপ অঞ্চলে অবস্থিত বঙ্গদেশ নদ-নদী-খাল-বিলে পরিপূর্ণ। মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে কখনো কখনো প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে বন্যা বঙ্গে নতুন নয় ; আবার নিম্নচাপের অত্যাচারও রয়েছে। কিন্তু এ-সবের ফলে বন্যা ভয়াল আকার ধারণ করে

4. *আত্মচরিত*, পৃ—১৮৫
5. *আত্মচরিত*, পৃ—১৮৩

না। কারণ, বন্যার জল পরিবহনের উপায়গুলি কম নয়। বস্তুতপক্ষে, প্রবল বর্ষার ফলে বন্যার জল স্থায়ী হয়না, নদ-নদী-খাল ইত্যাদি দিয়ে অচিরে সমুদ্রগর্ভে নেমে যায়। কিন্তু যত অনিষ্ট ও সর্বনাশের মূল হয় মনুষ্যসৃষ্ট বন্যা। এই লেখকের 1978 সালে মনুষ্যসৃষ্ট ভয়াবহ বন্যার অভিজ্ঞতা রয়েছে যখন তিলজলা ব্যারেজের একপাশ ভেঙে উত্তাল সমুদ্ররূপী বন্যা বর্ধমান, হুগলী, হাওড়া ও মেদিনীপুর প্লাবিত করে শষ্যের ক্ষতি ও প্রাণহানি ঘটায়। 1922 সালের আত্রাই বন্যাও যতটা না প্রাকৃতিক কারণে তার চেয়ে অনেক বেশী মনুষ্য কারণে। উত্তরবঙ্গের এই বন্যার জন্য দায়ী সান্তাহার অঞ্চলে আড়াআড়িভাবে নির্মিত রেলের বাঁধ। বন্যা হবার এক বছর আগে গ্রামবাসীরা দ্রুত জল নিকাশের সুবিধার জন্য নব নির্মিত রেলপথের সঙ্কীর্ণ ক্যালভার্টকে চওড়া করে সেতুর মত নির্মাণ করার জন্য সরকারের কাছে দরখাস্ত করে। কিন্তু রেল কোম্পানীর বিদেশী অংশীদারগণের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রেখে সরকার সে আবেদন অগ্রাহ্য করে। ফলে, প্রবল বর্ষায় অপ্রশস্ত ক্যালভার্টে ভালভাবে জলনিকাশ না হওয়ায় এক পাশে সঞ্চিত বিপুল জলরাশির চাপে রেলপথ ভেঙে গিয়ে ওই অঞ্চল বিধ্বস্ত হয়। ইংরেজ শাসকবর্গের চরিত্র ও প্রকৃতি অনুধাবনের জন্য এখানে রেলওয়ে এজেন্ট কর্তৃক জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে লিখিত পত্রটি 'আত্মচরিত', (পৃ—১৮১) থেকে উদ্ধৃত হলো :

" ... আপনার 1921 সালের 25 শে এপ্রিল তারিখের পত্র পাইলাম। উহার সঙ্গে উমিরুদ্দিন জোদ্দার এবং আদমদীঘি ও তন্নিকটবর্তী গ্রামসমূহের অধিবাসিগণের যে দরখাস্ত আপনি পাঠাইয়াছেন, তাহাতে আবেদন করা হইয়াছে যে আদমদীঘি ও নসরতপুর স্টেশনের মধ্যে একটি সেতু নির্মাণ করা হউক। তদুত্তরে আমি জানাইতেছি



সঙ্কট ত্রাণ সমিতিতেপ্রফুল্লচন্দ্র

যে, যথাযোগ্য তদন্তের পর আমরা এই সিদ্ধান্ত করিয়াছি যে, উক্ত স্থানে সেতু নির্মাণের কোন প্রয়োজন নাই।"

অশিক্ষিত গ্রামবাসীরা সেদিন তাদের অভিজ্ঞতা থেকে রেলপথের অদূরদর্শী পরিকল্পনায় ভবিষ্যৎ বন্যার আশঙ্কা করেছিল, এবং তার প্রতিকারের কারণও উল্লেখ করেছিল। কিন্তু স্বার্থান্ধ ব্রিটিশ সরকার গ্রামবাসীদের আবেদনে সাড়া দেয়নি। দেশ স্বাধীন হলো। নানা বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা রচিত হলো, গৃহীত হলো। কিন্তু দামোদর নদীর তান্ডব রোধে যে বাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনা অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা করলেন, তা সম্পূর্ণ গৃহীত হলো না। তাই আজও 1978 সালের মনুষ্যসৃষ্ট ভয়াল বন্যা হয়, এবং প্রায় প্রতি বছরই বর্ধমান, হুগলী, হাওড়া ও মেদিনীপুরের বিস্তৃর্ণ অঞ্চল সমুদ্ররূপ ধারণ করে থাকে।

বন্যা সাহায্য কমিটি

ইন্ডিয়ান আসোসিয়েশন হলে সকল সম্প্রদায়ের মানুষ সমবেত হয়ে বন্যা সাহায্য কমিটি গঠন করে ভবিষ্যৎ কার্যপদ্ধতি গ্রহণ করা হলো। সদ্য খুলনা-দুর্ভিক্ষের ত্রাণ কার্য থেকে প্রত্যাগত আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র সভাপতির ন্যায় গুরু দায়িত্ব বহনে প্রথম সম্মত না হলেও জনগণের ইচ্ছায় ওই পদ গ্রহণ করলেন। বেঙ্গল রিলিফ কমিটি সমবায় ও সহযোগিতার ভিত্তিতে কার্য পরিচালনা করতে থাকল। অসংখ্য সাহায্য কমিটিকে ঐক্যবদ্ধ ও সুনিয়ন্ত্রিতভাবে পরিচালিত করতে থাকল। পরামর্শ ও আলোচনার ভিত্তিতে কার্যের   খলা বিধানের নিমিত্ত কংগ্রেস কমিটি, বি. সি. পি. ডব্লিউ, বেঙ্গল সোসাল সার্ভিস, বঙ্গীয় যুব সঙ্ঘ প্রভৃতি প্রতিনিধি পাঠালেন। সুভাষচন্দ্র, জে. এম. দাশগুপ্ত, যতীন্দ্রনাথ রায়, সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত অসামান্য ভূমিকা পালন করে বিধ্বংসী বন্যার মোকাবিলা করতে থাকলেন। অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র, অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা, বঙ্গবাসী কলেজের নীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী প্রমুখ নিঃস্বার্থ কর্মীরা বন্যা সেবাকার্যকে সফল করে তুললেন।

বিপুল কর্মযজ্ঞ

বিজ্ঞান কলেজের দক্ষিণ দিকের নীচের তলার প্রশস্ত ঘরগুলি বন্যা সাহায্য সমিতির অফিসে পরিণত হলো। সাধারণ কার্যালয়, কোষাগার, দ্রব্য ভান্ডার, অর্থ সাহায্য গ্রহণ করা, প্রচার বিভাগ ও বন্যাপীড়িত অঞ্চলে ত্রাণসামগ্রী পাঠাবার অফিস খোলা হলো। অধ্যাপকগণ ও প্রায় সত্তর জন স্বেচ্ছাসেবক সকাল থেকে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত কাজ করতে থাকলেন। সারা দেশে, এখন কি ফ্রান্স, আমেরিকাতেও সাহায্যের আবেদন পাঠানো হলো। স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে বন্যাপীড়িত অঞ্চলে ছুটতে থাকলেন সুভাষচন্দ্র, সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত, যতীন্দ্রনাথ রায়, ইন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্ত প্রমুখ। শত শত স্বেচ্ছাসেবক বস্ত্র, অর্থ ও চাল নিয়ে বিজ্ঞান কলেজে হাজির হতো। রতনমণি চট্টোপাধ্যায় আচার্যদেবের স্নেহ ও ভালবাসা প্রদর্শন সম্পর্কে লিখেছেন,—"ছেলেরা সকলেই আচার্য রায়ের এক আধটা কিল-চড়ের আদর পেয়ে ধন্য হতো এবং নিজ নিজ স্থানে ফিরে গিয়ে দ্বিগুণ উৎসাহে বন্যার জন্যে সাহায্য সংগ্রহের কার্যে লিপ্ত হতো। সারা

দেশ জুড়ে সে যেন একটা বিরাট সেবা-যজ্ঞের আয়োজন।"[6] বিজ্ঞান কলেজ সেবামন্দিরে পরিণত হলো, তথাপি গবেষণাকার্য যাতে কোনরূপে ব্যাহত না হয়, সেদিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখলেন প্রফুল্লচন্দ্র। এই বিষয়ে "ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান" উল্লেখ করেছে : "একদিন দেখিলাম, বন্যাপীড়িতদের জন্য দেশবাসীর প্রদত্ত যে সব নূতন ও পুরাতন বস্ত্র স্তূপীকৃত হইয়াছে, সেইগুলি তিনি সানন্দে পর্যবেক্ষণ করিতেছেন। স্বেচ্ছাসেবকরা তাঁহার সম্মুখে সেইগুলি গুছাইতেছেন এবং বিভিন্ন সাহায্যকেন্দ্রে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতেছেন। পরদিন দেখিলাম, তিনি দুইজন তরুণ ছাত্রকে রাসায়নিক পরীক্ষায় সাহায্য করিতেছেন—আমার বোধ হইল শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে যথেষ্ট প্রীতির সম্বন্ধ বর্তমান।"[7]

সান্তাহারে বেঙ্গল রিলিফ কমিটির প্রধান কেন্দ্র। অধিকাংশ স্বেচ্ছাসেবীই অসহযোগী ছাত্র ও যুবক। দূরবর্তী গ্রামে নৌকা যোগে, জলকাদা ভেঙে পায়ে হেঁটে উপস্থিত হয়, গ্রামবাসীদের অন্ন, বস্ত্র ও অর্থ সাহায্য দেয়, আর বিধ্বস্ত গৃহ পুনঃনির্মাণ ও গবাদি পশু রক্ষার ব্যবস্থা করে। স্বয়ং আচার্যদেব মাসে অন্তত দু-তিন বার উপস্থিত হয়ে বন্যাকবলিত অঞ্চল পরিদর্শন করতেন।

ত্রাণকার্য সাফল্যের পশ্চাতে

বন্যাত্রাণ কার্যে এরকম অভূতপূর্ব সাফল্যের পশ্চাতে কয়েকটি কারণ লক্ষ করা যায় : (a) সুভাসচন্দ্র, মেঘনাদ সাহা প্রমুখের ন্যায় সংগঠক বিরল বললে অত্যুক্তি হয় না। শৃঙ্খলা ও সমন্বয়ের মাধ্যমে সমগ্র ব্যবস্থাদির রূপায়ণে তাঁদের কর্মক্ষমতার তুলনা মেলা ভার। এঁদের সঙ্গেই ছিলেন সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত, ইন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্ত, যতীন্দ্রনাথ রায়, ডাঃ জে. এম. সেনগুপ্ত, অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র, নীরেন্দ্র চৌধুরী যাঁরা স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে সেবাকার্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। ব্রিটিশ সরকারের বন্যাত্রাণে অবহেলা ও ঔদাসীন্য তাঁদের উদ্বুদ্ধ ও উজ্জীবিত করে দৃষ্টান্ত স্থাপনের প্রেরণা দান করেছিল। (b) 1921 সালে গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। এই আন্দোলনের গতি বিপুল হয় 1921-এর শেষে ও 1922-এর প্রথম দিকে। সারা দেশে যখন অহিংস সংগ্রামের উৎসাহ তুঙ্গে, তখন উত্তর প্রদেশে চৌরীচৌরার ঘটনার জন্য গান্ধীজী হঠাৎ আন্দোলন স্থগিত রাখলেন। এর ফলে দেশবাসীর অস্থির আবেগ স্তব্ধ ও রুদ্ধ হলো। কিন্তু বাংলায় "এই স্তম্ভিত ও রুদ্ধ আবেগ মুক্ত হয়ে গেল বন্যাপীড়িতদের সেবাকার্যের বিপুল বিস্তৃত ক্ষেত্রে।" রাজনীতি ক্ষেত্রে গান্ধীজী ও সেবাকার্যে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র এই উভয়ের ভূমিকার তুলনা করে রতনমণি চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন,—"রাজনীতিক্ষেত্রে অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা গান্ধীজীর মত, সেবাক্ষেত্রে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে এসে দাঁড়ালেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র—কর্মে অনুপম, ব্যক্তিত্বে অসাধারণ, চরিত্রবত্তায় সুদৃঢ়, বিপন্নের আহ্বানে সাড়া দিতে সর্বদাই উন্মুখ। উত্তরবঙ্গ বন্যা-সাহায্য প্রচেষ্টার কেন্দ্রস্থলে বিরাজমান হয়ে আচার্য

6. *আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের চিন্তাধারা,* পৃ—১৯২
7. *আত্মচরিত,* পৃ—১৮৬

প্রফুল্লচন্দ্র হলেন দেশবাসীর স্থির বিশ্বাসভূমি ও অটল আশ্রয়।"[8] (c) সর্বোপরি, আচার্যের আবেদন ও উদাত্ত আহ্বানে সাড়া দিয়ে অর্থ, বস্ত্র ও অন্ন দান করে শত সহস্র নর-নারীর এগিয়ে আসার কারণ হলো সর্বত্যাগী এই মানুষটির প্রতি দেশবাসীর বিশ্বাস ও আস্থা। বিপুল সাহায্য দান করে দেশবাসী বিশ্বাস করল তাদের প্রতিটি দানের সদ্ব্যবহার হবে, একটি পয়সাও এদিক-ওদিক হবে না।

আচার্যদেব কখনো কোন কর্মে গরিমা উপলব্ধি ও প্রকাশ করেননি। শিক্ষাদান, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, নানা জনে ও নানা ক্ষেত্রে আর্থিক সাহায্য দান নিয়ে তাঁর কোন গর্ব বা অহঙ্কার ছিল না। তাঁর গর্ব ও অহঙ্কারের একটিমাত্র ক্ষেত্রই ছিল। তা হলো তাঁর ছাত্ররা সর্বক্ষেত্রে কৃতিত্ব অর্জন করে তাঁকে অতিক্রম করবে। উত্তরবঙ্গ বন্যাত্রাণকার্যের সাফল্যের জন্য লোকমুখে আচার্যের নাম সপ্রশংস উল্লিখিত হতে থাকে। কিন্তু স্বয়ং আচার্যদেব বলেন,—"এই ব্যাপারে আমার নাম যে সমধিক প্রচারিত হইয়াছে, এজন্য আমি কুণ্ঠিত। প্রকৃতপক্ষে, আমি নামমাত্র কর্তা ছিলাম।"[9] বিদ্যা ও জ্ঞানের সহিত এরূপ বিনয় কদাচিৎ দৃষ্ট হয়।

একটি ভ্রান্ত ধারণার অবসানকল্পে

বোবার শত্রু না থাকতে পারে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ও প্রফুল্লচন্দ্রের নিন্দুক ছিল—কম হলেও ছিল। রবীন্দ্রনাথ কবি, খুবই সংবেদনশীল বলে নিন্দায় ও কুৎসা রটনায় হৃদয়ে গভীর বেদনা অনুভব করতেন। কিন্তু প্রফুল্লচন্দ্র বিজ্ঞানী, বাস্তববাদী, পার্থিব লাভালাভে নির্মোহ ও নির্লিপ্ত ; তদুপরি, চিরকুমার, সর্বত্যাগী ঋষি ও সন্ন্যাসী। তাই চরম ঔদাসীন্যে নিন্দা, অপবাদ মৃদু হাস্যে উপেক্ষা করাতে তাঁর কখনো অসুবিধা হয়নি। একবার অভিযোগ উঠেছিল, উত্তরবঙ্গ বন্যায় ত্রাণকার্যের উদ্বৃত্ত তিন লক্ষ টাকা আচার্যদেব অপব্যবহার করেছেন। এই অহেতুক অভিযোগ খন্ডন করেছেন প্রথম মহিলা স্নাতক ও ডাক্তার কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়ের পুত্র প্রভাতকুমার গঙ্গোপাধ্যায় যিনি সেবা প্রতিষ্ঠানের সহকারী সম্পাদক হয়ে টাকাকড়ি ও দ্রব্যসামগ্রী গ্রহণের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। তিনি লিখেছেন,—"এই সেবাকার্য শেষ হয়ে যাবার পর দেখা গেল তিন লক্ষের কিছু বেশী টাকা তখনও হাতে রয়ে গেছে। এই উদ্বৃত্ত অর্থ সম্বন্ধে কিছু লোকের মনে একটা ভ্রান্ত ধারণা আছে। অনেকে মনে করেন যে তাঁর একান্ত স্নেহভাজন কর্মী সতীশচন্দ্র দাশগুপ্তের প্রতি অনুরাগবশতঃ এই অর্থ তিনি অন্যায়ভাবে খাদি প্রতিষ্ঠানকে দিয়েছেন। উত্তরবঙ্গের বন্যাপীড়িত জনগণের সেবার জন্যই জনসাধারণ এই অর্থ দান করেছিলেন ;তাঁদের সেবাতেই এই উদ্বৃত্ত অর্থ ব্যয়িত হওয়া উচিত—তাই এই দানের টাকার অপব্যবহার করার অভিযোগ মুষ্টিমেয় হলেও যখন একশ্রেণীর লোকের মনে উঠেছে—তখন তার নিরসন হওয়া উচিত।...

"বন্যার প্রকোপ সাময়িকভাবে মোচন হয়ে যাবার পর এই অঞ্চলের সুষ্ঠু পুনর্বাসন

8. *আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের চিন্তাধারা*, পৃ—১৯১
9. *আত্মচরিত*, পৃ—১৮৪-১৮৫

ও স্থায়ী গঠনমূলক কাজের জন্য আচার্যদেব একটি ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করে এই উদ্বৃত্ত অর্থ তাঁদের হাতে অর্পণ করেন। তাঁর অন্যতম বিশ্বস্তকর্মী নীরেন্দ্রনাথ দত্ত কেন্দ্র পরিচালক নির্বাচিত হয়ে সেখানে খদ্দরবয়ন, কৃষি ও পশুপালন প্রভৃতি অর্থকরী ব্যবস্থাসহ চিকিৎসাকেন্দ্র ও পাঠাগার স্থাপনের বন্দোবস্ত করেন। সুখের বিষয় যে এই কেন্দ্রটি স্বাবলম্বী হয়ে এখনও নীরেনবাবুর পরিচালনায় বর্তমান আছে। এই ট্রাস্টি বোর্ডে আচার্যদেব স্বয়ং, সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত, ক্ষিতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত, সুরেশচন্দ্র মজুমদার, মাখনলাল সেন, অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র ও আমি মেম্বর ছিলাম। নিয়মিতভাবে এই ট্রাস্টিবোর্ডের সভায় পরীক্ষিত হিসাব ও কার্যবিবরণী পেশ করা হত ;আমি সে বিষয়ে স্বয়ং সাক্ষ্য দিতে পরি। স্বর্গারোহণের সামান্য কিছুদিন পূর্বে বর্তমানে পূর্ব-পাকিস্তানের (বর্তমানে বাংলাদেশ) অন্তর্গত শ্রীপুরে তাঁর অন্যতম প্রিয় শিষ্য অরবিন্দ সর্দারের বাড়ীতে এই ট্রাস্টিবোর্ডের যে সভা হয়, তাতে আমি উপস্থিত ছিলাম। তখন জানা গেল যে, সেবাকেন্দ্রটি স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছে বটে, কিন্তু ট্রাস্টিগণের উপর ন্যস্ত টাকা প্রায় নিঃশেষ হয়ে গেছে। দুঃখ হয় যে, যিনি আজীবন বিলাসব্যসন থেকে সর্বদা শতহস্তদূরে থেকে শুধু লোকমঙ্গল ও দেশহিতৈষণাকেই জীবনের একমাত্র অবলম্বন করেছিলেন,—সেই ত্যাগব্রতী নিঃস্বার্থ দরিদ্রবন্ধুর সম্বন্ধে সংখ্যায় অল্প হলেও কিছু লোক এই ভুল ধারণা পোষণ করেন।"[10]

উত্তর ও পূর্ববঙ্গে বিধ্বংসী বন্যা (1931)

1931 সালে ব্রহ্মপুত্রের সমগ্র অববাহিকা অঞ্চল ভয়াল বন্যার সম্মুখীন হলো : উত্তরবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গ প্লাবিত হলো। মেঘনাদ সাহা যিনি 1922 সালে উত্তরবঙ্গের বন্যায় সক্রিয় ভূমিকা অবলম্বন করে ত্রাণকার্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, তাঁর মতে "স্মরণীয় কালের মধ্যে এরূপ বন্যা এদেশে আর হয় নাই"। পাবনা, বগুড়া, রংপুর, ইত্যাদি জেলাগুলিতে বন্যার্তের হাহাকার উঠল। অন্তত্তপক্ষে কুড়ি লক্ষ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হলো ; চার লক্ষ ঘরবাড়ী বিধ্বস্ত হলো। প্রতিটি বাড়ীর মূল্য 200 থেকে 250 টাকা ধরে প্রায় দশ কোটি টাকা ক্ষতি হিসাবে পাওয়া গেল। বন্যার ফলে কলেরা, ম্যালেরিয়া রোগের প্রাদুর্ভাব হলো। কিন্তু এইসব বিপদ অগ্রাহ্য করে মেদিনীপুর জেলার কাঁথি ও তমলুক থেকে আগত স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী ত্রাণকার্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

আচার্যদেবের বয়স তখন সত্তর বৎসর। ভাবতেও বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয় যে, এই বয়সে তাঁকে বন্যাসেবাকার্যের হাল ধরতে হলো, অবিভক্ত বিশাল বাংলায় আর কাউকে পাওয়া গেল না যাঁর ওপর জনগণ অগাধ আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে। যাই হোক, আগের মতই বিজ্ঞান কলেজে সঙ্কটত্রাণ সমিতির কার্যালয় স্থাপিত হলো। সাহায্যের আবেদনে সাড়া দিয়ে মানুষজন এগিয়ে এলেন ; স্কুলের বালক-বালিকারা, কলেজের ছাত্রগণ, জনসাধারণ অর্থসংগ্রহে ব্রতী হলো ; মিশনারীরাও অর্থ সংগ্রহে যোগদান করলেন। এই সময় বিশ্বব্যাপী অর্থসঙ্কট দেখা দেওয়ায় পূর্বের মত

10. *Acharya Prafulla Chandra Ray, C.U.*, p. 254

অর্থ সাহায্য না পাওয়া গেলেও ত্রাণকার্য যথারীতি চলতে লাগল। আচার্যদেবের সেবাকার্যে এগিয়ে এলেন সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত, ক্ষিতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত, পঞ্চানন বসু প্রমুখ।

কলেরা, ম্যালেরিয়া প্রতিরোধের ব্যবস্থা নেই, অনাহারক্লিষ্ট মানুষের মুখে এক মুঠো অন্ন যোগানোর প্রচেষ্টা নেই। সরকারের কোন এক সদস্যের মতে, সরকার দাতব্য প্রতিষ্ঠান নয়। দান করার অবসর তাদের নেই। তা ছাড়া এমন অন্নাভাব নেই যে, সাহায্য করার কোন দরকার আছে। ব্রিটিশ সরকার মিথ্যা ইস্তাহার প্রকাশ করে বলছে সাহায্যের জন্য সংগৃহীত অর্থ জমা করে রাখা হোক, বিতরণের প্রয়োজন নেই। ব্রিটিশ পদলেহী কোন কোন বাঙালী উচ্চপদস্থ কর্মচারীও এরূপ মনোভাব পোষণ করতে দ্বিধা করেনি। এ-বিষয়ে জনৈক ভারতীয়ের অভিমতটি উল্লেখ করা যেতে পারে : "…. দুঃখের বিষয় এই যে, এই ইস্তাহার একজন বাঙালী সদস্যের তদন্তের ফলাফলের উপর নির্ভর করিয়া লিখিত। এই বাঙালী সদস্য মহাশয় জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশ দেশের সর্বোচ্চ বিচারালয়ে বিচারপতির কার্যে যাপন করিয়াছেন ….।"[11]

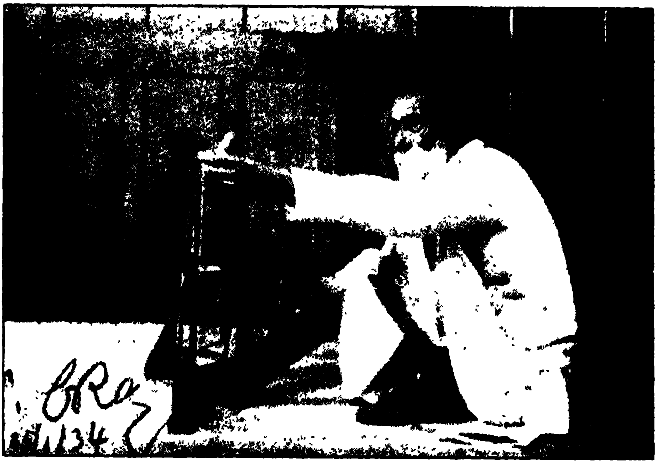
আচার্যদেব ওই পত্রলেখকের মন্তব্যটি স্বীকার করতে পারেননি। এ-বিষয়ে তাঁর অভিমত হলো একজন বাঙালী ঘটনাচক্রে রেভিনিউ সদস্য পদে ছিলেন, কিন্তু শোচনীয় অবস্থার জন্য দায়ী ব্রিটিশ শাসনপ্রণালী। দুঃখের বিষয়, আচার্যদেবের মন্তব্যের প্রথমাংশটির সহিত সহমত পোষণ করা কঠিন। কারণ, ব্রিটিশ শাসনকালে বহু বাঙালী ও ভারতীয় নিম্নপদস্থ থেকে উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা ব্রিটিশদের তোষণ ও পদলেহন করে আখের গুছিয়েছিল, এবং দেশপ্রেমিকদের ফাঁসি কাঠে ঝুলিয়েও প্রমোশন লাভের পথ প্রশস্ত করেছিল,—এমন নজির ইতিহাসের পাতায় লেখা না হলেও প্রত্যক্ষদর্শীদের অজানা চিল না। সেকালের সেই 'দেশদ্রোহীদের' বংশধরগণের অনেকে বর্তমানে 'দেশপ্রেমিক' রাজনৈতিক নেতায় পরিণত হয়েছেন!!! হায়েনাদের চেনা যায়, কিন্তু বাস্তুঘুঘুদের শয়তানী বোঝা কঠিন জটিল।

বন্যা, বন্যা, বন্যা। এবার কাঁথি ও তমলুক ভাসল। আচার্যদেবের সেবাহস্ত প্রসারিত হলো। সেবাকার্য শেষে গঠনমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হলো। তমলুকের কুলপাড়া ও মেদিনীপুরের জুখিয়াতে খদ্দর তৈরীর কেন্দ্র স্থাপিত হলো। কুলপাড়া কেন্দ্রের ভার অর্পিত হলো ভীমাচরণ মহাপাত্র ও জীবেশ মিশ্রের ওপর, আর জুখিয়া কেন্দ্রের ভার নিলেন প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। জুখিয়া কেন্দ্রটি বর্তমানে লুপ্ত, কিন্তু কুলপাড়া কেন্দ্রটি অন্তত 1961 সাল পর্যন্ত বর্তমান ছিল।

এই বন্যা, সেবাকার্য, ত্রাণ ও পুনর্বাসন থেকে অখন্ড ভারতবর্ষের যে ছবিটি প্রতিভাত হতে দেখা যায়, তা-ই ছিল আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের স্বপ্ন। তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন "বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন রকমের জলবায়ু, বিভিন্ন ভাষা, বিচিত্র রকমের বেশভূষা, বিভিন্ন ধর্ম এবং বিভিন্ন রকমের মতামত থাকা সত্ত্বেও, ভারতবর্ষ একটি অখন্ড দেশ…..।" কিন্তু পরবর্তীকালে ধর্মান্ধতা, মৌলবাদিতা ও স্বার্থান্ধতার ফলে অখন্ড

11. *আত্মচরিত*, পৃ—১৯৫

ভারতবর্ষ—এই উপমহাদেশ হলো খণ্ডিত : ভারত ও পাকিস্তান; পূর্ব পাকিস্তান আবার হলো বাংলাদেশ। সন্ত্রাসবাদ, বিচ্ছিন্নতাবাদ, আঞ্চলিকবাদ আজ মাথাচাড়া দিয়ে উঠে দেশের অস্তিত্বকেই বিপন্ন করে তুলেছে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বছরে বছরে আবির্ভূক্ত হন না, শত বৎসরেও না, কিন্তু তাঁর চিন্তা ভাবনা, আদর্শ তো বর্তমান। এ-সব গ্রহণ করার উপযুক্ত শিক্ষাক্রম কি গ্রহণ করা যায় না?



সূতাকাটায় রত আচার্য

চরখা ও খদ্দর

1921 সালে স্বরাজ আনার প্রতীকরূপে গান্ধীজী দেশব্যাপী চরখা ও খদ্দর প্রবর্তনের ডাক দিলেন। কুড়ি লক্ষ চরখা প্রবর্তনের কথা ঘোষিত হলো। গান্ধীজীর এই উদাত্ত আহ্বানে অসহযোগী কংগ্রেসীদের মধ্যে অভূতপূর্ব সাড়া পাওয়া গেলেও, দেশের সকল মনস্বী ও মননশীল ব্যক্তিগণ এই নীতি সমর্থন করতে পারেননি। এ-সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। চরখা সম্বন্ধে তাঁর অভিমত হলো : "মহাত্মাজির কণ্ঠে বিধাতা ডাকবার শক্তি দিয়েছেন, কেননা—তাঁর মধ্যে সত্য আছে, অতএব এই তো ছিল আমাদের শুভ অবসর। কিন্তু তিনি ডাক দিলেন একটি মাত্র সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে। তিনি বললেন, কেবলমাত্র সকলে মিলে সুতো কাট, কাপড় বোনো। ... বড়ো কলের দ্বারাও মানুষকে ছোটো করা যায়, ছোটা কলের দ্বারাও করা যায়। এঞ্জিনের দ্বারাও করা যায়, চরকার দ্বারাও। চরকা যেখানে স্বাভাবিক সেখানে সে কোনো উপদ্রব করে না, বরঞ্চ উপকার করে—মানবমনের বৈচিত্র্যবশতই চরকা যেখানে স্বাভাবিক নয় সেখানে চরকার সুতা কাটার চেয়ে মন কাটা যায় অনেকখানি।"[12] রবীন্দ্রনাথ আরো

12. *রবীন্দ্র রচনাবলী*, ত্রয়োদশ খন্ড, পৃ—৬৪৫

বলেছেন যে, ভারতের কৃষককুলের আশীজন চাষবাসের পর ছ-মাস বেকার থাকে বলে তাদের সুতা কাটায় উৎসাহিত করতে হবে,—এটি নিছক অনুমান নির্ভর। সুতরাং এই বিষয়টি প্রকৃত তথ্যানুসন্ধানের ওপর নির্ভর করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। যুক্তির পরিবর্তে উক্তিতে তিনি বিশ্বাসী নন। চরখা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রধান নালিশ ছিল, —"চরকার সঙ্গে স্বরাজকে জড়িত করে স্বরাজ সম্বন্ধে দেশের জনসাধারণের বুদ্ধিকে ঘুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে।"[13]

রবীন্দ্রনাথের ন্যায় প্রফুল্লচন্দ্রেরও প্রথম প্রথম চরখা সম্বন্ধে সংশয় ও দ্বিধা ছিল। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক পরিমণ্ডলে যাঁর মানসিক কাঠামো নির্মিত, তিনি যে চরখার ন্যায় মধ্যযুগীয় ব্যবস্থাপনার খুশী হবেন,—এরূপ আশা করা যায় না। কিন্তু প্রফুল্লচন্দ্র গজদন্ত মিনারে অধিষ্ঠিত বিজ্ঞানী ছিলেন না, অতি বাস্তব পরিস্থিতির সহিত তাঁর প্রত্যক্ষ পরিচয় ও অভিজ্ঞতা ছিল ; দেশের চাষাভূষো, দীন মজুর, দিন আনা দিন খাওয়া মানুষদের সহিত তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। বস্তুতপক্ষে, দেশের সব শ্রেণীর মানুষের সহিত এমন প্রত্যক্ষ ও ঘনিষ্ঠ সংযোগ দেশের অন্য কোন মনীষীর ছিল কিনা সন্দেহ। খুলনার দুর্ভিক্ষ, উত্তর বঙ্গের দু-দুটি বিধ্বংসী বন্যা, কাঁথি ও তমলুকের বন্যা ও শ্রমিক, মজুর, কৃষক আর সাধারণ নরনারীর দুঃখ-দুর্দশা প্রত্যক্ষ করে তাদের দুঃখ-দুর্দশার আপাত সমাধানকল্পে আচার্যদের চরখা ও খদ্দর প্রচার ও প্রবর্তনের অনুরাগী হয়ে উঠলেন।

রবীন্দ্রনাথ তথ্যানুসন্ধান করে চরখা প্রবর্তনের যৌক্তিকতা বিচার করার প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন। প্রফুল্লচন্দ্র 'আত্মচরিত'-এ ঐতিহাসিক তথ্য থেকে শুরু করে অর্থনৈতিক তথ্যাদির উল্লেখ করে চরখার সপক্ষে তাঁর অভিমত প্রতিপাদন করেছেন। পাঠকদের অবগতির জন্য এখানে সামান্য তথ্য পরিবেশিত হলো।

প্রখ্যাত কোলব্রুক (Colebrooke) বাংলার কৃষকদের অবস্থা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভের পর *Husbandry of Bengal* গ্রন্থটি রচনা করেন 1800 সালে। ওই পুস্তকে তিনি অতি দরিদ্রের দুর্দশা লাঘবের জন্য চরখায় সুতা কাটার প্রসঙ্গটি উত্থাপন করেন। তিনি লেখেন, "যে সব বিধবা ও অনাথা স্ত্রীলোকেরা রুগ্ন বলিয়া অথবা সামাজিক মর্যাদার জন্য কৃষিক্ষেত্রে শ্রমিকের কাজ করিতে পারে না, তাহাদের পক্ষে জীবিকার্জনের একমাত্র উপায় চরকায় সূতাকাটা। পুরুষেরা যখন শারীরিক অক্ষমতা বা অন্য কোন কারণে শ্রমের কাজ না করিতে পারে, তখনই স্ত্রীলোকেরা কেবলমাত্র এই উপায়েই পরিবারের ভরণপোষণ করিতে পারে। ইহা সকলের পক্ষেই সহায়স্বরূপ, এবং জীবিকার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় না হইলেও, দরিদ্রের দুর্দশা অনেকটা লাঘব করিতে পারে।"[14] 1808-1815 পর্যন্ত ভারতের আর্থিক অবস্থা আলোচনা করে বুকানন হ্যামিলটন দেখান যে, সূতা কেটে প্রত্যেক কাটুনীর বার্ষিক লাভ হতো তিন টাকা পঁচিশ পয়সা (= ৩।০)। 1808 সালে সাড়ে বারে লক্ষ টাকা 1937 সালে পঞ্চাশ লক্ষ টাকার

13. *তদেব*, পৃ—৭০১
14. *আত্মচরিত*, পৃ—২৮১

সমান ছিল। *Topography of Dacca* গ্রন্থের লেখক টেলারের (Taylor) মতে, সূতাকাটা ও বস্ত্রবয়ন শিল্প এদেশে অগণিত মানুষের অন্নসংস্থান করেছে। প্রখ্যাত রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁর *Economic History of India in the Victorian Age*-এর উপসংহারে বলেছেন যে, "উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্যন্ত ভারতের লোকেরা নানা শিল্পকার্যে নিযুক্ত ছিল। বস্ত্র বয়ন তখনও তাহাদের প্রধান বৃত্তি ছিল। লক্ষ লক্ষ স্ত্রীলোক সূতা কাটিয়া জীবিকার্জন করিত।"[15]

চরখা প্রবর্তনের বিরুদ্ধে দেশে সমালোচকের অভাব ছিল না। রবীন্দ্রনাথ চরখা প্রবর্তন সমর্থন করেননি : জগদীশচন্দ্রও না। তিনি বলতেন, "পা দিয়ে যে কাজ করা যায় তা হাত দিয়ে করতে যাব কেন?" তৎকালীন অর্থনীতিবিদদের অভিমত হলো বিদেশ থেকে সস্তায় আমদানী করা জিনিস পাওয়া গেলে সেগুলি এদেশে উৎপাদন করার প্রয়োজন নেই ; আদিম যুগের লুপ্ত প্রণালীর পুনরুদ্ধার হাস্যকর মাত্র। প্রফুল্লচন্দ্র এই সমালোচনার প্রত্যুত্তরে বলেন, "কিন্তু ইহার ভিতর একটা যে মিথ্যা যুক্তি আছে, তাহা আশ্চর্যরূপে তাঁহাদের দৃষ্টি এড়াইয়া যায়। বাংলার অধিকাংশ স্থানে একমাত্র প্রধান ফসল আমন ধান্য এবং রোপণ ও বোনা, কাটা সমস্ত শেষ করিতে তিন মাস মাত্র সময় লাগে। বৎসরের বাকী নয় মাস কৃষকেরা আলস্যে কাটায়। বাংলায় কোন কোন অঞ্চলে ধান ও পাট ছাড়া সরিষা, মটর প্রভৃতি রবিশস্য হয়। কিন্তু সেখানেও কৃষকদের বৎসরের মধ্যে ৫/৬ মাস কোন কাজ থাকে না।"[16] অর্থনীতিবিদরা বিদ্রূপবাণ নিক্ষেপ করতে পটু, কিন্তু কৃষকরা যখন বছরে অর্ধেক সময়ের অধিক কর্মহীন হয়ে দুর্দশায় নিক্ষিপ্ত হয়, তার উপায় ও পথ নির্ণয়ে মাথা চুলকান। আচার্যদেব তথ্যের পর তথ্য—ঐতিহাসিক, আর্থিক, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ভিত্তিক—প্রদর্শন করে এই দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, সুতাকাটা ও কাপড় বোনা—কুটির শিল্পরূপে বাংলায় সর্বত্র প্রচলিত হতে পারে। ব্যক্তিগত আয়ের পরিমাণ খুব কম হলেও একত্রে হিসাব করলে কোটি কোটি টাকা আমদানী-রাহু থেকে রেহাই পায়। এই প্রসঙ্গে 'হিতোপদেশ' থেকে শ্লোকাংশটি তিনি উদ্ধৃত করেছেন : *তৃণৈর্গুণত্বমাপন্নৈর্বধ্যন্তে মত্তদন্তিন* : তৃণরাশি একত্র করে রজ্জু নির্মাণ করলে তা দিয়ে মত্ত হাতীকেও বাঁধা যায়। এখানে অজিতা আচার্যের বিশ্লেষণটি অবশ্যই প্রাসঙ্গিক : "In P.C. Ray's mind there was no confusion over Machine vs. Handicrafts. The machine, like arnaments, was necessary. But like armaments, machine should not be allowed to govern human life. His impassioned plea for the *Charka had a symbolic value. The Charka* stood for handicrafts and handicrafts had employment potential and were, at the same time, aesthetically satisfying .. Judged in this light, his passionate advocacy for the Charka in the Coconade speech makes sense."[17] দেশের মফঃস্বল শহরগুলিতে পর্যন্ত ম্যাঞ্চেস্টার, লিভারপুল,

15. *তদেব*, পৃ—২৮২
16. *আত্মচরিত*, পৃ—২৮৪
17. *Acharya Prafulla Chandra Ray*, ISNA, p. 95

গ্লাসগো প্রভৃতির ন্যায় বৃহৎ বৃহৎ কলকারখানায় ভরে যাবে, সুতরাং চরখার ন্যায় আদিম কলের দরকার নেই,—এরূপ লম্বাচওড়া কথায় আচার্যদেবের আস্থাও ছিল না, বিশ্বাসও ছিল না। তাই 'have nots'-দের তাৎক্ষণিক ও আপাত সমস্যার সমাধানকল্পে তাঁর চরখা নীতি গ্রহণ ও নিরলস প্রচার। কিন্তু "sensationlists and political dramatists" spoil the joke.

সমবায় আন্দোলন

সমবায়ের মধ্য দিয়ে জনগণের অশেষ হিতসাধনের মর্মবাণী উপলব্ধি করতে আচার্যদেবের কোন দিন অসুবিধা হয়নি। বাল্যকালেই তিনি পিতার Loan Office প্রতিষ্ঠার সহিত পরিচিত ছিলেন এবং Office-এর উপযোগিতা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাই তিনি সমবায় আন্দোলনের পরিমন্ডল গড়ে তোলার জন্য আন্তরিক প্রয়াস চালিয়েছিলেন। একজন প্রথম সারির বিজ্ঞানী বিজ্ঞানের আঙ্গিনার বাইরে এসে সমবায় আন্দোলনে জড়িয়ে পড়বেন, এরূপ অনেকেই ভাবতে পারেননি। এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা অবশ্যই স্মরণযোগ্য। যাই হোক, সমবায় আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে এখানে আচার্যদেবের একটি অনন্য হিউমারের উল্লেখ করা যাক: "১৯৩৬ সালে ঝাড়গ্রাম রাজার আমন্ত্রণে ঝাড়গ্রামের বেলেবেড়ায় গমন করেন কো-অপারেটিভ সোসাইটির উদ্বোধনে ;রাত্রে হাতীর পিঠে চেপে বহুবিস্তৃত জলপথ তাঁকে অতিক্রম করতে হয়। রাস্তার ক্লেশ কিছুমাত্র তাঁকে নিরুৎসাহ বা নিরানন্দ করেনি। শিক্ষাব্রতী বৈজ্ঞানিক তিনি। কো-অপারেটিভ সোসাইটির উদ্বোধন উপলক্ষে তাঁর আগমনে কেহ কেহ সপ্রশ্ন বিস্ময় প্রকাশ করায় তিনি সহাস্যে উত্তর দেন—"আমি হচ্ছি ব্যঞ্জন বর্গের বিসর্গবর্ণীয় ; ক-এ বিসর্গ দাও কঃ, খ-এ বিসর্গ দাও খঃ,' গ-এ বিসর্গ দাও গঃ। তেমনি আমি বৈজ্ঞানিকের দলে বৈজ্ঞানিক, ব্যবসায়ী-সমাজে ব্যবসায়ী, গ্রামসেবকদের সাথে গ্রামসেবী, অর্থনীতিবিদদের মহলে অর্থনীতিজ্ঞ।" সমস্যার সহজ সমাধান।"[১৪]

সমবায়ের ধ্যান-ধারণা প্রফুল্লচন্দ্রের রক্তে ছিল। তাই 1904 সালে প্রথম বিধিবদ্ধ সমবায় আইন চালু হলে এর উপযোগিতা ও উপকারিতা সাধারণের মধ্যে প্রচারিত করার জন্য তিনি সাধ্যমত সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা করতে থাকেন। তাঁর একাধিক বার ইউরোপ ভ্রমণকালে তিনি সমবায় সম্বন্ধে আধুনিক ধারণার সহিতও পরিচিত হন। 1906 সালের মধ্যে রাড়ুলি অঞ্চলে 41টি কৃষি ঋণদান সমিতি গড়ে ওঠে। ওই ঋণদান সমিতিগুলি একত্রিত করে আচার্যদেব ও তাঁর অগ্রজ নলিনীকান্ত রায়চৌধুরী রাড়ুলিতে 1908 সালে সেন্টাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক গঠন করেন। অবিভক্ত বাংলায় এটি তৃতীয় সমবায় ব্যাঙ্ক।

বেঙ্গল কেমিক্যালের শ্রমিকদের স্বার্থে স্বয়ং উদ্যোগী হয়ে গড়ে তোলেন *বেঙ্গল কেমিক্যাল সমবায় সমিতি* (1917) ; ছাত্রদের মধ্যে সমবায়ের ধারণা সঞ্চারিত করতে অধ্যক্ষ গিরিশচন্দ্র বসুর সহিত একযোগে 'বঙ্গবাসী কলেজ কো-অপারেটিভ ক্যান্টিন

18. *Acharya Prafulla Chandra Ray*, C.U., p. 274

অ্যান্ড সেন্টার' প্রতিষ্ঠা করেন তিনি (1918)।* সমবায়ে ধারণাকে সম্প্রসারিত করে দুই আচার্য গঠন করলেন *Teachers Benevolent Fund* যা শিক্ষকদের বা তাদের বিধবাদের স্বার্থে নানা বিপদে-আপদে অসামান্য ভূমিকা পালন করে।



কৃষি শিল্প প্রতিষ্ঠানে প্রফুল্লচন্দ্র

সমবায়ের ধারণা ও আদর্শকে ধারাবাহিকভাবে রূপায়ণ করার প্রচেষ্টার জন্য 1921 সালে তিনি *The Bengal Co-operative Organisation Society*-র সভাপতি পদ অলঙ্কৃত করেন। তাঁর পূর্বে এই সম্মানজনক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন ডি. এম. হ্যামিল্টন, স্যার আর. এন. মুখার্জী, মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী প্রমুখ। 1923-24 সালে Ghola Anti-Malaria Society-র সভায় সভাপতিত্ব করেন আচার্যদেব। 1924 সালের 5 ই জুলাই কলকাতায় *The Bengal Co-operative Organisation Society* আন্তর্জাতিক সমবায় দিবস পালন করে। সভাপতিরূপে এই সভায় সমবায়ের ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে তাঁর ভাষণ উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন, জাতীয় গঠনের ক্রিয়াশীলতায় ভারতীয়গণ সর্বদাই

* লেখক বঙ্গবাসী কলেজে ছাত্রাবস্থায় এই ক্যান্টিনের উপযোগিতা ও উপকারিতা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তখন লেখক জানতেন না যে, এই ক্যান্টিন প্রতিষ্ঠার পশ্চাতে ছিলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র।

সরকারের সাহায্যের দিকে তাকিয়ে থাকে। এটি জাতীয় দুর্বলতা। এই দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠার ও আত্মশক্তিতে নির্ভরশীল হওয়ার একমাত্র উপায় ও প্রতিকার হলো সমবায়।

অনিদ্রার শিকার ও জীর্ণশীর্ণ দেহ নিয়ে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ভারতের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত ছুটে বেড়িয়েছেন নানা বিষয়ের উদ্বোধন ও সভাপতিত্ব করতে। ছুটে গেছেন ঢাকায়, বোম্বাই (মুম্বাই), লাহোর, করাচি ইত্যাদি শহরে সমবায় ব্যাঙ্ক বা সম্মেলনের সভাপতি হিসাবে যোগদান করতে। এইসব স্থানে তাঁর ভাষণগুলির মধ্যে আছে The Co-operative Movement. Its Principle—Its Ideal and Historical Setting, Task Ahead, Co-operation and Economic Welfare, A Programme of Co-operative Development ইত্যাদি। আচার্যদেবের সমবায় আন্দোলন সম্পর্কে পিনাকপাণি দত্তের উপসংহারটি গ্রহণযোগ্য বলে এখানে উদ্ধৃত হলো : "সমবায় আন্দোলনের মাধ্যমে দেশের এক বিশাল অংশের মানুষ উপকৃত হবে এ চিন্তা ভাবনার প্রয়োগ তিনি তাঁর স্বগ্রাম থেকে শুরু করে, ছাত্র, শিক্ষক, শ্রমিক, কৃষক, শহরের উচ্চবর্গের মধ্যে সারা ভারতবর্ষব্যাপী প্রচার ও প্রসার করেছেন। হাতেকলমে ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করে প্রকৃত সমবায়ীর উদাহরণ রেখেছেন।"[19]

নীলক্ষেত অভয় আশ্রম ডেয়ারী ফার্ম

1921 সালে স্বরাজ আনায়নের স্বার্থে যে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন গান্ধীজী, তাতে আঠারোটি গঠনমূলক বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়। চরখা, খদ্দর, ইত্যাদির মধ্যে গোপালন ছিল একটি। আচার্যদেবের বিশ্বখ্যাত ছাত্রগণ ঢাকায় এই উদ্যোগ গ্রহণ করেন, এবং উন্নতজাতের গরু ও ফার্ম পরিদর্শন করে হরিপদ চ্যাটার্জী দার্জিলিং-এ মেসার্স কেভেন্টার লিমিটেডের ডেয়ারী ফার্ম-এ অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য যান। অধ্যাপক জ্ঞানচন্দ্র ও তাঁর বন্ধুবর্গ অর্থসংস্থানের ব্যবস্থা করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্নিকটস্থ নীলক্ষেতে এক একর সরকারী জমি ইজারা নিয়ে গোপালন ও ডেয়ারী ফার্ম প্রতিষ্ঠা করেন। স্থির হয়, সদস্যগণ সকলে এক হাজার টাকা করে দেবেন। কিন্তু সকলে এক হাজার টাকা না দিলেও জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, সত্যেন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ এক হাজার টাকার বেশী করে দান করলেন। অন্যান্য যাঁরা এই উদ্যোগে অংশগ্রহ করলেন তাঁরা হলেন মেঘনাদ সাহা, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র মজুমদার, হরিদাস ভট্টাচার্য, রায়বাহাদুর শশাঙ্ক ঘোষ, ক্যাপ্টেন গাঙ্গুলী প্রমুখ।

আচার্যদেব এই নীলক্ষেত অভয় আশ্রম ডেয়ারী ফার্মের উদ্বোধন করলেন। উন্নত জাতের গরু সংগ্রহ করে দুধ, মাখন, ঘি সরবরাহ হতে লাগল। কিন্তু আচার্যদেব উদ্যোগীদের সতর্ক করে বললেন, ফার্মের নিজস্ব জমি না হলে যে-কোন দিন সরকারী বিরূপে ফার্ম উঠে যেতে পারে। লবণ আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হলে আচার্যদেবের উপদেশে ফার্মের সব—মায় গরু পর্যন্ত নীলামে বিক্রি করে ভরাডুবির হাত থেকে রেহাই পাবার ব্যবস্থা হয়। নীলামে প্রাপ্ত অর্থ গচ্ছিত রইল হরিপদ চ্যাটার্জীর কাছে

19. 'সমবায় আন্দোলনে প্রফুল্লচন্দ্র', পশ্চিমবঙ্গ, ১৪০৬, পৃ—১০৬

আন্দোলনের খরচপত্রের উদ্দেশ্যে। স্বয়ং আচার্যদেব হরিপদর হাতে আরো কিছু অর্থ প্রদান করলেন।

কত জনহিতকর উদ্যোগ ও প্রচেষ্টায় আচার্যদেবের অদৃশ্য হস্ত ক্রিয়াশীল ছিল, তার লিখিত বিবরণ নেই। আবার তাঁর অনুপ্রেরণায় তাঁর ছাত্র ও বন্ধুগণও কত রকম বিবিধ জনহিতকর কর্মে বিজড়িত হয়েছিলেন, সে-সবেরও কোন লিখিত বিবরণ পাওয়া যায় না। কত ছোট ছোট ঘটনায় আচার্যদেবের চরিত্রের নানা দিকের প্রকাশ, সে-সব গ্রন্থিত করে জীবনী রচনা অবশ্যই গবেষণাসাপেক্ষ।

নবম অধ্যায়

স্বদেশ ও সমাজ

1861 থেকে 1944 পর্যন্ত দীর্ঘজীবন প্রফুল্লচন্দ্রের কেটেছে জ্ঞানান্বেষণ করে, স্বদেশ ও দেশবাসীর সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা ও সেবা করে। উচ্চশিক্ষিত মহলে তিনি ডাঃ পি. সি. রায়—বিজ্ঞানসাধক, আবিষ্কারক ও ভারতীয় রসায়ন গোষ্ঠীর জনক ; অভিজাত মহলে তিনি স্যার পি. সি. রায়। কিন্তু সাধারণ মানুষের মধ্যে তাঁর পরিচিতি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় যিনি দুর্ভিক্ষ ও বন্যাপীড়িতদের দুঃখ-কষ্ট ও দুর্দশা লাঘবের জন্য ত্রাণসামগ্রী নিয়ে ছুটে যান, আর তাদের আর্থিক সমস্যা সমাধানের জন্য সাময়িক ব্যবস্থা করার গঠনমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করেন। ঊনবিংশ-বিংশ শতকের ভারতের অর্থনৈতিক দুরবস্থা যাঁর মানসিক যন্ত্রণার কারণ ছিল, এবং যিনি মনেপ্রাণে চাইতেন বিজ্ঞান ও শিল্পে, ব্যবসা ও বাণিজ্যে ভারত পাশ্চাত্য দেশগুলির সমকক্ষ হয়ে উঠুক। আচার্যের বিজ্ঞানচর্চা ও স্বদেশপ্রীতি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। বস্তুতপক্ষে, মানবপ্রেমিক ও স্বাদেশিক হিসাবে তিনি বহুগুণে শ্রদ্ধার্হ ও আদরণীয়। স্বদেশী কোন সীমানাবদ্ধ ক্ষেত্র নয় ; জাতীয় জীবনের সবখানি জুড়েই আছে এই ভাবনা। স্বদেশীর মূলমন্ত্র, তার উপাদান ও সত্তা সম্বন্ধে রতনমণি চট্টোপাধ্যায়ের ধ্যান-ধারণা আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের জবীনে সম্পূর্ণরূপে প্রতিভাত হতে দেখা যায়। রতনমণি লিখেছেন—"দেশের জন্য সম্যক্ প্রেম, সম্যক্ চিন্তা, সম্যক্ সংকল্প, দেশের জন্য সম্যক্ উৎসাহ, সম্যক্ চেষ্টা, সম্যক্ কর্ম, সম্যক্ ত্যাগ এই হলো স্বদেশীর মূল কথা, স্বদেশীর উপাদান, স্বদেশীর সত্তা। স্বদেশ-আত্মার সহিত সুগভীর যোগে যুক্ত হয়ে যিনি নবচেতনা লাভ করেছেন, সেই যোগে যাঁর নবদৃষ্টির উন্মেষ হয়েছে, হৃদয় যাঁর নবপ্রেমের অরুণালোকে উত্তীর্ণ হয়েছে, প্রাণ যাঁর নবরাগে রঞ্জিত হয়েছে, তিনিই হলেন যথার্থ স্বাদেশিক, স্বদেশ-মন্ত্রের সত্য উপাসক।"[1] কেবল বাংলার নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ স্বাদেশিকদের অন্যতম ছিলেন প্রফুল্লচন্দ্র। মনেপ্রাণে, অস্থিমজ্জায়, চিন্তায় ও কর্মে এবং অন্তরে ও বাইরে তাঁর মত স্বাদেশিক ভারতে বিরল। অথচ তিনি কখনো রাজনীতির কোলাহলমুখর ঢক্কানিনাদে ও নাটকীয়তার মধ্যে জড়িয়ে পড়েননি। তাঁর "স্বভাব ও প্রবৃত্তিতে রাজনীতিক" হবার যোগ্যতা থাক বা নাই থাক, তাঁর মত স্বদেশী, স্বদেশপ্রেমী, রাজনৈতিক ভাবনাপুষ্ট মানুষ কোটিতে গুটিক।

1876 সালে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠা

---

1. *আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের চিন্তাধারা*, পৃ—১৮২

করেন। স্বাদেশিকতার দীক্ষাগুরুদের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন অগ্রগণ্য। এই সম্বন্ধে বিপিনচন্দ্র পাল তাঁর 'চরিতকথা'-য় লিখেছেন,—"বাঙলার এই আধুনিক স্বাধীনতা ও স্বাদেশিকতার আদর্শকে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য নানা দিকে নানা লোক চেষ্টা করিয়াছেন সত্য, কিন্তু এই নূতন সাধনার সর্বপ্রথম যুগের দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু তিনজন—রামমোহন, কেশবচন্দ্র ও সুরেন্দ্রনাথ। সুরেন্দ্রনাথই প্রথম এই স্বাদেশিকতার মধ্যে এক অভিনব ও উন্মাদিনী ঐতিহাসিকী উদ্দীপনার সঞ্চার করেন।"[2] তখন শ্রীঅরবিন্দ কথিত ভারতবাসীর ধর্মই ছিল স্বাদেশিকতা। আচার্যদেবের স্বাদেশিকতা রাজনীতিকদের ক্ষুদ্র গন্ডীতে আবদ্ধ স্বাদেশিকতা ছিল না ; তিনি নিজেকে বহুবিস্তৃত ক্ষেত্রে ব্যাপৃত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। ক্ষণিক রাজনৈতিক উন্মাদনা নয়, গঠনমূলক ক্রিয়াশীলতা ও কার্যাবলী গ্রহণ করে তার বাস্তব রূপায়ণের মধ্যেই আচার্যের চিন্তা-ভাবনা নিয়োজিত ছিল। তাঁর সমগ্র কার্যাবলীর—গবেষণা, শিল্প-বাণিজ্য, লোকসেবা, শিক্ষা-চিন্তা ইত্যাদির মধ্যেই স্বাদেশিকতার স্পর্শ বর্তমান। দেশের অন্তরাত্মার সহিত এমন ঘনিষ্ঠ যোগ আর কোন ব্যক্তিত্বে আজ পর্যন্ত দেখা যায় না। 'ম্যাঞ্চেসাটার গার্ডিয়ান'-এ যথার্থই মন্তব্য করা হয়েছে : "স্যার পি. সি. রায় বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক। তাঁহাকে গোঁড়া অসহযোগী বলা যাইতে পারে না, কিন্তু তিনি একজন প্রবল জাতীয়তাবাদী এবং গবর্ণমেন্টের কার্যের তীব্র সমালোচক। শিক্ষক ও সংগঠনকর্তা হিসাবেও তাঁহার ক্ষমতা অসাধারণ। একজন ইউরোপীয়কে আমি বলিতে শুনিয়াছি—মি. গান্ধী যদি আর দুইজন স্যার পি. সি. রায় তৈরি করিতে পারিতেন, তবে এক বৎসরের মধ্যেই তিনি স্বরাজ লাভে সক্ষম হইতেন।"[3] এই সারমর্মীকরণে আমরা একটু সংশোধনী আনতে চাই যে, *Sir P.C. Ray is born, but cannot be made.*

ইতিপূর্বে আচার্যের শিল্প-বাণিজ্য ও ব্যবসা, দুর্ভিক্ষ ও বন্যায় সেবাকার্যের মধ্য দিয়ে তাঁর স্বদেশভাবনা ও স্বাদেশিকতার বিবরণ দিয়েছি ;গবেষণা ও বৈজ্ঞানিক গোষ্ঠীর কথাও আলোচনা করেছি যার মধ্য দিয়ে দেশসেবার মূলমন্ত্র প্রকাশিত হয়েছে ;তা ছাড়া অসংখ্য দরিদ্র ছাত্রদের আর্থিক সাহায্যের কথা তো অলিখিত রয়েই গেছে যেখানে রয়েছে তাঁর অকৃত্রিম সীমাহীন সহানুভূতি ও ভালবাসা। আচার্যদেবের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য কি এই প্রশ্নের উত্তরে ডঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ বলেছিলেন,—"প্রফুল্লচন্দ্রের মত মহাপ্রাণ ও ছাত্রবন্ধু বিরল। ... প্রতি মাসের প্রথম তিন-চার দিন অগণিত প্রার্থীর ভিড়-নিয়ন্ত্রণ করতে ... হিমশিম খেতে হয়েছে। কিন্তু এমনি নীরব ছিল তাঁর দান যে তাঁর ডান হাতের দান বাঁ হাত জানতে পারত না।"[4]

রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ, আনন্দমোহন প্রমুখের মধ্য দিয়ে বাঙালীদের মধ্যে ক্রমশ জাতীয় ভাব, জাতি গঠনের উপাদান ও দেশপ্রেমের উদ্বোধন ঘটছিল। কূটকৌশলী সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের ভাবধারা অনুধাবন করতে

2. *তদেব*, পৃ—১৮২
3. *আত্মচরিত*, পৃ—১৮৬
4. *Acharya Prafulla Chandra Ray*, C.U. p. 275

বিলম্ব হলো না। তাই কার্জন রোমকদের ভেদনীতি ও ম্যাকিয়াভেলির দুষ্ট নীতি অবলম্বন করে বাংলাকে ভাগ করার সঙ্কল্প করলেন। কার্জন এমন ব্যবস্থা করলেন "যাহাতে উত্তর-পূর্ব ভাগে মুসলমান সংখ্যাধিক্য হয়। তিনি তাঁহার মোহমুগ্ধ পরিষদবর্গের সাহায্যে মুসলমান জনসাধারণের, বিশেষভাবে তাহাদের নেতাদের সম্মুখে, নানা প্রলোভন প্রদর্শন করিতে লাগিলেন, যাহাতে তাহারা হিন্দুদের নিকট হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। বাংলাদেশের হৃদয়ে এমন এক শাণিত অস্ত্র সন্ধান করা হইল, যাহার ফলে বাঙালী জাতির সংহতি শক্তি নষ্ট হয়। হিন্দু-মুসলমানে চির বিরোধ উপস্থিত হয় এবং বাংলার জাতীয়তা ধ্বংস হয়।"[৫]

কিন্তু বাংলা গর্জে উঠল। বঙ্গভঙ্গ রদ করার জন্য দেশের আপামর জনসাধারণ সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে প্রবল আন্দোলনের সামিল হলো। রবীন্দ্রনাথের 'বাংলার মাটি বাংলার জল' গান আকাশে-বাতাসে ধ্বনিত হতে লাগল। বিদেশী দ্রব্য বর্জন শুরু হলো। প্রফুল্লচন্দ্রের মতে, কার্জন পরোক্ষভাবে বাঙালী জাতির জাগরণে সহায়তা করল : যারা ঘুমিয়েছিল, তারা জেগে উঠল।

প্রফুল্লচন্দ্র তখন সরকারী কর্মচারী ;বাধা-বিপত্তি ও নিষেধের গন্ডীতে আবদ্ধ। তাই এই আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে যোগদান করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। এ-বিষয়ে তিনি লিখেছেন,—"কিন্তু আমার গবেষণাগার হইতে আমি এই আন্দোলনের গতি লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। বলা বাহুল্য, এই আন্দোলন আমার হৃদয় স্পর্শ করিল। এই নব জাগরণের ফলে বিজ্ঞানের জন্যই বিজ্ঞান-সাধনার আদর্শ জাতির সম্মুখে উপস্থিত হইল।"[৬]

প্রফুল্লচন্দ্রের ধাতে রাজনীতি ছিল না, তিনি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের সভ্যও ছিলেন না। কিন্তু তেমন উপলক্ষ দেখা দিলে রাজনৈতিক ইস্যুতে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে দ্বিধাবোধ করেননি। টাউন হলে রাউলাট বিলের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করেছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের আহ্বানে। প্রফুল্লচন্দ্র বললেন, এমন সময় আসে যখন বৈজ্ঞানিককেও গবেষণাগার ছেড়ে দেশের আহ্বানে সাড়া দিতে হয়। অন্যত্র তিনি এই অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন যে, বিজ্ঞান অপেক্ষা করতে পারে, কিন্তু স্বরাজ অপেক্ষা করতে পারে না।

কংগ্রেসীদের কাছে তিনি ছিলেন অশেষ শ্রদ্ধার পাত্র। এমন সম্মান ও মর্যাদা আর কোন ব্যক্তিত্ব কখনো পেয়েছিলেন কিনা সন্দেহ। বহু সময় তিনি নানা সম্মেলনে উপস্থিত থেকে ভাষণ প্রদান করেছেন। এখানে একটি ঘটনার উল্লেখ খুবই প্রাসঙ্গিক হবে : 1925 সালে ডেলিগেট ও পর্যবেক্ষকরূপে আচার্য কোকনদ কংগ্রেসে উপস্থিত ছিলেন। সভাপতি মহম্মদ আলীর পাশেই ছিল তাঁর স্থান। নামাজের সময় উপস্থিত হলে জনাব আলী সভা থেকে অনুপস্থিত হবার সময় আচার্যদেবকে সভা পরিচালনার ভার অর্পণ করে গেলেন। সমবেত প্রতিনিধিগণ সানন্দে আচার্যদেবের সভাপতিত্বকে অভিনন্দিত করলেন।

5. *আত্মচরিত,* পৃ—১০৮
6. *তদেব,* পৃ—১০৮

ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলন তিনটি পথের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল : (a) শাসকবর্গের কুশাসনের প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে, সবিশেষ অনুনয় ও প্রার্থনার মধ্য মধ্য দিয়ে ও দরখাস্ত করে ;(b) গান্ধীজীর অহিংস অসহযোগিতার মধ্য দিয়ে, এবং (c) বন্দুক ও বোমার দ্বারা সহিংস বিপ্লবের মধ্য দিয়ে। আচার্য তিনটি মত ও পথের সমর্থক হলেও বিপ্লব আন্দোলনের মধ্যে দেশের প্রাণশক্তির উৎস তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, আবার গান্ধী-পথেও দেশের মুক্তি তাঁর দৃষ্টিপথে ধরা পড়েছিল। এক সময় চরখার ঘোর বিরুদ্ধাচারণ করেছেন, কিন্তু পরে নিজ হস্তে চরখা কেটেছেন, খদ্দরের লুঙ্গি ও ফতুয়া পরিধান করে দেশের দীনতমের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। ধুতি ও চাদর পরে ও তালচলার চটি পায়ে বিদ্যাসাগর যে দার্ঢ্য, ও স্বাদেশিকতার অহঙ্কার প্রকাশ করেছিলেন, আচার্যদেবও তেমনি বেশভূষায় আড়ম্বরহীনতা ও ঔদাসীন্য প্রকাশ করে চারিত্র্যশক্তির প্রাচুর্য ও আত্মদানের চরম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

1919 সালে জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকান্ডের পর রবীন্দ্রনাথ তাঁর সরকারী খেতাব 'নাইট' উপাধি ত্যাগ করেন। কিন্তু প্রফুল্লচন্দ্র তা করলেন না বলে অনেকে বিস্ময় প্রকাশ করেছিল। এই উপাধি ত্যাগ না করার পিছনে আচার্যের অন্তত একটি দূরদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। ওই উপাধির দৌলতেই তিনি অনেক বিপ্লবীকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন, আবার নিরাপদ আশ্রয়ও দিয়েছেন। রতনমণি চট্টোপাধ্যায় বর্ণিত একটি ঘটনা এখানে স্মরণ করা যেতে পারে : "১৯১৮-১৯ সালের কথা। একবার তাঁদের গ্রামের কুল-পুরোহিত-ঘরের এক ছেলের অনেক কাল কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। আচার্য সেই ফেরারী বিপ্লবীর জন্যে উদ্বেগ প্রকাশ করে বললেন, "সে ভাল আছে এই খবরটুকু পেলে, আমাদের গ্রামে তার বাড়িতে জানিয়ে দিই। তা হলেই তার বাড়ির লোক আশ্বস্ত হবে।"

"আমি বললুম, "তবে খবর পাঠিয়ে দিন, সে ভাল আছে।"

আচার্য আশ্চর্য হয়ে বললেন, "তাই বলি, তোমাদের ভেতর এই সব স্বদেশীর গোলমাল আছে বাপু। ঠিক খবর জান তো?"

আমি বললুম, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

আচার্য খুশি হয়ে তখনই খুলনার বিখ্যাত বিপ্লবী ফেরারি শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্তীর বাড়িতে তাঁর কুশল-বার্তা পাঠিয়ে দিলেন। তারপর তাঁরই আদেশে আমাকে একদিন চন্দননগরে শ্রীমতিলাল রায়ের প্রবর্তক আশ্রমে সতীশচন্দ্র চক্রবর্তীর সঙ্গে তাঁর অগ্রজের সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করতে হয়েছিল।"[7] বিপ্লবী কানাইলাল দত্তের প্রতি তাঁর সপ্রশংস মন্তব্য তাঁর *staunch revolutionary but in the garb of a scientist* এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দ্যোতিত করে। সেইজন্যই তাঁর *name was always in the black book.* তিনি কখনোই ইন্ডিয়ান এডুকেশন সার্ভিসপদ পেলেন না, প্রাদেশিক পদে থেকেই সরকারী কর্ম থেকে অবসর গ্রহণ করলেন।

1901 সাল থেকে গান্ধীজীর সহিত প্রফুল্লচন্দ্রের সাক্ষাৎ শুরু হয়, এবং তাঁরই

7. *আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের চিন্তাধারা,* পৃ—১৭৯

উদ্যোগে অ্যালবার্ট হলে গান্ধীজীকে প্রধান বক্তা করে জনসভা আহূত হয়। এই সময় থেকেই গান্ধীজীর প্রতি তিনি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। উভয়ের প্রকৃতির মধ্যে ত্যাগ ও তিতিক্ষায় বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়। গান্ধীজীর বহু গঠনমূলক কর্মসূচীর সমর্থক ছিলেন আচার্য ; খদ্দর ও চরখা প্রবর্তন ও প্রচারে তিনি ছিলেন গান্ধীজীর দক্ষিণ হস্ত, সত্যাগ্রহ ও নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের মর্ম উপলব্ধিকারী। তিনি প্রায়ই বলতেন,—"I am the disciple of the semi-naked Fakir". কিন্তু ন্যায়নিষ্ঠার দার্ঢ্যে ও আত্মিকশক্তির বজ্রকঠিন ইস্পাতে নির্মিত প্রফুল্লচন্দ্র কোন অসংলগ্ন ও অসঙ্গত বিষয়ের সঙ্গে আপোষ করেননি। তাই দেখা যায়, খিলাফৎ আন্দোলনের অশুভ দিকটির প্রতি ইঙ্গিত করতে কোন দ্বিধাবোধ করেননি তিনি। সুস্পষ্ট আচার্য-ভাষায় জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়ার সমাবর্তনে বললেন,— "I am certainly not impervious to the grandeur of the Pan-Islamic movement as one of the promising portents of the awakening of Asia, nor to the sublimity of the spiritual call of *Khalifa* upon the rank and file of the faithful in all parts of the world, but these demands must be all viewed in their proper perspective and must not be allowed to drown the call of Mother India herself to her sons for achieving an independent, sovereign, national life. We must not allow our loyalty to the mother country, be swamped by the wave of extra-territorial patriotism. India must not be a spoke in the *Khilafat* wheel gyrated from Istambul. The *Swaraj* of India must be our one all compelling goal and everything else must be kept in its place."[৪]

তাঁর স্বদেশপ্রেম ও পরাধীনতার গ্লানিবোধ সম্পর্কে প্রিয় ছাত্র জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ লিখেছেন,—"পরাধীনতার জ্বালা আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের মনকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল। স্বরাজ্যের স্বপ্ন তিনি দেখিতেন—স্বরাজ পাইবার জন্য পাগল হইয়া উঠিলেন। বাংলার যুবশক্তি দেশকে মুক্ত করিবার জন্য যে বৈপ্লবিক কর্মপ্রচেষ্টায় লিপ্ত ছিল তাহাতে আচার্য রায়ের সহানুভূতি ও অনুপ্রেরণা কম নহে। আচার্য রায়ের আবাসস্থল সায়েন্স কলেজ হইতে গোপনে শৈলেন ঘোষের আমেরিকা যাত্রা ইহার একটি দৃষ্টান্ত।"[৯] এই শৈলেন ঘোষ সত্যেন্দ্রনাথ ও মেঘনাদ সাহার সহিত একই বছরে পদার্থবিজ্ঞানে এম. এস-সি. পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন। কিন্তু বিপ্লবী ক্রিয়াকলাপের সহিত যুক্ত থাকার জন্য তাঁকে দেশত্যাগ করতে হয়।

সমাজ-ভাবনা ও সংস্কার

সমাজ-চিন্তক প্রফুল্লচন্দ্র সম্পূর্ণরূপেই রামমোহন-বিদ্যাসাগর প্রমুখের ন্যায় সর্ববিধ যুক্তিহীন কুসংস্কার, জাতিভেদ, ধর্মীয় গোঁড়ামি, নানা সামাজিক কুপ্রথা ও জীর্ণ আচারের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রামী। রামমোহন ও বিদ্যাসাগর যে অর্থে সমাজ সংস্কারক ছিলেন, সেই অর্থে প্রফুল্লচন্দ্র সমাজ সংস্কারক না হলেও দেশ ও জাতি গঠনে যে-সব

8. উদ্ধৃতিটি *Acharya Prafulla Chandra Ray*, ISNA, p. 111 থেকে গৃহীত।
9. *পশ্চিমবঙ্গ*, ১৪০৬, পৃ—১১

দুষ্ট ক্ষত সমাজ দেহে ক্যান্সারের লক্ষণ সুস্পষ্ট করে তুলছিল, সে-সব চিহ্নিত করে নানা লেখায় ও বক্তৃতায় দেশের শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করার অবিরাম প্রচেষ্টা করে গেছেন। গবেষণাগারে যাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় কেটেছে তাঁর পক্ষে কিভাবে জাতিগঠনের অন্তরায় যে-সব কারণ অচলায়তনের মত বিদ্যমান ছিল, তা দূরীকরণের জন্য নিরন্তর প্রয়াস অব্যাহত রেখেছিলেন,—একথা ভাবলে বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়। তিনি লিখেছেন,—"শ্রুতি ও স্মৃতি যেখানে পরস্পর বিসম্বাদী, সেখানে বিরোধ-মীমাংসায় স্মৃতি ছেড়ে শ্রুতির কথাই গ্রাহ্য। কিন্তু আমাদের এমনই দশা হয়ে পড়েছে যে, আমরা বরং সত্য ও শ্রুতি পরিত্যাগ করব, তবুও স্মৃতির উদ্ভুত বিধান ও লোকাচারের কঙ্কালরাশি কিছুতেই ছাড়তে পারব না। বিচার ও যুক্তির বশবর্তী হয়ে কোন হৃদয়বান ব্যক্তি যদি অর্থহীন নির্মম বিধিব্যবস্থার বিরুদ্ধে কোন কথা বলে, তবে সমাজ অমনি রক্ত-আঁখি হয়ে তার কড়া শাসনের জন্যে "একঘরের মস্ত বন্দোবস্ত" করতে উদ্গ্রীব হয়ে উঠবেন।"[10] আচার্যদেবের সমাজ-ভাবনা ও সংস্কারের সার্বিক আলোচনা এই গ্রন্থে সম্ভব নয় বলে আমরা কয়েকটি প্রধান প্রধান বিষয়ের ওপর সীমাবদ্ধ থাকব।

জাতিভেদ প্রথা

ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনত্ব সিন্ধুসভ্যতায় নিহিত থাকলেও এই সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিচয় ঋগ্বেদের যুগ (1500 B.C.) থেকে পাওয়া যায়। সাড়ে তিন হাজার বছর পূর্বের এই প্রাচীন গ্রন্থে জাতিভেদের কোন ব্যবস্থা দেখা যায় না, কিন্তু আর্য-অনার্য ভেদ দেখা যায়। ক্রমে গুণ ও কর্মের ভিত্তিতে বর্ণপ্রথার উদ্ভব হয় ;'বর্ণ' তখন জাতপাতের ব্যাপার ছিল না। তা ছিল সম্পূর্ণ গুণ ও কর্মের ভিত্তিতে সামাজিক গঠন। গীতায় বলা হয়েছে,—

চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগতঃ (4/13)

মহাভারতেও বলা হয়েছে,—

ক্রিয়াকর্মবিভেদেন চাতুর্বর্ণ্যং প্রতিষ্ঠিতম্।

প্রাচীন ভারতে চার জাতের ভেদ ছিল 'স্বভাব' বা 'স্ববৃত্ত'-এর ওপর ;তা কখনোই জন্মগত ছিল না। মহাভারতে সুস্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে,—

ন যোনি র্নাপি সংস্কারো ন শ্রুতং ন চ সন্ততি।
কারণানি দ্বিজত্বস্য বৃত্তমেবাত্র কারণম্।।

—জন্ম, সংস্কার, বিদ্যা বা বংশ দ্বিজত্বের কারণ নয়, বৃত্তিই হলো তার কারণ।

কিন্তু মনু তা মানতে রাজী নন। তাঁর মতে, জন্মই হলো জাতিভেদ নির্ণায়ক ;ব্রাহ্মণ সর্বশ্রেষ্ঠ ; ক্ষমাহীন জঘন্য অপরাধেও ব্রাহ্মণ মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হবে না, কেবল তাকে সমস্ত ধনের সহিত অক্ষত শরীরে নির্বাসিত করা হবে :

ন জাতু ব্রাহ্মণং হন্যাৎ সর্বপাপেষ্বপি স্থিতম্।
রাষ্ট্রাদেনং বহিষ্কুর্যাৎ সমগ্রধনমক্ষতম্।। 8/380

প্রাচীন ভারতে যে জাতপাতের মনু-বিহিত অনুশাসন ছিল না তার বহু প্রমাণ ও

10. *আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের চিন্তাধারা*, পৃ—১৩৪

দৃষ্টান্ত আচার্য প্রদান করেছেন : "যীশু ছুতোরের ছেলে, ভক্তবীর কবীরের জন্ম নীচ জোলার ঘরে। ভক্তমালে রুহিদাস প্রভৃতি অনেক সাধুর বর্ণনা আছে যাঁরা হীন বংশে জন্মলাভ করেছেন। মাদ্রাজে হীনবংশোদ্ভব অনেক তামিল সাধু ছিলেন এবং মুসলমানদের মধ্যে অনেক পীর ছিলেন যাঁদের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে মন্দির ও দরগা নির্মিত হয়েছে এবং উচ্চবংশীয় ব্রাহ্মণগণ তাঁদের দেবজ্ঞানে পূজা করেছেন। বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ বামুনের ঘরে জন্মগ্রহণ করেননি। বশিষ্ঠ, নারদ, ব্যাস প্রভৃতি দেবর্ষি ও মহর্ষিগণ উচ্চবংশোদ্ভূত নন—কেউ বা দাসীরপুত্র, কেউ বা বেশ্যাপুত্র।"[11] আচার্য তাঁর 'আত্মচরিত'-এ বহু উদাহরণ দিয়ে প্রমাণ করেছেন কিভাবে মুষ্টিমেয় মৌলবাদীরা কুচক্র ও কৌশল অবলম্বন করে ক্ষমতার উচ্চশিখরে অবস্থান করার জন্য দেশের বিশাল জনসমষ্টিকে সমাজদেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে 'পুরাণ-বর্ণিত কবন্ধ বিশেষে' পরিণত করেছে। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে এই ঘৃণ্য ও জঘন্য প্রথা না থাকার দরুণ মুসোলিনী, ম্যাসারিক, স্ট্যালিন, লয়েড জর্জ, বার্নস, ফ্যারাডে, কার্লাইল প্রমুখের ন্যায় প্রতিভার উদয় হয়ে দেশ ও দশের অশেষ কল্যাণসাধন করেছে।

History of Hindu Chemistry-র 'বিজ্ঞান ও শিল্পের অবনতি' শীর্ষক অধ্যায়ে কি পরিমাণে জাতিভেদ প্রথা জাতির গঠন ও বিকাশে প্রতিবন্ধক হয়ে উঠেছে, তার বিস্তারিত বিবরণ দেখা যায়। তিনি বলেছেন,—"চরক ও সুশ্রুত দেশীয় চিকিৎসা-প্রণালীর দুখানি মহাগ্রন্থ। এতে অবস্থা-বিশেষে এমন কি গোমাংস খাবারও কথা আছে। সুশ্রুতে শবব্যবচ্ছেদের রীতিমত ব্যবস্থা ছিল; কিন্তু মনু মহাশয় বলেন, শবস্পর্শ হলে জাতিচ্যুত হতে হবে।* সুতরাং ব্যবস্থা হয়ে গেল, শবব্যবচ্ছেদের স্থানে অতঃপর লাউব্যবচ্ছেদ হবে ; অর্থাৎ লাউ কেটে মনুষ্য শরীরের শিরা-উপশিরা প্রভৃতির সংস্থান জানতে হবে। ব্যবস্থাটা কতকটা সেই কলাগাছ বিয়ে করার মত নয় কি? জাতিচ্যুতির ভয় দেখিয়ে এমনি করে যখন স্বাধীন চিন্তার গলা টিপে মারা হল, তখন 64 কলাবিদ্যা লোককে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করে অন্তর্হিত হয়ে গেল। বিজ্ঞানের যা কিছু রইল—তা Surgeon পরামাণিক, Botanist বেদে, আর Metallurgist ভীল কোল সাঁওতালদের হাতে। আঙুলের নৈপুণ্যে ঢাকাই মস্‌লিন অতি সূক্ষ্ম হল বটে, কিন্তু মস্তিষ্কের দৌড় ওই "পাত্রাধার তৈল বা তৈলাধার পাত্র"-এর বেশী আর গেল না। বুদ্ধি জড় আর আড়ষ্ট হয়ে উঠল। তাই পর্যবেক্ষণ-পরীক্ষণের দ্বারা বস্তুর প্রকৃতি বিচার করে, ঘটনা পরম্পরার কার্যকারণ-সম্বন্ধ নির্ণয়ের চেষ্টা লুপ্ত হল। সামাজিক অত্যাচারের ফলে সাধারণ লোক অস্পৃশ্য ও মূর্খ হয়ে পশুত্বে নেমে গেল। ওদিকে ইংলন্ডে আর্করাইট নাপিত ছিলেন, ক্ষৌরকর্মের

11. *তদেব, পৃ*—১৩৭-৩৮

'শবং তৎস্পৃষ্টিনঞ্চৈব স্পৃষ্ট্বা স্নানেন শুদ্ধতি' (মনুস্মৃতি, 5/85) ; আবার, শবের সরস ও শুষ্ক অস্থিস্পর্শে শুদ্ধ হওয়ার বিধানঃ নারং স্পৃষ্ট্বাস্থি সস্নেহং স্নাত্বা বিপ্রো বিশুধ্যতি।

আচম্যৈব তু নিঃস্নেহং গামালভ্যার্কমীক্ষ্য বা॥ 5/87

—মৃত মনুষ্যের সরস অস্থি স্পর্শ করলে দ্বিজাতিগণ স্নান দ্বারা শুদ্ধ হন ; কিন্তু শুষ্ক অস্থি স্পর্শস্থলে আচমনপূর্বক গাভী স্পর্শ অথবা সূর্যদর্শন করে শুদ্ধ হওয়া যায়।

দ্বারা জীবিকা অর্জন করতেন—কিন্তু স্বীয় অসাধারণ প্রতিভাবলে বস্ত্রবয়ন-কল আবিষ্কার করে যুগান্তর উপস্থিত করলেন। ... সুতরাং দেখা যাচ্ছে, আমাদের দেশে স্বাধীনচিন্তা ও কর্মশক্তি লুপ্ত হয়ে গিয়ে বিদ্যা ও বিজ্ঞানচর্চার যে শোচনীয় অবস্থা হয়েছে তার জন্য জাতিভেদ বড় কম দায়ী নয়।"[12]

বাংলাদেশে জাতিভেদ প্রথা ক্রমশ শিথিল হয়ে পড়ায় ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যের পর সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনে ও শিক্ষাদীক্ষা গুণে অন্য অনেক জাতি ক্রমে মুখ তুলে দাঁড়াচ্ছে; মনু-রঘুনন্দনের বেড়াজালে আবদ্ধ গোঁড়া ব্রাহ্মণ ছাড়া আর সবাই তাদের স্বীকৃতি দিতে দ্বিধা করছেন না। কিন্তু মাদ্রাজে বর্তমান তামিলনাড়ুতে জাতিভেদের শাসন অতীব নিষ্ঠুর ও ভয়ঙ্কর। বহু দিন আগে স্বামী বিবেকানন্দ এই জাতের নামে বজ্জাতির কথা তাঁর গুরুভাই রামকৃষ্ণানন্দকে লিখেছেন,—"ওরে ভাই, দক্ষিণ দেশে যা দেখেছি, উচ্চজাতির নীচের উপর যে অত্যাচার! মন্দিরে দেবদাসীদের নাচ ধুম! যে ধর্ম গরীবের দুঃখ দূর করেনা, মানুষকে দেবতা করে না, তা কি আর ধর্ম? আমাদের কি আবার ধর্ম? আমাদের ছুঁৎমার্গ; খালি আমায় 'ছুঁয়ো না, আমায় ছুঁয়ো না'। দেশের বড় বড় মাথাগুলো আজ দু'হাজার বছর খালি বিচার করছে, ডান হাতে খাব, কি বাম হাতে। ডান দিক থেকে জল নেব, কি বাঁদিক থেকে এবং 'ফট্ ফট্ স্বাহা' ক্রাং ক্রুং হুঁ হুঁ করে, তাদের অধোগতি হবে না কার হবে?"[13] মাদ্রাজে আয়ার ও আয়েঙ্গাকাররাই ব্রাহ্মণ, আর সব ব্রাহ্মণেতর জাতিই নীচ ও অস্পৃশ্য। মাদ্রাজের পেরিয়াদের অবস্থা অতীব শোচনীয়। তারা জন্মের পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত, বংশ পরম্পরায় মাথা হেঁট করে থাকে। তাদের ছায়াস্পর্শে ব্রাহ্মণদের প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। তাদের পথে বেরুলে চিৎকার করে জানান দিতে হয়, "মহাশয় সরে যান, আমি অধম যাচ্ছি। আবার, কোন হতভাগ্যের গলায় ঘন্টা বাঁধা থাকে 'শুচি' ব্রাহ্মণদের সতর্ক হওয়ার জন্য। আচার্যদেব মানবতার এমন কদর্য ও ক্যুৎসিত অপমানে আহত হয়েছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, যাদের এরূপ অপমান করা হচ্ছে, একদিন তাদের সবার সমান অবশ্যই হতে হবে—"অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান"।

জাতিভেদের শিকার হয়ে সমাজের নিম্নস্তরের মানুষ অবহেলিত, উপেক্ষিত ঘৃণিত হওয়ায় ফলে দেশের প্রাণশক্তি কিভাবে পঙ্গু হয়ে পড়ে আচার্য রাষ্ট্রপতি উইলসনের *New Freedom* গ্রন্থ থেকে প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করে তাঁর বক্তব্যের প্রামাণিকতা দেখিয়েছেন। উইলসনের মতে, মানুষের জ্ঞানসম্পদ অতিসাধারণ মানুষের জীবনের অভিজ্ঞতার ওপর প্রতিষ্ঠিত। ঐক্য, জীবনীশক্তি ও সাফল্য ওপর থেকে নীচে চুইয়ে পড়ে না, যেমন, গাছ মূল থেকেই রস আহরণ করে বেড়ে ওঠে, মানব-সমাজেও ঠিক তেমনি ঘটে। যে-সব অজ্ঞাত ও অখ্যাত মানুষ সমাজের নিম্নস্তরের মূলদেশে থেকে জীবন সংগ্রাম করছে, তাদেরই প্রচন্ড শক্তির সাহায্যে সমাজ উন্নত হয়ে উঠছে। কোন জাতির লোকেরা যে পরিমাণে মহৎ, উদার ও উন্নত হয়, জাতিও ঠিক সেই পরিমাণে

12. *তদেব,* পৃ—১৪২-৪৩

13. *আদর্শ শিক্ষক সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ,* পৃ—৬২

মহৎ ও উন্নত হয়। কিন্তু আমাদের দেশে জাতের নামে বজ্জাতির জন্য চামার, জোলা, তাঁতি, নাপিতদের সেই একঘেয়ে পৈতৃক ব্যবসা করতেই হবে ; তাদের উন্নতি নেই, জীবনে কোন পরিবর্তন নেই, আনন্দই নেই। অথচ এরাই সমাজের বৃহত্তম অংশ।

ভারতকে জাতিভেদের নির্বুদ্ধিতার জন্য অপরিসীম ক্ষতি সহ্য করতে হচ্ছে। "জাতিভেদ বুদ্ধি ও প্রতিভাকে কেবল মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে আবদ্ধ রাখে নাই, ইহা অন্তর্বিবাদ ও কলহের অন্যতম প্রধান কারণ।" তাই আজ দিকে দিকে আঞ্চলিকবাদ ও বিচ্ছিন্নতাবাদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে ; সন্ত্রাসবাদেরও জন্ম এই ভেদমূলক জাতিপ্রথা থেকে। স্বাধীনতার পর ভারতীয় মহাজাতি গঠন হয়নি। তাই মাঝে মাঝে অসম অসমীদের, উড়িষ্যা ওড়িয়াদের, বিহার বিহারীদের, মহারাষ্ট্র মহারাষ্ট্রীদের ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। 'বৈচিত্র্যের মাঝে ঐক্য'—এই ধারণা প্রকৃতপক্ষে উপনিবেশের সমর্থক ব্রিটিশ ঐতিহাসিকদের। অতীব পরিতাপের বিষয়, আচার্যের স্বচ্ছ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে মহান ভারত গঠনের যে প্রধান ও মূল অন্তরায় ধরা পড়েছিল, তা নিরসনের জন্য আমাদের দেশের তথাকথিত নেতৃবৃন্দ উপলব্ধি করতে পারেননি। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ তপশীলি জাতি, উপজাতি নাম দিয়ে জাতপাতের নব সংরক্ষণ করেছেন, কিন্তু তাদের সামাজিক ও আর্থিক উন্নতির কোন প্রচেষ্টা করেননি। বজ্জাতি চলছে নতুন নামে, নতুন অভিধায়।

অস্পৃশ্যতা

জাতপাতের কঠোরতা ও অনমনীয়তার মধ্য দিয়েই অস্পৃশ্যতার অনুপ্রবেশ সমাজ দেহে। বিশ্বের অন্যত্র অর্থনৈতিক কৌলীন্যের জন্য মানুষের মধ্যে বিভেদ ও পার্থক্য দেখা গেলেও জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা ভারতীয় সমাজের দুষ্ট ব্রণস্বরূপ। খ্রীস্টীয় প্রথম শতক অর্থাৎ মনুর আগে থেকেই জাতপাত ও অস্পৃশ্যতার প্রারম্ভ বলে ধরা যেতে পারে। বিদেশী আক্রমণ ও বৌদ্ধধর্মের পতনের ফলে ব্রাহ্মণ্যবাদ ক্রমশ শক্তিসঞ্চার করে সমাজকে অক্টোপাশের বন্ধনে আবদ্ধ করে শ্বাসরোধ করার প্রয়াস চালায়, এবং গুপ্তযুগে তা আরো বৃদ্ধি পায়। হিন্দুধর্ম সহিষ্ণুতা ও উদারতা বিসর্জন দিয়ে জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতার মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করতে থাকে, এবং নানা লোকাচার ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হয়। মনুসংহিতায় চতুর্বর্ণের বাইরে নানা অস্পৃশ্য জাতির উল্লেখ দেখা যায় : পৌন্ড্রক, ওড্র, দ্রাবিড়, কম্বোজ, চন্ডাল, শ্বপচ, নিষাদ, মেদ, চুঞ্চু, অন্ধ্র, মদগু, বেণ ইত্যাদি, চন্ডাল ও স্বপচদের সম্বন্ধে মনু বলেছেন :

চন্ডালশ্বপচানাস্তু বহির্গ্রামাৎ প্রতিশয়ঃ।
অপপাত্রাশ্চ কর্ত্তব্যা ধনমেষাং শ্বগর্দ্দভম্।। 10/51

চন্ডাল ও শ্বপচদের বাসস্থান, পোষাক-পরিচ্ছদ, সম্পদ, আচার-ব্যবহার প্রভৃতির যে বর্ণনা মনুসংহিতায় পাওয়া যায় তা অন্ত্যজ ও অস্পৃশ্য জাতিদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এরা পাহাড়ের কাছে, শ্মশানে, বনে বা গ্রামের বাইরে কোন স্থানে বাস করে। এদের বাসনপত্রও ছোঁয়া দোষের ; এরা ভাঙা পাত্র ব্যবহার করে ; কুকুর ও গাধা এদের সম্পদ ; মৃতের কাপড়-চোপড় এদের পরিধান, এরা সব সময় এখানে-ওখানে

ঘুরে বেড়ায় ; সাধুদের দ্বারা এদের দর্শন নিষিদ্ধ ; দিনের বেলাতে এরা শরীরে বিশেষ চিহ্ন ধারণ করে নগরে প্রবেশ করতে পারত ('দিবা চরেয়ুঃ কার্য্যার্থং চিহ্নিতা')।

বৈদিক যুগের বর্ণভেদ ক্রমশ মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রমুখের আদেশে জাতিভেদে পরিণত হলো, অস্পৃশ্য চন্ডাল, শ্বপচদের সম্প্রসারণ ঘটিয়ে অসংখ্য অস্পৃশ্য জাতের উদ্ভব হলো—"নমঃশূদ্র, পোদ প্রভৃতির কথা দূরে থাকুক,—সাহা, তিলি বণিকরা পর্যন্ত যেন সমাজদেহের অকর্মণ্য অঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে এবং বিদ্যুৎপ্রবাহ চালাইয়াও তাহাদের মধ্যে জীবনীশক্তি সঞ্চার করা যায় না।"[14] আচার্য অস্পৃশ্যতা সম্বন্ধে 'বিকাশ' পত্রিকায় (অগ্রহায়ণ, ১৩২৯) বিস্তারিত আলোচনা করেন ('অস্পৃশ্যতা ও জাতিগঠনের অন্তরায়')। 1924 সালে হিন্দু মহাসভার ফরিদপুর অধিবেশনে আহ্বায়ক সমিতির সভাপতি হিসাবে এই প্রশ্ন উত্থাপন করেন যে, ব্রাহ্মণদের মধ্যে দ্রাবিড়, শক, হুণ প্রভৃতির আকৃতির ও প্রকৃতিগত সবিশেষ পরিলক্ষিত হলেও জাতিগত বৈষম্য ও অস্পৃশ্যতা মানা হবে কেন। এর উত্তরে এগিয়ে এসেছিলেন গান্ধীজী তাঁর 'হরিজন' অভিধা নিয়ে। কিন্তু আমাদের বিদ্বান ও মননশীল এবং সমাজসেবী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের ক্ষমতার লোভে ও ঐশ্বর্য-কামনায় সব হারিয়ে গেল। জাতপাত তপশীলি ও তপশীলি উপজাতির মধ্যে বিরাজ করতে লাগল।

সমুদ্রযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা

ঋগ্বেদের যুগে ভারতীয়দের সমুদ্র-পরিচিতি কতখানি ছিল, এ-সম্পর্কে দ্বিমত থাকলেও বুদ্ধের আবির্ভাবকালের মধ্যেই যে ভারত সমুদ্রযাত্রায় বাণিজ্য তরী ভাসিয়ে বার্মা (বর্তমান মায়নামার), মালয় ও ইন্দোনেশিয়া দ্বীপপুঞ্জে উপস্থিত হতো, তাতে কোন সন্দেহ নেই। খ্রীস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে রোমের সহিত বাণিজ্য ঐতিহাসিক ঘটনা। কুশান যুগে ভারতের স্থলপথে ও সমুদ্রপথে বহির্বাণিজ্যের কথা জানা যায়। রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর গুপ্ত যুগের পূর্বেই ভারতের সহিত চীনের বাণিজ্যের বিবরণ জানা যায়। বিশালকায় জাহাজ না হলেও মাঝারি ও ছোট জাহাজ যে এদেশে নির্মিত হতো, তাতে সন্দেহ নেই। অজন্তা গুহায় তিন-মাস্তুল বিশিষ্ট জাহাজের প্রতিকৃতি দেখা যায়। জাতকের গল্প থেকে জানা যায়, ভৃগুকচ্ছ থেকে বভেরু অর্থাৎ ব্যাবিলনের সহিত সমুদ্রপথে বাণিজ্য চলত। 'মিলিন্দ পঞহো'-তে বার্মা, মালয়, চীনা ও আলোকজান্দ্রিয়ার সহিত বাণিজ্যের উল্লেখ আছে। ষষ্ঠ অথবা সপ্তম শতাব্দীর একটি গল্পে এক বণিকপুত্রের মাদাগাস্কার অথবা জাঞ্জিবারে বাণিজ্যের বিবরণ আছে।[15] ভারতের পশ্চিম উপকূলের প্রধান বন্দরগুলি ছিল ভৃগুকচ্ছ, সুপার ও পটল। ভারতের রোম ও অন্যান্য দেশের সহিত বাণিজ্যের কথা প্রথম শতাব্দীর *The Periplus of the Erythrean Sea* ও টলেমীর *Geography* থেকে জানা যায়। ভারতীয় বণিকরা দ্রব্যসামগ্রীর পরিবর্তে সোনা গ্রহণ করত। ভারতে প্রচুর রোমান স্বর্ণমুদ্রা আবিষ্কৃত হওয়া তার অন্যতম কারণ।

---

14. *আত্মচরিত*, পৃ—৩৯৬
15. *The Wonder That Was India*, p. 227

কিন্তু মুসলমান আক্রমণের পর থেকেই ভারতের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার দ্রুত অবনতি হতে থাকে। ধর্মশাস্ত্র ও স্মৃতি শাস্ত্রের নানা বিধি, উপবিধি ও তার অপব্যাখ্যার ফলে সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ হতে থাকে। ধর্মীয় অনুশাসন জারি হলো 'কালাপানি' পার হলেই 'জাত' যাবে। মাতৃভক্ত আশুতোষ সে-কারণে কখনো বিদেশযাত্রা করতে পারলেন না। যাই হোক, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ফিনিসিয়া, কার্থেজ, ভেনিস ও ফ্লোরেন্সের উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছেন সমুদ্রযাত্রা কিভাবে জাতির ঐশ্বর্য বৃদ্ধি ও রাজনৈতিক বোধ জাগ্রত করে। তিনি আরো বলেছেন,—"... কোন দেশে, শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে উন্নত মতবাদ এবং রাজনৈতিক চেতনা, সমুদ্রযাত্রা এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে ঘনিষ্ঠরূপে জড়িত। যেসব দেশ কেবলমাত্র কৃষিবৃত্তির উপর নির্ভর করিয়াছে, সেখানেই স্বেচ্ছা-শাসনতন্ত্র এবং বিদেশী শাসনের প্রাধান্য দেখা গিয়াছে। তাহার অধিবাসীরা সাধারণতঃ প্রাচীন প্রথা ও কুসংস্কার আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকে এবং তাহাদের দৃষ্টি সঙ্কীর্ণ ও অনুদার হইয়া পড়ে।"[16]

বহির্জগত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ভারত কূপমন্ডুক হয়ে উঠল ; সমাজের বাইরের লোকদের ম্লেচ্ছ বলে নিজেদের গুটিয়ে রাখল ; ভাব ও ভাবনার আদান-প্রদান স্তব্ধ হয়ে গেল। নিজেদের অধঃপতন ও অবক্ষয় ধর্মীয় আফিমে বুঁদ হয়ে থাকার দরুন দেখতে পেল না। ভারত 'বিদেশী আততায়ীদের মৃগয়াক্ষেত্রে' পরিণত হলো।

ধর্মীয় ভাবনা

প্রাচীন অভিজাত ও সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম প্রফুল্লচন্দ্রের। পিতামহ আনন্দলাল তো বিধবা বিবাহের তীব্র বিরোধী ছিলেন ; ধর্মীয় গোঁড়ামি থেকে তিনি মুক্ত হতে পারেননি। কিন্তু পিতা হরিশ্চন্দ্র ছিলেন আশ্চর্য ব্যতিক্রম। এমন উদার ও মুক্ত মনের মানুষ সে-যুগে কমই দেখা যায়। প্রগতিশীল সব রকমের ভাবনা ও সমাজ সংস্কারে তাঁর সমর্থন দেখা যায়। স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে তাঁর প্রচেষ্টা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি। তা ছাড়া তাঁর সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা আমরা আগেই করেছি। এখানে এইটুকু বলা দরকার যে, প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর পিতার উদার ও মুক্ত মনের পূর্ণ উত্তরাধিকার পেয়েছিলেন।

কবে থেকে ব্রাহ্মমতে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলেন প্রফুল্লচন্দ্র তার সন-তারিখ নির্ণয় অসম্ভব। তবে তাঁর জীবনে ব্রহ্মবান্ধব কেশবচন্দ্র সেনের চৌম্বক প্রভাব দেখা যায়, তেমনি আবার তাঁর শিক্ষক কৃষ্ণবিহারী সেন, আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায়, মহেন্দ্রনাথ দাঁ প্রমুখের অপরিসীম প্রভাবও বর্তমান। বাল্যকালেই পড়েছিলেন 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা, অক্ষয়কুমার দত্তের লেখা ; অ্যালবার্ট স্কুলে ছাত্রাবস্থায় নিয়মিতভাবে পড়তেন কেশবচন্দ্রের 'সুলভ সমাচার', আর তাঁর প্রতিটি বক্তৃতায় যোগ দিতেন। ব্রাহ্মসমাজের আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল হিন্দুধর্মের অন্ধবিশ্বাস বিদূরিত করে মূল ধর্মতত্ত্ব প্রচার, জাতিভেদ প্রথার উচ্ছেদ, সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণ, কুপ্রথা ও কুসংস্কারের মূলোচ্ছেদ, স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার ইত্যাদি। ব্রাহ্মসমাজের জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম, সমাজ-উন্নয়ন ও

16. *আত্মচরিত,* পৃ—৩৯৯

সংস্কারের ভাবধারায় আকৃষ্ট হয়েছিলেন প্রফুল্লচন্দ্র ; ধর্মমোহ ও আধ্যাত্মিকতার আদর্শ কখনো তাঁকে ধর্মবাদী করে তোলেনি। ধর্ম ও সমাজ সম্বন্ধে তাঁর যুক্তি ও ন্যায়বোধই তাঁকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দিকে আকৃষ্ট করেছিল। তাই তিনি সাগ্রহে যোগ্যতার সহিত 'ব্রাহ্মবন্ধু সভা' ও 'সান্ধ্য সম্মিলনী' পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। ধর্মোপসনার চেয়ে ব্রাহ্ম যুবকদের মনে সমাজ-জাগরণ ঘটানোই তাঁর কাছে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তথাকথিত ব্রাহ্মধর্মের অন্তর্ভুক্ত হলেও আসলে প্রফুল্লচন্দ্রের ধর্মের মূল ভিত্তি ছিল সমাজ-কল্যাণ ও সংস্কার, মানবসেবা, "এক জাতি, এক ধর্ম, এক আত্মা ও এক দেশ"। এখানে মৌলবাদিতা, সঙ্কীর্ণতা ছিল না, ছিল স্বদেশ, সমাজ ও জাতি-বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে সর্বজনীন মানব-কল্যাণ। তাই রাজনীতিক না হয়েও তিনি রাজনীতিক, বিপ্লবী না হলেও বিপ্লবী ; জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা ও নানা কুসংস্কার ও কুপ্রথার আজীবন আপোষহীন সংগ্রামী ও বিদ্রোহী। ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করা প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন :

"শতাব্দীর পুঞ্জীভূত কুসংস্কার, অন্ধ ধর্মীয় আচার-আচরণ ও সামাজিক কুপ্রথাদির তমসাচ্ছন্ন গ্রাম্য পরিবেশ হইতে আমি যখন প্রথম কলিকাতায় আসি, তখন ব্রাহ্মধর্মের যুক্তিপূর্ণ চিন্তাধারায় উদ্ভাসিত হইয়া দেশে অসাম্য ও অসত্যের সামাজিক বন্ধন-মুক্তির স্বর্ণযুগ চলিতেছিল। সেই সময় হইতেই আমি ব্রাহ্মধর্মের সমাজ-কল্যাণ ব্রতকে আমার জীবনের ভিত্তিরূপে গ্রহণ করিতে আরম্ভ করি।"

হিন্দুধর্মের রক্ষণশীলতায় ইসলাম ধর্মের প্রসার

ব্রাহ্মধর্মের তাত্ত্বিক ও আধ্যাত্মিক দিকে প্রতি আচার্যের আকর্ষণ ছিল না। সমাজ-কল্যাণ, কুসংস্কার দূরীকরণ ও প্রগতিশীল চিন্তাধারায় তাঁর মানসিক কাঠামো গঠিত হয়েছিল। ভারতে ইসলাম ধর্মগ্রহণ ও ধর্মান্তকরণ সম্পর্কে যে প্রধান কারণ তিনি উপস্থিত করেছেন, তা হলো হিন্দুধর্মের অতীব কঠোর রক্ষণশীলতা ও অনুদার দৃষ্টিভঙ্গী। বলা বাহুল্য, শাসককুলের সহায়তায় উলেমা, মৌলভী ও মোল্লারা জোর করেও যেমন বহু হিন্দুকে ধর্মান্তরিত করেছে, তেমনি আবার আর্থিক প্রলোভনে পড়েও অনেকে মুসলমান হয়েছে ; সামাজিক মর্যাদাহীন নিম্ন ও অন্ত্যজ শ্রেণীর অনেকে আবার স্বেচ্ছায় ধর্মান্তরিতও হয়েছে। তাঁর মতে, "হিন্দুধর্মকে উদার ও সার্বভৌম প্রমাণ করিবার জন্য এত বেশী সময় ব্যয় হয়েছে যে, তদনুসারে কাজ করিবার সময় পাওয়া যায় নাই।" হিন্দুধর্মের নেতাদের ভণ্ডামীতে বিরক্ত হয়ে অনেকে অন্য ধর্মের আশ্রয় শ্রেয় বলে মনে করেছে। এ-বিষয়ে আচার্য শ্রীহট্টের সুনীমগঞ্জের নমঃশূদ্রদের মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করার দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন। "উচ্চবর্ণীয় হিন্দুদের অত্যাচার এবং ঢাকার একজন মুসলমান মৌলভীর প্রচারকার্যের ফলেই এরূপ ব্যাপার ঘটিয়াছে।"[17] একই পাদটীকায় আচার্য ইসলাম ধর্মের বহুল বিস্তৃতি সম্পর্কে বলেন,— "ইসলামধর্মের দৃষ্টি উদার গণতন্ত্রমুলক। জনৈক আধুনিক লেখক বলিয়াছেন— "ইসলামধর্ম মরুভূমির মধ্যে জন্ম লাভ করিয়াছিল। মরুভূমি সাম্যবাদের প্রধান ক্ষেত্র।

17. *আত্মচরিত*, পৃ—৪১০, পাদটীকা—১৯

ইসলামধর্ম অতি শীঘ্রই তিন মহাদেশে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। ইহার মধ্যে কোন দিনই জাতিবৈষম্য নাই। ইসলামের নিকট সব মুসলমানই ভাই ভাই, তাহারা—বান্টু বা বার্বার, তুর্ক বা পারসীক, ভারতবাসী অথবা জাভাবাসী—যাই হোক না কেন। এ কেবল ভাবজগতের সাম্য নহে, দৈনন্দিন জীবনে ও সামাজিক আচার-ব্যবহারে এই সাম্যের প্রত্যক্ষ পরিচয় পাওয়া যায়। এই সাম্যই দরিদ্র ও নিম্নস্তরের লোকদের ইসলামধর্মে আকর্ষণ করে; তাহারা জানে যে ইসলামধর্ম গ্রহণ করিলে, অন্য সমস্ত মুসলমানের সমান হইবে।"

মসজিদে আমির এবং ফকির পাশাপাশি থাকিয়া উপাসনা করে। এই কারণেই মালয় উপনিবেশ, জাভা, বোর্নিও এবং সুমাত্রায় ইসলাধর্ম এত দ্রুত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছেন।"

আচার্যের মতে, বাংলাদেশের গন্ধবণিক, সুবর্ণবণিক, সাহা, তিলি ব্যবসায়ী জাতিরাও মুসলমান হয়ে যেত, যদি না শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব হতো। শ্রীচৈতন্যের সাম্য ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের আহ্বান ও জাতিভেদ উচ্ছেদ করার চেষ্টায় এই ধর্মান্তকরণ রোধের সম্মুখীন হয়।

ইসলামধর্মে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে উদারতা ও সাম্য বর্তমান থাকলেও ইসলাম-বিরোধীরা তাদের মতে কাফের। অস্বীকার করার হেতু নেই, ভারতীয় মুসলমানদের পা ভারতের মাটিতে হলেও মস্তিষ্ক আরবে। ধর্মের ভিত্তিতে, সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে উপমহাদেশের বিভাগ ও কাশ্মীর সমস্যা সৃজন দেখলে আচার্য মুসলমানদের সম্বন্ধে কি ভাবতেন, তা অনুমানের বিষয়। আবুল কালাম আজাদ, ডঃ জাকির হোসেন, মহম্মদ আলী প্রমুখের ন্যায় মুসলমানের সংখ্যা হাতে গোনা যেতে পারে। খুবই আশ্চর্যের বিষয়, বিশ্বসন্ত্রাসবাদী বিন লাদেন ও সন্ত্রাসবাদের আশ্রয় দাতা তালিবান সরকারের সমর্থকদের অভাব এ-দেশে বিরল নয়। বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের প্রতিক্রিয়া যে-যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত, তা দেখলে এই উদার মানবপ্রেমী আচার্য কি ভাবতেন?

নারী ও নারীসমাজ

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের স্বদেশ ও সমাজ সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনার গভীরতা ও ব্যাপ্তিতে বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না। জাতিগঠনের সার্বিক দিক নিয়ে ক্লান্তিহীন প্রচেষ্টা—কখনো বক্তৃতা, কখনো লেখা, আবার কখনো কার্যক্রম গ্রহণ করে সমস্যা সমাধানের প্রয়াস অব্যাহত রাখা তাঁর সমকালে আর কেউ করছেন কিনা, সন্দেহের বিষয়। প্রফুল্লচন্দ্র কখনো দারপরিগ্রহ করেননি সত্য, কিন্তু নারী ও নারীসমাজের মূল সমস্যাগুলি তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। বস্তুতপক্ষে, সমাজে নারীদের অবস্থান, শিক্ষা, প্রভাব, কর্মসংস্থান, স্বনির্ভরতা ও বিভিন্ন পরিবেশ-পরিস্থিতি সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন। আচার্যদেবের স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার, বিধবা বিবাহ সমর্থন অবশ্যই পৈতৃক অধিকার থেকে প্রাপ্ত; আবার ব্রাহ্মসমাজের কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় তাঁর প্রচেষ্টা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে বলা চলে। পিতৃবন্ধু বিদ্যাসাগরের ন্যায় নারীজাতির প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা

পোষণ করতেন প্রফুল্লচন্দ্র ; তাঁদের 'মা-লক্ষ্মী' বলে সম্বোধন করতেন। 'আত্মচরিত'-এর মুখবন্ধে লিখেছেন,—"এই পুস্তকখানিকে জনসাধারণের বিশেষতঃ গৃহলক্ষ্মীদের অধিগম্য করিবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি হয় নাই।" অসহযোগ আন্দোলনের সময় দেশবন্ধু কারারুদ্ধ হলে বাসন্তী দেবীকে 'প্রিয় ভগিনী' সম্বোধন করে সহানুভূতিপূর্ণ চিঠিতে লিখলেন,—"আপনি আপনার দুঃখ অপূর্ব সাহস ও আনন্দের সঙ্গে বহন করিতেছেন। বাংলার সম্মুখে নারীত্বের যে উচ্চ আদর্শ আপনি স্থাপন করিয়াছেন, তাহা সেই অতীত রাজপুত গৌরবের যুগকেই স্মরণ করাইয়া দেয়।"

প্রথম যৌবনে যখন এডিনবার্গ-এ অধ্যয়ন করছেন প্রফুল্লচন্দ্র তখন তরুণীদের সঙ্গে আলাপ ও আলোচনায় আড়ষ্টতা বোধ করতেন। বস্তুতপক্ষে, বয়স্ক পুরুষদের সঙ্গে নানা বিষয়ের আলোচনায় যেমন স্বচ্ছন্দবোধ করতেন, তরুণীদের সঙ্গে আলোচনায় তেমনি সঙ্কোচবোধ করতেন। এ-বিষয়ে তিনি লিখেছেন,—"কিন্তু যখনই তরুণীদের সঙ্গে আমার পরিচয় হইত, আমার কেমন সঙ্কোচ বোধ হইত এবং মামুলী আবহাওয়া, জলবায়ু ইত্যাদি বিষয় ছাড়া আর কোন বিষয়ে কথা বলিতে পারিতাম না। ঐরূপে দুই চারিটা কথা শীঘ্রই শেষ হইয়া যাইত এবং নতুন কোন বিষয় খুঁজিয়া না পাইয়া আমি অপ্রতিভ হইয়া পড়িতাম। আমার কোন কোন ভারতীয় বন্ধু নারী মহলে আলাপ পরিচয়ে বেশ সুপটু ছিলেন। ঘটনাক্রমে কোন সমাজের মধ্যে পড়িলে তাহার 'ধাত' বুঝিয়া আলাপ জমাইয়া তুলিবার মত দক্ষতা আমার ছিল না। কেহ যেন মনে



নারীকল্যাণ সমিতিতে প্রফুল্লচন্দ্র

না করেন যে, আমি নারীবিদ্বেষী ছিলাম অথবা নারী জাতির সৌন্দর্য ও মাধুর্য অনুভব করিবার শক্তি আমার ছিল না। বস্তুতঃ রসায়নশাস্ত্রের খ্যাতনামা প্রবর্তক ক্যাভেন্ডিশের

চেয়ে এ বিষয়ে যে আমি সৌভাগ্যবান ছিলাম, এজন্য নিজেকে ধন্য মনে করি।"[18] বিদেশী তরুণীদের সামনে সঙ্কোচবোধ, আলাপে খেই হারিয়ে ফেললেও দেশে ফিরে তাঁর এই অপ্রতিভ মনোভাব ছিল না। তবে 'ধাত' বুঝে কথা না বলতে পারার জন্য কোন প্রখ্যাত সংস্কৃতিসম্পন্ন পরিবারের তরুণীর পাণিপ্রার্থনা করে প্রত্যাখাত হয়েছিলেন জীবনে। প্রফুল্লচন্দ্র চিরদিন ব্রহ্মচারী রয়ে গেলেন, আর 'ধাত' বোঝার কোন প্রচেষ্টাই করলেন না। যদুনাথ সরকার তাঁর 'A Twentieth Century Rishi' প্রবন্ধে এই তথ্য পরিবেশন করে লিখলেন—"It was gain to science and all the country and to himself also personality."

দার পরিগ্রহ করলেন না, পুত্র-কন্যার জনক হলেন না সত্য, কিন্তু তিনি হয়ে উঠলেন ভারতের রসায়নের জনক, বহু ছাত্ররূপী সন্তানের পিতা, আর বহু নারীর বন্ধু ও ভাই যাঁদের সঙ্গে মধুর প্রীতির সম্পর্ক আচার্যের মহান ব্যক্তিত্বের সূক্ষ্ম দিকটি উন্মোচিত করে।

ফ্রেন্ড-ফিলজফার-গাইড

1888 সালের আগস্ট থেকে 1889 সালের জুন মাসের শেষ পর্যন্ত প্রফুল্লচন্দ্র ছিলেন বেকার ; অস্বস্তির জীবন তখন। এই নিদারুণ দুঃসময়ে আচার্য জগদীশচন্দ্র ও অবলা বসু তাঁকে জীবনযুদ্ধে লড়াই করার প্রেরণাই দেননি, সাগ্রহে সম্মানীয় অতিথি হিসাবে তাঁকে গ্রহণ করেছেন। প্রফুল্লচন্দ্র প্রায়ই আতিথ্য গ্রহণ করেছেন, কোন দ্বিধাবোধ করেন নি। এই আতিথ্য গ্রহণ সম্ভব হয়েছিল লেডী বসুর আন্তরিকতা ও উদারতার জন্য। উভয়ের মধ্যে ভ্রাতা-ভগিনীর প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। লেডী বসু ভাইফোঁটা দিয়ে এই সম্পর্ক আরো মধুর করে তুললেন। অতঃপর প্রেসিডেন্সী কলেজে যোগদানের পর প্রফুল্লচন্দ্র প্রায়ই গল্প-গুজব করার জন্য জগদীশচন্দ্রের দোতালার বারান্দায় লেডী বসু ও বিখ্যাত বিজ্ঞানী দেবেন্দ্রমোহন বসুর মাতা স্বর্ণপ্রভার আসরে উপস্থিত হতেন। দেবেন্দ্রমোহন সকৌতুকে লিখেছেন,—"During this period I found Prafulla Chandra's visit to my family rather inconvenient; my misdeeds in the college were duly reported to my mother."[19] প্রায়ই প্রফুল্লচন্দ্র ভৃত্য গফ্ফরকে দিয়ে একটি চিরকুটসহ গুড়ের মোয়া উপহার পাঠাতেন ভগিনী অবলাকে।

এই ভ্রাতা ও ভগিনীর সম্পর্কের একটি চমৎকার কাহিনী বর্ণনা করেছেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়। একবার মাসের শেষে খুবই টানাটানি চলছে। আচার্য জ্ঞানেন্দ্রনাথকে মিতব্যায়ী হতে বললে তিনি অকুল পাথারে পড়লেন। এমন সময় কলকাতার কোন এক বিখ্যাত ব্যারিস্টারের বাড়ী থেকে বিবাহের নিমন্ত্রণ এল। বিরাট টিফিন বাক্স নিয়ে চললেন আচার্যদেব; নিজে কিছু খান না, তবে টিফিন বাক্স ভরপুর হয়ে আসাই প্রথা। ছাত্ররা সবাই মিষ্টান্নাদির অপেক্ষায় আছে, আচার্যের জন্য রাতের খাবারও রাঁধা হলো

18. *আত্মচরিত*, পৃ—৫৪-৫৫

19. *Acharya Prafulla Chandra Ray*, C.U., p. 124

না। উনি যথাসময়ে ফিরে এলেন। কিন্তু বাক্স খুলে দেখা গেল কয়েকটি লুচি আর দুটি রসগোল্লা! অতঃপর জ্ঞানেন্দ্রনাথের ভাষায় শোনা যাক : "He wanted me to go to next door (Sir J. C. Bose's house) and enquire discreetly at the kitchen if they had any spare food. After ascertaining the fact, I was to see Lady Bose, but on no account I was to see her first. As ill luck would have it, Lady Bose saw me from her room talking with the cook and wanted to know who I was and what was my business. She had perhaps seen me with Acharya Ray but was not able to recognise me. She thought I was some kind of a vagabond and nearly told me so, as I was not able to give a coherent answer to her questions. When things were looking very dark for me, I blurred out the truth. She quickly got a tiffin carrier ready and proceed to the Science College to deliver it with some home truths to Acharya Ray. Acharya Ray was shocked to see Lady Bose at that hour with the food and gave me very dark looks. Lady Bose told him that she had repeatedly suggested his meals being sent out from her house, but Acharya Ray had always declined it for no apparent reason. Now he must have all meals sent to him daily."[20] ভ্রাতা-ভগিনীর কী মধুর সম্পর্ক! ছোট বোন কর্তৃক বড় ভাইকে শাসন করার কী মহিমাহিম রূপ!! বড় ভাই-এর কাচুমাচু ভাবের মধ্যে স্নেহের কী অপরূপ প্রকাশ!!!

প্রত্যেক গ্রীষ্মের ছুটিতে খুলনা গমন ছিল প্রফুল্লচন্দ্রের বাঁধাধরা নিয়ম। সেবার 1939 সালে দৌলতপুর পৌঁছে শুনলেন কবি মানকুমারী বসু তাঁর চৌষট্টি বছরের কন্যার মৃত্যুতে শোকে বিহ্বল হয়েছেন। শোনামাত্র অপটু দেহে চললেন কবি সন্নিধানে। আচার্যদেবকে দেখেই কবি হাউ হাউ করে কেঁদে তাঁর কোলে আছড়ে পড়লেন। আচার্যদেব সস্নেহে কবির মাথায় হাত বুলিয়ে তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে শোকসংবরণে সাহায্য করলেন। এই কবি-ভগ্নীর সহিত তাঁর মধুর সম্পর্ক চিরদিন অম্লান ছিল। দার্শনিক অনাসক্তির এক অনবদ্য প্রভাব তাঁর মাঝে সর্বদা বিরাজ করত।

'অবলাবন্ধব' দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের পত্নী ছিলেন প্রথম মহিলা স্নাতক ও ডাক্তার কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়। দ্বারকানাথ অল্প বয়সে মারা গেলে সংসারসহ ছোট ছোট পুত্রকন্যাদের সব দায়িত্ব এসে পড়ে কাদম্বিনীর ওপর। প্রায়শ কাদম্বিনী সংসার সংগ্রামে হতাশ হয়ে পড়তেন ও ক্লান্তিবোধ করতেন। ওই সময়—ওই কঠিন সময়ে আচার্যদেব প্রায়ই সেখানে গিয়ে সংসারের খোঁজখবর নিতেন, কাদম্বিনীকে উৎসাহিত, অনুপ্রাণিত ও উদ্দীপ্ত করতেন। কাদম্বিনীর পুত্র প্রভাতকুমার আচার্যদেবের গাইড-ভূমিকার কথার স্মরণ করে লিখেছেন,—"...কোন সমস্যা উপস্থিত হলে, সে সম্পর্কে তাঁর মতামত সহৃদয়তার সহিত ব্যক্ত করতেন। সেই সব সমস্যার সমাধান করার জন্য তাঁর আপ্রাণ চেষ্টা তার সঙ্গে যুক্ত হত। .... আমরা শুধু তাঁকে চিনতে

20. *Ibid*, p. 204

শিখেছিলাম আমাদের পরিবারে অতি ঘনিষ্ঠ বান্ধব বলে ও পরম আত্মীয় বলে।"[21] কাদম্বিনীর কন্যা জ্যোতির্ময়ীকে তিনি 'মা লক্ষ্মী' বলে ডাকতেন, এবং তাঁর সবিশেষ স্নেহ ও আশীর্বাদের পাত্রী ছিলেন।

জাতিগঠনে দুর্বল দিক : স্ত্রীশিক্ষা

চিন্তানায়ক আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র জাতিগঠনে নানা দিক চিহ্নিত করে দুর্বল দিকগুলির প্রতি অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। নানা বক্তৃতা ও বিভিন্ন সময়ে অবিশ্রান্ত লেখনী চালনা করে দেশবাসীকে সচেতন করার প্রয়াস পেয়েছেন। স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি যেমন তাঁর পিতৃদেব ও পিতৃবন্ধু বিদ্যাসাগরের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছে, তেমনি ব্রাহ্ম সমাজের আদর্শও তাঁকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। 'এখন ও তখন' প্রবন্ধে (প্রবাসী, আশ্বিন, ১৩২৭) তিনি বলেছেন,—"দেশে স্ত্রীশিক্ষার অভাবে সমাজদেহের আধখানা তো অসাড় গতিহীন হয়ে পড়ে আছে।" আবার জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ গঠিত হলে তাতে স্ত্রীশিক্ষার স্থান না থাকায় আচার্যদেব তীব্র সমালোচনা করে বললেন,—"বর্তমান সময়ে জাতিগঠনের আন্দোলনে লোকশিক্ষা বা স্ত্রীশিক্ষার স্থান আমরা কোথায় দিয়েছি? বাঙলার নবজাগরণের দিনে যখন জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত হল, তখন ব্রজেন্দ্র কিশোর পাঁচ লক্ষ টাকা দিলেন, সুবোধচন্দ্র এক লক্ষ টাকা দিলেন, কিন্তু সে সময়ে পৃথিবীতে স্ত্রীজাতি বলে যে কেউ আছেন একথা তাঁরা একেবারেই ভুলে গেলেন। মা, ভগ্নী, সহধর্মিনীকে মূর্খ করে রাখলে কি লাঞ্ছনা হয় তা তো আমরা প্রতি পদে বুঝতে পারছি। তবু তো আমাদের চেতনা হয় না। ... তাদের গন্ডমূর্খ ও অকেজো পুতুল করে রেখে আমরা সমাজে আধখানা অঙ্গ কে পক্ষাঘাতে পঙ্গু করে রেখেছি।"[22] সন্তানের সাফল্য ও কৃতিত্বের পিছনে পিতামাতার অবদান বিষয়ে কার্নেগী তাঁর আত্মচরিতে বলেছেন,—"মা, ধাত্রী, রাঁধুনী, গবর্নেস, শিক্ষক, ধর্মের আদর্শ সবই একজন।"[23] বাড়ীর মা বোনেরা মূর্খ হলে তাদের সন্তানের পক্ষে শিক্ষার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করা সম্ভব নয়।

তাই ভারতবর্ষের সবচেয়ে depressed class-এর উন্নতিকল্পে আচার্যদেব স্বয়ং অগ্রসর হলেন। পিতৃদেব প্রতিষ্ঠিত ভুবনমোহিনী বালিকা বিদ্যালয়ের সংস্কার ও উন্নতিকল্পে প্রভূত অর্থ সাহায্য করলেন ; তাঁরই উদ্যোগ ও পৃষ্ঠপোষকতায় দুঃস্থ ও অনাথা নারীদের কল্যাণে 'বিদ্যাসাগর বাণীভবন' প্রতিষ্ঠিত হয়। যশোহর জেলার 'জেনানা সম্মিলনী' 'যশোহর-খুলনা সম্মিলনী' নামে চালু হলে আচার্যদেব হন তার সভাপতি। মেয়েরা লেখাপড়া শিখলে বিধবা হবে,—এই অন্ধ কুসংস্কারের পদমূলে কুঠারাঘাত করে চললেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র,—বাংলা মাসিক পত্রিকাগুলিতে ক্রমাগত লিখে চললেন নারীসমাজকে সচেতন করার জন্য।

21. *Ibid*, p. 253
22. *আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের চিন্তাধারা*, পৃ—১২৯
23 *আত্মচরিত*, পৃ—২১২, পাদটীকা—১১

কৌলিন্য—পণপ্রথা—বিধবা বিবাহ

কৌলিন্য প্রথার উদ্ভব সেন যুগে—বল্লালসেনের সময়। কুলীন হতে হলে নয়টি গুণের অধিকারী হতে হয়, যেমন, আচার, বিনয়, বিদ্যা ইত্যাদি (নবধা কুললক্ষণম্)। কিন্তু ব্রাহ্মণরাই কুলীন হলেন ; গুণ থাক বা নাই থাক কুলীন ব্রাহ্মণের পুত্ররাও কুলীন হলেন। ঘটকপ্রবর দেবীবর বংশের দোষ দেখে দেখে দোষীদের একত্র করে মেল বাঁধলেন। সামাজিক প্রথা ও বিধি হলো মেলে মেলে বিয়ে দিতে হবে, মেলের বাইরে হলেই কৌলিন্য-চ্যুতি। 'অঘরে' মেয়ের বিয়ে দিলে কুলনাশ। কুলীন কন্যার কুলীন পাত্রের সঙ্গেই বিয়ে হবে, 'অঘরে' হবে না। অতঃপর আচার্যদেবের ভাষায়,—"কিন্তু ফল হল বিষময়। পাত্রের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম হওয়ায়" কুলীনের কুলরক্ষা করাই কুলীনের ধর্ম" হয়ে উঠল। আর ব্রাহ্মণের ছেলে কদাপি ধর্মপালনে পরাঙ্মুখ নন! তাই পূর্ণ উদ্যমে কেউ ৬০, কেউ ৭০, কেউ ৮০টি পর্যন্ত বিবাহ করে বসলেন এবং পাকা খাতায় বিবাহের 'লিষ্টি" করে রেখে দিলেন।"[24] এইভাবে কোন কোন কুলীন কন্যার বিবাহ হলো, কিন্তু অনেকে 'বিবাহধবা' হয়ে রইল। আর যাদের বিবাহের কোন উপায় রইল না, তাদের বৃদ্ধের সহিত বিবাহ দিয়ে কুলরক্ষা করার উপায় নির্ধারিত হলো। সমাজে দুর্বৃত্তের অভাব নেই। কোন কোন তরুণীর পা ফস্কাল ; ভ্রষ্টাচার ও ব্যাভিচার বৃদ্ধি পেতে থাকল ; অর্থশালী ও জমিদারদের বাগান বাড়ীতে রক্ষিতার পোষণ চলল।

কৌলিন্য প্রথার নামে নারীজাতির অবমাননা ও সমাজপতিদের মধ্যযুগীয় কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধ্যান-ধারণা বিরুদ্ধে আচার্যদেব তীব্র ভাষায় বলেছেন, মেল বন্ধন প্রকৃতপক্ষে উদ্বন্ধন। এই কৌলিন্য প্রথা ও বাল্যবিধবাদের পুনর্বার বিবাহ করার উপায় না থাকার জন্যই উপপত্নী ও রক্ষিতা সমাজে ছড়িয়ে পড়ছে। আর এই নির্যাতন ও নিপীড়নের হাত থেকে রেহাই এবং কলঙ্কময় জীবন থেকে মুক্তি পাবার জন্য অনেকে ইসলামধর্ম গ্রহণ করে উদ্বাহসূত্রে আবদ্ধ হতে চাইছে। (আচার্যবাণী)

পণপ্রথা সমাজদেহের আর এক দুষ্ট ব্যাধি। এই একবিংশ শতাব্দীতেও এই প্রথা বর্তমান, এবং নগদ অর্থে ও আসবাবপত্রে এর উত্তরোত্তর বৃদ্ধি বড়ই শঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারী মূর্খরা এর পরিপোষক,—এই অভিজ্ঞতা অনেকের আছে বলে মনে হয়। এই মূর্খদের আচার্যদেব ক্লাশে কশাঘাত করে বলেছিলেন,—"Each and everyone of you is a potential murderer of Shehalata." কিন্তু মূর্খরা যমের স্বরূপ, তাদের সম্বিৎ এখনো ফিরেনি। নারীদের পরিত্রাণ, পাষণ্ডদের বিনাশের জন্য আচার্য আবার জন্মগ্রহণ করুন, যুগ-যুগের অপেক্ষা যেন না করেন।

পাতিত্য সমস্যা

সত্যই আচার্যদেব ছিলেন দ্বিতীয় বিদ্যাসাগর। তিনি যেমন নিজের যথাসর্বস্ব 'বহুজন হিতায়' দান করে নিঃস্ব ও নিঃস্বম্বল অবস্থায় এই বাংলা তথা ভারতভূমি ত্যাগ

24. *আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের চিন্তাধারা,* পৃ—১৩৭

করে চলে গেছেন, তেমনি তাঁর অসীম করুণা, স্নেহ ও সহানুভূতি দিয়ে তিনি অনেক অনাথা দুর্দশাগ্রস্থ বালবিধবাদের স্বাবলম্বী হবার আত্মশক্তি জাগ্রতও করেছেন। বারবণিতারাও তাঁর অমৃতঘন করুণা ও স্নেহ ও সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত হয়নি। বারনারীদের সমস্যা নিয়ে বহু আলোচনা করেছেন। 1920 সালে বেঙ্গল কেমিক্যাল প্রেস থেকে প্রচার করেন 'জাতিভেদ ও পাতিত্য' সমস্যা ; খুলনার পৌণ্ড্রিক ক্ষত্রীয় সমাজ সভায় সভাপতিরূপে পাতিত্য সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন। ফরিদপুরে হিন্দু মহাসভার সম্মেলনে তিনটি মূলবান প্রস্তাবের মধ্যে একটি হলো "যে সমস্ত কুলবধূ প্রতিনিয়ত আমাদের গৃহ হইতে অপহৃত হইতেছে এবং দুর্বলতা ও কাপুরুষতা প্রযুক্ত যাহাদিগকে আমরা দুবৃর্ত্তের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারি না তাহাদিগকে উদ্ধার করা ও সমাজের বক্ষে স্থান দেওয়া।" কিন্তু অতীব পরিতাপের বিষয়, এই বাংলায় তথা ভারতে দ্বিতীয় প্রফুল্লচন্দ্রের উদয় হলো না, এমন কি তাঁর জীবনী ও বাণী পাঠ করার অবসর ও অবকাশও কারুর হলো না। রবীন্দ্র শতবর্ষের আড়ালে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ঢাকা পড়ে গেলেন। প্রফুল্লচন্দ্রের ওপর সবিশেষ গবেষণা পর্যন্ত বিরল। কিন্তু তৎকালে বারনারীরা আচার্যকে ভোলেননি, আচার্যদেবকে পিতৃজ্ঞানে তাঁরা পূজা করতেন। এই রকম একটি কাহিনীর বর্ণনা করেছেন রতনমোহন চট্টোপাধ্যায় উত্তর বঙ্গের বন্যায় ত্রাণসামগ্রী সংগ্রহ প্রসঙ্গে : "... এমন সময় ক'বোঝা কাপড়-চোপড় এবং কিছু সংগৃহীত অর্থাদি নিয়ে ক'জন নারী আপিস ঘরের দ্বারদেশে এসে উপস্থিত হল। এরা বারনারী। "এস মা লক্ষ্মীরা" বলে আচার্য তাদের সাদরে আহ্বান করলেন। পিতার সেই অকৃত্রিম স্নেহের আহ্বানে পরিত্যক্তাদের মুখ দীপ্ত হয়ে উঠল। অকথিত থাকলেও তাদের মুখের ভাবে এই কথাটাই স্পষ্ট হয়ে উঠল যে, এমন প্রাণভরা আপন-করা সহজ আহ্বান তারা তো কই আর কখনও শোনে নি।"[25]

অনাথা দুর্দশাগ্রস্থ বিধবা ও অন্যান্যদের চরখা কেটে জীবিকার্জনের উপায় নির্ধারণ করেছিলেন আচার্যদেব। এই উদ্দেশ্যে চরখা বিতরণ ও আর্থিক সাহায্যও ছিল। সব শহরের শিক্ষিত মহিলাদের উদ্দেশ্যে তাঁর আহ্বান ছিল পল্লীগ্রামের মেয়েদের পথ দেখাতে। সমাজ সংস্কারের বহুবিধ দিকে বিজড়িত থেকেও নারীজাতির কল্যাণে, তাদের আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠায় দৃঢ়কণ্ঠে বৈষম্য দূরীকরণের আপ্রাণ প্রচেষ্টা করে গেছেন যিনি তিনি হলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়।

25. *তদেব*, পৃ—১৭৪

দশম অধ্যায়

বাংলা ও বাঙালী

1935 সালের 4ঠা নভেম্বর আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র কর্তৃক মেঘনাদ সাহাকে লিখিত একটি চিঠির অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা যাক :

"আমি ইদানীং বেজায় ব্যস্ত। বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ ভাবিয়া হতাশ। Behar, U.P., Oudh, Punjab প্রভৃতি স্থানে বাঙ্গালীরা চাকরীর লোভে যাইয়া একশত বৎসর পূর্ব্ব হইতে colony স্থাপন করিয়াছে। আর তাহাদের বংশধরেরা আজ কোন রকম চাকরী পায় না। তুমিইত বলিয়াছ তাহারা ফতুর—so many paupers. আর বঙ্গালার দুর্দ্দশাও সেই প্রকার। "নিজ দেশের পরবাসী" হইতে চলিল। কলিকাতার বড়বাজার, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ বাদ দিলেও নূতন যে মানিকতলা street যেমন বিবেকানন্দ রোড, সেখানেও বড় বড় ৫-তলা বাড়ী উঠিতেছে সবই মাড়োয়ারী ভাটিয়ার। কলিকাতায় মাড়োয়ারীরা, যথা নাগরমল সূরজমল প্রভৃতি, একক (i.e. not as joint stock company) ১৫ লক্ষ, ১৮ লক্ষ দিয়া ৩/৪টি বৃহৎ sugar mill করিয়াছে কিন্তু আমরা sixteen percent protection পাইয়াও কিছুই করিতে পারিলাম না। এমন দেখিতেছি সমস্ত জমিদারীও ক্রমশঃ অবাঙ্গালীর হাতে যাইতে বসিল ইত্যাদি। এইসব ভাবিয়া আমি শেষ জীবনে বড়ই উদ্বিগ্ন ও হতাশ। সম্প্রতি অন্নসমস্যা ও বাঙ্গালীর পরাজয় বলিয়া একখানা বই লিখেতেছি। তাহাতে কেন বাঙ্গালী সর্ব্বক্ষেত্র হইতে জীবন সংগ্রামে হটিয়া যাইতেছে তাহার সবিশেষ অলোচনা করিতেছি।"[1]

ভারতে ইংরেজ রাজত্বের কুশাসন, তাদের বৈষম্যমূলক নীতি ও শোষণের বিরুদ্ধে কলম ধরেছিলেন ছাত্রাবস্থায় এডিনবার্গে যখন *India before and after the Mutiny* ও *Essays on India* রচনা করেন। কিন্তু বাংলা ও বাঙালীর দুর্দশা ও শোচনীয় অবস্থার বিশ্লেষণ ও প্রতিকারের উপায় সম্বন্ধে কখন থেকে চিন্তা-ভাবনা শুরু করেন তা সঠিকভাবে নির্ণীত না হলেও, BCPW-এর জন্মলগ্ন যে তার প্রারম্ভ তা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। প্রফুল্লচন্দ্র জগৎবিখ্যাত বিজ্ঞানী, ভারতে রসায়নচর্চার জনক, ছাত্র-অন্ত-প্রাণ, সমাজসেবা ও জনহিতকর কার্যে অত্যুৎসাহী ও সর্বস্বত্যাগী ব্রহ্মচারী ঋষি ; আবার তিনি ভারতের সুসন্তান, স্বরাজের জন্য পাগল, দেশ ও জাতির সার্বিক কল্যাণ ও উন্নয়নে সদাজাগ্রত কর্মবীর ; তাই হাজার হাজার মাইল অপটু শরীরে দেশের সর্বত্র ভ্রমণ করে দেশবাসীকে জাগরণের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ ও দীক্ষিত করার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। এতে বাকসর্বস্বতা নেই,

1. *Acharya Prafulla Chandra Ray,* C.U. p. 294-95

অতিরঞ্জন নেই, এ-সব সত্য। কিন্তু সর্বভারতীয় ব্যক্তিত্ব হয়েও বাঙালী, নিখাদ বাঙালী। বাংলা ও বাঙালীর জন্য এমন গভীর চিন্তা ও আকুতি অন্য কোন বাঙালী মনীষীর মধ্যে অদ্যাবধি দেখা যায়নি। তাঁর সামাজিক ও অর্থনৈতিক চিন্তাভাবনার সিংহভাগ জুড়ে আছে বাংলা ও বাঙালী। এই সম্বন্ধে প্রচুর লিখেছেন তিনি, কখনো প্রবন্ধে, কখনো পুস্তিকায়। তাঁর 'আত্মচরিত'-এও বাংলার শোচনীয় অবস্থার বিবরণ ও কারণ নিপুণতার সহিত গ্রন্থিত হয়েছে, আর বাঙালী চরিত্রের স্বভাব, প্রকৃতি ও প্রবণতার দিকগুলিও চিহ্নিত হয়েছে। তাঁর পূর্ববর্তী, সমকালীন ও পরবর্তী প্রখ্যাত ব্যক্তিত্বদের সহিত তুলনামূলক আলোচনায় এ-সব যেমন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, তেমনি আচার্যের শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্ব উপলব্ধিতে তা অপরিহার্য। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের সীমিত পরিসরের জন্য সংক্ষিপ্ততা অবলম্বন করা ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই।

বাংলা—লুটেরার স্থায়ী বিচরণ ভূমি

ইতিহাস থেকে বাংলাদেশের শক্তপোক্ত আর্থিক বুনিয়াদের চিত্র পাওয়া যায় না। 'গোলাভরা ধান, গোয়াল ভরা গরু, পুকুর ভরা মাছ' সাধারণ বাঙালীর ছিল না। সাধারণ মানুষ চিরকাল দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে এসেছে ; কোন রকমে মোটা কাপড় পরে ও মোটা চালের ভাত খেয়ে জীবনধারণ করেছে। 'প্রাকৃতপৈঙ্গল'-এর একটি পদে সাধারণ বাঙালীর জীবনচিত্র এভাবে অঙ্কিত হয়েছে :

ওগ্‌গর ভত্তা, রম্ভঅ পত্তা।
গাইক ঘিত্তা, দুদ্ধ সজুত্তা।।
মোইলি মচ্ছা, নালিচ গচ্ছা।
দিজ্জই কন্তা, খাঅ পুণ্যবন্তা।।

—"ওগরাভাত কলাপাতায় ঢালা, গব্যঘৃত, সুস্বাদু দুগ্ধ, মৌরল্যা মাছ, নালতে শাক রন্ধন করিলেন কান্তা। দিতেছেন কান্তকে, আহার করিতেছেন পুণ্যবান।"[2]

চন্ডীমঙ্গলের আখেটিক খন্ড তো দারিদ্র্যে মোড়া। মুকুন্দরাম কালকেতু-ফুল্লরার জীবনের মধ্য দিয়ে সেকালের দরিদ্র বাঙালীকেই দেখেছেন। গ্রামীণ জীবনের যে অভাব-অনটনের ছবি কবি প্রত্যক্ষ করেছেন, অনুভব করেছেন তাই প্রতিফলিত হয়েছে কালকেতু ফুল্লরার মধ্যে, চন্ডীমঙ্গলে সাধারণ বাঙালী জীবনের প্রকৃত বাস্তব চিত্র পাওয়া যায়, আর তা দারিদ্র্যপীড়িত জীবন।

মোগল যুগেও বাংলাদেশ নিজের শাসন-ব্যয় সঙ্কুলান করতে পারত না ; বাংলার সামরিক ব্যয়ভার অন্যান্য সুবা থেকে সংগৃহীত হতো। ঔরঙ্গজেব মুর্শিদকুলি খাঁকে বাংলার দেওয়ান নিযুক্ত করার পর বাংলার রাজস্ব তখন এক কোটি টাকায় দাঁড়াল। দিল্লীশ্বরকে রাজস্ব দেবার জন্য বাংলার সমস্ত রৌপ্য শোষণ করা হতো, কিন্তু তার কিয়দংশও আর ফিরে আসত না। ফলে, মুর্শিদাবাদের কোষভাণ্ডার প্রায় শূন্যে পরিণত হতো ; "ব্যবসা-বাণিজ্য বা বাজার-হাট করাই কঠিন হইত"।

2. *বাংলা সাহিত্যে ইতিবৃত্ত*, প্রথম খন্ড, পৃ—১০৩

অতঃপর মহারাষ্ট্রের ভাস্কর পন্ডিতের নেতৃত্বে বর্গী হাঙ্গামা। ধন-সম্পত্তি লুণ্ঠন ও চৌথ আদায় করে বর্গীরা নিয়ে গেল কয়েক কোটি টাকা ; জগৎশেঠের বাড়ী থেকেই দু-কোটি টাকা লুণ্ঠিত হলো। কিন্তু তবুও বাংলার ধনসম্পদ ও আর্থিক ভান্ডার নিঃশেষিত হয়নি ; শেঠ ভ্রাতৃদ্বয় তখনো কোম্পানীকে এক এক বারে এক কোটি টাকার 'দর্শনী' বা হুন্ডি দিতে সক্ষম ছিল। দিল্লীশ্বরদের শোষণ, বর্গীদের লুণ্ঠন ছিল সাময়িক, এবং তা কাটিয়ে ওঠার সামর্থ্য বাংলার ছিল।

কিন্তু পলাশীর যুদ্ধের পর বাংলার আর্থিক শোষণ নতুন রূপ পরিগ্রহ করল। বাংলা শাসনের ক্ষমতা প্রকৃতপক্ষে ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর হাতে এসে গেল ; মুর্শিদাবাদের মসনদ পরপর নীলামে সর্বোচ্চ দরে বিক্রী হতে লাগল। বাংলার মসনদে নতুন নতুন নবাবকে বসিয়ে কোম্পানী পাঁচ-ছ' কোটি টাকা উপার্জন করল। এই বিপুল পরিমাণ অর্থের সিংহভাগ ইংলন্ডে প্রেরিত হলো। 'পলাশীর পোষণ' শুরু হলো।*

1765 সালে দিল্লীর মোগল সম্রাটের কাছ থেকে দেওয়ানি পেয়ে কোম্পানী আইনত ও কার্যত বাংলার শাসনকর্তা হয়ে বসল। নবাবকে ছাব্বিশ লক্ষ টাকা কর, ভাতা, আর রাজস্ব আদায়ের খরচ বাদ দিয়ে অবশিষ্ট টাকা মূলধন হিসাবে খাটানো হতে থাকল। এই অর্থের অধিকাংশ দিয়ে পণ্য ক্রয় করে রপ্তানী করতে থাকল কোম্পানী যার স্বল্পাংশও বাংলায় আর ফিরে এলো না। রাজস্বের উদ্বৃত্ত অংশ মূলধনরূপে কিভাবে খাটানো হতো, এবং বাংলার পক্ষে তা কিরূপ বিষময় ফল প্রসব করেছিল, প্রফুল্লচন্দ্র তা একটি রিপোর্ট থেকে উদ্ধৃত করেছেন :

"বাংলার রাজস্বের কিয়দংশ বিলাতে রপ্তানি করিবার উদ্দেশ্যে পণ্য ক্রয় করিবার জন্য পৃথকভাবে রাখা হইত এবং ইহাকেই 'ইনভেস্টমেন্ট' বলিত। এই 'ইনভেস্টমেন্ট'-এর পরিমাণের উপর কোম্পানির প্রধান কর্মচারীদের যোগ্যতা নির্ভর করিত। ভারতে দারিদ্র্যের ইহাই ছিল প্রধান কারণ, অথচ ইহাকেই তাহার ঐশ্বর্যের লক্ষণ বলিয়া মনে করা হইত। অসংখ্য বাণিজ্যপোত ভারতের মূল্যবান পণ্যসম্ভারে পূর্ণ হইয়া প্রতি বৎসর ইংলন্ডে আসিত এবং জনসাধারণের চোখের সম্মুখে ঐ ঐশ্বর্যের দৃশ্য প্রদর্শিত হইত। .... ঐ রপ্তানী পণ্যের দ্বারা এরূপও মনে করা হইত পারিত যে, প্রতিদানে ইংলন্ড হইতেও পণ্য সম্ভার ভারতে রপ্তানি হয় এবং সেখানকার ব্যবসায়ীদের মূলধন বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ইহা প্রকৃতপক্ষে বাণিজ্য সম্ভার নয়, ভারতের পক্ষ হইতে প্রভু ইংলন্ডকে দেয় বার্ষিক কর মাত্র ....।"[3] কেবল এভাবেই শোষণ চলত না। চীনের সহিত ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য কোম্পানী বাংলা থেকে প্রতি বৎসর আড়াই লক্ষ পাউন্ড নিত ; মাদ্রাজ ও বোম্বাই-এর শাসন-ব্যয়ভার বাংলা থেকে সংগ্রহ করা হতো। মারাঠা ও টিপু সুলতানের সহিত যুদ্ধের ব্যয়ভারও বাংলাকে যোগাতে হতো। 'ঈস্ট

* **আচার্যদেব পলাশী শোষণের এরূপ সংজ্ঞা দিয়েছেন : যে আর্থিক শোষণের ফলে বাংলার ধন ক্রমাগত ইংলন্ডে চলিয়া যাইতেছে, তাহারই নাম 'পলাশী পোষণ'। 'আত্মচরিত', পৃ—৩৩৪।**

3. *আত্মচরিত,* পৃ—৩৩৩

ইন্ডিয়া বিল'-এর আলোচনাকালে বিখ্যাত বাগ্মী এডমন্ড বার্ক ইংরেজ শোষণের এক জ্বলন্ত চিত্রে বলেন,—"তাতার অভিযান অনিষ্টকর ছিল বটে, কিন্তু আমাদের 'রক্ষণাবেক্ষণই' ভারতকে ধ্বংস করিতেছে। তাহাদের শত্রুতা ভারতের ক্ষতি করিয়াছিল আর আমাদের বন্ধুতা তাহার ক্ষতি করিতেছে। .... ইংরাজদের লাভের প্রত্যেকটি টাকা, ভারতে সম্পদকে ক্ষয় করিতেছে।"[4]

মুসলমান শাসকরা উপদ্রব, অত্যাচার ও লুণ্ঠন করেনি, তা নয়। তবুও সেই ধন তাদের পারিবারিক সম্পত্তিকে পরিণত হতো, এবং বিলাস-ব্যসন বা অন্যভাবে ব্যয় করায় প্রজাদের হাতে ফিরে গিয়ে দেশেই থাকত। শাসকদের স্বেচ্ছাচার ছিল, অশান্তি সৃষ্টি করতেও দ্বিধা করত না সত্য, কিন্তু এতে দেশের ধনোৎপাদনের উৎসগুলি শুকিয়ে যেতনা : ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের উন্নতি ব্যাহত হতো না।

1757 সালে পলাশী বিজয়ের পর ত্রিশ বৎসরে বাংলা থেকে ইংলন্ডে ঐশ্বর্যের স্রোত বইতে লাগল। 1886 সালে ব্রহ্ম বিজয়ের পর কুড়ি বৎসর যাবৎ সেই দেশের শাসন-ভার বহনের জন্য বাংলাকেই নিঃশেষিত হতে হয়েছে। শুধু তাই নয়, মেষ্টনী ব্যবস্থায় বাংলাই সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হলো। 1896 সালে বাংলার ভূতপূর্ব লে. গভর্নর ইম্পিরিয়াল বাজেট আলোচনাকালে বলেন,—"এই প্রদেশরূপী মেষটিকে মাটিতে ফেলিয়া লোমগুলি নির্মূল করিয়া কাটিয়া লওয়া হইতেছে। যতক্ষণ পর্যন্ত পুনরায় রোমোদ্গাম না হয়, ততক্ষণ সে শীতে থরথর করিয়া কাঁপিতে থাকে।"[5]

অসামান্য মমতা ও দরদে ইংরেজ শোষিত বাংলার চিত্র অঙ্কন করেছেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র। বাংলা ছিল ইংরেজদের কামধেনু। যেখানে যে যুদ্ধই করুক ইংরেজরা তার ব্যয়ভার বহন করতে হয়েছে বাংলাকে, এমন কি সেইসব বিজিত দেশের শাসন-ভার পর্যন্ত। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা, বিস্তার ও রক্ষাকার্যে এভাবে বাংলার শোণিত শোষিত হয়েছে ; তার ওপরে বণিক ইংরেজরা এই বাংলার কুটির শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য একেবারে ধ্বংস করে বাঙালীর মেরুদন্ড ভেঙে দিয়েছে।

আলিবর্দীর শাসনকালে যে-সব জাতি বাংলায় ব্যবসা-বাণিজ্য করত, তারা হলো মোগল, আর্মানি, তুরানী, পাঠান, ইংরেজ, ফরাসী, ওলন্দাজ ইত্যাদি। সিরাজের পতনের পর মীর জাফরের সঙ্গে ইংরেজদের যে সন্ধি হয়, তার একটি শর্ত হলো 'কলিকাতার অনিষ্ট হওয়াতে যাহাদের ক্ষতি হইয়াছে' তাদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করতে হবে। এর ফলে, ইংরেজরা পেল পঞ্চাশ লক্ষ টাকা, আর আর্মানিরা পেল সাত লক্ষ টাকা। শোষণের অজুহাত ও ফিরিস্তির অন্ত ছিল না শ্বেতকায়দের। কামধেনু কঙ্কালসার হতে থাকল।

বিদেশী অপশাসন ও দুষ্ট নীতির ফলে বাংলার আর্থিক অবস্থা যে চরম বিপর্যয় ও দুর্দশার সম্মুখীন হলো, তা তিনটি জেলার—বাঁকুড়া, ফরিদপুর ও রংপুরের—আর্থিক অবস্থা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র। বাঁকুড়া ও তৎসংলগ্ন

4. *তদেব,* পৃ—৩৩৫
5. *তদেব,* পৃ—৩৩৭

বীরভূম জেলায় মোগল আমলে অর্ধ-স্বাধীন করদ রাজারা প্রভুত্ব করতেন। এই দুটি জেলায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অন্য জেলাগুলির তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম বলে ওইসব রাজারা বিরাট বিরাট বাঁধ নিমাণ ও বড় বড় পুকুর খনন করে জলসংরক্ষণ করার ব্যবস্থা করতেন। আর ওই জল সেচের কাজে ব্যবহারের জন্য খাল খনন করা হতো। পাঠকদের 'শুভঙ্করের দাঁড়ার' কথা স্মরণ হতে পারে। ইংরেজ আমলে এই করদ রাজারা জমিদার বলে গণ্য হয়ে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' ও 'সূর্যাস্ত আইনের' অধীনে এলেন। এতে কোম্পানীর রাজস্ব নিশ্চিন্ত ও নির্দিষ্ট হলো, কিন্তু জমিদারদের অবস্থা ক্রমশ সঙ্গীন হতে শুরু করল। জমিদাররা জমি ইজারা দিতে শুরু করলেন ; পত্তনিদার, দরপত্তনিদার, জোতদারদের সৃষ্টি হলো। বর্গীর হাঙ্গামায় বাঁকুড়া ও বীরভূম তো বিধ্বস্ত হয়েছিলই, তার ওপর 1769-70 সালে মন্বন্তরের করাল গ্রাসে দেশের এক-তৃতীয়াংশ নরনারী প্রাণ হারাল। কিন্তু কোম্পানী রাজস্ব আদায়ে কানাকড়ি পর্যন্ত আদায় করে নিল। বীরভূমের রাজা করারুদ্ধ হলেন, বিষ্ণুপরের রাজাও দুরবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করতে করতে কারারুদ্ধ হলেন ও অকালে প্রাণত্যাগ করলেন।

জমির স্বত্ত্ব জমিদার, পত্তনিদার, দরপত্তনিদার, জোতদার প্রমুখের ওপর ন্যস্ত হওয়ায় জলসেচ ব্যবস্থা অবহেলিত ও উপেক্ষিত হলো ; বাঁধা নির্মিত হলোনা, পুকুর ও খাল খনন আর হলো না, সংস্কারকার্যের অবহেলা ও ঔদাসীন্যের ফলে তা ক্রমশ মজে গেল। বিষ্ণুপুরে এই ধ্বংসের চিহ্ন এখনো বর্তমান। বিষ্ণুপুরের পিতল ও রেশম শিল্প উপযুক্ত বাজার না পাওয়ার ফলে মৃতবৎ অবস্থা প্রাপ্ত হলো। উইলিয়াম উইলকক্সের *The Restoration of the Ancient Irrigation of Bengal,* p. 24 থেকে আচার্য এই উদ্ধৃতি দিয়ে তাঁর বক্তব্যের প্রামাণিকতা উপস্থাপিত করেছেন : "আপনাদের ভূমি-রাজস্বের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, মূলতঃ কৃষকদের মঙ্গলের জন্যই প্রবর্তিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু উহার ফল অনিষ্টকর হইয়াছে : আপনাদের বংশপরম্পরাগত সহযোগিতার শক্তি উহাতে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, জলসেচ-ব্যবস্থা লুপ্ত হইয়াছে এবং ম্যালেরিয়া ও দারিদ্র্যের আবির্ভাব হইয়াছে।"[6]

ফরিদপুর বীরভূম ও বাঁকুড়া জেলার তুলনায় উর্বর হলেও এই জেলায় উৎপন্ন ধানে জেলার খাদ্যের চাহিদা মিটত না। এই জেলার মানুষ এক সময় নানা ধরনের জীবিকা অবলম্বন করে বেঁচে থাকার উপায় অবলম্বন করত, কিন্তু তা ক্রমশ লুপ্ত হতে বসেছে। আচার্যদেব লিখেছেন,—"বয়নশিল্প দ্রুত লোপ পাইতেছে,—পূর্বে নদীতে মাল ও যাত্রী বহনের জন্য যে সব বড় বড় নৌকা চলিত, বিদেশী কোম্পানির জাহাজ তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে। যে সব তাঁতী, জোলা ও মাঝি-মাল্লাদের মুখের অন্ন কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে, তাহারা সকলে এখন কৃষিবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে। ফলে জমির উপর অতিরিক্ত চাপ পড়িয়াছে।"[7] কিন্তু কৃষিকাজ আর ক'মাস! তারপর 'হা ভাত হা ভাত'। তার ওপর জমিদাররা সব কলকাতাবসী। লক্ষ লক্ষ টাকা খাজনা

6. *তদেব,* পৃ—৩২২
7. *তদেব,* পৃ—৩২৫

আদায় করে কলকাতায় বাঈজী নাচিয়ে, পায়রা উড়িয়ে ওমেনী বিড়ালের বিয়ে দিয়ে আভিজাত্য প্রকাশ করে চলেছেন। গ্রামের রক্তে তাদের তাথৈ নৃত্য বাংলাকে ক্রমশ 'মহেঞ্জোদড়ো' করে তুলল।

ব্রিটিশ শাসনের ফলে বাংলাদেশের প্রত্যেকটি কুটির শিল্প লোপাট হয়ে গেল। কারণ, 'হোম' থেকে কলে তৈরী জিনিস এ-দেশে আমদানী করতে হবে। রংপুরের সব শিল্পই ছিল হস্তশিল্প। চট বোনা, সতরঞ্চ তৈরী করা, এন্ডি শিল্প, তুলা বয়ন শিল্প, চিনি ও গুড় শিল্প ইত্যাদি। কিন্তু বিদেশ অথবা ভিন্ন প্রদেশ থেকে সস্তা দামের কম্বল, কাপড়, চিনি ইত্যাদি আমদানী করে জেলা-শিল্প রুগ্ন হয়ে ক্রমশ লুপ্ত হয়ে যাওয়ায় কৃষির ওপর চাপ বৃদ্ধি পেল। আচার্যদেব তথ্য সহযোগে দেখালেন সাধারণ মানুষ দৈনিক সাত পয়সা (64 পয়সা = 1 টাকা) আয়ের ওপর নির্ভর করতে বাধ্য হয়েছিল।

অবাঙালীদের দ্বারা বাংলা শোষণ

ঔপনিবেশিকবাদের চরম অপকর্ষতা দেখিয়েছে ব্রিটিশ সরকার ; আইন তৈরী করেছে নিজেদের বণিক-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার স্বার্থে ; আবার জোর-জুলুম করে নিষ্পেষণ করেছে যার জ্বলন্ত চিত্র দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ'-এ দেখা যায়। সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে সংগ্রাম করলে হয়তো কোন ক্ষেত্রে প্রতিরোধ গড়ে তোলা যেত, কিন্তু বাঙালী চরিত্রের দুর্বলতার জন্য তা হয়নি। বাঙালী চরিত্রের ঔদাসীন্য ও নিশ্চেষ্টতার জন্য অবাঙালীরাও বাংলা শোষণের জাল বিস্তার করতে লাগল। গৃহ ভৃত্য, রাঁধুনী, ঠেলাওয়ালা, রিক্সাওয়ালা ইত্যাদি থেকে শুরু করে শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য সব অধিকার করে নিল অবাঙালীরা। মাড়োয়ারীরা ধীরে ধীরে প্রবেশ করে ব্যবসা-বাণিজ্য ও গ্রামীণ আর্থিক অবস্থার ওপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করেছে, তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত আচার্যদেব উপস্থাপিত করেছেন।

মাড়োয়ারীরা দার্জিলিং, কালিম্পং, সিকিম ও ভূটান সীমান্ত পর্যন্ত আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্যের জাল বিস্তার করেছে—পশম, মৃগনাভি, ঘি, এলাচ, লবণ, বস্ত্রজাত সামগ্রী এই ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত। বাঙালীরা হটে যাচ্ছে, আর মাড়োয়ারীরা কোটি কোটি টাকার ব্যবসা করছে। বাংলার প্রধান কৃষিজাত—চাল, পাট, তৈল বীজ, ডাল মাড়োয়ারীদের হাতে ; বিষ্ণুপুরের রেশম ও তসর বস্ত্র এক সময় বাঙালীদের হাতে ছিল, কিন্তু মাড়োয়ারীদের দ্বারা তা হস্তচ্যুত হয়েছে। মুর্শিদাবাদের রেশম শিল্প মাড়োয়ারী ও ভাটিয়াদের দাদনের টাকায় চলছে ; তারাই রপ্তানীকারক। বরিশাল ও নোয়াখালীর সুপারী ব্যবসা চীনা ও মগদের সঙ্গে গুজরাটীরা অধিকার করে নিয়েছে ; বোম্বাই-এর ব্যবসায়ীদের হাতও এতে কম নয়। রংপুরের নীলফামারীর তামাক উৎকৃষ্ট। চুরুট তৈরীর জন্য এই তামাকের চাহিদা বার্মায়। 1924-29 এই পাঁচ বছরে উৎপন্ন তামাকের মোট গড় মূল্য প্রায় দেড় কোটি টাকা। কিন্তু তার বাজার বর্মী ও বোম্বাইওয়ালা খোজাদের হাতে। তামাক ব্যবসায়ে দালালের দরকার। এই দালালরা সাধারণ স্নাতকদের চারগুণ উপার্জন করে। অথচ বাঙালীর 40/50 টাকা রোজগারের চাকরী চাই। আচার্যদেব

পরিতাপের সহিত বলেছেন,—"বাঙালী যুবকদের বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধির মোহে এতদূর অধঃপতন হইয়াছে যে, তাহাদের ঘরের কাছে যেসব সুযোগ সুবিধা আছে, তাহাও তাহারা গ্রহণ করিতে পারে না। একথা ভাবিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়।"[৪]

ব্যবসা বাণিজ্যের প্রতিযোগিতায় কোথাও বাঙালী থাকছে না। নতুন নতুন রেলপথ খোলা হচ্ছে, আর তার ঠিকাদারির কাজ করছে গুজরাটী, পাঞ্জাবী ও কচ্ছীরা। বাঙালী বেলাইন হবে না—চাকরী লাইন থেকে একচুল সরবে না। এই প্রসঙ্গে আচার্যদেব কালিদাস থেকে উদ্ধৃত করে বাঙালীর স্বভাব ও প্রকৃতি উদ্ঘাটিত করেছেন :

রেখামাত্রমপি ক্ষুণ্ণদা মনোর্বর্ত্মনঃ পরম্।
ন ব্যতীয়ুঃ প্রজাস্তস্য নিয়ন্তুর্নেমিবৃত্তয়ঃ ॥

বাংলার সব ব্যবসা মাড়োয়ারী ও গুজরাটীরা অধিকার করে নিয়েছে। অবশ্য কিভাবে ও কেমন করে অর্থ উপার্জন করা যায়, এ-বিষয়ে তাদের ব্যবসায়িক বুদ্ধি ও স্বাভাবিক বোধশক্তির প্রশংসা না করে পারা যায় না। তারা যে-ব্যবসাতেই নামুক, একেবারে খুঁটি গেড়ে বসে। আর আবহমানকালের বাঙালী ব্যবসায়ীরা—সাহা, তেলি ইত্যাদি প্রতিযোগিতায় পরাস্থ হচ্ছে। অ্যালুমিনিয়ামের রান্নার হাঁড়ি, বাসন-কোসন মায় টিফিন বাক্স ইত্যাদি বাঙালী মহানন্দে ব্যবহার করছে, কিন্তু ওইসব জিনিসপত্র তৈরী করছে ভাটিয়ারা। এম. এস-সি ডিগ্রীধারী বাঙালী ছাত্ররা অ্যালুমিনিয়ানের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম মুখস্থ করে, আর ভাটিয়ারা ও-সবের বিন্দু বিসর্গ না জেনেও পাতলা অ্যালুমিনিয়ামের পাত মেসিনে পিটিয়ে নানা ধরনের পাত্র তৈরী করে প্রভূত পরিমাণ অর্থ উপার্জন করে। খনি শিল্পে ইউরোপীয়রা প্রধান হলেও ভারতীয়দের মধ্যে মাড়োয়ারী ও কচ্ছীরাই প্রধান। ভূতত্ত্ব ও খনিজতত্ত্বের ধার না ধরেও তারা অনেক খনির মালিক, আর ইজারা নিয়েছে বহু কয়লা ও অভ্র খনি। লাক্ষা শিল্পেও বাঙালীর স্থান নেই।

"ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই ছোট এ তরী", পাঞ্জাবী, ওড়িয়া, হিন্দুস্থানী, মাড়োয়ারী ইত্যাদিতে "গিয়াছে ভরি"। মোটরযানের ব্যবসা পাঞ্জাবীদের দখলে, ইলেকট্রিক মিস্ত্রীও তারা। জুতোয় চীনা ও হিন্দুস্থানী চর্মকার ; চাকর, রাঁধুনী, রাজমিস্ত্রী, গাড়োয়ান, কুলী হিন্দুস্থানী অথবা ওড়িয়া। খাটালের মালিক হিন্দুস্থানী অথবা পাঞ্জাবীরা। বড় বড় খেয়া ঘাটগুলি নীলামে সর্বোচ্চ ডাকে ইজারা নিচ্ছে অবাঙালীরা। আলু হিমঘরগুলির মালিক প্রায় সবাই অবাঙালী। মশলার ব্যবসা চলে গেল গুজরাটীদের হাতে, বিড়ি শিল্পও তারা অধিকার করে নিয়েছে। তথ্যসহযোগে বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে আচার্যদেব লিখেছেন,—"স্বদেশী আন্দোলনের ফলে সিগারেটের পরিবর্তে লোকে বিড়ি ব্যবহার করাতে, বিড়ি ব্যবসায়ে খুব লাভ হইতেছে। কাঁচা মাল সরবরাহের ব্যবসাও বেশ জাঁকিয়া উঠিয়াছে ; এক শ্রেণীর চূর্ণ তামাক এবং কেন্দুয়া গাছের পাতাই ইহার কাঁচা মাল। যাহারা বিড়ি এবং তৎসম্পর্কীয় কাঁচা মালের ব্যবসা করে, এরূপ কয়েকটি ফার্মের নাম দেওয়া গেল :—

"মূলজী সিক্কা এন্ড কোং ; এজরা স্ট্রীট ; ভোলা মিএঞা, ক্যানিং স্ট্রীট ; চূণীলাল

৪. তদেব, পৃ—৩৪৮

পুরুষোত্তম, চিৎপুর রোড ; কালিদাস ঠাকুরসী, আমড়াতলা স্ট্রীট, ভাইলাল ভিকাভাই, আমড়াতলা স্ট্রীট ; মণিলাল আনন্দজী, হ্যারিসন রোড ; সতীশচন্দ্র চন্দ্র, হ্যারিসন রোড।"[9]

"বড়বাজার, পোস্তাবাজার, শ্যামবাজার, রাধাবাজার অবাঙালীদের দখলে ; বেলতলা, কলুতলা, আমতলা, আমড়াতলায় তাদের কোটি কোটি টাকার ব্যবসা। মাড়োয়ারীরা কলিকাতার বড় বড় অর্থনীতিক সমস্যার মীমাংসা করে, এবং শেয়ারবাজারে, পাইকারী বাজারে সর্বত্রই তাহাদের প্রভাব। খুচরা দোকানদারিতেও পাঞ্জাবী বেনিয়া এবং হিন্দুস্থানী মুদিদের আমদানি হইয়াছে। উহারা অলিগলির মধ্যে নিজেদের ভাষায় লিখিত সাইনবোর্ড টাঙাইয়া পরম উৎসাহে ব্যবসা করিতেছে।"[10] 1326 সালে আচার্যদেবের হিসেব মত কলকাতায় মাড়োয়ারীর সংখ্যা 90,000 থেকে 100,000-এর মধ্যে, আর ভাটিয়াদের সংখ্যা 10,000। তা ছাড়া বিহারী, ওড়িয়া, দিল্লীওয়ালা, বোম্বাইওয়ালা, মাদ্রাজী, পাঞ্জাবী এদের সংখ্যা নির্ণীত হয়নি। এইসব অবাঙালীরা বাংলা থেকে কত কত কোটি টাকা শোষণ করছে, তার হিসেব নেই। এখন তো আবার চেম্বার্স অফ কমার্সের প্রধানগণ, প্রোমোটারগণ সবই অবাঙালী। আচার্যদেবের সময়কালের চেয়ে বাঙালী নিজ ভূমে সত্যসত্যই প্রবাসী হয়েছে বর্তমানে।

অবাঙালীদের অর্থশোষণের তথ্যাদি

1921 সালের আদমসুমারি অনুসারে বাংলাদেশে অবাঙালীর সংখ্যা ছিল বাইশ লক্ষ। এদের মধ্যে অল্প লোকের স্ত্রীপুত্র নিয়ে বসবাস, এবং তারা সাধারণত কলকাতাতেই থাকে। 22 লক্ষের মধ্যে স্ত্রীপুত্রের সংখ্যা দু-লক্ষের বেশী নয়। তা হলে 20 লক্ষ লোক কেবল উপার্জনে নিযুক্ত থাকে। কুলি, ধোবা বা নাপিতরাও অন্তত পক্ষে 25/30 টাকা রোজগার করে। মাড়োয়ারীরা তো সেই সময়েই লক্ষপতি হয়েছিল। যাই হোক, মাসে গড়ে 50 টাকা করে আয় ধরলে 20 লক্ষের আয় হয় 10 কোটি টাকা ; তা হলে বছরে আয় হলো 120 কোটি টাকা। এই বিবরণ আরো তথ্যনিষ্ঠ করে আচার্যদেব দেখিয়েছেন, কলকাতার নিকটবর্তী পাটকলসমূহের ডাকঘর থেকে 1929 সালে 1 কোটি 76 লক্ষ টাকা মণি-অর্ডার দ্বারা বাংলার বাইরে যায়। 1927 সালে বিহারের ছাপরা ডাকঘরে মাসে গড়ে 10 লক্ষ টাকা করে মণি-অর্ডার আসে। কটক জেলার ডাকঘরে 1926 সালে মণি-অর্ডার আসে 4 লক্ষ টাকা। এই হিসাবের বাইরে আরো বহু টাকা প্রতিমাসে, প্রতি বছর বাংলার বাইরে চলে যাচ্ছে। কারণ, রাঁধুনি, চাকর, প্লাম্বার, কুলি, ঠেলাওয়ালা, রিক্সাওয়ালারা, চর্মকার, ধোবা, নাপিত ইত্যাদিরা বাড়ী যাবার সময় টাকা সঙ্গে নিয়ে যায়।[11]

বাংলার সম্পদ বৃদ্ধিতে অবাঙালীদের কোন অবদান নেই। মাড়োয়ারী ও স্বচ্ছল অবস্থার হিন্দুস্থানীরা তাদের খাদ্য আটা-ময়দা, ডাল, ঘি বাংলার বাইরে থেকে আমদানি

9. *আত্মচরিত*, পৃ—৩৫৫, টীকা—১৯

10. *তদেব*, পৃ—৩৬৩

11. *তদেব*, পৃ—৩৬৬-৬৮

করে। সুতরাং তাদের উপার্জন নিজেদের পকেটেই থাকে। আচর্যদেব সরস ব্যঙ্গোক্তি করে বলেছেন,—"তাহারা কামস্কাটকা বা টিম্বাক্‌টোর আধিবাসী হইলেও বাংলার বিশেষ ক্ষতি হইত না।"[12]

বাঙালী বুদ্ধিমান জাতি বলে প্রচার আছে। মাড়োয়ারীরা তাই কোন বাঙালীকে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যে, ফার্মে শিক্ষানবিশী করতে নেয় না। তারা জানে, বাঙালী ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকে আকর্ষিত হলে তাদের একচেটিয়াপনা গুটিয়ে যাবে। তাই বাঙালীরা ছোটখাট ব্যবসা শুরু করলে তাদের ব্যবসা লাটে ওঠার সব চক্রান্ত করে। অবাঙালীরা জাতভাইয়েদের সর্বপ্রকার সাহায্য করে, গণেশের 'পোস্ট' শক্ত করে, কিন্তু বাঙালীদের গণেশ ওল্টানোয় সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে স্বস্বার্থ বজায় রাখে।

স্বখাত সলিলে বাঙালী

বাঙালীর স্বভাব, প্রকৃতি ও চারিত্রিক ত্রুটির ওপর অদ্যাবধি মাত্র একজন মনীষীই যথার্থ ছুরি চালনা করে অ্যানাটমি-বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি আর কেউ নন, তিনি হলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র। কারণ বাঙালীকে তিনি অন্তর দিয়ে ভালবাসতেন ; এই জাতির উন্নতির ও সমৃদ্ধির চিন্তা-ভাবনায় তাঁর দীর্ঘ জীবনের বহুলাংশ ব্যয়িত হয়েছে। তিনি স্বয়ং 'আত্মচরিত'-এর পরিশিষ্ট-2 অংশে বলেছেন, —"আমি বাঙালী চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া তাহার দোষ-ত্রুটি দেখাইতে দ্বিধা করি নাই। অস্ত্রচিকিৎসকের মতই আমি তাহার দেহের ছুরি চালাইয়াছি এবং ব্যাধিগ্রস্ত অংশ দূর করিয়া তাহাতে ঔষধ প্রয়োগ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু বাঙালী আমারই স্বজাতি এবং তাহাদের দোষ-ত্রুটির আমিও অংশভাগী। তাহাদের যেসব গুণ আছে, তাহার জন্যও আমি গর্বিত, সুতরাং বাঙালীদের দোষ-কীর্তন করিবার অধিকার আমার আছে।"[13]

সাধাররভাবে বাঙালী অলস, শ্রমবিমুখ, বিলাসপরায়ণ, উদ্যোগহীন, ভ্রান্ত আত্মমর্যাদাসম্পন্ন, কয়েকটি বাঁধাগতে জীবিকার্জনের জন্য উন্মুখ। এইসব ত্রুটির জন্য বাংলাদেশের ভৌগোলিক আবহাওয়াও কম দায়ী নয়। "আমাদের সুজলা সুফলা বাঙালাদেশ—তারপর আবার আমাদের ছেলেরা পাখীর ডাকে ঘুমায় আর পাখীর ডাকে ওঠে। বাঙালার স্যাঁতস্যেতে হাওয়ার জন্যে মেকলে বলেছিলেন এদের ভাপ্‌সা তাপের (vapour bath) মধ্যে থাকতে হয়।"[14] একদা ভারতসচিব চার্চিলের পিতা বলেছিলেন মানুষগুলো *Lulled by the languor of the land of lotus*—"কমলবিলাসী দেশের ঘুমপাড়ানী হাওয়ায় এলিয়ে পড়ে"। বাংলার উর্বরা মাটিতে অতি সহজে ফসল উৎপন্ন হয়, রোদে তেতেপুড়ে কঠোর পরিশ্রম করতে হয় না।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমি জোগাড় শুরু হলো। এতে যাদের অন্ন সমস্যা মিটল, তারা পায়ের ওপর পা দিয়ে হুঁকো-গড়গড়া টেনে চন্ডীমন্ডপে মজলিশ করে

12. *তদেব*, পৃ—৩৬৮
13. *আত্মচরিত*, পৃ—৪২০
14. *আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের চিন্তাধারা*, পৃ—৮৫

সুখে দিনযাপন করতে থাকল। কিন্তু দিন সমান যায় না। কুটির শিল্প, হস্তশিল্প, শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্য বিদেশী বণিকদের চক্রান্তে ধ্বংস হতে থাকলে বাঙালী গলাধাক্কা খেতে শুরু করল। অর্থশালী বাঙালী হয় জমিদারী, না হয় মহাজনী বা কোম্পানীর কাগজ কিনে বংশানুক্রমে ভোগ করার মতলব করল, কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকে পা বাড়াল না। বারভূঁইএরা ছিল জমিদার ; জমিদারী আর চাকরী নবাবী আমল থেকেই বাঙালীর রক্তে মিশে শিরা-উপশিরায় ছড়িয়ে পড়েছে।

বিস্ময়ের পর বিস্ময় উপস্থাপনা করে আচার্যদেব বাঙালীর প্রণবতা ও প্রবৃত্তির বিশ্লেষণ করেছেন। বাঙালীকে আপনার মুখ আপনি দেখতে হলে আচার্যদেবের লেখাগুলি অবশ্যই গীতাজ্ঞানে পাঠ করতে হবে। বাঙালীর ভাবোচ্ছ্বাস ও উৎসাহ সম্পর্কে আচার্যদেবের বিশ্লেষণ : "আমাদের উৎসাহ খড়ের আগুনের মত—দপ্ করে জ্বলে ওঠে, কিন্তু আবার খপ্ করে নিভে যায়। এরূপ ভাবোচ্ছ্বাস কর্মপঙ্গুত্ব আনয়ন করে। স্বদেশীর সময় গোলদীঘির ধারে অনেক ভাবোচ্ছ্বাস হয়েছিল। ... ভাবপ্রবণ হও, খুব বড় কল্পনা কর, ভাবুকতার বলে গতানুগতিকের গন্ডী ভেঙ্গে ফেল। নূতন পথে এগিয়ে চল, কিন্তু দেখো পঙ্গু ভাবুক হয়ো না ;—ভাবকে কর্মে আকার দাও—কর্মে ভাবের প্রতিষ্ঠা কর। ... অলসতা ও সুখপ্রবণতাই হচ্ছে আমাদের জাতীয় দুর্বলতা। ... আমাদের চরিত্রে গলদ কোথায় খুঁজে বার করতে হবে ; সঙ্গে সঙ্গে এক-একটি দোষ পরিহার ক'রে তার স্থলে গুণের প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আমাদের এখন শ্রমশীল হওয়া চাই, অদম্য উৎসাহ চাই, সাহস ও ধৈর্য চাই—মোটের উপর খাঁটি ও শক্ত মানুষ হওয়া চাই। ... কঠিন সমস্যা সকলের মীমাংসা করবার ভার আমাদের হাতে—আমাদের কি দুর্বলচিত্ত, চাকরিপ্রিয়, বিলাসী বাবু হওয়া সাজে? শক্ত হতে হবে, দৃঢ়ব্রত হতে হবে, মেরুদন্ড-বিশিষ্ট মানুষ হতে হবে। অন্নসমস্যার মীমাংসা করতে পারলে সঙ্গে সঙ্গে অনেক প্রশ্নের সমাধান হয়ে যাবে। তাই ব্যবসা-বাণিজ্য ছাড়া আজ আমার অন্য কিছু বলবার নেই। ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজে আমাদের স্পৃহা নেই—প্রবৃত্তি নেই। এই প্রবৃত্তি আগে জাগিয়ে তুলতে হবে।"[15]

ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকে বাঙালীর দৃষ্টি ফেরানোর জন্য আচার্যদেব স্বয়ং সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। মাড়োয়ারী, ভাটিয়া, বোম্বাইওয়ালা, দিল্লিওয়ালা কর্তৃক বাংলার আর্থিক শোষণের মর্মন্তুদ চিত্র উপস্থাপন করে বাঙালীর চাকরী-প্রবণতারূপ আফিমের নেশা কাটাবার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু বাঙালী আচার্যবাণীতে কর্ণপাত করেনি—ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকে ঝুঁকল না। বাঙালীর চারিত্রিক দোষ-ত্রুটি সংশোধিত হলো না, গুণের উন্মেষ হলো না।

ব্যবসায়ের প্রধান মূলধন ধৈর্য, সাধুতা, অংশীদারত্বের প্রবণতা, কঠোর শ্রম আর শ্রমের মর্যদা। ব্যবসায়ে সামান্য থেকেই শুরু করতে হয়, প্রথম প্রথম শিক্ষানবিশী করতে হয়। কেউ কখনো লাফিয়ে বড় হয়নি, আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হওয়া সম্ভব নয়। কার্নেগী ছেলেবেলায় রাস্তায় খবরের কাগজ বিক্রী করতেন, টাটার ম্যানেজার,

15. *তদেব,* পৃ—৯২-৯৩

তুৎউইলার নিগ্রো জুড়িদারদের সঙ্গে ইঞ্জিনে কয়লা ঢালতেন। এরূপ উদাহরণ দিয়েছেন আচার্যদেব। মাড়োয়ারীরা ছাতু খেয়ে পিঠে কাপড়ের বস্তা নিয়ে ব্যবসা শুরু করে, পুরোনো ও ভাঙ্গা লোহা-লক্কড়ের ব্যবসা শুরু করে, কিন্তু ধৈর্য, কঠোর শ্রম ও অধ্যবসায়ের গুণে তারা পরে লাখপতি, কোটিপতি হয়। কিন্তু বাঙালীর ব্যবসার শুরুতেই চাই সুদৃশ্য কাচের ঘর, বড় বড় টেবিল, আলমারি ইত্যাদি। তাই আচার্যদেব নিজের কর্মোদ্যোগ সম্পর্কে বলেন,—"২৭/২৮ বৎসর পূর্বে আমি যখন 'বেঙ্গল কেমিক্যাল' আরম্ভ করি তখন কুলীর মত খেটেছিলাম। কয়েক বৎসরের মাহিনা থেকে ৮০০ টাকা জমিয়ে 'বেঙ্গল কেমিক্যাল' আরম্ভ করি—আজ তার মূলধন ২৫/২৬ লক্ষ টাকা।"[16]

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র কুলীর মত খাটতে পারেন, কিন্তু বাঙালী খাটবে না ; আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র নিজের হাতে জামা-কাপড় কাচতে পারেন, কিন্তু বাঙালীর জামা-কাপড় যাবে লন্ড্রীতে ; পাঞ্জাবী গিলে হয়ে আসবে, প্রজাপতি গোঁফের নীচে সিগারেট বা চুরুটের ধোঁয়া উড়িয়ে তুড়ি মারবে, কাব্য-কবিতা গলাধঃকরণ করে বদহজম হবে। তাই বাঙালীর মিষ্টির দোকান নেই, বড় বড় মুদির দোকান নেই, কাপড়ের দোকান নেই, বড় বড় খাটাল নেই, বাঙালী ভৃত্য ও রাঁধুনী নেই, চামড়ার কারখানা নেই, জুতোর দোকান নেই ; পাটকল, তেলকল, গমকল, ময়দা কল সব অবাঙালীদের দখলে ; ট্যাক্সি ড্রাইভার, লরি ড্রাইভার সব পাঞ্জাবী ও অবাঙালীদের কব্জায়।

বাঙালী চরিত্রে অংশীদারী হয়ে কাজ করার প্রবণতা নেই। আবার কখনো কখনো অংশীদারী হয়ে কাজ আরম্ভ করলেও কাজ শিখে নিয়ে অংশদার চম্পট দেয়। পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস না থাকায় বাঙালীর যৌথ কারবার সফল হয় না। কোন রেকর্ড না রেখেও মাড়োয়ারীরা লক্ষ লক্ষ টাকার কারবার করছে কেবল মুখের কথায়, কিন্তু বাঙালীর এই সাধুতা নেই। বাঙালীর চাই বাঁধা মাইনের চাকরী ; তা কেরানীগিরিই হোক, আর হিসেবের খাতা লেখাই হোক। একাজ পান চিবিয়ে চিবিয়ে বাঙালী বেশ করতে পারে—এক নাগাড়ে বার ঘন্টাও করতে পারে। বাঙালীর আত্মমর্যাদা জ্ঞান টনটনে—ঠুনকো। শ্রমের মর্যাদা দিতে বাঙালী শেখেনি। কোন কায়িক পরিশ্রমের কাজ মানেই ছোট। অন্যের ঘাড়ে বসে খেতেও বাঙালী যুবকদের বাধে না। বাইবেলের বাণীতে বাঙালীর আস্থাও নেই, বিশ্বাসও নেই : *You shall not eat except by the sweat of your brow.*

ইংরেজ বণিক ও শাসকের স্বার্থেই একদা চাকরীর বাজার প্রশস্ত হয়। এই সময় "ইয়েস, নো" জানা বাঙালীও চাকরী পেতে পারত—কেরানীর চাকরী। ইংরেজী জানায় তাই বাঙালীর আগ্রহ বেড়ে গেল। সেকালে অর্থাৎ 1816 সালের আগে ইংরেজী শিক্ষার নমুনা হলো :

পম্‌কিন লাউকুমড়ো, কুকুম্বর শশা।
ব্রিঞ্জেল বার্তাকু, প্লৌমেন চাষা॥

16. *তদেব,* পৃ—৯১

রাজনারায়ণ বসুর "সেকাল ও একাল"-এ বাঙালীর ইংরেজী শিক্ষার নমুনার একটি মজার বিবরণ : রথের দিনে এক সরকার অফিস কামাই করেছে। পরের দিন সাহেব তার অফিসে না আসার জন্য কৈফিয়ৎ চেয়ে বসল। তখন রথের ব্যাপারটি সাহেবকে বুঝিয়ে বলছে সরকারবাবু : "চার্চ, চার্চ স্যার (Church)।" কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে হলো চার্চ ইটের তৈরী। তাই ব্যাখ্যা করে বলল—"চার্চ, চার্চ স্যার" "Wodden Church"। কিন্তু Wooden Church দিয়েও সব বোঝানো গেল না ভেবে আরো ব্যাখ্যা করে বলল—"Three stories high", "God Almighty (জগন্নাথদেব) sit upon," "Long long rope", "Thousand men catch", "Pull pull, run away, run away, "হরি বোল, হরি হরি বোল।" এইসব ইংরেজী শুনে ইংরেজরা তৎক্ষণাৎ পাততাড়ি গোটাতে পারত, কিন্তু ওরা এঁটেলচিমড়ির জাত বলে করেনি ; রক্তশোষণ করে পেট মোটা করে তবে গেছে। যাই হোক, আচার্যদেব দুঃখ প্রকাশ করে বলেছেন, কি কুক্ষণেই বাঙালী কেরানীগিরির স্বাদ পেল! সুযোগ সন্ধানী মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যরাই সামান্য ইংরেজী শিখে কেরানীর দলে নাম লিখাল, আর পল্লীবাস উঠিয়ে যে-সব জমিদাররা শহর কলকাতায় এল, তাদের পুত্ররাও কেরানীগিরির লোভ সামলাতে পারল না। মূলধন থাকা সত্ত্বেও সুবর্ণবণিক, তিলিরা মোটা টাকা আমানত করে ব্যাঙ্কে ক্যাশিয়ার বা সহকারী ক্যাশিয়ার হয়ে উঠল। কেরানীগিরি অতীত জীবনের সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে পড়ল যে তা বাঙালী জীবন ও চরিত্রের অংশবিশেষ হয়ে দাঁড়াল। কথায় বলে, *Habit is the second nature* কেরানীগিরি হলো বাঙালীর *second nature.*

ইউরোপীয় বণিকরা বাঙালী কেরানীর মাথায় কিভাবে কাঁঠাল ভেঙ্গে খেয়েছে, সে-সম্বন্ধে 1932 সালের 21 শে মে তারিখের অমৃতবাজার পত্রিকায় জনৈক পত্রলেখক বিশ্লেষণ করে লেখেন,—"৩০্ টাকা মাহিনার একজন কেরানী তাহার প্রভুর চিঠিপত্র লেখে, তাঁহার ব্যাকরণেরও ভুল সংশোধন করে, উহা 'ফাইল' করে, প্রয়োজনীয় পুঁথিপত্র গুছাইয়া রাখে ; তাহার স্মরণশক্তি প্রখর, কারবারে ১০/২০ বৎসর পূর্বে যাহা ঘটিয়াছে, তাহাও মনে রাখিতে হয়, ক্রিকেট ক্লাব, বোটিং ক্লাব, সুইমিং ক্লাব, বয়-স্কাউট সংক্রান্ত কার্যের সেক্রেটারী হিসাবে প্রভুর ব্যক্তিগত কাজও সে করে। প্রভু কহিলে সে দৌড়ায়, চেঁচাইতে বলিলে চেঁচায়, 'মহিলা সভার' চিঠিপত্র লেখা প্রভৃতি মেমসাহেবের ঘরের কাজও সে করে—এবং এ সমস্তই মাসিক ত্রিশ টাকার মাহিনার পরিবর্তে। ইহাকে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির ব্যাভিচার ভিন্ন আর কি বলিব?"

* * * * * * * *

"পাশ্চাত্যের বণিকেরা আসিয়া ভারতীয় কেরানীদের বুদ্ধি ও কর্মশক্তি কাজে খাটাইয়া, নিজেরা ধনী হয় এবং এদেশ ত্যাগ করিবার সময় ঐ হতভাগা কেরানীদের অকর্মণ্য, রুগ্নদেহ, দরিদ্র অক্ষম করিয়া ফেলিয়া যায়।"[17]

বাঙালী 'জন্ম-কেরানী' হয়ে গেল। ইউরোপীয়দের মত মাড়োয়ারী ও গুজরাটীরাও তাকে নিংড়ে নিতে লাগল। বাঙালী এম. এস-সি, বি. এল-রাও বিজ্ঞানে ও ওকালতিতে

17. *আত্মচরিত*, পৃ—৩৬১

কিছু করতে না পেরে টাইপ শিখে ইউরোপীয়, মাড়োয়ারী বা গুজরাটী ফার্মে কেরানীগিরি করতে ঢুকে গেল। আচার্যদেব *Uncle Tom's Cabin*-এর ক্রীতদাসদের সঙ্গে বাঙালীর কেরানীগিরি মনোবৃত্তির তুলনা করেছেন। একটা বাঁধা বেতন দিলেই বাঙালী কেরানী কলুর চোখ বাঁধা বলদের মত দিনরাত খাটতে রাজী। বাঙালীর জীবনসর্বস্ব কেরানী-মনোবৃত্তি সম্পর্কে আচার্যদেবের *Bengali Brain and Its Misuses* থেকে একটি দীর্ঘ উদ্ধৃতির লোভ সামলানো গেল না : "Since the foundation of the British power the Bengalee has learned to look upon service under the Government or in the numerous European merchants' houses as the be-all and end-all of his existence. Whenever a new territory has been annexed of, the Bengalee has followed the fortunes of the British Raj as affording fresh field and pastures new for the display of his clerical genius. From the Punjab to Burmah there has thus been an unending chain–a network of Bengalee *Keranis*. His sole ambition in life has been to court the favour and sedulously cultivate the good graces of his official superior. Brought up for generations in the school of servility and sycophancy the Bengalee lost manliness and self-reliance and even self-respect and fast deteriorated in some of the noble qualities which go to the making of a nation."[18]

কেরানীর স্বাভাব ও প্রকৃতির দুটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন আর্চাযদেব : একটি সেক্সপীয়ারের 'জুলিয়াস সিজার' থেকে, আর একটি সুশ্রুতসংহিতা থেকে। 'জুলিয়াস সিজার'-এ অন্যতম চরিত্র অ্যান্টনি বলছেন : "গর্দভ যেমন স্বর্ণ বহন করে, সে তেমনি ভার বহন করে। আমরা তাহাকে যে ভাবে চালাইব, সেই ভাবেই চলিবে। এবং আমাদের ধনরত্ন নির্দিষ্ট স্থানে যখন সে বহন করিয়া আনিবে, তখন আমরা তাহার ভার নামাইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিব। ভারবাহী গর্দভকে যেমন ছাড়িয়া দিলে সে তাহার কান ঝাড়িয়া মাঠে চরিতে যায় এও তেমনি করিবে।"[19] সুশ্রুতও ভারবাহী গর্দভ সম্বন্ধে অন্তুতপক্ষে তৃতীয়-চতুর্থ শতাব্দীতে বলেছেন :

খরশ্চন্দনভারবাহী ভারস্য বেত্তা ন তু চন্দনস্য

—ভারবাহী গর্দভ কেবল চন্দনের ভারের কথাই জানে, তার সুগন্ধের কথা জানে না।

কেরানীরা কোটি কোটি টাকার হিসাব রাখে, মুনাফার শতকরা হিসাব কষে, প্রভুর কথায় ওঠে আর বসে, নির্দিষ্ট সময়ের অতিরিক্ত শ্রম দিয়েও প্রভুকে খুশী করার চেষ্টা করে অর্থাৎ কর্তার ইচ্ছায় কর্ম করে, কিন্তু তার পরিবর্তে ওই তিরিশ টাকা! কর্তার ইচ্ছায় কর্ম করে যাঁরা তাঁদেরকেও আচার্যদেব কেরানী বলেছেন,—তবে তাঁরা সম্মানার্হ কেরানী, যেমন—মুন্সেফ, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, কমিশনারের ব্যক্তিগত সহকারী, ইনস্পেক্টর জেনারেল, এমন কি অ্যাকাউন্টান্ট জেনারেল পর্যন্ত।

18. Quoted from *Acharya Prafulla Chandra Ray,* ISNA, p. 159

19. *আত্মচরিত,* পৃ—৩৬২ ; এখানে 'সে' অর্থে যোদ্ধা।

'ইংলিশম্যান' একসময় ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল বাঙালী কেরানী লোপ পাবে। খুব সম্ভব, তখন অনেকের ঠোঁটে বিদ্রূপের হাসি ফুটে উঠেছিল। কিন্তু বর্তমানে কম্পিউটারের যুগে VRS প্রকল্পে এখন সেই ভবিষ্যদ্বাণী সকলের দিকে এগিয়ে চলেছে। *আচার্যদেব কি সত্যদ্রষ্টা ও ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা ঋষি ছিলেন?

বাঙালীর ডিগ্রীর প্রতি দুর্নিবার মোহ ও আকর্ষণ আচার্যদেব কখনো সমর্থন করেননি। এই প্রসঙ্গে তিনি বহুবার বহু প্রবন্ধে ও গ্রন্থে আলোচনা করেছেন। তিনি মনে করতেন, ব্যবসা-বাণিজ্য করতে হলে এল. এ., বি. এ. পাশ করার কোন প্রয়োজন নেই। এতে অর্থের অপচয় ও সময়ের অপব্যবহার হয়, আর বি. এ., এম. এ পাশ করে যুবকদের কঠোর জীবন সংগ্রামে অযোগ্য করে তোলে। তাঁর মতে, উচ্চতর শিক্ষালাভে যাদের যোগ্যতা আছে, তারাই কেবল উচ্চতর শিক্ষা লাভ করুক, এবং তা দশ থেকে পনেরো শতাংশের বেশী নয়। সাধারণ স্নাতকদের তিনি 'মার্কাধারী মূর্খ' বলে মনে করতেন। তাঁর মতে, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি অজ্ঞতা ঢাকার ছদ্মবেশ মাত্র। এই ডিগ্রীর জন্যই ডিগ্রী অর্জনের ফলে বহু বি. এ. বি. এল ও এম. এ. বি. এল. আইন ব্যবসায় নেমে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দেয় ও ব্রিফহীন উকিলে পরিণত হয়। তারকনাথ পালিত, রাসবিহারী ঘোষ, চিত্তরঞ্জন দাশ বিরল দৃষ্টান্ত মাত্র। আলীপুর বারের 950 উকিলের মধ্যে শতকরা দশ জনও জীবিকার্জনে সক্ষম হয়নি।[২০] কতখানি সত্যনিষ্ঠ ও ন্যায়নিষ্ঠ হলে স্পষ্টকথা বলা যায়, তার এক জ্বলন্ত উদাহরণ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। কারুর মনরাখা বা মানরাখার জন্য তিনি অপ্রিয় সত্য কথা বলতে দ্বিধা করেননি। তিনি বলেছেন,—**ন ব্রুয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম** ঠিক নয়। রোগ ঢাকলে চলবে না। রোগ নির্ণয় করে বিধিমত ওষুধের ব্যবস্থা করলে তবেই বাঁচা সম্ভব। তাই আইন কলেজ সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য : "স্যার আশুতোষ প্রতিভাশালী পন্ডিত, শিক্ষাবিস্তারের জন্য অনেক করেছেন—এসবই স্বীকার করি। কিন্তু আইন কলেজ সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে আমার বন্‌লো না। আমায় যদি কেউ একদিনের জন্যই সর্বময় কর্তা (Dictator) করে তবে 'ল-কলেজ'টাকে আমি অগে ভূমিস্যাৎ করি ; অন্তত দশ বছরের জন্য আইন পড়া উঠিয়ে দিই। কারণ তাহলে উপোষী উকীলদের অন্ন হতে পারে।"[21]

আচার্যদেব সম্বন্ধে মহাভ্রান্তি

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র সম্বন্ধে কয়েকটি ভ্রান্তি প্রচলিত থাকতে দেখা যায়। তার মধ্যে একটি মহাভ্রান্তি যে, তিনি প্রাদেশিক মনোভাবাপন্ন। শান্তিস্বরূপ ভাটনগরের ন্যায় খ্যাতনামা বিজ্ঞানী যিনি আচার্যদেবের প্রশিষ্য বা প্রছাত্র বলে গর্ব অনুভব করতেন, তিনিও এই ভ্রান্তি পোষণ করতেন। এ-বিষয়ে আলোচনার আগে আমরা অন্য দুটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। কারণ, তা হলে আচার্যদেবকে বুঝতে, জানতে ও উপলব্ধি করতে সুবিধে হবে।

20. *আত্মচরিত*, পৃ—২০৩, পাদটীকা—৩

* সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীরা VRS-এর আওতায় আসছেন।

21 *আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের চিন্তাধারা*, পৃ—৬৫-৬৬

আমরা একটু আগেই আচার্যদেব কর্তৃক আইন কলেজ ভূমিস্যাৎ ও অন্তত দশ বছরের জন্য আইন পড়া বন্ধের কথা আলোচনা করেছি। আচার্যদেবের এই কথার আক্ষরিক অর্থ করলে মারাত্মক ভুল হবে। যে-কোন কথার প্রকৃত অর্থ উদ্ধার করতে হলে তার তাৎপর্য ও ইঙ্গিতের সন্ধান করতে হবে, এবং তার ব্যঞ্জনাও উপলব্ধি করতে হয়। এবং সেই সঙ্গে সর্বাগ্রে প্রসঙ্গটিও স্মরণ রাখতে হয়। আচার্যদেবের প্রজ্ঞা, মনস্বিতা ও বহুল পাঠের প্রাসঙ্গিতা, আর সেই সঙ্গে বাকভঙ্গিমার সঙ্গে গভীরভাবে অন্বিষ্ট না হলে তাঁর উক্তি, বক্তব্য ও বিবৃতির মূল্যায়ন কোন ক্রমেই সম্ভব নয়। বস্তুতপক্ষে, এই কারণেই নানা মহলে ভুল বুঝাবুঝি ও ভ্রান্তি।

আক্ষরিক অর্থ করলে দাঁড়ায় আচার্যদেব আইন কলেজ উঠিয়ে দিয়ে দশ বছরের জন্য পড়াশোনা বন্ধ রাখার অভিমত পোষণ করতেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁর বক্তব্যের ইঙ্গিত ও তাৎপর্য অন্যরূপ ছিল। খুবই সৌভাগ্যের বিষয়, এই প্রসঙ্গে তিনি স্বয়ং অন্যত্র বিশদ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ প্রদান করেছেন। তিনি বলেন,—“এই ধরুন বি. এল. পাস করে ওকালতি করা। ছেলেদের ও-একটা বাঁধা গৎ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেখানে যাই—জেলা, মহকুমা, জজ বা ম্যাজিস্টরের সকল রকমের আদালত—সব জায়গাতেই উকীলের সংখ্যা মক্কেলের দশগুণ, কোথাও বা বিশগুণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কাজেই উকীল হ'লেই পয়সা রোজগার আর হচ্ছে না। কিন্তু তবুও বি. এ. পাশ করেই বাঙালী যুবক আইন পড়তে ছুটছেন। পালে পালে, দলে দলে, সকালে বিকালে আইন পড়া চলছে। “পাসটা করে রাখা যাক”—আইন পড়বার এই একমাত্র নজীর আছে। কিন্তু যেখানে প্রয়োজনের চেয়ে আয়োজনের আড়ম্বরটা অধিক, সেখানে আয়োজন যে অনেক পরিমাণে ব্যর্থ হবে এ তো স্বতঃসিদ্ধ কথা।

“ “সর্বমত্যন্তগর্হিতম্”—আইন পড়ো না, আর দরকার নেই,—এমন কথা বলি না। কিন্তু এই কথা বলি—যার কাটতি নেই, আদর নেই, গুমোর নেই, যা গুদামজাত হয়ে পড়ে থেকে পচে, সে জিনিসের আবাদ যেমন বন্ধ রাখা ভাল, আইন পড়াও সেই যুক্তিরই বশে স্থগিত রাখা বা বহুল পরিমাণে কমিয়ে দেওয়া দরকার নয় কি? আইনজ্ঞেরা আমার শত্রু তেমন উৎকট অদ্ভুত কথা আমি বলিনি। বাঙলার ব্যবহারজীবিদের নিকট আমাদের ঋণ অপরিশোধ্য। মনোমোহন ঘোষ, লালমোহন ঘোষ, ডবলিউ সি. ব্যানার্জী, আনন্দমোহন বসু প্রভৃতি রাজনৈতিক নেতৃগণ, কলকাতা সায়ান্স কলেজের প্রাণস্বরূপ স্যার তারকনাথ ও স্যার রাসবিহারী এবং মনস্বী জষ্টিস চৌধুরী, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, ব্যোমকেশ চক্রবর্তী, ও সি. আর. দাশ প্রভৃতি ব্যবহারজীবিগণ বাঙলার সকল শুভকার্যে অগ্রণীস্বরূপ। রাজনৈতিক আন্দোলনে বিজ্ঞ ব্যবহারজীবিদের স্থান কোথায়—মহামতি বার্ক তা অতি সুনিশ্চিতরূপে নির্দেশ করে গেছেন। কিন্তু ছোট বড় সকল প্রকার আদালতের আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়িয়েও যাঁরা উপোষ ক'রে থাকতে বাধ্য হন, বার লাইব্রেরীর চাঁদার পয়সাটা যাঁরা দিয়ে উঠতে পারেন না এবং স্থল বিশেষে এক ছিলিম তামাক পেলে যাঁরা কয়েক পাতা নকল করে দিতে পারেন, এমন উকীলরা

কি ওকালতি ব্যাপারটার মর্যাদাহানি করছেন না! তাই বলছিলাম উকীল তৈরীর কলটা যদি বেশ কয়েক বছর বন্ধ থাকে তবে গোবেচারী উপোষকারীর দল বেঁচে যেতে পারে।"[22]

সত্যেন্দ্রনাথ বসুর ছাত্রজীবন কৃতিত্বে সমুজ্জ্বল। ইন্টারমিডিয়েট থেকে শুরু করে এম. এস-সি. পর্যন্ত কখনো দ্বিতীয় হননি তো বটেই, আবার এম. এস-সিতে রেকর্ড নম্বর পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। ইন্টারমিডিয়েটে মাত্র দু-বছর রসায়নশাস্ত্র পড়েছিলেন আচার্যদেবের কাছে। প্রখর বুদ্ধি ও তীক্ষ্ণ মেধা সম্পন্ন এই ছাত্রটিকে ক্লাসে সামলানো কঠিন ছিল বলে তাঁকে ভাষণ-মঞ্চের রেলিং-এর ওপর বসে থাকতে হতো। সত্যেন্দ্রনাথ ও মেঘনাদ আচার্যের রসায়নমণ্ডলীর সভ্য ছিলেন না সত্য, কিন্তু মেঘনাদের সহিত ছিল আচার্যের নিত্য-যোগ। বন্যাত্রাণে মেঘনাদ সাহার কর্মতৎপরতার কথা তো সর্বজনবিদিত। তা ছাড়াও বহু কর্মে আচার্যদেবের ডান হস্ত ছিলেন তিনি। 1921 সালের আগে পর্যন্ত সত্যেন্দ্রনাথের সহিত আচার্যের সাক্ষাৎকার ছিল, কিন্তু তারপর তিনি ঢাকা চলে গেলে এই যোগযোগ বিচ্ছিন্ন হয়। কিন্তু আচার্যের আদর ও স্নেহ থেকে কখনো বঞ্চিত হননি ; কলকাতায় এলে তিনি গুরুর সহিত দেখাসাক্ষাৎ করতে কখনো ভুলতেন না।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে সতেন্দ্রনাথ বসু ও মেঘনাদ সাহার মধ্যে একটি পার্থক্য লক্ষ করার মত। সত্যেন্দ্রনাথের চরিত্রে ছিল একটা খোলামেলা ভাব, ঢিলেঢালা ভাব ; হৈহৈ রৈরৈ করে গল্পে মশগুল থাকতেন তিনি ; কোন গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধান গল্প ও আড্ডার মধ্যেই হয়ে যেত, এবং অন্যান্য ছাত্র ও সহকর্মীদের উত্থাপিত সমস্যার সমাধান বিষয়ে তাঁর ইঙ্গিত ও সূত্রপ্রদান ছিল অভ্রান্ত। আচার্যদেবের ন্যায় তাঁরও ছিল নানা বিষয়ে অগাধ পাণ্ডিত্য। গণিত, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, ভূতত্ত্ব, সাহিত্য, সঙ্গীত ইত্যাদি ক্ষেত্রে তাঁর জ্ঞান বিলিয়ে দিয়েছেন আগ্রহীদের মধ্যে দু-হাত ভরে। তাঁর গিন্নিপনা ছিল না। অপরপক্ষে, মেঘনাদ সাহার কর্মজীবন ছিল সুসংগঠিত, গুরুর ন্যায় ছকে বাঁধা। কি গবেষণা, কি সমাজসেবা, কি বিজ্ঞান-সংগঠন সর্বক্ষেত্রেই তাঁর সাংগঠনিক চরিত্রেব প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। তাই বোধ হয়, তিনি ছিলেন গুরুর অধিকতর প্রিয়পাত্র।

আদর্শ শিক্ষক আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র সত্যেন্দ্রনাথের প্রতিভা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। আমাদের মনে হয়, এই উজ্জ্বল ছাত্রটিকে তাঁর রসায়নমণ্ডলীতে পাবার একান্ত কামনা ও বাসনা পোষণ করতেন তিনি। কিন্তু তা না হওয়ায় প্রফুল্ল-ভঙ্গীমায় রস ও রসিকতার সহিত বলতেন "বাঙ্গালী মস্তিষ্ক ও তার অপব্যহারের" চলমান উজ্জ্বল উদাহরণ। বিদ্রূপ নয়, তাচ্ছিল্য ও তুচ্ছতা প্রকাশ নয়,—নিছক রসিকতার মধ্য দিয়ে আচার্যের সত্যেন্দ্রনাথকে রসায়নমণ্ডলীতে পাবার সুপ্ত আকাঙ্খা ও বাসনা।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের উক্তির প্রকৃত তাৎপর্য ও ইঙ্গিত অনুধাবন করতে গেলে আক্ষরিক অর্থ অবশ্যই পরিহার করতে হবে। অন্যান্য উজ্জ্বল ছাত্রদের সহিত 'আত্মচরিত'-এ সত্যেন্দ্রনাথের নামও বিভিন্ন স্থানে উল্লিখিত হয়েছে। সত্যেন্দ্রনাথ বিদেশী ডিগ্রীতে

22. *আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের চিন্তাধারা*, পৃ—৭৫-৭৬

মোহাবিষ্ট ছিলেন না বলে প্রশংসা করে তিনি লিখেছেন,—"সত্যেন্দ্র বসু (বোস-আইনস্টাইন তত্ত্বের জন্য বিখ্যাত) যদিও বিদেশে গিয়া তথাকার প্রসিদ্ধ গণিতজ্ঞ পদার্থতত্ত্ব-বিদগণের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, তথাপি ঐ একই মনোভাবের বশবর্তী হইয়া কোন বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উপাধি গ্রহণ করেন নাই।"[23] আক্ষরিক অর্থ গ্রহণ করে অনেকে ভুল করলেও স্বয়ং সত্যেন্দ্রনাথ ভুল বুঝেন নাই। তাই গুরু নির্দেশিত 'নীলক্ষেত অভয় আশ্রম ডেয়ারী ফার্ম' প্রতিষ্ঠায় সত্যেন্দ্রনাথ সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন।

মারাত্মক ভ্রমে শান্তিস্বরূপ ভাটনগর

1928 সালে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের রসায়ন শাখার সভাপতির ভাষণে অধ্যাপক শান্তিস্বরূপ ভাটনগর বলেছিলেন,—"The one atrocious crime which I have committed and for which, I am sure, I have not been forgiven by Sir P. C. Ray, is that I am not his pupil. My defence is that I was not born early enough and hence I happen to be grand pupil of his, having received instruction in chemistry from the late Mr. Atul Chandra Ghosh, one of his earliest pupils." তৎকালের ভারতের শ্রেষ্ঠ রাসায়নবিদগণই ছিলেন আচার্যদেবের ছাত্র—নীলরতন ধর, প্রিয়দারঞ্জন রায়, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বিমানবিহারী দে, হেমেন্দ্রকুমার সেন প্রমুখ। সুতরাং আচার্যদেবের প্রত্যক্ষ ছাত্র হয়ে এই জ্যোতিষ্কমন্ডলীর অন্যতম হওয়ার আকাঙ্খা পোষণ করবেন, তাকে অবাক হওয়ার কিছু নেই। কিন্তু তাঁর নিজেকে *grand pupil* বলে বর্ণনাও অনুপম। *Indian Chemical Society* প্রতিষ্ঠাতেও ভাটনগরের উদ্যোগ কম নয়। অথচ আচার্যদেবের প্রতি অশেষ শ্রদ্ধাবান ভারতের এই বিশিষ্ট বিজ্ঞানীও তাঁকে ভুল বুঝে মারাত্মক ভ্রমে পতিত হয়েছেন। তিনি চিঠিতে আচার্যের প্রাদেশিক দৃষ্টি-ভঙ্গীর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। আচার্য ভাটনগরকে 12 ই ডিসেম্বর, 1935 সালে একটি চিঠি লিখে তাঁর অভিমত স্পষ্ট করেন। এখানে চিঠিটির প্রাসঙ্গিক অংশের ভাবানুবাদ প্রদান করা হলো :

"তুমি আমার প্রাদেশিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতি ইঙ্গিত করেছ। কিন্তু তার অন্তরালে আছে সর্বস্তরের বাঙালীর আলস্য ও কর্মোদ্যোগহীনতার তীব্র আর্তনাদ। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতিটি শাখায় বাঙালীর ব্যর্থতা দেখিয়ে একটি বই লিখছি। কলকাতার চৌরঙ্গীর ন্যায় মালের (Mall) সব ব্যবসা-বাণিজ্য পাঞ্জাবীদের দখলে ; বড়বাজারের মত যে অনার্কলি (Anarkali) সেখানে মাড়োয়ারীদের সুস্পষ্ট অনুপস্থিতি, কিন্তু কলকাতার বড়বাজার মাড়োয়ারী ও ভাটিয়াদের, বাস চালক ও ট্যাক্সিচালক শিখেরা, আর রেলওয়ের ঠিকাদারও পাঞ্জাবীরা। ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে এ-সব উদাহরণ দিচ্ছি না, বাঙালীদের সরাসরি মনোযোগ আকর্ষণের জন্যই এইসব উদাহরণ। তুমি অবশ্যই জান বিড়লা ভাইয়েরা হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে ছ'লক্ষ টাকা দান করেছে, অন্যান্য ক্ষেত্রেও তাদের বহু দান রয়েছে। আমি যদি এ-বিষয়ে মাড়োয়ারী ও ভাটিয়াদের প্রতি ইঙ্গিত করে থাকি, তা

23. *আত্মচরিত,* পৃ—২৪৩

কোন ঈর্ষা উদ্রেগ করার জন্য নয়, কেবল বাঙালীর চোখ খুলে দেবার জন্য। দু-একটা উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হবে। হাটন (Hutton) কর্তৃক লিখিত সাম্প্রতিক আদমসুমারী অনুসারে প্রধানত বিহারী মজুর শ্রেণীর লোকেরাই প্রতি বছর ছ'কোটি টাকা বাংলা থেকে মণি অর্ডার করে পাঠাচ্ছে। আমার *Life and Experiences* গ্রন্থে দেখিয়েছি প্রতি বছর সরণ জেলা-শহরে এক কোটি টাকা মণি অর্ডারে প্রেরিত হচ্ছে। আমাদের রাঁধুনী, ভৃত্য প্রায় সবই উড়িষ্যা, বিহার ও যুক্তপ্রদেশ থেকে নিযুক্ত হয়। আমরা তাদের নিযুক্ত করতে বাধ্য হই, কারণ ওই শ্রেণীর (class) বাঙালীরা অলস ও অসমর্থ। বোম্বাই ও আমেদাবাদের মিলমালিকদের আমরা 12 কোটি টাকা প্রদান করি, এবং আরো দু-কোটি টাকা বীমার জন্য। আমার গ্রন্থে দেখিয়েছি, এই হতভাগ্য বাংলাদেশ থেকে অবাঙালীরা প্রতি মাসে 10 কোটি টাকা অর্থাৎ বছরের 120 কোটি টাকা জল ছেঁচা করছে।

উদ্বিগ্ন হয়েই আমি বারংবার এই বিষয়গুলির উল্লেখ করছি, কিন্তু ঈর্ষার বশবর্তী হয়ে নয়। যদি কোন বাঙালী উড়িষ্যায় বা বিহারে বসবাস করে 50 টাকা বা 100 টাকার কোন সরকারী চাকরী পায়, অমনি ওড়িয়া ও বিহারীরা সরগোল তোলে, যদিও বাংলার আর্থিক বিজয় তারাই করেছে।

আশা করি তুমি আমার অবস্থাটা বুঝবে।"[24]

কেবল ভাটনগরই নয়, অন্যত্রও আচার্যদেবের বাঙালী-প্রীতি ও বাঙালীর ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণকে প্রাদেশিকতা বলে কটাক্ষ করা হয়েছে। 'ক্যাপিটাল'-এ 'স্বরাজ ও বাংলার আর্থিক অবস্থা' পুস্তিকার সমালোচনায় এই কটাক্ষ দেখা যায়। ওই সমালোচনার প্রত্যুত্তরে নৃপেন্দ্রকুমার গুপ্তের 10 ই ডিসেম্বর, 1931 সালের পত্রের একটি অংশ উদ্ধৃত হলো : "১৯৩১ সালের ৩রা ডিসেম্বরের "ডিচার্স ডায়েরিতে" স্যার পি. সি. রায় প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের প্রকাশিত "স্বরাজ এবং বাংলার আর্থিক অবস্থা" শীর্ষক পুস্তিকার বিস্তৃত সমালোচনা করা হইয়াছে। আপনার যুক্তিপূর্ণ সমালোচনায় কিন্তু দেখানো হয় নাই, বাংলা কিরূপে আর্থিক ধ্বংস হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিবে। প্রাদেশিক পক্ষপাত যতদূর সম্ভব বর্জন করিতে হইবে, এবং উহা আমাদের নিকট রুচিকরও নহে। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি, ইহা ছাড়া আর কি পথ আছে?

বাঙালীদের আর যে দোষই থাক, তাহারা দেশপ্রেমিক জাতি এবং তাহাদেরই জন্য ভারতে, বিশেষভাবে, বোম্বাইয়ে কার্পাস-শিল্পের উন্নতি হইয়াছে। কিন্তু বোম্বাই তাহার জন্য কি প্রতিদান দিয়াছে? স্বদেশী বাঙালীর মজ্জাগত, তাহারা যদি বলে যে, আমরা সর্বাগ্রে আমাদের নিজেদের শিল্প রক্ষা করিব, তাহা হইলে কেহই এই সঙ্গত ব্যবহারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে পারে না;"[25]

নৃপেন্দ্রকুমারের পত্রটি আচার্যদেবের বিরুদ্ধে অভিযোগটির ওপর যে সমুচিত

24. *Acharya Prafulla Chandra Ray*, C.U. p. 296-97

25. *আত্মচরিত*, পৃ—৩৭৭-৭৮

আলোকপাত করতে সমর্থ হয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। তা ছাড়া আচার্যদেব কখনো কোন প্রসঙ্গে অবাঙালী ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেননি, এবং এ-বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ বা জনমত গঠন করার প্রচেষ্টা করেননি। বাঙালীকে ডিগ্রীর মোহ ত্যাগ করতে, ব্রিফহীন উকিল না হতে, কেরানীগিরি না করতে, পিতৃপুরুষের বৃত্তি ত্যাগ করে অবাঙালীদের ন্যায় ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রবেশ করে অন্নসংস্থান ও বেকারত্বের অবসান ঘটাতে বলাকে যদি প্রাদেশিকতা বা আঞ্চলিকতা আখ্যা প্রদান করা হয়, তা হলে বলতে হবে দেশের প্রজ্ঞা ও মনস্বিতার সম্পূর্ণ অবক্ষয় ও অধঃপতন হয়েছে। আমাদের মনে হয়, অধ্যাপক শান্তিস্বরূপ ভাটনগর আচার্যদেবের সব লেখার সহিত পরিচিত ছিলেন না, ক্ষুদ্রাংশ মাত্র পড়ে ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে মারাত্মক প্রমাদ ঘটিয়েছিলেন। আবার, এও সত্য যে, বিশেষজ্ঞদের অন্য বিষয়ে হাস্যকর অজ্ঞতা দেখা যায়।

আচার্যদেব প্রায় অর্ধ শতাব্দী কাল ধরে বাংলা ও বাঙালীর দুর্দশায় ব্যথিত হয়ে তার আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য নানা চিন্তা-ভাবনা যেমন করেছেন, তেমনি আবার শিল্প-বাণিজ্য-ব্যবসা প্রতিষ্ঠায় নানা উদ্যোগ ও কার্যক্রম গ্রহণ করেছেন। একদিকে নিজে মৌলিক গবেষণা করেছেন, *History of Hindu Chemistry*-র ন্যায় অনন্য গ্রন্থ রচনা করেছেন, 'বেঙ্গল কেমিক্যাল'-এর বীজ বপন করেছেন, গবেষণা পরিচালনা করেছেন, *Indian School of Chemistry, Indian Chemical Society* প্রতিষ্ঠা করেছেন,' তেমনি জনসেবা, সমাজ সংস্কার ও জনহিতকর নানা কাজে নিজেকে নিমগ্নও রেখেছেন। তাঁর আগে ও সমকালে বিখ্যাত ব্যক্তিদের অভাব ছিল না দেশে : রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, জগদীশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রমন, রাধাকৃষ্ণণ, রামানুজ, গোখলে, গান্ধীজী প্রমুখ। তাঁরা সকলেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ, কিন্তু সীমাবদ্ধতার গন্ডী তাঁরা অতিক্রম করতে পারেননি। কিন্তু 'এক অঙ্গে এত রূপ নয়ানে না ধরে' হলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ; ভারতবর্ষে তো বটেই, সমগ্র বিশ্বে তাঁর তুলনা মেলা ভার।

একাদশ অধ্যায়

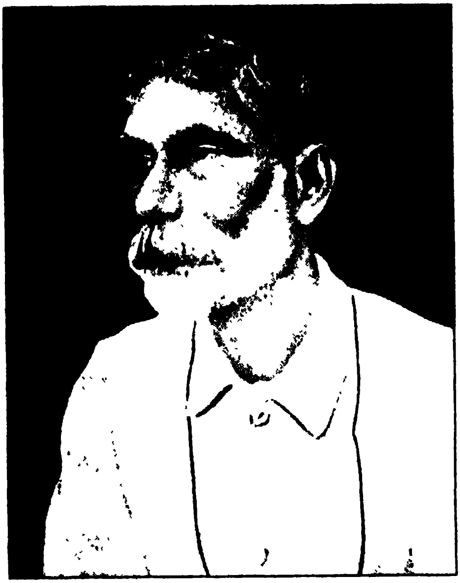
শিক্ষক ও শিক্ষাব্রতী

বর্তমানে শিক্ষা পণ্যে পরিণত হয়েছে। ছাত্রছাত্রীগণ ক্রেতা, আর শিক্ষকগণ বিক্রেতা। শিক্ষকগণ রমরমিয়ে প্রাইভেট টিউশনী করছেন, সকাল, বিকাল ওসন্ধ্যায় ক্ষেপে ক্ষেপে পঁচিশ-তিরিশ জন ছাত্রছাত্রী বিদ্যা ক্রয়ের জন্য ভিড় করছে, আর শিক্ষকগণ 'নোট' লিখিয়ে, ফটোকপি বিতরণ করে অর্থ উপার্জন করে গাড়ী-বাড়ী হাঁকাচ্ছেন। ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই, কেবল ক্রেতা-বিক্রেতার সম্পর্ক। অভিভাবক-অভিভাবিকারা মনে করছেন, তাঁদের পুত্রকন্যারা সবাই কেষ্ট-বিষ্টু ; সবাই ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হবে। বিদ্যা ও জ্ঞানের দরকার নেই, ভাল ভাল নোট ও পথনির্দেশনা পেয়ে একবার ওইসব বৃত্তিমূলক লাইনে ভর্তি হতে পারলেই মোক্ষ লাভ হবে। তা ছাড়া, ডিগ্রীর মোহ তো আছেই—এল. এ., বি. এ. পাশ করতেই হবে, তা না হলে পিতামাতার 'প্রেসটিজ' থাকে না, আত্মীয়-স্বজনের কাছে মুখ দেখানো ভার হয়ে ওঠে। 'জয়েন্ট এন্ট্রান্স' সর্বনাশ ঘটাবার বাকী রাখেনি। পাগলামীর উৎকেন্দ্রিকতায় পেয়ে বসেছে ছাত্রছাত্রী ও অভিবাকদের। ছাত্রছাত্রীদের যোগ্যতা, মানসিকতা, প্রবণতার কোন মূল্য নেই ;সবাই বিজ্ঞান পড়বে, আর JEE-তে আবির্ভূত হওয়ার জন্য হাজার হাজার টাকা অপব্যয় করবে। প্রাইভেট কঁলেজগুলিকে হাজার হাজার লাখ লাখ টাকা 'ডোনেশন' দিয়েও অভিভাবকরা তাদের পুত্রকন্যাদের ভর্তি করতে পিছপা হচ্ছেন না। 'বিদ্যাং দেহি জ্ঞানং দেহি' নয়, পেশাগত ক্ষেত্রগুলিতে ভর্তি হয়ে মিলিওনিয়ার হওয়ার স্বপ্নে সবাই মশগুল! শিক্ষাক্ষেত্রে এই অরাজগতা—মাৎস্যন্যায়ের শিকার হয়ে কত সুকুমারমতি ছাত্রছাত্রী হতাশা ও বিষাদের কবলে পড়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছে তার হিসাব নেই। এই অস্থিরতা ও উৎকেন্দ্রীকতরা সময়ে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র আমাদের পথের নিশানা দিতে পারেন ; তিনি আজ খুবই প্রাসঙ্গিক।

শিক্ষক প্রফুল্লচন্দ্র

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের কর্মক্ষেত্র ও চিন্তাধারা যে বহুধা বিস্তৃত, তার পরিচয় আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে পেয়েছি। কিন্তু শিক্ষক হিসাবেই তাঁর কর্মজীবন শুরু এবং সুদীর্ঘ কাল (1889-1936) শিক্ষকতার সঙ্গে অন্বিষ্ট থেকে অবসর গ্রহণ। তিনি ছিলেন আদর্শ শিক্ষক—জাত শিক্ষক, সর্বকালের একজন শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হিসাবে তাঁকে অভিহিত করলে বিন্দুমাত্র অত্যুক্তি করা হয় না। প্রকৃত শিক্ষার প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগ, মৌলিক জ্ঞানের বিকাশে ক্লান্তিহীন অবিরাম প্রয়াস, ছাত্রবাৎসল্য, আর সরল আড়ম্ববিহীন

জীবনচর্যার এমন দৃষ্টান্ত ভারতের প্রাচীন আচার্যদের মধ্যেই দেখা যায়। প্রাচীন ভারতে 'কুলপতি'দের অধীনে দশ হাজার ছাত্র অধ্যয়ন করত, কিন্তু প্রফুল্লচন্দ্রের অধীনে কত হাজার ছাত্র অধ্যয়ন করেছে, তার সংখ্যা নিরুপণ করা আজও সম্ভব হয়নি। 91 নং সারকুলার রোডে অবস্থানকালে নীলরতন ধর থাকতেন, আর বিজ্ঞান কলেজে তো তাঁর একটি 'সংসার'-ই ছিল। গুরু-শিষ্যের যে মধুর গভীর সম্পর্ক প্রাচীন ভারতের আচার্য- শিষ্যের মধ্যে দেখা যায়, তার আধুনিক রূপদান করেন আচার্যদেব। ছাত্রদের অর্থ দিয়ে, বৃত্তির সুপারিশ করে, পরামর্শ ও পারস্পরিক ভাব বিনিময় করে যে আদর্শ তিনি স্থাপন করেছেন, তা বিশ্বে দুর্লভ এক দৃষ্টান্ত। তাঁর ছাত্র বীরেন্দ্রনাথ দে গণিতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করেন : এন্ট্রান্স পরীক্ষায় গণিতে প্রথম হন, এবং বি. এ.-তেও (অনার্স) প্রথম হন, এবং ঈশান স্কলারের সম্মানও প্রাপ্ত হন, কিন্তু রসায়নে প্রথম শ্রেণী পান নি। তা সত্ত্বেও আচার্যদেব বীরেন্দ্রনাথকে স্টেট স্কলারশিপের জন্য সুপারিশ



আচার্যদেব (1932)

করেন। ফলে, তিন বছরের জন্য তিনি কেম্ব্রিজের সেন্ট জন কলেজে উচ্চতর অধ্যয়নের সুযোগ পান। তা ছাড়া, হেমেন্দ্রকুমার সেন, নীলরতন ধর প্রমুখও আচার্যের অর্থসাহায্য থেকে বঞ্চিত হননি। আচার্যদেবের শিক্ষাদান ও তার তাৎপর্য সম্বন্ধে বীরেন্দ্রনাথ লিখেছেন,—"From my own experience I can assert with confidence that his lectures were always impressive and instructive, and sparkled with humorous anecdotes and stories interspersed with the recital of important episodes in the lives of world-famous personages In the event of an appreciable number of his

students not being able to follow his lectures or his experiments, he would readily repeat them for the benifit of the whole class."[1]

প্রাচীন ভারতে প্রাত্যহিক শিক্ষার সমারম্ভে আচার্য নিম্নলিখিত মন্ত্র উচ্চারণ করে গুরু-শিষ্য একাত্ম হবার আহ্বান করতেন,—

ওঁ সহ নাববতু সহ নৌ ভুনক্তু সহ বীর্যং করবাবহৈ,
তেজস্বিনাবধীতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ।।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

—"ব্রহ্ম আমাদের উভয়কেই রক্ষা করুন। তিনি আমাদের একত্রে বহন করুন। আমরা একত্রে জ্ঞানলাভের শক্তি যেন অর্জন করি। আমাদের শিক্ষা যেন তাহার প্রকৃত বৈশিষ্ট্যটি প্রকাশ করিতে পারে—অথবা আলোকের ন্যায় সুদীপ্ত হইয়া উঠিতে পারে। আমাদের মধ্যে যেন কখনও বিদ্বেষের সৃষ্টি না হয়।"[2]

প্রফুল্লচন্দ্রের লেকচারে বাগ্মিতা ছিল না, অলঙ্করণের প্রয়াস ছিল না ; সাদামাটা ইংরেজী, কখনো কখনো বাংলা বাক্যাংশের মিশ্রণ যা সেকালে কেউ ভাবেনি। কিন্তু এই ভাষা ছিল অন্তরের ভাষা,—প্রাণস্পর্শী যা ছিল *impressive and instructive*. এই ভাষার মধ্য দিয়েই গুরু-শিষ্যের জ্ঞানলাভের শক্তি অর্জিত হতো, রসায়নের 'প্রকৃত বৈশিষ্ট্যটি' 'আলোকের ন্যায় সুদীপ্ত' হয়ে উঠত। সেইজন্যই নীলরতন ধর, প্রিয়দারঞ্জন রায়, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়, হেমেন্দ্রকুমার সেন, বীরেশচন্দ্র গুহ, পুলিনবিহারী সরকার, মেঘনাদ সাহা, সত্যেন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ উজ্জ্বল নাক্ষত্রিক প্রতিভার উন্মেষ ও আবির্ভাব সম্ভব হলো।

শিক্ষকদের অবসর গ্রহণে যে-সব ভাষণ ও মানপত্র প্রদান করা হয়, তা সাধারণত অতিকথন ও অতিরঞ্জনে পূর্ণ হয়। অনেক সময় অবসর গ্রহণকারী শিক্ষকেরও ওইসব অতিকথনে বিড়ম্বিত ও বিলজ্জিত হতে দেখা যায়। কিন্তু প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে অবসর গ্রহণের প্রাক্কালে ওই কলেজের ছাত্রগণ আচার্যদেবকে যে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন, তাতে অত্যল্পও অতিরঞ্জন ও অতিকথন নেই—আশ্চর্যরূপে তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। উদ্ধৃতাংশটি এখানে খুবই প্রাসঙ্গিক:

"কলেজে আপনার যে স্থান ছিল, তাহা পূর্ণ হইবার নহে। ভবিষ্যতে আরও অনেক অধ্যাপক আসিবেন ; কিন্তু আপনার সেই মধুর প্রকৃতি, সেই সরলতা, অক্লান্ত সেবার ভাব, উদার বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা, তর্ক ও আলোচনায় সেই গভীর জ্ঞান, এই সমস্ত গুণ আমরা কোথায় পাইব? গত ৩০ বৎসর ধরিয়া এই সমস্ত দুর্লভ গুণেই আপনি ছাত্রদের প্রীতি অর্জন করিয়াছেন।

"আপনার কৃতিত্ব অসামান্য। আপনার সরল জীবন যাপন প্রণালী আমাদিগকে প্রাচীন ভারতের গৌরবময় যুগকে স্মরণ করাইয়া দেয়। আপনি চিরদিনই আমাদের বন্ধু, গুরু ও পথ-প্রদর্শক ছিলেন। সকলেই আপনার কাছে প্রবেশ করিতে পারে।

1. *Acharya Prafulla Chandra Ray*, C.U., p. 151
2. *বেদের পরিচয়*, পৃ—১৯৪

আপনার প্রকৃতি সর্বদাই মধুর। দরিদ্র ছাত্রদিগকে কেবল সৎপরামর্শ দিয়া নহে, অর্থ দ্বারাও আপনি সহায়তা করিতে সর্বদাই প্রস্তুত। কঠোর ব্রহ্মচর্যপূত অনাড়ম্বর জীবন আপনার, আপনার দেশপ্রেমের বাহ্য আড়ম্বর নাই। কিন্তু উহা গভীর,—আপনার মধ্যে আমরা প্রাচীন ভারতের গুরুর আদর্শেরই পুনরাবির্ভাব দেখিতেছি।"[3]

আদর্শ শিক্ষক জন্মগ্রহণ করেন, গড়েপিটে আদর্শ শিক্ষক তৈরী করা যায় না। প্রফুল্লচন্দ্র ছিলেন বাস্তবিকপক্ষে আদর্শ শিক্ষক। তাঁর শিক্ষাদানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল ছাত্রদের বিষয়ের প্রতি অনুরাগ জন্মানো, ভালবাসার নিগড়ে আবদ্ধ হওয়া। তাই তাঁর পাঠদানকালে নব নব বিচিত্র ভূমিকার আয়োজন। যেমন, তখন সেসনের প্রথম তিন মাসে পড়ানো হতো হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন এই তিনটি গ্যাস এবং তাদের মিশ্র পদার্থগুলি। এইসব পদার্থগুলি পড়ানোর সময় তাই রসায়নের ইতিহাস, অক্সিজেনের আবিষ্কার এবং রসায়নশাস্ত্রের জনক লাভোয়াশিয়ে, প্রিস্টলে ও শীলির আবিষ্কার কাহিনী ও তাদের পারস্পরিক কৃতিত্ব বর্ণিত হতো। ছাত্রদের রসায়ন জ্ঞানকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করতেই তাঁর নব্য রসায়নের জনকদের সহিত যোগসূত্র স্থাপনের পরিকল্পিত আয়োজন। এইভাবেই অপরিসীম কষ্ট স্বীকার করে গবেষণা ও আবিষ্কার করার নেশা ধরিয়ে দিয়েছিলেন তিনি ছাত্রদের মনে। এইভাবে পড়ানোর জন্য অনেক সময় অন্যান্য কলেজের তুলনায় পাঠ্যসূচী শেষ করতে তাঁকে বেগ পেতে হয়েছে। একবার পরপর দু-তিন বছর প্রেসিডেন্সী কলেজে রসায়নের ফল অন্যান্য কলেজের তুলনায় প্রত্যাশিতভাবে ভাল হয়নি। তখন অধ্যক্ষ এইচ. আর জেমস প্রফুল্লচন্দ্রকে তার কারণ জিজ্ঞাসা করতে তিনি উত্তর দেন,—"because we teach chemistry and not the syllabus of the Calcutta University". প্রফুল্লচন্দ্র কোন নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক অবলম্বন করে পড়াতেন না; ছাত্রদের তাঁর লেকচার অনুসরণ করতে বলতেন, বই কিনে থাকলে তা পুড়িয়ে ফেলতে বলতেন অর্থাৎ বাজার চলতি বই পড়তে নিরুৎসাহিত করতেন। কিন্তু উচ্চশ্রেণীর মৌলিক গ্রন্থ পড়তে উৎসাহিত করতেন। বিদ্যা ও জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ নেই, কেবল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াকে আচার্যদেব কখনো সমর্থন করেননি। সেইজন্য Aids, Digests, Compendium, one-day-preparations Series, Made Easy Series গলাধঃকরণ করে পাশ করাকে তিনি তীব্র ভাষায় সর্বদা নিন্দা করেছেন। এই প্রসঙ্গে 1928-29 সালে ভারতের শিক্ষার বিবরণ সম্পর্কে এডুকেশনাল কমিশনারের মন্তব্য উদ্ধৃত করেছেন বিখ্যাত *Nature* পত্রিকা থেকে : "বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা পাঠ্যপুস্তক পড়িবার জন্য মাথা ঘামায় না, তাহারা তৎপরিবর্তে বাজার-চল্‌তি সংক্ষিপ্তসার, নোটবুক প্রভৃতি মুখস্থ করিয়াই সন্তুষ্ট হয়।"[4] কেবল ছাত্ররাই নয়, যে-সব শিক্ষক নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক অবলম্বনে পাঠদান করতেন, তিনি তাঁদের 'গতানুগতিক প্রথার দাস' বলে আখ্যাত করেছেন। এ-যুগে তো সে-যুগের 'গতানুগতিক প্রথার দাস'-রা ক্রীতদাসে পরিণত হয়েছেন। বহু

3. *আত্মচরিত,* পৃ—১৪৪
4. *আত্মচরিত,* পৃ—২৩৬, পাদটীকা—২০

শিক্ষক এখন তো স্কুলে নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তকের কমা, দাঁড়ি পাঠ করেই শিক্ষাদান 'কন্ম'-টি সমাধা করছেন।

ছাত্রাবস্থায় কখনো পাঠ্যপুস্তকের ক্ষুদ্র বিষয়ের মধ্যে আবদ্ধ থাকতে পারেননি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র। পাঠ্যপুস্তক ছিল তাঁর কাছে পথপ্রদর্শক মাত্র। বহুবিধ বিষয়ে পাঠের দুর্নিবার আগ্রহ আকর্ষণের জন্য স্বদেশে ছাত্রজীবনে কখনো উজ্জ্বল রেজাল্ট করতে পারেননি তিনি। কাব্য-সাহিত্য, জীবনী, ইতিহাস ইত্যাদিতে আকৃষ্ট হয়েছেন সারা জীবন। ইংরেজী ও বাংলা ভাষা ছাড়াও জার্মান, ফরাসী, ল্যাটিন ও সংস্কৃতে তাঁর ঈর্ষণীয় দখল ছিল। এইসব কারণে রসায়ন বিজ্ঞানের ন্যায় নীরস বিষয়টিকে সরস ও জীবন্ত করে তুলতে তাঁর অসুবিধা হয়নি। তাঁর রসায়নের সহিত সেক্সপীয়ার, রোমান্টিক কাব্য, কালিদাস প্রভৃতি বিক্রিয়া ঘটিয়ে নতুন নতুন বিক্রিয়ালব্ধ পদার্থ উৎপন্ন করত। "চর্মকারের কাছে যেমন Nothing like leather অর্থাৎ দুনিয়ায় চামড়াই সার বস্তু, ময়রার কাছে যেমন ঘি আর চিনি, বিশেষজ্ঞের নিকট তেমনি তাঁর special subject,"[5] তিনি তেমন বিশেষজ্ঞ ছিলেন না। বিশেষজ্ঞ সম্বন্ধে আরো কৌতুকজনক উক্তি : "আমার এক ছাত্র আছেন ; তাঁর খ্যাতি ইউরোপে পৌছেচে। তিনি একজন এই রকম বিশেষজ্ঞ, একজন D. Sc.। একদিন ছাত্র-পরিবেষ্টিত হয়ে ব'সে তাঁকে বললাম, "আমার তো বয়স হ'ল। B.C.P.W. অর্থাৎ বেঙ্গল কেমিক্যাল আমার মেয়ে, আর ছাত্রেরা আমার ছেলে। এখন বুড়া বয়সে দেখছি আমার King Lear, রাজা লীয়ারের দশা হবে। কেউ কর্ডেলিয়া হবেন, কেউ গণেরিল, আবার কেউ বা রেগান।" ছাত্র তো শুনে অবাক্—বললেন, 'তারা কে?'. দুনিয়ার সব রসে বঞ্চিত হয়ে এ রকম রসায়ন-রসিক হওয়া তো মুস্কিল।"[6] আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ভুলক্রমে রাসায়নিক হননি, তিনি রসায়ন-রসিক হয়েই রাসায়নিক হয়েছিলেন। 'আমি প্রায় ভ্রমক্রমে রাসায়নিক হইয়াছিলাম' তাঁর স্বভাবসুলভ রসিকতার প্রকাশ মাত্র। আমাদের মনে হয়, তাঁর পাঠ-পরিধির বিস্তৃতির ফলেই রসায়ন-সমুদ্র থেকে অমৃত মন্থিত হয়েছিল : ভারত জগৎসভায় মর্যাদার আসন লাভ করেছিল।

শিক্ষাব্রতী প্রফুল্লচন্দ্র

পঁচাত্তর বছর বয়স পর্যন্ত শিক্ষকতা, গবেষণা করেছেন, আর গবেষণা তত্ত্বাবধানও করেছেন ; তার ওপর স্বচ্ছ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ও বহুধা ক্ষেত্রে যাঁর চিন্তাধারা প্রবাহিত, তিনি যে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব অভিমত ব্যক্ত করার সম্পূর্ণ অধিকারী তাতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। তাই আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বিভিন্ন উপলক্ষে—কখনো বিশেষ ভাষণে, কখনো শিক্ষক সমিতির সভাপতিরূপে, কখনো বা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন ভাষণে শিক্ষা ও শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁর দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করতে দ্বিধা করেননি। যে-সব মুখ্য বিষয়গুলি আচার্যদেবের ভাষণ ও বক্তৃতায়

5. *আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের চিন্তাধারা*, পৃ—৩২-৩৩

6. *তদেব*, পৃ—৩৩

আলোচিত হয়েছিল, তা হলো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃত কার্য, ডিগ্রীর মূল্য, শিক্ষার মাধ্যম, পাঠ্যসূচী ও পাঠ্যপুস্তক, সাহিত্য ইত্যাদি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য

আচার্যদেবের মতে, বিশ্ববিদ্যালয় হবে "পাণ্ডিত্য, গবেষণা ও উচ্চতর সংস্কৃতির কেন্দ্রস্বরূপ।" যারা জ্ঞানান্বেষণের জন্য সমগ্র জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত, তারাই কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পাক। সে-কারণে সবারই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার পাওয়া উচিত নয়, বাছাই করা অল্প সংখ্যক ছাত্র—শতকরা দশজনের বেশী নয়—এমন ছাত্ররাই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পাক। যাদের অন্তরে উচ্চশিক্ষা লাভের প্রেরণা নেই, তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের অধিকার নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ হলো এমন শিক্ষা দেওয়া যাতে ছাত্রদের জ্ঞানচক্ষু খুলে যায়, আর মনের সঙ্কীর্ণতা দূরীভূত হয়। তিনি অধ্যাপক হ্যারল্ড লাস্কির *Danger of Obedience* গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, অস্নাতকদের সমস্ত তথ্যের আধার করে তোলা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ নয়। তথ্য সমূহকে কিরূপে কাজে পরিণত করা যায়, তার শিক্ষা দেওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা এমন হতে হবে যাতে ছাত্ররা তথ্যসমূহ যথার্থ ও প্রকৃষ্টরূপে বিশ্লেষণ করে সত্যে উপনীত হতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা নতুনকে গ্রহণ করতে শেখাবে, জ্ঞানলাভের স্পৃহা ও আকাঙ্খা জাগ্রত করবে। আবার, সংস্কৃতি প্রজ্ঞার ওপর প্রতিষ্ঠিত বলে প্রজ্ঞার অনুশীলনই হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম কাজ। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালী এমন হবে যাতে স্বাধীন চিন্তাশক্তির উন্মেষ হবে ; ছাত্রদের মানসিক কাঠামো এমনভাবে গঠিত হবে যাতে সে নিজেই সমস্যা সমাধান করে সফল হতে পারবে জীবনের সর্বক্ষেত্রে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপদ্ধতির ত্রুটি

আচার্যদেব পাঁচ-সাতবার বিদেশ ভ্রমণ করেছিলেন, কিন্তু তা নিছক বিনোদনের জন্য তো নয়-ই, আবার 'কেরিয়ার' গোছানোর জন্যেও নয়। এডিবার্গে অধ্যায়নকালে ওই দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থা, শিক্ষাদান প্রণালীর সহিত তিনি তো পরিচিত ছিলেনই, আবার বারবার বিদেশভ্রমণ করে উন্নত দেশগুলিকে জ্ঞান ও বিজ্ঞানে যে নতুন নতুন ভাব ও ভাবনায় উদ্ভব হয়েছে, সে-সবের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হয়েছিলেন। শিক্ষাবিদ ও চিন্তাবিদ প্রফুল্লচন্দ্র তাই এদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটিগুলি খুব সহজে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। অন্ততপক্ষে পাঁচটি ত্রুটির কথা তাঁর 'আত্মচরিত'-এ উল্লিখিত হতে দেখা যায় :

(i) অধ্যাপকের বক্তৃতা দেওয়ার বাধ্যতামূলক রীতি

(ii) বিশ্ববিদ্যালয় ডিগ্রীধারীদের একচেটিয়া প্রতিষ্ঠান

(iii) ছাত্র নির্বাচনের অভাব

(iv) শিক্ষার বাহন—মাধ্যম

(v) বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের যোগসূত্রহীনতা

(i) অধ্যাপকের বক্তৃতার বাধ্যতামূলক রীতি

তখন মাধ্যমিক শিক্ষা ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে। এই শিক্ষার অনেক অনাবশ্যক অংশ বর্জন করার প্রশ্ন তুলেছিলেন আচার্যদেব তাঁর মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন ভাষণে (1926)। তিনি বলেছিলেন, শিক্ষার অনেক গতানুগতিক অংশ বিদ্যালয়েই শেষ হওয়া উচিত—বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত তার জের টানা একান্ত অনাবশ্যক। বিশ্ববিদ্যালয়ে যে খুঁটিনাটি অংশের ওপর জোর দেওয়া হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ে তার কোন প্রয়োজন নেই। স্নাতকোত্তর শ্রেণীতেও *Exercise* দেবার রীতি একান্তই অপ্রয়োজনীয়। আচার্যদেব বলেন, "মানসিক যোগ্যতার সঙ্গে পরিশ্রম করিবার অভ্যাস" বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার অন্যতম মূল শর্ত হওয়া উচিত। অধ্যাপকদের বক্তৃতা দেওয়ার শর্ত ও *Exercise* দেওয়ার পক্ষপাতি ছিলেন না তিনি। কারণ, তার ফলে ছাত্রদের মানসিক শক্তি আদৌ বিকশিত হয় না। বাঁধাধরা বক্তৃতার ফলে ছাত্রদের অনেক সময় বুঝতে না পারলে অধ্যাপককে প্রশ্ন করার কোন সুযোগ ও অবকাশ থাকে না। বারট্রান্ড রাসেলও বলতেন, "বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় পাঠশালার গুরুগিরির স্থান আর এখন নাই।" 'টিউটোরিল' প্রথায় ছাত্রদের যে শিক্ষা হয়, তা কেবল পরীক্ষা পাশের নামান্তর মাত্র। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা এমন হবে যাতে ছাত্ররা অধ্যাপকের কাছ থেকে কতকগুলি বই-এর নাম জানবে, আর ওইসব বই-এ যে-সব সমস্যা আলোচিত হয়েছে, সে-বিষয়ে চিন্তা করবে, সমাধানের উপায় আবিষ্কার করবে, কলেজের তর্কসভায় অধ্যাপক ও সহপাঠীদের সহিত বিতর্কে অংশগ্রহণ করবে। আচার্যদেবের মতে, ছাত্রদের বিশ্লেষণ ও সমীকরণ ক্ষমতা বৃদ্ধির এই পদ্ধতিই একমাত্র উপায়—নান্যঃ পন্থা। প্রশ্ন উঠতে পারে, অধ্যাপকদের বক্তৃতা দেওয়ার রীতি বন্ধ হলে তারা করবেটা কি? এই প্রশ্নের সমাধানে আচার্যদেবের সুস্পষ্ট অভিমত হলো : "অধ্যাপকদের প্রধান কাজ হইবে মৌলিক গবেষণা। অধ্যাপক যেখানে মনে করেন যে, তাঁহার নূতন কিছু শিক্ষা দিবার আছে, কেবল সেই স্থলেই তিনি বক্তৃতা দেন, আলোচনা করেন এবং এইভাবে ছাত্রদের মধ্যে জ্ঞানান্বেষণের প্রবৃত্তি জাগ্রত রাখেন।"[7] কিন্তু দুঃখের বিষয়, আচার্যদেব প্রস্তাবিত অধ্যাপকদের বাঁধাধরা বক্তৃতা আজও বিলুপ্ত হয়নি, অধ্যাপকগণ 'নতুন কিছু' দেওয়ার পরিবর্তে মান্ধাতা আমলের প্রস্তুত 'নোট' ভাঙা রেকর্ডের মত শ্রীকণ্ঠে বাজিয়ে চলেছেন। জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ক্ষেত্রে দৈন্য বৃদ্ধি পেয়েছে বৈ কমেনি।

(ii) বিশ্ববিদ্যালয় ডিগ্রীধারীদের একচেটিয়া

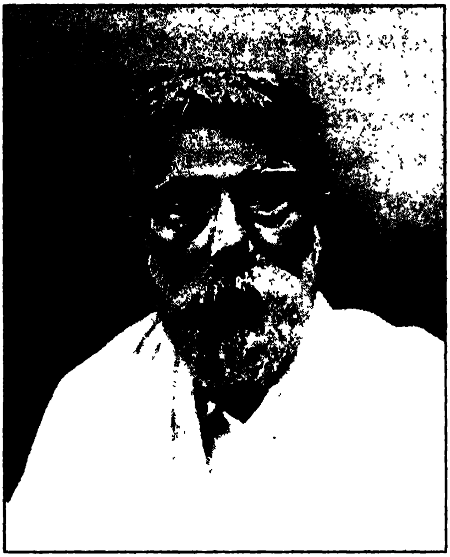
আমাদের সমাজে ও শিক্ষায়তনে ডিগ্রীর মূল্য অপরিসীম, আবার যিনি বিদেশী ডিগ্রীর অধিকারী তাঁর তো বিশেষ মর্যাদার আসন। বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রীধারীদেরই প্রাধান্য—একচেটিয়া ; যাদের ডিগ্রী নেই অথচ মৌলিক চিন্তা ও গবেষণা করার শক্তি ও প্রবণতা আছে, তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন স্থান নেই, আর স্বীকৃতিও নেই। আচার্যদেবের সুদৃঢ় অভিমত হলো বিশ্ববিদ্যালয়কে মৌলিক গবেষণার কেন্দ্রস্বরূপ বলে গ্রহণ করলে যাদের মৌলিক চিন্তা-ভাবনা করার ক্ষমতা ও প্রবণতা আছে, যারা

7. *আত্মচরিত*, পৃ—২৩৮

গবেষণায় আত্মোৎসর্গ করতে প্রস্তুত, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ তাদের দেহে থাক বা নাই থাক, বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজা তাদের জন্য উন্মুক্ত রাখতে হবে। ডিগ্রীর ছাপের অসারতা প্রসঙ্গে কসবা লাইব্রেরীর বাৎসরিক উৎসবে বক্তৃতায় তিনি বলেন,—"যদি বল Dr. Ray, D. Sc., তবে বুঝতে হবে এই যে তাঁর ১৮৮৫ বা ৮৭ সালের ডিগ্রীর কথা হচ্ছে। তারপর ৩৫ বৎসর ধ'রে তিনি রসায়ন বা অন্য কোনো শাস্ত্র সম্বন্ধে যে গবেষণা করলেন, D. Sc. বললে সেটা তো স্বীকার করা হয় না। সুতরাং ডিগ্রীটা কিছু নয়,—ওটা অনেক সময় অজ্ঞতার আবরণ মাত্র। অনেকে অমুক সালে দর্শন শাস্ত্রে পরীক্ষা দিয়ে 'সুবর্ণ পদক পেয়েছি' বলে গর্ব করেন ;এদিকে হয়ত পরীক্ষার পর পড়া ছেড়েছেন ব'লে হ্যামিল্টন ও রীডের মত ছাড়া নূতন দার্শনিক তত্ত্বের খোঁজ রাখেন না। অনেক ডাক্তারবাবু ১৮৭২ সালের অর্জিত জ্ঞান অনুসারে রোগীর প্রেস্ক্রিপ্‌শন্‌ লেখেন। সেকালের মত খন্ডন হয়ে কত নূতন মত প্রচলিত হয়েছে তার খবরই রাখেন না। আলোচনা না করলে অজ্ঞতা এইরূপই দাঁড়ায়। কিন্তু ইংল্যান্ড আমেরিকায় লোকে এত ডিগ্রী চায় না। তারা চায় প্রকৃত শিক্ষা।"[৪] প্রফুল্লচন্দ্র নামোল্লখ করে বলেছেন বিশ্বের বহু মহৎ ও প্রতিভাশালী ব্যক্তিত্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট ঋণী নন। যেমন,—রামমোহন, কেশবচন্দ্র সেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, নজরুল ইসলাম, সেক্সপীয়ার, জনসন, বার্নার্ড শ' প্রমুখ। বিস্ময়কর গাণিতিক প্রতিভা রামানুজন তো দু-বার ধরেও এদেশে এফ. এ. পাশ করতে পারেননি, আর নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত জে. বি. এস. হলডেন তো এদেশে শিক্ষকতার চাকরী পর্যন্ত পেতেন না। তাই তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় হলো "যাঁহারা মানবজ্ঞানের ক্ষেত্র বিস্তৃত করিবার জন্য আগ্রহান্বিত বিশ্ববিদ্যালয় এমন সমস্ত কর্মীকে যেমন সাদর অভ্যর্থনা করিবেন, তেমনি প্রতিভার অধিকারীদের যাহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপরে একান্তভাবে নির্ভর করিতে না হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহায্য ব্যতীত স্বাধীনভাবে তাঁহারা কার্য করিতে পারেন, তাহাও আমাদের দেখিতে হইবে।"[৫] আচার্যদেব তাঁর অভিমত ও প্রত্যয়ের সমর্থনে বিখ্যাত এইচ. জি. ওয়েলস-এর অভিমত উদ্ধৃত করেন। ওয়েলস-এর মতে, বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণ শিক্ষার দরকার নেই, আর কোন উপাধি বিতরণেরও প্রয়োজন নেই। যারা জ্ঞানচর্চার প্রতি আকর্ষণ অনুভব করবে, তারা বিখ্যাত মনীষী ও অধ্যাপকদের সহকারী, সেক্রেটারী, শিষ্য ও সহকর্মীরূপে কাজ করলে ছাত্ররূপে গণ্য হবে। এইভাবে বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ হতে পারে। বস্তুতপক্ষে, ডিগ্রীধারীদের 'মনোপলি'-তে মৌলিক চিন্তাশক্তি বিনষ্ট হয়, প্রতিভার বিকাশ ব্যাহত হয়, মননশীলতা ঊষর মরুপ্রান্তরে পরিণত হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমাদের দেশের মোটা মোটা মাথাওয়ালাগণ কোন একটি বিশ্ববিদ্যালয়েও আচার্যের আদর্শ গ্রহণ করেননি—আংশিকভাবেও নয়। এখনো ডিগ্রীর মহিমা এমন যে, তা না থাকলে কোন কোন Society-র সভ্য পর্যন্ত হওয়া যায় না!

৪. *আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের চিন্তাধারা,* পৃ—৩১

৫. *আত্মচরিত,* পৃ—২৩৯



আচার্যদেব (1926)

ছাত্র নির্বাচন

ভারতে বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজা হাট খোলা। পঞ্চা-পাঁচীরাও ছুটছে এল. এ.-বি. এ. পাশ করার জন্য। খুবই আশ্চর্যের বিষয়, তারা পাশ হয়েও যাচ্ছে! আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী অর্জনের যে মানসিকতা বাঙালী অভিভাবক ও তাদের সন্তান-সন্ততিদের ছিল, তা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং খোদ পশ্চিমবঙ্গেই হাজার হাজার নথিভূক্ত বেকার। দেশের আর্থিক অপব্যবহার ও যুবশক্তি অপচয়ের বাস্তব দৃষ্টান্ত। এই নিদারুণ সমস্যা সমাধানের প্রতি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র অন্তত আশি-নব্বুই বছর আগে বাঙালীর তথা ভারতবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর কথায় কেউ কর্ণপাত করেনি,—সেদিনও নয়, আজকের দিনেও নয়। কারণ, বুদ্ধিজীবীরা বুদ্ধি খেয়ে ফেলেছেন, আর রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দগণ গদি দখলের জন্য চাকরীর টোপে প্রলুব্ধ করে বেকারদের হাতিয়ার করে ভোটে লড়ছেন। সুতরাং চলছে, চলবে।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজা সবার জন্য উন্মুক্ত রাখার পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁর মতে, যাদের যোগ্যতা আছে, অধিকার আছে, উচ্চতর শিক্ষা কেবল তাদের জন্যই উন্মুক্ত থাক ঃ মাত্র শতকরা দশ কি পনেরো জন উচ্চশিক্ষা লাভ করতে পারে। তাঁর সমকালে কলকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষার্থীদের একটি বাস্তব চিত্র তুলে ধরে ছাত্র নির্বাচন ও তার সুফল সম্বন্ধে বলেছেন,—"কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ২০/২৫ হাজার এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আরও

প্রায় দুই হাজার ছাত্র ডিগ্রী লাভের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। ইহাদের মধ্যে শতকরা মাত্র ২/৩ জন সরকারী চাকরি, এবং ডাক্তার, ওকালতি প্রভৃতি ব্যবসায়ে স্থান পাইতে পারেন, এই অপ্রিয় সত্য সকলেই ভুলিয়া যান। অবশিষ্ট শতকরা ৯৭ জনের কি হইবে? ... যদি এই বিপুল সংখ্যা হইতে বাছিয়া বাছিয়া তিন হাজার ছাত্রকে উচ্চ শিক্ষালাভার্থ প্রেরণ করা যায়, তবে অবসর গ্রহণ বা পদত্যাগ প্রভৃতির ফলে যে সমস্ত চাকরি খালি হয় তাহার জন্য যথেষ্ট লোক পাওয়া যাইবে, নানা বিদ্যায় গবেষণা করিবার জন্য ছাত্রের অভাব হইবে না এবং ভবিষ্যৎ শাসক, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, মুন্সেফ এবং উচ্চশ্রেণীর কেরানী পদের জন্যও লোক জুটিবে।"[১০]

বৃহৎ বঙ্গে আচার্যের সমকালে ছিল মাত্র দুটি বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন তখনো বর্তমান রূপ পায়নি। কিন্তু বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গেরই আরো ছ'টি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছে; আর টেকনিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ও হচ্ছে। হাজারে হাজারে ছাত্রছাত্রীরা ডিগ্রী লাভ করছে; অর্থ ও শক্তির অপব্যয় ও অপচয় হচ্ছে। সরকারী তহবিল থেকেও কোটি কোটি ব্যয় করে ভস্মে ঘি ঢালা হচ্ছে। বাংলার বার্ষিক শিক্ষাবিবরণী (1927-28) থেকে তথ্য পরিবেশন করে আচার্যদেব দেখিয়েছেন কি পরিমাণ অর্থ কেবল এই পাশ-লাভেচ্ছু ছাত্রদের জন্য ব্যয় হয়। যেমন, প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রত্যেক ছাত্রের জন্য ব্যয় হয় 755/- টাকা, তার মধ্যে সরকারী তহবিল থেকে আসে 301.5 টাকা; সংস্কৃত কলেজে 556.3 টাকা, সরকারী তহবিল থেকে আসে 509 টাকা; হুগলী কলেজে 515.5 টাকা, সরকারী তহবিল থেকে আসে 427.2 টাকা; ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজে 431.9 টাকা, সরকার থেকে ব্যয় 343.4 টাকা ইত্যাদি। বর্তমানে ছাত্রবেতন বৃদ্ধি করে সরকারী ব্যয় হ্রাস করার প্রচেষ্টা চলছে, কিন্তু তাতে মূল সমস্যা—হাজার হাজার ছাত্রের ডিগ্রীলাভের দুর্নিবার আকাঙ্খা অবদমিত হবে বলে মনে করার কারণ নেই।

শিক্ষার বাহন—মাধ্যম

শিক্ষার মাধ্যম নিয়ে বিশ্বে কোথাও কোন বিতর্ক-বিতন্ডা নেই। বিশ্বের সর্বত্র মাতৃভাষার মাধ্যমেই শিক্ষাদান করা হয়ে থাকে। বিদ্যা ও জ্ঞানকে স্বীকরণ করতে হলে তা মাতৃভাষাতেই সম্ভব—নান্যঃ পন্থা। কিন্তু আমাদের দেশে তা হয়নি। ব্রিটিশ সরকার তাদের স্বার্থে—কেরানী তৈরী করার জন্য ও শাসনকার্যের সুবিধার জন্য এদেশে শিক্ষাবিস্তার করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল, আর এদেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণী চাকরী লাভের স্বার্থে ইংরেজী শেখার প্রেরণা পেয়েছিল। তখন ওই 'পমকিন লাউকুমড়ো' শিখে চাকরী পাওয়া যেত, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে—1840 সাল পর্যন্ত। হিন্দু স্কুলের প্রতিষ্ঠাতাগণও ইংরেজী ভাষায় গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন; তারপর 1857 সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হলে একেবারে নীচের স্তর থেকে উঁচুস্তর পর্যন্ত ইংরেজীই শিক্ষার বাহন হয়ে উঠল। এই অবৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা ও ঔপনিবেশিকতাসুলভ দৃষ্টিভঙ্গীর

10. *তদেব, পৃ*—২০৩

বিরুদ্ধে কেউ কেউ সোচ্চার হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ও প্রফুল্লচন্দ্র ছিলেন অগ্রগণ্য। পরবর্তীকালে সত্যেন্দ্রনাথ বসু অবিরাম প্রচার ও প্রচেষ্টা করেছিলেন মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের জন্য। স্যার আশুতোষ মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের গুরুত্ব উপলব্ধি করতেন, এবং তাঁর প্রচেষ্টায় আংশিভাবে মাতৃভাষায় শিক্ষাদান কার্য শুরু হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাধা-বিধান পরিবর্তন করে এই কার্যটি কিরূপ কঠিন ছিল, সেই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ 'শিক্ষার বাহন'-এ (1322) লিখেছেন,—"দেশে বিদ্যাশিক্ষার যে বড়ো কারখানা আছে তার কলের চাকার অল্পমাত্র বদল করিতে গেলেই বিস্তত হাতুড়ি-পেটাপেটি করিতে হয়—সে খুব শক্ত হাতের কর্ম। আশু মুখুজ্যে মশায় ওরই মধ্যে এক-জায়গায় একটুখানি বাংলা হাতল জুড়িয়া দিয়াছেন।

"তিনি যেটুকু করিয়াছেন তার ভিতরকার কথা এই, বাঙালির ছেলে ইংরেজি বিদ্যায় যতই পাকা হোক বাংলা না শিখিলে তার পুরা শিক্ষা হইবে না। কিন্তু এ তো গেল যারা ইরেজি জানে তাদেরই বিদ্যাকে চৌকশ করিবার ব্যবস্থা। আর, যারা বাংলা জানে, যারা ইংরেজি জানে না, বাংলার বিশ্ববিদ্যালয় কি তাদের মুখে তাকাইবে না? এতবড়ো অস্বাভাবিক নির্মমতা ভারতবর্ষের বাইরে আর কোথাও আছে?"[11]

1926 সালে মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র দ্বিধাহীনকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন যেন, বর্তমান শিক্ষা প্রণালীতে বিদেশী ভাষা—ইংরেজীকে শিক্ষার বাহন করাই আমাদের অপরাধ, আমাদের গুরুতর ভ্রম। এর ফলে আমাদের বুদ্ধি ও প্রতিভা বিকাশের পথ রুদ্ধ হয়েছে। বিদেশী ভাষা শিক্ষায় তাঁর কোন বিরাগ ছিল না। তথাপি তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় ও দৃঢ় প্রত্যেয়ের সহিত বলেন,—"শিক্ষিত ব্যক্তিকে প্রথমতঃ সব বিষয়ের মোটামুটি জ্ঞান লাভ করিতে হইবে এবং মাতৃভাষার সাহায্যেই এই শিক্ষা যথাসম্ভব কম সময়ে উত্তমরূপে হইতে পারে। পাটীগণিত, ইতিহাস, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, তর্কশাস্ত্র এবং ভূগোল মাতৃভাষার সাহায্যেই সহজে শিক্ষা করা যাইতে পারে। উচ্চতর শিক্ষার ভিত্তিপ্রতিষ্ঠার ইহাই সর্বোৎকৃষ্ট উপায়।"[12] তিনি বলেন, এমন ব্যাপার কেউ কল্পনাও করতে পারে না যে, একজন ইংরেজ বালক প্রথমে পারসী, চীনা, জার্মান অথবা রুশীয় ভাষা শিখে তার মধ্য দিয়ে অন্যান্য বিষয় শিখছে। সুতরাং "মাতৃভাষাই সব সময়ে শিক্ষার বাহন হওয়া উচিত।" বাংলার দুটি বিভাগের তৎকালীন কমিশনার এফ. জে. মোনাহান কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিশনের নিকট যে অভিমত জ্ঞাপন করেন, প্রামাণিকতাস্বরূপ আচার্যদেব তা উদ্ধৃত করেন। মোনাহান বলেন,—"আমার মনে হয়, যে সব ইংরাজ স্কুল কলেজে ইংরাজী ভাষাকে শিক্ষার বাহন রাখিবার পক্ষপাতী তাঁহাদের মধ্যে অনেকে সাম্রাজ্যবাদের ভাবের দ্বারা প্রভাবান্বিত। ইংরাজী ভাষাকে সাম্রাজ্যের মধ্যে ঐক্যসূত্ররূপে তাঁহারা গণ্য করেন ;—এই ভাষাই ভারতের সর্বত্র সাধারণ ভাষা হইয়া উঠিবে, এমন স্বপ্নও তাঁহারা দেখেন।

11. *রবীন্দ্র রচনাবলী*, ত্রয়োদশ খন্ড, পৃ—৫৪৪

12. *আত্মচরিত*, পৃ—২৩০

"আমার মনে হয়, ভারতবর্ষের মত দেশে, যেখানে বহু বিচিত্র জাতি, ভাষা, সভ্যতা, আদর্শ, ধর্ম ও দর্শন শাস্ত্র বিদ্যমান, সেখানে বিদেশী ভাষার মধ্য দিয়া একই প্রণালীতে উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করা মহা ভ্রম।"[13]

বস্তুতপক্ষে, মাতৃভাষাকে অবহেলা ও উপেক্ষা বাঙালীই করেছে। মেকলে-র রিপোর্টে (1835) কিছু কিছু আপত্তিকর অংশ থাকলেও তাঁর এই দূরদৃষ্টি ছিল যে, ভারতবাসীরা পাশ্চাত্য শিক্ষা-লাভ করে এক সময় মাতৃভাষায় গ্রন্থাদি রচনা করে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচার ও প্রসার করবে। কিন্তু বাঙালী মেকলের "আমি এমন একজনও প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্ দেখি নাই যিনি অস্বীকার করিতে পারেন যে, কোন ভাল ইউরোপীয় লাইব্রেরির এক আলমারি বই, ভারত ও আরবের সমস্ত দেশীয় সাহিত্যের সমতুল" এই বক্তব্যের নিন্দাই করেছে, তাঁর "পাশ্চাত্য জ্ঞান স্বদেশী ভাষার সাহায্যে প্রচার করিতে সক্ষম হইবে" গ্রহণ করেনি। এই প্রসঙ্গে বাঙালীর স্বাভাব, প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য কথাকোবিদ রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজস্ব অনুভব অনুপম ভাষায় ব্যক্ত করেছেন : "বাংলাদেশে শুভবুদ্ধির ক্ষেত্রে আজকাল হঠাৎ সকল দিক হইতেই একটা অদ্ভুত মহামারীর হাওয়া বহিয়াছে। ভূতের পা পিছন দিকে, বাংলাদেশে সামাজিক সকল চেষ্টারই পা পিছনে ফিরিয়াছে। আমরা ঠিক করিয়াছি সংসারে চলিবার পথে আমরা পিছন মুখে চলিব, কেবল রাষ্ট্রীয় সাধনার আকাশে উড়িবার পথে আমরা সামনের দিকে উড়িব, আমাদের পা যেদিকে আমাদের ডানা ঠিক তার উল্টো দিকে গজাইবে।"[14] বাঙালী আজও ভূতের ঠাং নিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে পিছনের দিকে হেঁটে চলেছে : ব্যাঙের ছাতার মত ইংরেজী মাধ্যম ইস্কুল গড়ে উঠছে, বাঙালী শিশু অ আ ক খ শেখার পরিবর্তে A B C D শিখতে শুরু করছে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নিম্নশ্রেণী থেকেই ইংরেজী শেখার আয়োজন করছে। আর স্নাতকোত্তর স্তরে এখনো অনেক বিষয় ইংরেজী মাধ্যমেই পড়ানো হচ্ছে। রাজনীতির ঢক্কানিনাদে চাষী-মজুররাও প্রাথমিকস্তরে ইংরেজী শিক্ষার ধুয়ো তুলছে! কী বিষম ভ্রম!

Report of the Matriculation Regulation Committee, June, 1932 প্রকাশিত হলে দেখা যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রবেশিকা পরীক্ষায় ইংরেজী ছাড়া আর সব বিষয় মাতৃভাষায় পড়ানোর প্রস্তাব করেছে। স্যার আশুতোষের প্রচেষ্টা ও এই কমিটির প্রস্তাবে মাতৃভাষার স্বীকৃতি মিললেও ইংরেজীর গুরুত্ব কিছুমাত্র কমেনি। আচার্যদেব এই রিপোর্টের সমালোচনা করে বলেন, "... আমি দেখিয়া হতাশ হইলাম যে, নূতন নিয়মাবলীতে, একদিক হইতে যে সুবিধা দেওয়া হইয়াছে, অন্যদিক হইতে তাহা কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে। দুরূহ বিদেশী ভাষা আয়ত্ত করিবার কঠোর পরিশ্রম ছেলেদের মস্তিষ্ক এখনও ভারাক্রান্ত করিতে থাকিবে। বস্তুতঃ ইংরাজীকে এত বেশী প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে যে তাহার জন্য তিনটি প্রশ্নপত্র নির্দিষ্ট হইয়াছে। অথচ ইতিহাস ও ভূগোলের ন্যায় প্রয়োজনীয় বিষয়ের জন্য মাত্র একটি করিয়া প্রশ্নপত্র থাকিবে। গণিতের

13. *তদেব*, পৃ—২২৯
14. *রবীন্দ্র রচনাবলী*, ত্রয়োদশ খণ্ড, পৃ—৫৪০

জন্য একটি ও মাতৃভাষার জন্য দুইটি করিয়া প্রশ্নপত্র থাকিবে। সুতরাং ইংরাজীর জন্য যেরূপ মনোযোগ দেওয়া হইবে, তাহার মাত্র ষষ্ঠ অংশ ইতিহাস বা ভূগোলের জন্য দেওয়া হইবে এবং অন্য সমস্ত বিষয়ের ক্ষতি করিয়া ইংরাজীর জন্যই ছেলেদের অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে হইবে।"[15]

সেই যুগের প্রেক্ষিতে ইংরেজীর বিলুপ্তি ঘটিয়ে মাতৃভাষায় শিক্ষাদান অসম্ভব ও অবাস্তব বিবেচনা করে আচার্যদেব ইংরেজীকে দ্বিতীয় ভাষার পর্যায়ে রাখার প্রস্তাব করেন। তত্রাপি দ্বিভাষা শিক্ষায় তাঁর সম্মতি ছিল না। ওয়েস্ট-এর *Bilingualism* গ্রন্থে আলোচিত একটি ভাষা ও দুটি ভাষা শিক্ষার সহিত সহমত পোষণ করে তিনি এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, যাদের বিদেশী ভাষার মধ্য দিয়ে শিক্ষালাভ করতে হয় তারা ভাষা আয়ত্ত করতে গিয়ে বিদ্যা ও জ্ঞান-লাভে দরিদ্র হয়।

বিদেশী ভাষা শিক্ষা

আচার্যদেবের মতে, বিদেশী ভাষা—জার্মান, ফরাসী ইত্যাদি শেখার প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই আছে, কিন্তু তা সবার জন্য নয়। যাঁরা পাণ্ডিত্য অর্জন করতে চান, তাঁদের এ-সব ভাষা শেখার দরকার। আর সাধারণ ছাত্ররা মাতৃভাষার মাধ্যমেই বিদ্যা ও জ্ঞান অর্জন করবে। প্রাথমিক স্তরে কোন প্রকারেই বিদেশী ভাষা শেখার প্রয়োজন নেই। কারণ, তা করলে শিক্ষার্থীর মাতৃভাষা শিক্ষা ব্যাহত হবে। তা ছাড়া বিদেশী ভাষা শিক্ষার যোগ্যতা ও ক্ষমতা সব শিক্ষার্থীর নেই, এবং বারো-চোদ্দ বছরের আগে বোঝা যায় না কোন শিক্ষার্থীর এরূপ যোগ্যতা আছে।

নিরক্ষরতা দূরীকরণে আচার্যদেব

নিরক্ষরতা দেশের অভিশাপ। 1931 সালের আদমসুমারীতে দেখা যায় ভারতে সাক্ষরতার হার ছিল 9.50% ; পুরুষদের সাক্ষরতার হার 15.59% ও নারীদের 2.93%। এই 90.50% নিরক্ষর মানুষ নিয়ে কোন দেশ উন্নতির পথে একটি ধাপও অগ্রসর হতে পারে না। এই পাহাড়-প্রমাণ সমস্যাটিও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের নজর এগিয়ে যায়নি। এই সমস্যার সমাধানকল্পে তাঁর প্রস্তাব ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের যারা বি. এ. পড়ে, আবার বি. এ. পড়ার পর যারা অন্য বিষয় পড়ে তাদের বছরে দীর্ঘ ছুটির অভাব নেই। কিন্তু এই দীর্ঘ ছুটি তারা কাটায় তাস, পাশা, দাবা, পরনিন্দা করে, আর দিনের বেলায় ভাতঘুম দিয়ে। এভাবে তারা বহু মূল্যবান সময় নষ্ট করে। অথচ কত কাজ করবার আছে, "কত নিরক্ষরতা, কত অস্বাস্থ্য, কত অজ্ঞতা, উন্নতিশীল জাতিসমূহের কত পশ্চাতে কোন্ অন্ধকারে অবস্থান" আমাদের দেশের। কিন্তু 'শিক্ষিত সম্প্রদায় এই হতভাগ্য জাতির সেবায় পরাঙ্মুখ।"

1991 সালে ভারতে সাক্ষরতার হার 52.11% ; পুরুষদের সাক্ষরতা 63.86% ও নারীদের 39.42%। পশ্চিমবঙ্গে সাক্ষরতার হার ছিল 57.70%। অতঃপর সারা দেশের

15 *আত্মচরিত,* পৃ—২২৪, পাদটীকা—১৫

সাক্ষরতা অভিযান শুরু হলো, এবং আশ্চর্যভাবে আচার্যদেবের পরিকল্পিত পন্থা অবলম্বন করে। শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীরা একত্রে 'আমরা করব জয়' এই গান গেয়ে নিরক্ষরতা দূরীকরণে অগ্রসর হলেন। বিভিন্ন জেলা সাক্ষর বলে ঘোষিত হলো। কিন্তু দুঃখের ও পরিতাপের বিষয়, কাজের কাজ কিছু হলো না : ঢোক গিলে গিলে কেউ কেউ পড়তে পারল, নাম সই করতে পারল, 'বিবাহ'-কে 'বিবহ' করে লিখতে পারল বটে, কিন্তু বোঝার ক্ষমতা তাদের কিছুমাত্র হলো না। তারপর অভিযান গেল থেমে, সবাই সব ভুলে যেই তিমিরে সেই তিমিরেই থেকে গেল। আচার্যদেবের নিরক্ষরতা দূরীকরণে অবিরাম প্রক্রিয়াটি আর কেউ উপলব্ধি করল না। 1991 সালে ত্রিপুরার সাক্ষরতার হার 60.4%, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সারা দেশের পঞ্চদশ স্থানে। এই হচ্ছে একদা *What Bengal thinks to-day India thinks to-morrow!*

আচার্যদেবের সাবধান বাণী, উপদেশ ও বাস্তব পরামর্শ ও কার্যক্রমে এখনো কেউ কর্ণপাত করেনি। লাখে লাখে হাজারে হাজরে ছাত্র-ছাত্রীরা নির্বিচারে এল. এ., বি. এ. এম. বি. বি. এস. ও বি. ই হবার জন্যে ভীড় করছে, বিশ্ববিদ্যালয়রূপ ফ্যাক্টরী পণ্য উৎপাদন করছে, শিক্ষকগণ নোট দিয়ে বৈতরণী পার করছেন, শিক্ষকের ছেলে শিক্ষক, ডাক্তারের ছেলে ডাক্তার, উকিলের ছেলে উকিল, ভকিলের ছেলে ভকিল, কেরানীর ছেলে কেরানী ইত্যাদি হওয়ার দিকে ঝুঁকছে। কিঞ্চিৎমাত্র ব্যতিক্রম হচ্ছে না 'বাপ কা বেটা' হতে পারার জন্য। সুতরাং এদেশে দেকার্ত বা নিউটনের আবির্ভাব সুদূরপরাহত।

দ্বাদশ অধ্যায়

সাহিত্যপ্রীতি : সেক্সপীয়ার চর্চা

বাল্যকালেই সেক্সপীয়ারের সহিত প্রফুল্লচন্দ্রের পরিচয়। পিতার গ্রন্থগারে বই নাড়াচাড়া করতে গিয়ে তিনি টড কর্তৃক সম্পাদিত জনসনের ডিক্সনারীর দুই কোয়ার্টো-সংস্করণের নানা উদ্ধৃতাংশ মুখস্থ করতে থাকেন। ওই উদ্ধৃতাংশে রচনাকারীদের নাম সংক্ষিপ্তাকারে লেখা থাকত। যেমন,—"Shak", 'Beau. and Fl'. সংক্ষিপ্তাকারে এইসব নাম উদ্ধার করতে না পারলেও তিনি মুখস্থ করতেন : *Ingnorance is the curse of God, knowledge the wing wherewith we fly to heaven—Shak.* বলা বাহুল্য, Shak, Beau. and Fl. যথাক্রমে সেক্সপীয়ার (Shakespeare), বোমোণ্ট (Beaumont) ও ফ্লেচার (Fletcher)। সেক্সপীয়ার প্রফুল্লচন্দ্রের মন কেড়ে নিল, বিশেষত তাঁর বিয়োগান্ত (Tragedy) নাটকগুলি। স্কুল-জীবনে সেক্সপীয়ার পাঠ সম্বন্ধে প্রফুল্লচন্দ্র বলেছেন,— "সেক্সপীয়ারের জুলিয়াস সীজার, মার্চেন্ট অব ভিনিস এবং হ্যামলেটের কতগুলি নির্বাচিত অংশ (যথা—Soliloquy) আমার সম্মুখে নূতন জগতের দ্বার খুলিয়া দিল এবং পরবর্তী জীবনে মহাকবির বহিগুলি যতদূর পারি পড়িব, ইহাই আমার অন্যতম আকাঙ্ক্ষা হইল।"[1] 'আত্মচরিত'-এ অন্ততপক্ষে ষোলো বার সেক্সপীয়ারের উল্লেখ ও আলোচনা করেছেন প্রফুল্লচন্দ্র। কেবল সেক্সপীয়ার নয়, ইংরেজী কাব্য ও সাহিত্যে তাঁর অনুরাগের অবধি ছিল না। তা ছাড়া বহুবিধ বিষয়ে—সমাজ, অর্থনীতি, ইতিহাস, জীবনী ইত্যাদিতে তাঁর পাঠের পরিধির কথা ভাবলে বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়। বিদ্যা ও জ্ঞানের প্রতি তড়িৎ-চুম্বকের ন্যায় আকর্ষণ থাকার জন্য প্রফুল্লচন্দ্র পাঠ্যপুস্তকের সঙ্কীর্ণ গন্ডীতে আবদ্ধ না থাকায় স্কুল ও কলেজের পরীক্ষায় কখনো উচ্চস্থান লাভ করতে পারেননি,— সাধারণ ছাত্ররূপেই গণ্য হয়েছেন। এতে শাপে বর হয়েছে, প্রফুল্লচন্দ্রের উজ্জ্বল সহপাঠীরা ও আরো 'উজ্জ্বলতর' হয়ে হারিয়ে গেছে, কিন্তু প্রফুল্লচন্দ্র 'আচার্য' হয়েছেন।

নিয়ম-শৃঙ্খলায় প্রফুল্লচন্দ্র ছিলেন অনমনীয়। সকাল সাড়ে পাঁচটায় ঘন্টাখানেক ধরে গভীর পড়াশোনায় মগ্ন থাকতেন ; সাধারণত সেক্সপীয়ার চর্চা করতেন। এই সময় তাঁকে বিরক্ত করার কারুর উপায় ছিল না, এমন কি 'বাবাতো-মামাতো' ভাইয়েদেরও নয়। কি পড়তেন তিনি? সেক্সপীয়ারের মূল রচনাগুলি—কাব্য, সনেট ও নাটকগুলি, আর তাঁকে কেন্দ্র করে যে-সব বিশাল গ্রন্থরাজি তার সেরা সেরা লেখাগুলি। বস্তুতপক্ষে, সেক্সপীয়ারকে নিয়ে লেখার অন্ত নেই ; সেক্সপীয়ার চর্চা বিশাল আকার ধারণ করেছে। বার্মিংহাম Shakespear Memorial Library-তেই 1930 সালে 21,000 ও ব্রিটিশ

1. *আত্মচরিত*, পৃ—২৮

মিউজিয়ামের গ্রন্থতালিকায় 3,680 গ্রন্থ দেখা যায়। তা ছাড়া বোডলিয়ান লাইব্রেরী, ইংলন্ডের সম্ভ্রান্ত পরিবার, আমেরিকায় কোটিপতিদের সংগ্রহ আছে, আর জার্মান, ফ্রান্স, ডেনমার্ক, হল্যান্ড, পোলান্ড, সুইডেন ইত্যাদি দেশে কতই না গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এক একবার মনে হয় সেক্সপীয়ার-অ্যানাটমির পরিসমাপ্তি ঘটল, তাঁর সম্বন্ধে যা বলার সবই শেষ হয়েছে, নতুন-কিছু বলার নেই, কিন্তু "The great master of human passions will always present us with new problems for solution which will ever remain open and the final word on the poet will still remain unsaid."[2] এই অমর মহাকবি চিররহস্যে আবৃত : তাঁর জীবন-কাহিনী, কাব্য, সনেট, নাটক, মানসিকতা সবই নানা হেঁয়ালী ও প্রহেলিকায় আচ্ছন্ন। 'শেষ নাহি যে শেষ কথাটি কে বলবে'! তবু বলার শেষ নেই, যুগ যুগ ধরে সেই প্রচেষ্টাই চলে আসছে, এখনো চলছে। আচার্যদেব তাঁর কাজের গুরুত্ব, জটিলতা ও কাঠিন্য সম্বন্ধে সম্যক অবহিত ছিলেন। সেক্সপীয়ারের জীবিতকাল থেকে যে-সব টীকাকার, ভাষ্যকার ও সমালোচক অসামান্য আলোচনা করে গেছেন, তার সবের সঙ্গেই প্রফুল্লচন্দ্রের পরিচয় ছিল : অ্যাসকুইথ (Asquith), মুনরো (Munroe), ডাউডেন (Dowden), হ্যালিওয়েল-ফিলিপস (Halliwell-Phillips), বোয়াস (Boas), লী (Lee), স্টীভেনস (Steevens) প্রমুখের লেখার সহিত তাঁর যেমন পরিচিতি ছিল, তেমনি ছিল ইসরায়েল (Israel), রলে (Releigh), গ্রেগ (Greg), কুইলার-কাউচ (Quiller-Couch), চেম্বার্স (Chembers), পোলার্ড (Pollard), আলেকজাণ্ডার (Alexander), জে. ডি. উইলসন (J. D. Wilson), জে. এম. রবার্টসন (J. M. Robertson), থর্নডাইক (Thorndrike), ব্র্যাডলে (A. C. Bradley) প্রমুখের লেখার সহিত। এইসব বিশ্বখ্যাত মনস্বী সমালোচকদের প্রেক্ষিতে তাঁর কাজ সম্পর্কে সবিনয়ে আচার্যদেব বলেছেন,—"At the outset the present writer might be held presumtuous in descending into such an arena and trying to cross swords with so many masters of acknowledged merit and may be placed in the category of those who rush in where angles fear to tread, but his task is, indeed, less prentious and an humble one."[3] সেক্সপীয়ার বিশেষজ্ঞদের মধ্যে কত বিরোধোক্তি, কত আনুমানিক সংশোধন, কত ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী! এ-সবের ফলে "The hapless reader thus finds himself completely lost in the labyrinthine maze of literature."।

কোন প্রতিভার আবির্ভাব আকস্মিক নয়। তার পশ্চাতে থাকে অনুকূল সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা ও পরিস্থিতি। সেক্সপীয়ারের ন্যায় বিস্ময়কর আলোক- সামান্য প্রতিভার আবির্ভাবের পিছনেও ছিল তেমনি অনুকূল পরিস্থিতি। অষ্টম হেনরী, ষষ্ঠ এডওয়ার্ড, রানী মেরী ও রানী এলিজাবেথের শাসনকালে বিদ্বান-পৃষ্ঠপোষকতা যেমন ছিল, তেমনি তাঁরাও ছিলেন জ্ঞানী। রানী মেরী ক্যাথলিক ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস পেলেও প্রোটেসট্যান্টদের মুক্ত চিন্তা জনমনে অধিকতর ক্রিয়াশীল হতে থাকল ;

2. *The Calcutta Review, (= CR)*, Nov. 1939, p.131.
3. *Ibid*, p. 132

বদ্ধ-সংস্কার ও কুসংস্কারের তমিশ্রা বিদূরিত হতে থাকল; নানা উপভাষা বর্তমান থাকলেও মধ্যদেশের ভাষাই গৃহীত হতে থাকল। এলিজাবেথের দূরদৃষ্টিসুলভ নীতির ফলে স্পেনের পরাক্রান্ত রাজা ফিলিপের আরমাডা আক্রমণ বিধ্বস্ত হওয়ায় ইংল্যান্ড পূর্ণোদ্যমে জাগরিত হলো। কিন্তু এলিজাবেথীয় যুগে এই পরিবর্তনের সময় নানা সমস্যার উদ্ভব হলো। লর্ডদের হাত থেকে ভূমি চলে গেল বণিক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হাতে। অধিক মুনাফা অর্জনের জন্য তারা চষদ ভূমিকে গোচারণ ভূমিতে পরিণত করল; কৃষককুল হলো ভূমিহীন ও বেকার। নেদারল্যান্ডে যে বহুসংখ্যক ইংরেজ ভলেন্টিয়ার হিসাবে ধর্মীয় বিবাদে অংশগ্রহণ করেছিল, তারা দেশে প্রত্যাবর্তন করায় বেকার সমস্যা আরো তীব্র আকার ধারণ করল। সেই ষোড়শ শতাব্দীর তিন-চতুর্থাংশে রাষ্ট্র ভূমিহীন কৃষক ও ভলেন্টিয়ারদের রুজিরোজকারের পথ দেখাতে ব্যর্থ হলো। ফলে, এই বেকাররা চুরি ও রাহাজানির পথ অবলম্বন করল। সেই সঙ্গে গায়ক, হাতুড়ে চিকিৎসক ও অভিনেতারা 'ভ্যাগাবন্ড' শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত হলো। পিউরিটান আন্দোলন মধ্যবিত্ত শ্রেণী কর্তৃক সমর্থিত হয়ে রঙ্গমঞ্চের বিরুদ্ধে তীব্র প্রচার চালাতে লাগল। টমাস হোয়াইট (Thomas White) 1577 সালে মন্তব্য করলেন : "The cause of plagues is sinne, ... the cause of sinne are players."

সেক্সপীয়ার প্রহেলিকা

আশৈশব সেক্সপীয়ার অনুরাগী প্রফুল্লচন্দ্র আটটি শিরোনামে প্রহেলিকগুলি আলোচনা করেছেন, এবং অসংখ্য উদ্ধৃতির সাহায্যে সে-সবের প্রামাণিকতা প্রতিষ্ঠা



সেক্সপীয়ার পাঠরত

করার প্রয়াস পেয়েছেন। প্রহেলিকা বা হেঁয়ালীগুলি হলো (i) **নাট্যকার ও অভিনেতাদের প্রতি বিদ্বেষ ও ঘৃণা প্রদর্শন**, (ii) **গ্রন্থকারত্বহীনতা**, (iii) **সমকালীন সেক্সপীয়ার মূল্যায়ন**, (iv) **মারমেড ট্যাভার্নে সেক্সপীয়ার**, (v) **সেক্সপীয়ারের নৈর্ব্যক্তিকতা**, (vi) **সেক্সপীয়ারের শিক্ষা**, (vii) **সেক্সপীয়ার কর্তৃক সমকালীন ব্যক্তি ও ঘটনার উল্লেখ** ও (viii) **অন্য নাট্যকারদের নাটকের সংস্কারক : ষষ্ঠ হেনরী ত্রয়ী ও অ্যানড্রোনিকাস**। তাঁর অসমাপ্ত প্রবন্ধ 'The Shakespearean Puzzle—Endevours after its solution'-এ অষ্ট-প্রহেলিকা পাই। খুব সম্ভব, প্রবন্ধটি সমাপ্ত হলে আমরা আরো প্রহেলিকা পেতাম। সে যাই হোক, তাঁর অষ্টাঙ্গিক মার্গেই পদচারণা করা যাক।

নাট্যকার-অভিনেতাদের প্রতি বিদ্বেষ ও ঘৃণা

এলিজাবেথের শাসনকালে ইংরেজী সাহিত্যের কুঁড়ি থেকে ফোটার যুগ। ওই সময় অভিনেতা ও নাটক লেখকের অবস্থা ছিল খুবই দুর্দশাগ্রস্থ। সাধারণ লোকেরা নাটকে আগ্রহী ছিল বটে, কিন্তু সম্ভ্রান্ত ও উঁচু তলার মানুষরা নাট্যকার ও অভিনয় সম্বন্ধে অতি হীন ধারণা পোষণ করত। লিলি (Lyly), স্পেনসার (Spencer), ডেকার (Dekker), প্রমুখের বিলাপের মধ্যেই তার প্রমাণিকতা প্রতিষ্ঠিত হয়। 'ফেয়ারি কুইন'-এর (*Fairie Queene*) স্রষ্টা স্পেনসারের দারিদ্র্যের কবল পড়ে মৃত্যু হয়। জন উইভার (John Weever) তাঁর একটি 'এপিগ্যাম'-এ লিখেছেন :

Spencer is ruined, of our latest time
The fairest ruin, Faeries foulest want.

ফ্লেচার (Phineas Fletcher) বলেন, "Poorly, poor man he lived ; poorly poor man, he died."

নাট্যকারদের তুলনায় অবশ্য কবিদের সামাজিক অবস্থা শোচনীয় ছিলনা ; তারা অভিজাত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে এক-টেবিলে বসতে পারত, কিন্তু নাট্যকারদের এই অবস্থা ছিল না। সেক্সপীয়ার তাঁর 'দি টেমিং অফ দি শ্রু' (*The Taming of the Shrew*) নাটকে এক প্রভু কর্তৃক ভৃত্যকে নির্দেশ দিচ্ছেন :

Go, sirrah, take them to the buttery,
And give them friendly welcome, everyone.

এলিজাবেথীয় যুগে নাট্যকাররা 'বোহেমিয়ান' জীবনধারণ করলেও তাদের আর্থিক দুরবস্থা সত্যই ছিল শোচনীয়। চেষ্টা সত্ত্বেও ডেকার, ন্যাস, পীল ও গ্রীন "could keep the wolf from the door and both Dekker and Nashe were gaoled for debts and the former spent seven long years in prison."[4]

ফিলিপ হান্সলো (Phillip Hanslow) ছিলেন **কুসীদজীবী, উত্তমর্ণ ও ভল্লুক বাগানের মালিক ; একটি শব্দও বিশুদ্ধভাবে উচ্চারণ করার ক্ষমতা না থাকলেও তিনি থিয়েটার স্থাপন করে বেতনভুক ক্ষুধার্ত লেখকের দলকে নিযুক্ত করলেন। এই দলে বিখ্যাত বেন**

4. *CR*, December, 1939, p. 251

জনসন (Ben Jonson) পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁর ডায়েরী থেকে ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে নাট্যকারদের দুঃখ-দুর্দশার চিত্রটি সহজেই ধরা পড়ে। বহু নাট্যকার— চেটল (Chettle), ডেকার, ড্রেটন (Drayton), চ্যাপম্যান (Chapman), জনসন, হেউড (Haywood), উইলসন (Wilson), মিডলটন (Middleton), ওয়েবস্টার (Webster) প্রমুখ ছিলেন হ্যান্সলোর দানগ্রহীতা। সেই যুগের ইংরেজী ভাষা ও চুক্তির (contract) নমুনাটি আকার্ষণীয় বলে উদ্ধৃত হলো :

"Mr. That this 25 of march, 1598 Thomas haywood came and hiered himsealfe with me as a convenante searvante for ij yeares by the recevenge of ij single pence according to the statue of Winchester & to begine at the daye or bone written and not to play any wher publicke a bowt london not whille these ij years be expired but in my howse yf he do then he doth forfett unto me by the Recevinge of thes ij fortie powndes."[5]

নাট্যকারদের চেয়েও আরো শোচনীয় অবস্থায় ছিল অভিনেতাগণ। তারা 'base-rascals, vagabond objects and porterly hirelings' বলে অভিহিত হতো। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার ও কবিও তাঁর আপেক্ষ ও বিলাপ গোপন করে রাখতে পারেনি বিষাদময় জীবনের জন্য :

When a disgrace with forune and men's eyes,
I all alone beweep my outcast state
And troubles deaf heaven with my bootless cries,
And look upon myself and curse my fate

সময় গড়িয়ে চলল। ধীরে ধীরে নাট্যাভিনয় দেখতে অভিজাত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ আকৃষ্ট হলেন ;রাজানুকুল্য নাট্যাভিনয়কে জনপ্রিয় করে তুলল। সেক্সপীয়ারের থিয়েটার জীবন শুরু 1590-91 সালে। তাঁর পূর্বসূরী কীড (Kyd), মার্লো (Marlowe), ন্যাস, পীল, গ্রীন প্রমুখের নাটককে সাহিত্যপদবাচক হিসাবে পরিগণিত করতে সমর্থ হলেও তখনো নাটক সর্বজনীন স্বীকৃতি লাভ করেনি। সাধারণভাবে নাটক ও নাট্যকারগণ অবহেলিত, উপেক্ষিত ও অসম্মানিত হওয়ার ফলে বহু নাটকের রচয়িতা ও নাট্যকারদের জীবন সম্বন্ধে সঠিক তথ্য বিস্মৃতির অতল গহ্বরে নিহিত হয়েছে। সে-যুগে যে-সব নাট্যকার কোন স্ক্যান্ডালের সহিত জড়িত হয়ে পড়তেন বা কোন বিশিষ্ট রাষ্ট্রনেতাকে চিঠিপত্র লিখতেন, তাঁদের সম্বন্ধেই কিছু প্রামাণিক তথ্য সংরক্ষিত হয়েছে।

প্রকৃত লেখক কে?

থিয়েটার-ম্যানেজারদের আহ্বানেই নাট্যকারগণ লিখতেন, আর নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে 'কপিরাইট' ত্যাগ করতেন। নাট্যকারদের নাটকাভিনয়ে কোন আগ্রহ

5. *Ibid*, p. 252

থাকত না, এবং প্রকাশনার সঙ্গেও তাঁদের কোন সম্পর্ক থাকত না। থিয়েটার-ম্যানেজারদের নাটকের প্রকাশনায় সাধারণত কোন সম্মতি থাকত না। কারণ, তাতে দর্শকের অভিনয় দেখার আকর্ষণ ও আগ্রহ হ্রাস পাবার সম্ভাবনা থাকত।

Domestic tragedy-গুলি তো অজ্ঞাতনামা হয়েই প্রকাশিত হতো। তৃতীয় এডওয়ার্ড (Edward III) প্রথমে অজ্ঞতনামে প্রকাশিত হয়। তারপর·এই নাটকের সঙ্গে সেক্সপীয়ারের নাম যুক্ত হয় এই কারণে যে, এই 'masterpiece' অন্য কেউ রচনা করতে পারে না। এমন কি এক সময় *Mucedorous, Fair Em* ও *Merry Devil of Edmonton* এই তিনটি নাটককে সেক্সপীয়ার নামাঙ্কিত করা হয়, যেহেতু ওইগুলি রাজা দ্বিতীয় চার্লস তাঁর লাইব্রেরীতে 'Shakespeare Volume I'-এর সঙ্গে একত্রে বেঁধে রাখতেন। *The Taming of the Shrew-* কেও একসময় কীড, মার্লো, গ্রীন বা পীলের লেখা বলে মনে করা হতো। সেক্সপীয়ারের সাতটি নাটক অনামাঙ্কিত হয়ে প্রকাশিত হয় : *Titus Andronicus, Richard II & III, Romeo and Juliet, Henry IV, V* । এইসব নাটকগুলি ছিল খুবই জনপ্রিয়, এবং তাদের বহু সংস্করণ অল্পকালের মধ্যেই প্রকাশিত হয়। সেক্সপীয়ার নামাঙ্কিত হয়েও অন্যের নাটক প্রকাশিত হতে দেখা যায়। এই সম্পর্কে আচার্যদেব লিখেছেন,—"It is a puzzle proper to account for this because there were a large number of plays which were claimed to be of Shakespeare pratically on no ground except their popularity and vague initials, eg., W. S., W. Sh., and so on."[6]

আচার্যদেব কালানুক্রমে সেক্সপীয়ারের নাটকগুলি গ্রহণ করে গ্রন্থকারত্বের আলোচনা করেছেন। বহু নাটক অজ্ঞাতনামে প্রকাশিত হয়, এবং সেক্সপীয়ারের নাটকও তার ব্যতিক্রম ছিল না। কখনো কখনো অন্যজনের নাটক অপরজনের নামেও প্রকাশিত হতে দেখা যায়। কেন এরকম হতো? প্রফুল্লচন্দ্র এ-বিষয়ে তাঁর স্বাধীন অভিমত প্রকাশ করতে কুণ্ঠিত হননি। সেক্সপীয়ারের নাট্যপ্রকাশনায় উদানীতা সম্বন্ধে তাঁর অভিমত : "From the beginning of his career Shakespeare, as we can gather to-day, was more anxious for money than for fame. He was quite glad to see that the Globe Theatre attracted a large audience during the performances of his plays. It did not matter much whether this or that one of his dramas was genuinely or fraudulently published by piratical publishers, only if the box-office return of the Globe Theatre were not affected."[7] বস্তুতপক্ষে, তখন "nobody was particular about the authorship—either the poet himself or the readers at large. Shakespeare was no exception to this rule, and up to the year 1598 all plays were anonymous."[8]

6. *CR*, Jan, 1940, p. 10
7. *Ibid*, p.12
8. *Ibid*, p. 13

সমকালীন সেক্সপীয়ার মূল্যায়ন

নাট্যকার ও কবি হিসাবে আলোকসামান্য প্রতিভার অধিকারী সেক্সপীয়ার। কিন্তু এই অঘটন পটিয়সী প্রতিভার স্বীকৃতি ও প্রশংসা তাঁর জীবিতকালে কি সম্ভবপর হয়েছিল? সেক্সপীয়ার চর্চায় এই প্রহেলিকা এখনো বর্তমান। এই প্রশ্নে গবেষক ও বিদ্বানগণ দুটি শিবিরে বিভক্ত হয়ে কেউ সেক্সপীয়ারের স্বীকৃতি ও প্রশংসার পক্ষে, আবার কেউ ঠিক তার বিপরীত অভিমত পোষণ করেছেন। প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর প্রবন্ধে (*CR*, Feb., 1940, pp. 103-112) উভয় অভিমত নানা উদ্ধৃতি-সহযোগে আলোচনা করেছেন, এবং তাঁর নিজস্ব মন্তব্যও প্রকাশ করেছেন। প্রবন্ধের প্রারম্ভে তিনি নিকল স্মীথ (Nichol Smith) ও সিডনি লী-এর (Sydney Lee) মন্তব্য উদ্ধৃত করে সেক্সপীয়ারের জীবিতকালে শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের স্বীকৃতির উল্লেখ করেছেন। তারপর মুনরো (Munroe) ওয়াল্টার রলে (Walter Raleigh), বিশেষভাবে গ্রীন (Green) ও তাঁর বন্ধুদের লেখা থেকে সেক্সপীয়ারের জীবিতকালীন অস্বীকৃতি ও বিরূপ সমালোচনার উল্লেখ করেছেন। আমরা এখানে মুনরো-র অভিমত উদ্ধৃত করছি আগ্রহী পাঠকদের স্বার্থে : "... The death Shakespeare, ... made no immediate difference to the poet's position in literature. When the "myriad-minded" Shakespeare, that sweet swan of Avon, died, no contemporary poet assailed the dull cold ear of death with metrical lamentations, and not then did Shakespeare's posthumous greatness begin."[9]

সেক্সপীয়ারের কাব্য-কবিতা-নাটকচর্চার জীবন মোটামুটি কুড়ি বছরের। এই সময়ে বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত মানুষের সহিত তাঁর পরিচয় যেমন গড়ে ওঠে, তেমনি তাঁর যশ, খ্যাতি ও সৌভাগ্যের জন্য ঈর্ষাপরায়ণ প্রতিদ্বন্দ্বীরও অভাব হয়নি। সেক্সপীয়ার জীবন শুরু করেছিলেন অভিনেতা হিসাবে, তারপর নাটক লিখতে থাকেন। তাঁর নাটক জনপ্রিয়তা অর্জন করতে থাকায় তৎকালে কোন কোন লেখকের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হতে থাকল। অতএব গ্রীন প্রমুখ বিষোদ্গার করতে থাকলেন সেক্সপীয়ারের বিরুদ্ধে, কিন্তু নামোল্লেখ না করে। যেমন,—: "Yes trust them not : for there is an vpstart Crow, beautified with our feathers, that with his Tygers hart wrapt in a Players hyde, supposes he is as well able to bombast out a blanke verse as the best of you : and beeing an absolute Iohannes factotum is in his owne conceit the onely Shake-Scene in a country."

মহাকবির জীবিতকালে বিরোধী গোষ্ঠী থাকলেও তাঁর স্বীকৃতি ও প্রশংসা দুর্লভ নয়। ফ্রান্সিস মিরস (F. Meres, 1565-1647), জন উইভার (John Weever), গ্যাব্রিয়েল হার্ভে (Gabriel Harvey), বিখ্যাত বেন জনসনের শিক্ষক উইলিয়াম ক্যামডেন (William Camden) প্রমুখ সেক্সপীয়ারের উল্লেখ করেছেন ; কেউ কেউ প্রশংসা করেছেন, আবার কেউ কেউ অপ্রধান কবি হিসাবে উল্লেখ করেছেন।

9. *CR*, Feb., 1940, p. 104

ফ্রান্সিস মিরস স্কুল শিক্ষক ছিলেন বলে তাঁর সেক্সপীয়ার মূল্যায়ন সমকালে মূল্যবান বলে গৃহীত হয়নি। কিন্তু আগ্রহী সাহিত্যরসপিপাসু পাঠকদের জন্য আমরা তাঁর অভিমত উদ্ধৃত করলাম : "As the soule of Euphorbus was thought to liue in Pythagoras : so the sweete wittie of Ouid liues in mellifluous & honey-tongued Shakespeare, witnes his Venus and Adomis, his Lucrece, his suged Sonnets among his priuate friends, and &c."

সেক্সপীয়ারের উল্লেখ, প্রশংসা ও স্বীকৃতিতে বিখ্যাত বেন জনসন-এর (Ben Jonson) অভিমত অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য। তিনি কখনো সেক্সপীয়ারকে বিদ্রূপ করেছেন, আবার কখনো *Tales, Tempests, leronimo* বা *Andronicus*-এর দোষ-গুণ বিচার করেছেন। কিন্তু তিনিই সমকালে এই মহাকবির প্রতিভার শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়েছিলেন। সেক্সপীয়ার স্মরণে তাঁর বিখ্যাত উক্তি :

Soule of the Age!
The Applause! delight! the wonder of our stage
My Shakespeare rise.

আবার :

Triumph, my Britaine, thou hast one to showe,
To whom all Scenes of Europe homage owe
He was not of an age, but for all time!

পক্ষ ও বিপক্ষের নানা অভিমত ও মন্তব্য থেকে প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর নিজস্ব বক্তব্য উপস্থিত করে বলেন যে, সেক্সপীয়ার সমকালে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন নাট্যকার হিসাবে, কিন্তু শ্রেষ্ঠ নাট্যকার হিসাবে নয় ; এমন কি পরবর্তীকালেও তাঁর প্রতিভার শ্রেষ্ঠত্ব অজ্ঞাত ছিল।

মারমেড ট্যাভার্নে সেক্সপীয়ার

ইংরেজ সমাজের গঠন পর্বে কোন অ্যাকাডেমী, ক্লাব বা সমিতি ছিল না যেখানে সৃজনধর্মী প্রতিভাবানরা কোন বিষয়ে আলোচনা করতে পারেন। তখন ছিল মদের দোকান, পান্থশালা, সরাই ও শুঁড়িখানা। এইসব জায়গাই ছিল মিলনস্থল—আগন্তুক তার বন্ধুবর্গ খুঁজে নিত। বিখ্যাত অভিযাত্রী, নাবিক ও *Historie of the World*-এর লেখক স্যার ওয়াল্টার রলে 'মারমেড ট্যাভার্ন'-এর প্রতিষ্ঠাতা। এলিজাবেথীয় যুগে এর বিপুল জনপ্রিয়তা দেখা যায়। রলে, বোমন্ট, ফ্লেচার, ডন, ক্যারেউ (Carew), জনসন প্রমুখ কোন-না-কোন সময় এখানে হাজির হতেন, এবং এক গ্লাস মদ্য হাতে সাহিত্যালোচনায় মশগুল হতেন। কিন্তু আমাদের মহাকবির কি এখানে আগমন ঘটত? না, তেমন কোন নিশ্চিত তথ্য নেই। কিন্তু ঐতিহ্যানুসারে তাঁর 'ট্যাভার্ন'-এর সহিত সংযোগের কথা জানা যায়। এই রকম এক ঐতিহ্যের বর্ণনা করেছেন টমাস ফুলার (Thomas Fuller) তাঁর *Worthies of England (1661)* গ্রন্থে। তা ছাড়া, নানা আনুমানিক ও কাল্পনিক ঘটনা অবলম্বনে সেক্সপীয়ারের

সহিত অপর লেখকদের কথোপকথনের বর্ণনা ডেভিড ম্যাসন (David Masson), আলফ্রেড নোয়েস (Alfred Noyes) প্রমুখ করেছেন।

ট্যাভার্ন-এর সহিত সেক্সপীয়ারের সংযোগ থাক বা নাই থাক, কিন্তু তিনি তাঁর নাটকে যে-ট্যাভার্ন জীবনের বর্ণনা দিয়েছেন, তা কাল্পনিক নয়, একেবারে জীবন্ত চিত্র। এই সম্পর্কে প্রফুল্লচন্দ্র লিখেছেন,—"That Shakespeare had an intimate knowledge of the manners and customs of the people who used to lead a wild Tavern life is amply evident from his everlasting portraiture of Falstaff's sallies at Boar's Head Tavern, East-cheap, which was by far the most notable in Shakespeare's time."[10]

মারমেড ট্যাভার্নে সেক্সপীয়ার যেতেন, না যেতেন না,—এই প্রশ্নের সঠিক ও যথার্থ উত্তর দেওয়া কঠিন। কারণ, এই মহাকবির ইতিহাস একটি *big perhaps*. নানা তথ্য, আনুমানিক ও কাল্পনিক সাক্ষ্য থেকে প্রফুল্লচন্দ্র এই প্রহেলিকাচ্ছন্ন প্রশ্নের উত্তরে বলেন, "The only explanantion, which the present writer can offer to this query, is that Shakespeare, if he ever joined the Mermaid meetings, went to the tavern to learn and not to attract the young band of poets and playwrits and utilised his whole leasure in studying the characters of the frequenters there."[11]

প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর প্রবন্ধে এই কুহেলিকাচ্ছন্ন সমস্যা সমাধানে পাঠকদের বিষয়টিতে আকর্ষিত হবার আহ্বান জানিয়েছিলেন। কিন্তু কোন বাঙালী সেক্সপীয়ার বিশেষজ্ঞ কি এই সমস্যায় আকৃষ্ট হয়েছিলেন? আমাদের জানা নেই।

সেক্সপীয়ারের নৈর্ব্যক্তিকতা

সেক্সপীয়ারের নাটকাবলীতে কি তাঁর ব্যক্তিজীবনের প্রতিফলন ঘটেছে? তাঁর নাটকের নানা চরিত্রে যে সুখ-দুঃখ, হাসি-আনন্দ, বিষাদ, দ্বন্দ্ব বর্তমান, তার মধ্যে কি মহাকবির জীবনের কোন সংযোগ বা স্পর্শ ঘটেছে? বা নাটকের বিভিন্ন চরিত্রের বিশেষত্ব অবলম্বনে কি মহাকবির জীবনী রচনা করা সম্ভব? এই প্রশ্নের আলোচনায় সমালোচকদের দৃষ্টিভঙ্গী ও অভিমত পরস্পর বিপরীতিধর্মী। বস্তুতপক্ষে, সমস্যাটি অত্যন্ত জটিল যার সমাধান আজও সম্ভব হয়নি। এহেন জটিল ও কঠিন প্রশ্নটি নিয়ে প্রফুল্লচন্দ্র দীর্ঘ আলোচনা করেছেন (*CR*, July, 1940 / August, 1940)। প্রফুল্লচন্দ্রের লেখার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো প্রামাণিকতার জন্য বহু উদ্ধৃতি, এবং তারই পাশাপাশি নিজস্ব অভিমত ও সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন। মহাকবির প্রতিভার বৈশিষ্ট্য ও তাঁর নৈর্ব্যক্তিকতা সম্বন্ধে প্রফুল্লচন্দ্র এমারসনের *Representative Man* থেকে উদ্ধৃত করেছেন :

"Given a man of talents a story to tell, and his partiality will presently appear. He has certain observations, opinions, topis, which have some accidental prominence, and which he disposes all to exhibit. ... But Shakespeare has no

10. *CR*, March, 1940, p. 233
11. *Ibid*, p. 236-37

peculiarity, no important topic / but all is duly given, no veins, no curiosities, no low painter, no bird-fancier, no mannered is he : he has no discoverable egotism. The great he tells greatly; the small sûbordinately."[12] এমারসন আরো বলেছেন, সেক্সপীয়ার হলেন একমাত্র সেক্সপীয়ারের জীবনীকার। যদি তিনি কিছু না বলেও থাকেন, তা হলেও তিনি আমাদের মধ্যেকার সেক্সপীয়ার সম্বন্ধে বলেছেন। আবার, অস্কার ওয়াইল্ড (Oscar Wilde) মহাকবির আত্মমুখীনতায় (subjectivity) বিশ্বাসী। তিনি বলেন, কোন সৃজন যতখানি নৈর্ব্যক্তিক, ঠিক ততখানি আত্মমুখী। রলে (Releigh) সেক্সপীয়ারের নৈর্ব্যক্তিকতায় গভীর বিশ্বাসী। তাঁর মন্তব্য হলো "He is a dramatic poet; and poetry, the clown says, is feigning. His enormously rich creative faculty has given us a long procession of fictitious persons who are as real to us as our neighbours; a large assembly including the most diverse characters— Hamlet and Falstaff, Othelo and Thersites, Imogen and Mrs. Quickly, Dogberry and Julius Caesar, Cleopatra and Audrey and in this crowed the dramatist conceals himself, and escapes."[13]

অস্কার ওয়াইল্ড ও রলের অভিমতের সামঞ্জস্যহীনতা দেখানোর জন্য প্রফুল্লচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের 'দুই বিঘা জমি'-র বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করেছেন। এই কবিতায় জমিদারের অত্যাচার ও ছল-চাতুরীর বিরুদ্ধে বিশ্বকবি যে বিষোদ্গার করেছেন, এবং উপেনের পক্ষে যে প্রতিবাদ জানিয়েছেন, তার সঙ্গে কবির ব্যক্তিজীবনের কোন সম্বন্ধ দেখা যান না। আচার্যদেবের ভাষায় রবীন্দ্রনথের কবি-বৈশিষ্ট্য চমৎকারিত্ব লাভ করেছে :

"What is it—is it subjective or objective? The actual circumtances of the poet points to the latter but is not it subjective simultaneously? Does not every line of it speak of the poet's innermost mind? Has not the last time of the piece betrayed the poet's sentiment of protest against oppresion of the wealthy? Truly it has. The poet at an inspired moment realised with all his soul the oppresion done to the unlucky man and identified himself thoroughly and inseparably with the wronged. True it is that he is born of a will-to-do family of the city but it is equally true that he forgot his personal existence at an inspired moment and for a few minutes at least the soul of Rabindranath retired and .one wronged Upendra's took possession of Rabindranath's body."[14]

সেক্সপীয়ারের আত্মমুখীনতা ও বস্তুমুখীনতা প্রসঙ্গে প্রফুল্লচন্দ্রের মন্তব্য হলো তাঁর লেখা অনুপ্রাণিত মুহূর্তের ইতিহাস, এবং তার সঙ্গে মিলিয়ে ব্যক্তিজীবনের কাহিনী রচনা করা বিপজ্জনক। তিনি কখনো পিউরিটান আন্দোলনে সহানুভূতি প্রদর্শন করেছেন, কখনো প্যাপিস্টদের পক্ষেও বা ; কখনো রাজতন্ত্রের পক্ষে, আবার কখনো

12. *CR*, July, 1940, p. 1
13. *Ibid*, p. 4
14. *Ibid*, p. 5

গণতন্ত্রের ধ্বজা উড্ডীনও করেছেন ; কিন্তু সামগ্রীক মূল্যায়ন করলে ফল হয় শূন্য। আমরা নাটকের নানা ঘটনা ও চরিত্র থেকে অনুপ্রাণিত সেক্সপীয়ারের জীবনেতিহাস পেতে পারি বটে, কিন্তু "never of the *man* Shakespeare may be traced out."

প্রফুল্লচন্দ্র **হ্যামলেট, টেম্পেস্ট, চতুর্থ হেনরী** নাটকের চরিত্র বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন ব্যক্তিসেক্সপীয়ারের জীবনের সহিত ওইসব নাটকের বিশেষ কোন সম্বন্ধ নেই। যেমন,—হ্যামলেটের বিষাদ ও বিষণ্ণতার সহিত কবিপুত্র হ্যামনেটের (Hamnet) মৃত্যুর কোন সম্পর্ক নেই। এই সম্পর্কে প্রফুল্লচন্দ্রের সিদ্ধান্ত : "The death of his only son certainly affected him too much and it sounds quite fitting if his pathos has found some expression in his writings. But circumstantial evidence clearly proves that he was not too much moved."[15]

মহাকবির ব্যক্তিজীবনে দুঃখ-কষ্ট ছিল, একমাত্র পুত্রের অকাল মৃত্যু হয়েছিল ; পিতা জনের মৃতু হয়েছিল ;আর্ল অফ এসেক্স-এর (Earl of Essex) মৃত্যুদণ্ড হয়েছিল। আর্ল অফ সাউদাম্পটন-এর (Earl of Southampton) জেল হয়েছিল। এ-সব সত্য হলেও মহাকবির লেখায় তা গুহান্ধকারে নিহিত। সেক্সপীয়ারের নৈর্ব্যক্তিকতা প্রসঙ্গে আচার্যদেব বলে,—"He is strictly impersonal in his dramatic works and whatever he speaks through the characters of his creation are but words which would be quite natural and fitting to the occasion. The poet is absent in the assemblege of his characters who speak, act and dance according as they wish."[16]

সেক্সপীয়ারের শিক্ষা

সেক্সপীয়ারের পড়াশোনা, ক্লাসিক চর্চা ও ভাষাজ্ঞান নিয়ে পণ্ডিতরা আজও বিবাদ করছেন ; ওইসব বিষয় তাঁদের মধ্যে ঐকমত্য দেখা যায় না। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এই সম্পর্কে দুটি বিরুদ্ধ অভিমত গড়ে উঠতে দেখা যায়। কেউ কেউ তাঁর বিদ্যাবত্তা ও পান্ডিত্যের পক্ষে অভিমত পোষণ করেন, আবার কেউ কেউ ঠিক বিপরীত অভিমত পোষণ করেন। এই উভয় অভিমতের বিস্তারিক বিশ্লেষণ করেছেন প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর 'Learning of Shakespeare' উপশিরোনাম প্রবন্ধে। প্রবন্ধটি 'The Calcutta Review'-এর সেপ্টেম্বর, অক্টোবর ও নভেম্বর সংখ্যার 1940 সালে প্রকাশিত হয়। আচার্যদেবের আলোচনার মূল বিষয়গুলির সারাংশমাত্র প্রদান করার প্রচেষ্টা এখানে করা হলো।

এলিজাবেথীয় যুগে শিক্ষার বাহন ছিল ল্যাটিন। গ্রীক অবশ্যই পড়ানো হতো, কিন্তু তা আবশ্যিক ছিল না। সাধারণত ছয় থেকে আট বছর বয়সে স্কুলে ভর্তি হয়ে তেরো বা চোদ্দ বছর বয়সে স্কুলের পাঠ শেষ হতো। সেক্সপীয়ারের পড়াশোনা সম্বন্ধে প্রায় কিছুই জানা যায় না ; খুব সম্ভব, তিনি স্ট্যাটফোর্ডের গ্রামার স্কুলে

15. *CR*, August, 1940, p. 117
16. *Ibid*, p. 123-124

পড়েছিলেন, কিন্তু পড়াশোনা সমাপ্ত করেছিলেন কিনা তার কোন রেকর্ড নেই। যাই হোক, মহাকবির ল্যাটিন ভাষায় জ্ঞানের পরিচয় তাঁর নাটকগুলির সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। তাঁর নাটকে ব্যবহৃত কয়েকটি ল্যাটিন শব্দগুচ্ছের (phrase) উদাহরণ প্রদত্ত হলো :[17]

Love's Labour's Lost নাটকের স্কুল শিক্ষক হলোফার্নেস (Holofernes) ডন অ্যাড্রিয়ানো ডি আরমাডো সম্পর্কে বলছেন *Novi hominem tanquam te*—'I know the man as well a you'. এই শব্দগুচ্ছটি অবশ্য লিলির ল্যাটিন গ্রামার থেকে গৃহীত। অন্যত্র হলোফার্নেস উদ্ধৃত করেছেন *Vir sapit qui pauca loquitur*—'wise is the man who speaketh few things or words'. এটিও লিলির গ্রামার থেকে নেওয়া হয়েছে। আবার এই শিক্ষক ফ্লোরিও-র (Florio) *Fist Fruites* থেকে উদ্ধৃত করেছেন :

Venetia, venetia,
Chi non ti vede, non ti pretia

—'Venice, Venice, who seeth thee not, praiseth thee not'.

The Taming of the Shrew নাটকে বিয়াঙ্কার এক প্রশ্নের উত্তর প্রেমিক লুসেনটিও ওভিদের ভাষায় বলছেন,—

Hic ibat Simois, hic est Sigeia tellus,
Hic steterat Priami regia celsa senis

—'Here ran the river Simois ; here is the Sigeian land ; here stood the lofty palace of old Priam.'

The Merry Wives of Windsor নাটকে মিসট্রেস পেজ তাঁর পুত্রের ল্যাটিন-জ্ঞান পরীক্ষা করাচ্ছেন স্যার হাগ ইভানকে দিয়ে। ছেলেটি 'singulariter, nominativo, hic, haec, hoc" উচ্চারণ করলে ইভানস সংশোধন করে বললেন *nominativo, hig, hag, hog.* নাটকে এই দৃশ্যের অবতারণা থেকে প্রফুল্লচন্দ্র মন্তব্য করেন "This scene will undoubtedly lose all its importance if anybody fails to think over its real significance. It appears that these few lines Shakespeare penned in order to redicule the existing system of book education, and we have no reason to deny the assertion that the poet himself underwent this method of education."[18]

সেক্সপীয়ারের বহু নাটকের প্লট ইউরোপীয় ক্লাসিক গ্রন্থ থেকে গৃহীত। তা হলে তিনি ক্লাসিকগুলি অনুবাদের মাধ্যমে পড়েছিলেন, না মূলভাষায় পড়েছিলেন? এই প্রশ্নের সমাধান সুদূর পরাহত। কারণ, তাঁর নাটকে গ্রীক, ফরাসী, ইটালীয় ও স্প্যানিশ ভাষার ব্যবহার লক্ষ করা যায়, আবার তৎকালে বহু ক্লাসিকের অনুবাদও হয়। *King Lear, The Tempest, Henry VIII,* ইত্যাদি নাটকে এমন সব অংশ দেখা যায় যেখানে

17. *CR*, Oct, 1940, p. 4-5
18. *Ibid*, p. 5

ক্লাসিকগুলির অনুবাদের সহিত সম্পূর্ণ মিল রয়েছে। শুধু তাই নয়, অনূদিত গ্রন্থের ভ্রান্তিও তাঁর লেখায় দেখা যায়। বস্তুতপক্ষে, এলিজাবেথীয় যুগ ছিল অনুবাদের যুগ। এই সময় হোমার, ইউরিপিডিস, ওভিদ, সিসিরো, হিপোক্রেটস, জোনোফোন, হেরোডটাস, প্লেটো, অ্যারিস্টটল, ভার্জিল, প্লুটার্ক, সেনেকা, লিভি, প্লিনি, ট্যাসিটাস প্রমুখের গ্রন্থের অনুবাদ হয়। এ-সব গ্রন্থ ছাড়াও মহাকবি হলিনসেডের *Chronicles*, টমাস নর্থ কর্তৃক অনূদিত প্লুটার্ক-এর *Lives*, পেন্টারের *Palace of Pleasure* থেকে তাঁর নাটকের প্লট নির্মাণ করেন।

মহাকবির ডিগ্রী ছিল না সত্য, কিন্তু "Shakespeare knew Latin only up to a school-boy standard, and in Greek he was as poor as in Hebrew. ... he was no scholar in the tongue.[19] ল্যাটিন ভাষায় জ্ঞানের জন্য ফরাসী, ইটালীয়, স্প্যানিশ ভাষায় 'ক অক্ষর গোমাংস' ছিলেন না। আবার, মূলভাষায় ক্লাসিকগুলি পড়ুন বা নাই পড়ুন তাঁর পাঠের পরিধিও সঙ্কীর্ণ ছিল না। সেক্সপীয়ারের শিক্ষা সম্বন্ধে এই উদ্ধৃতিটি খুবই প্রাসঙ্গিক : "Of Shakespeare's education we know little, except that for a few years he probably attended the endowed grammar school at stratford, where he picked up the "Small Latin and less Greek" to which his learned friend Ben Jonson refers. His real teachers, meanwhile, were the men and women and the natural influences which surrounded him."[20]

সমকালীন ঘটনার উল্লেখ

প্রতিভার স্বরূপ ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ ও বিচার-বিবেচনায় সমকালীন ঘটনার গুরুত্ব ও তাৎপর্য অস্বীকার করার উপায় নেই, আর সেক্সপীয়ারের রহস্যময় জীবন ও তাঁর ঐকান্তিক নৈর্ব্যক্তিকতার প্রশ্নে তা আরো প্রাসঙ্গিক। সেইজন্য প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর নিবন্ধে (*CR*, April, 1940, pp 1-12) এই বিষয়ে সম্যক আলোচনা করেছেন। তাঁর বিভিন্ন ঘটনা ও ব্যক্তির উল্লেখ, এবং বিশ্লেষণ আমাদের বিস্মিত করে। আমাদের সীমিত পরিসরে দীর্ঘ আলোচনার সুযোগ ও অবকাশ না থাকায় কয়েকটি মাত্র ঘটনা ও ব্যক্তির উল্লেখমাত্র করব।

দুর্ভাগ্যের বিষয়, মহাকবি সমকালীন ঘটনার উল্লেখে প্রায়শ নীরব। তাঁর 37টি নাটকে 37টি ঘটনা বা ব্যক্তির উল্লেখও নেই। অথচ তাঁর অবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্বে ও সমকালে ঘটনার অভাব ছিল না। সেইজন্য সমালোচনগণ তাঁর নাটক থেকে ঘটনা নিষ্কাশনের প্রয়াস পেয়েছেন। অন্তত একটি সন্দেহাতীত ঘটনার উল্লেখ তাঁর নাটকে দেখা যায়। তা হলো 1599 সালে আর্ল অফ এসেক্স কর্তৃক আয়ারল্যাণ্ড অভিযান। *Henry V*-এ এই ঘটনা একটি 'কোরাস'-এ (Chorus) উল্লিখিত হয়েছে (Act. V, Sc. 1)। প্রাসঙ্গিক কোরাসের কিছু অংশ :

19. *CR*, Nov., 1940, p. 137
20. *English Literature*, W. J. Long, p. 140

Were now the general of our gracious empress,
As in good time he may—from Ireland coming,
Bringing rebellion broached on his sword,
How many would the peaceful city quit
To welcome him!

বিশ্বনাট্যকার সাধারণভাবে সমসাময়িক ঘটনার উল্লেখে নীরব হয়ে কেন এরকম একটি প্রত্যক্ষ ঘটনার উল্লেখ করলেন, তার দুটি কারণ থাকতে পারে : (i) তিনি কি রাজনৈতিক পক্ষপাতদুষ্ট ছিলেন, অথবা (ii) বন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন? কারণ, আর্ল অফ এসেক্স ছিলেন তাঁর বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক সাউদাম্পটনের মিত্র। এই বিতর্কে প্রফুল্লচন্দ্রের অভিমত : "The present writer would like to support the latter view for obvious reason."[21]

The Twelfth Night নাটকে যে নতুন ম্যাপের ("the new map with augmentation of the Indies') কথা বলা হয়েছে, তা খুব সম্ভব 1598-1600 সালে প্রকাশিত হয়। আবার, *Romeo and Juliet*-এ বৃদ্ধা নার্স যে ভূমিকম্পের "Tis since the earthquake now eleven years" উল্লেখ করেছে, তা সম্ভবত 1588 সালে ঘটে।

1610-11 সালে লিখিত *The Tempest* নাটকে একটি জাহাজডুবির ঘটনা আছে। এরূপ মনে করা হয়, স্যার জর্জ সোমারের (Sommer) নেতৃত্বে 1609 সালে নৌবহরে জাহাজডুমি ঘটে, এবং একটি জাহাজ 'Sea Venture' বিচ্ছিন্ন হয়ে বারমুডা উপকূলে পৌছায়। ওই দ্বীপকে 'Isle of Devil' বলা হতো। নাটকে এই ঘটনার ইঙ্গিত "Still vexed Bermoothes", "Have we devils here" শব্দগুচ্ছে লক্ষ করা যায়।

Merchand of Venice-এ বিচারের দৃশ্যটি প্রকৃতপক্ষে ইহুদি চিকিৎসক লোপেজ-এর (Lopez) রাষ্ট্রদ্রোহের অপরাধের বিচার দৃশ্য থেকে গৃহীত। তখন জনসাধারণ লোপেজের বিচারে খুবই আগ্রহ ও ঔৎসুক্য দেখায়, এবং এই কাহিনী লোকের মুখে মুখে ফিরতে থাকে। সেক্সপীয়ার জনগণের এই সংবেদনশীলতা কাজে লাগিয়ে সাইলকের বিচারের অবতারণা করেন।

রাণী এলিজাবেথের সময় না ছিল সংবাদপত্র, না ছিল কোন সাময়িকী; ছিল গীর্জার বক্তৃতামঞ্চ, রঙ্গমঞ্চ আর ট্যাভার্ন। গল্প-গুজব ছড়াতো এখান থেকেই, মুখে মুখে। গল্প-গুজবের স্বরূপ ও প্রকৃতি মহাকবির ভাষায়,—

Rumour is a pipe
Blown by surmises, jealousies, conjectures
And of so easy and so plain a stop
That the blunt monster with uncounted heads,
The still discordant wavering multitude,
Can play upon it.

21. *CR*, April, 1940, p. 2

King John নাটকে (Act IV, Sc. 2) গুজবের জীবন্ত চিত্রটি মহাকবি অনুপম ভাষায় অঙ্কন করেছেন,—

I saw a Smith stand with his hammer, thus,
The whilst his iron did on the anvil cool,
With open mouth swallowing a tailor's news;
Who, with his shears and measures in his hand,
Standing on slippers,—which his nimble haste
Had falsely thrust upon contrary feet,—
Told of a many thousand warlike French,
That were embattailed and rank'd in Kent.
Another lean unwashed artificer
Cuts off his tale and talks of Arthur's death.

প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর নিবন্ধে আরো অনেক নাটক থেকে বহু উদাহরণ উপস্থাপিত করেছেন, নাটকস্থিত ডায়ালোগের পরিপ্রেক্ষিতের বর্ণনাও করেছেন। পরিশেষে তাঁর অভিমত হলো উপস্থাপিত ঘটনা ও পরিপ্রেক্ষিত বর্ণনায় তথ্যাপেক্ষা অনুমান অধিক হলেও "those do not appear far-fetched."[22]

সংস্কারক : ষষ্ঠ হেনরী ত্রয়ী ও টাইটাস অ্যানড্রোনিকাস

CR-এর ছ'টি সংখ্যায় অন্য নাট্যকারদের নাটকের সংস্কারক হিসাবে জটিল সমস্যাটি 45 পৃষ্ঠাব্যাপী আলোচনা করেন প্রফুল্লচন্দ্র। তাঁর সেক্সপীয়ার চর্চায় প্রথম থেকেই ভবেশচন্দ্র রায় প্রথমে শ্রুতিলেখক হিসাবে, এবং শেষ পাঁচটি প্রবন্ধে সহযোগী লেখক হিসাবে অংশগ্রহণ করেন। 1940 সালের ডিসেম্বর সংখ্যায় পাদটীকায় প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর ছাত্র ভবেশচন্দ্র রায় সম্বন্ধে লিখেছেন,—"He has been fairly well up in literature on the subject at hand and I have thought it proper to associate him as a collaborator in the next series of articles."

অসংখ্য উদ্ধৃতিসহ এই দীর্ঘ আলোচনা প্রকৃতপক্ষে খুবই অ্যাকাডেমিক। এই প্রবন্ধের আবেদন সেক্সপীয়ার বিশেষজ্ঞদের কাছে বলে আমরা সমস্যাটি মাত্র স্পর্শ করার প্রয়াস পাব।

সেক্সপীয়ার চর্চায় একটি জটিল সমস্যা হলো তিনি তাঁর নাটকের প্লট যেমন নানা ল্যাটিন, ফরাসী, ইটালীয়ান, স্প্যানিশ গ্রন্থ থেকে গ্রহণ করেছেন, তেমনি আবার তাঁর পূর্ববর্তী ও সমসাময়িক নাট্যকারদের নাটক সংস্কার, পরিমার্জনা করে নতুন রূপদান করেছেন ; এমন কি, অন্যদের নাটকও তাঁর নামাঙ্কিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। প্রফুল্লচন্দ্রের আলোচনা প্রধানত 'ষষ্ঠ হেনরীর' তিনটি খন্ড ও 'টাইটাস অ্যান্ড্রোনিকাস' অবলম্বনে।

---

22. *Ibid*, p. 12

এলিজাবেথীয় ইংল্যান্ডে থিয়েটার ম্যানেজারদের প্রস্তাব ও নির্দেশানুসারে নাটক লেখা হতো। লেখকরা তাঁদের লেখার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে একেবারেই সচেতন ছিলেন না। সুতরাং তখন ভাড়াটে লেখার (hack-writing) প্রচলন ছিল। ওই সময় "Collaboration and revision were the order of the day"। গ্রন্থসত্বের নিয়মও তেমন ছিল না, আর এ নিয়ে কেউ তেমন মাথাও ঘামাত না। অনেক প্রতিদ্বন্দ্বী থিয়েটার কোম্পানী ছিল : 'দি থিয়েটার' (1576), 'দি কার্টেন' (1577), 'দি বীয়ার গার্ডেন', (1583), 'দি রোজ' (1587), 'দি গ্লোব' (1599) ইত্যাদি। নতুন নাটক ও নতুন প্লটের সন্ধানেও ছিল তীব্র প্রতিযোগিতা। লেখকদের পুরোনো নাটক ব্যবহারের স্বাধীনতা ছিল ; তারা পরিমার্জনা করতে পারত দর্শকদের রুচি অনুসারে, কিন্তু কুম্ভীলকের (plagiarist) অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হতো না। স্বাভাবিকভাবে "Shakespeare has been credited with having served his apprenticeship as a "playdresser" 'revising and bringing up to date the work of other men.'[23] কিন্তু প্রফুল্লচন্দ্রের মতে, এই সিদ্ধান্ত যতটা না আনুমানিক, ততটা নিশ্চিত তথ্যভিত্তিক নয়।

ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাসে যে-সব নাটক সেক্সপীয়ারের রচনা নয় বা আংশিক রচনা বলে সন্দেহ করা হয়, তাদের মধ্যে *Henry VI*-এর প্রথম খন্ড ও *Titus Andronicus* প্রধান। *Henry VI*-এর পরবর্তী দুটি খন্ড ও *Richard III* রচনায় মার্লো-র (Marlowe) অংশগ্রহণ আছে ; Henry VIII-এ ফ্লেচার-এর (Fletcher) হস্তাবলোপ বিদ্যামান ; *Two Noble Kinsmen* সন্দেহের তালিকায় রয়েছে : *Edward III*-ও সন্দেহাতীত নয়।

Titus Andronicus সম্বন্ধে ঘোরতর সন্দেহ প্রকাশ করা হয় যে, এই নাটকটি আদৌ সেক্সপীয়ারের রচনা নয়। কিন্তু রোজ থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা হেন্সলো, Mere-এর তালিকা, প্রথম ফোলিও ও সহঅভিনেতা হোমিঞ্জ ও কন্ডেল-এর সাক্ষ্যে প্রফুল্লচন্দ্র নাটকটি সেক্সপীয়ারের রচনা বলে মন্তব্য করেন।[24] কিন্তু 1941 সালে *CR*-এর মার্চ ও এপ্রিল সংখ্যায় তাঁর এই সিদ্ধান্ত পরিবর্তিত হয়। বৈজ্ঞানিক মানসিকতা বড়ই গতিশীল, একগুঁয়েমীর স্থান নেই সেখানে। তাই অধিকতর বিচার-বিশ্লেষণের পর সিদ্ধান্ত পরিবর্তনে দ্বিধা করেননি তিনি। এই প্রসঙ্গে তাঁর দ্বিধাহীন স্বীকৃতি উদ্ধৃত হলো : "It has been observed before that this play was written by the poet in his prentice stage. This view has indeed to be revised and after a careful study the present authors have come to an altogether different conclusion. At the very outset the authors would like to offer an apology for their change of views, and would submit that in the bewildering track of Shakespearian study one is very much prone to revision of one's opinion."[25] অতঃপর সমস্যাটির পক্ষে ও বিপক্ষে নানা উদ্ধৃতি ও আলোচনা করেন মার্চ ও এপ্রিল সংখ্যায়। কিন্তু গভীর দুঃখের বিষয়, তাঁদের আলোচনা অসমাপ্ত থাকায়

23. *CR*, May, 1940, p. 92
24. *Ibid*, p. 93
25. *CR*, March, 1941, p. 207

শেষ সিদ্ধান্ত অজ্ঞাত থেকে যায়। খুব সম্ভব, পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গীতে নাটকটি যৌথভাবে মার্লো, গ্রীন বা পীল রচিত বলে গৃহীত হতো।

ষষ্ঠ হেনরী—প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খন্ড

Henry VI-নাটকের তিনটি খন্ড নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই। বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু হলো এই নাটকের প্রকৃত রচয়িতা কে। এ নিয়ে বিশাল সমালোচনা সাহিত্য গড়ে উঠেছে, এবং নানা মুনি নান মত পোষণ করেছেন। ম্যালোন (Malone) মনে করেন মার্লো, পীল ও লজ (Lodge) যৌথভাবে এই নাটক রচনা করেন; ব্যারেট ওয়েন্ডেল (Barret Wendell) মনে করেন গ্রীন, পীল ও কীড হলেন রচয়িতা; সিডনি লী মনে করেন নাটকের তিনটি খন্ডই গ্রীন ও পীলের রচনা। আবার এই অভিমতও অনেকে পোষণ করেন যে, নাটকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় খন্ড রচনা করেন মার্লো ও সেক্সপীয়ার। প্রফুল্লচন্দ্র নানা জনের নানা মত থেকে এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, ".. Henry VI more specially its first part, was not of Shakespeare's writing alone but was the product of composite authorship."[26]

ষষ্ঠ হেনরী ত্রয়ী সম্পর্কে চারটি তত্ত্ব দেখা যায় : (i) নাটকের প্রথম খন্ডটি কোন অজ্ঞাত লেখকের লেখা; (ii) কোন অজ্ঞাতনামা লেখকের রচনার পরিমার্জনা; (iii) যৌথ রচনা (iv) পূর্ববর্তী কোন নাটক সেক্সপীয়ার কর্তৃক সংস্কার। প্রফুল্লচন্দ্র এই তত্ত্ব চারটি সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করেছেন। কিন্তু আমাদের সেই সুযোগ না থাকায় কেবল অভিমতটুকু উপস্থাপন করি : "He might have been a mere collaborator-apprentice, could have been a reputed reviser, but never the sole author."[27]

এই বঙ্গদেশে বাঙালী সেক্সপীয়ার বিশেষজ্ঞ ছিলেন : টি. এন. সেন, পি. সি. ঘোষ, এম. এ. ভট্টাচার্য, পি. সি. চৌধুরী, এস. সি. সেনগুপ্ত প্রমুখ। সেক্সপীয়ার চর্চায় তাঁদের কতখানি অবদান, তা এই নগণ্য লেখকের জানা নেই। এমন কি, তাঁরা প্রফুল্লচন্দ্রের চর্চার মূল্যায়ন করেছিলেন কিনা, তাও অজ্ঞাত। আর. কে. দাশগুপ্ত প্রফুল্লচন্দ্রের সেক্সপীয়ার চর্চায় বিশেষ কোন অবদান দেখতে পাননি, কেবল তাঁর "considerable interest as the response of a Bengali Scientist to the greatest of English poets" দেখেছেন।[28] মাত্র 4.2 লাইনে মূল্যায়ন!

26. *Ibid*, May, 1940, p. 100
27. *Ibid*, Feb., 1941, p. 87
28. *Acharya Prafulla Chandra Ray*, C.U., p. 145

ত্রয়োদশ অধ্যায়

কৌতুক ও হাস্যরসের ঝর্ণাধারা*

উসকো-খুসকো চুল, চিরুনি পড়েনি ;স্নানের পর বা অন্য কোন সময় দশ আঙুল বা পাঁচ অঙুলের স্পর্শ পড়ত কিনা সন্দেহ ;ভ্রু জোড়া ঘন ও বিস্তারিত ; চোখ দুটি একটু গভীরে স্থাপিত, কিন্তু জ্বলজ্বলে ও মর্মভেদী ;খোঁচাখোঁচা দাড়ি ;ক্ষীণ তণু, জীর্ণশীর্ণ ;পরণে আটহাতি ধুতি বা চেক লুঙ্গি ; থান কাপড় থেকে কেটে কোট পরিধানে;আহার বিহারে অকল্পনীয় শৈথিল্য ও উদাসীনতা ;তিনি হলেন আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, D.Sc., Ph.D., F.C.S., F.R.A.S.B., C.I.E., Kt.। বাঙালী জাতিকে সারা জীবন ধরে তিনি তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করে গেছেন তাদের আলস্য, আরামপ্রিয়তা, ডিগ্রীর প্রতি দুর্নিবার আকাঙ্খার জন্য ; কেরানীপদলোভী হওয়ার জন্য ;শিল্পবিমুখতা, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি নিরতিশয় ঔদাসীন্যের জন্য ;কায়িক শ্রমের প্রতি অমর্যাদাসুলভ মানসিকতার জন্য। বাঙালী চৈতন্য প্রফুল্লচন্দ্রকে ভয় করেছে, ভক্তি করেছে, অবনত মস্তকে শ্রদ্ধা করেছে, নির্ভয় আশ্রয় বলে দ্বিধাহীন চিত্তে গ্রহণ করেছে ;তাঁকে আচার্যের আসনে অধিষ্ঠিত করে দুঃসময়ে ও সঙ্কটে ত্রাণের জন্য আহ্বান করেছে। বাঙালী এই কঠিন কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলা পরায়ণ ও স্পষ্টবাদী মানুষটিকে চিনত। কিন্তু আপাত শুষ্ক, নীরস ও রুক্ষ মানুষটির মধ্যে যে হাস্যরস রসিকতা ও কৌতুকপ্রিয়তার ঝর্ণাধারা ঝর্‌ঝর্‌ তর্‌তর্‌ করে বয়ে যেত, তার খবর অনেকের অজানা। অথচ প্রফুল্লচন্দ্রকে সম্পূর্ণরূপে জানতে হলে তাঁর চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্বকে অস্বীকার করার উপায় নেই। তাঁর চরিত্রের এই গুরুত্বপূর্ণ দিকটি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় দেখা যায়। আমরা বিভিন্ন স্মৃতিকথা, তাঁর লেখা ও 'আত্মচরিত' অবলম্বনে এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনার প্রয়াস পাব।

হাস্যরস সম্বন্ধে দু-চার কথা

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র অকপটে স্বীকার করেছেন, ".... আমি প্রায় ভ্রমক্রমে রাসায়নিক হইয়াছিলাম। ইতিহাস, জীবন-চরিত, সাহিত্য এই সব দিকেই আমার বেশী ঝোঁক।"[1] 'আত্মচরিত'-এর পাতায় পাতায় আচার্যদেবের সাহিত্যানুরাগের পরিচয় তো আছেই, তা ছাড়া তাঁর সেক্সপীয়ার চর্চা আমাদের বিস্ময়ে অভিভূত ও বিমূঢ় করে তোলে। বস্তুতপক্ষে, তিনি ছিলেন 'জন্ম সাহিত্যিক'। রবীন্দ্রনাথ তো ছিলেন রসিকচূড়ামণি, রসসাগর, আর বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তর' রঙ্গরসে ও হাস্যে থৈথৈ করছে। প্রফুল্লচন্দ্র ঈশ্বর গুপ্ত ও দীনবন্ধু মিত্র নন ;ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, অমৃতলাল বসু, প্রমথ চৌধুরী, পরশুরাম, প্র-

---

* 'জ্ঞান বিচিত্রা', আগস্ট, ২০০০, প্রবন্ধের পরিবর্তিত রূপ।

1. *আত্মচরিত*, পৃঃ ৪১৮

না-বি প্রমুখ নন। কবি বা সাহিত্যিক নন, কিন্তু কাব্য ও সাহিত্যরসে টইটম্বুর, তাঁর ভরা কলসী থেকে ছলকে ছলকে পড়ছে সাহিত্যের অন্যতম রস—হাস্যরস।

হাস্যরসের জন্ম একপ্রকার জীবনবোধ থেকে। হাস্যরসিকের জীবনদৃষ্টি এক উদার ক্ষমাসুন্দর জীবনদৃষ্টি। হাস্যরসিকের সে দৃষ্টিতে জীবন ও জগতের শত ভ্রূকুটি ও সহস্র অসঙ্গতির বিরুদ্ধে কোন তিক্ত অভিযোগ নেই। হাস্যরসিক শুধু চোখে আঙুল দিয়ে বৈষম্য ও অসঙ্গতির প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকেন।

হাস্যরস বা কৌতুকহাস্য ইংরেজীতে *humour*। এই হাস্যরসের আবার শ্রেণীবিভাগ দেখা যায় ঃ *humour, wit, satrie, irony, sarcasm* ইত্যাদি। wit হলো একপ্রকার বাগবৈদগ্ধ্য ;বুদ্ধি র কাছে এর অধিকতর আবেদন। Satrie-এ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ সুস্পষ্ট ;Irony-তে ব্যঙ্গ কিছুটা কোমল, মৃদু ;আর Sarcasm-এ বক্রোক্তি সুকঠোর, এবং তা বাকচাতুর্যের ওপর নির্ভরশীল। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের জীবনের বিভিন্ন ঘটনা, নানা উক্তি ইত্যাদির মধ্যে হাস্যরসের প্রায় সব বৈশিষ্ট্যগুলিই দেখা যায়।

উৎস ঃ কৃচ্ছ্রসাধন—পোষাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদিতে

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র অকল্পনীয় কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্যে জীবনযাপন করে গেছেন। তিনি বলতেন, "…. দরিদ্র দেশে বিলাতি বিলাস ঢুকিয়ে অন্নের পয়সা ক'টি শখে নষ্ট করে দেশের সর্বনাশ করা হচ্ছে। তিনি স্বয়ং ছিলেন খদ্দর পরিহিত সন্ন্যাসী। একটি চেককোট ও হাঁটুর উপর ধুতি ছিল তাঁর পোষাক। ঘরে ধুতির বদলে খদ্দরের চেক গামছা বা লুঙ্গি"। এই পোষাক-পরিচ্ছদের অসঙ্গতিকে কেন্দ্র করে অনেক কৌতুককর পরিস্থিতির (humorous situation) সৃষ্টি হয়েছিল ঃ

একবার ঢাকা যাচ্ছেন। সাধারণত, ডেকের সামনের দিকে বসতেন তরতাজা প্রচুর হাওয়া-বাতাস পাবেন বলে। গোয়ালন্দ ও নারায়ণগঞ্জের মধ্যবর্তী অংশের জন্য প্রথম শ্রেণীর টিকিট করতেন। সিঁড়ি দিয়ে ওপরের তলায় উঠতে যাচ্ছেন, এমন সময় এক 'সুখনি' (senior mate) তাঁকে লুঙ্গি পরিহিত এক গরীব মুসলমান চাষা ভেবে ভুল করে বসল। সে বলল, "ও, মিঞা ভাই, এদিকে নয়, ওই দিকের সিঁড়ি দিয়ে তৃতীয় শ্রেণীর ডেকে যাবার পথ।" জগৎবিখ্যাত ডঃ পি.সি.রায়, ডি.এস.সি., স্যার লুঙ্গি ও ফোতুয়ায় মুসলমান চাষা হিসাবে প্রতিভাত হলেন!

আচার্যদেব দার্জিলিং যাচ্ছেন। ট্রেনের লেট আছে। লাগেজের ওপর বসে ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করছেন। এমন সময় এক ইউরোপীয়ান সাহেবের বেয়ারা তাঁকে সমকর্মী জ্ঞানে ভুলের কবলে পড়ল। অতঃপর সে আচার্যদেবের সহিত গল্পসল্পে মেতে উঠল ঃ "তোমার সাহেব দার্জিলিং যাচ্ছে নাকি? মুনিব কেমন ধরনের লোক? কত মাইনে দেয়? তোমার কাজটা ভাল তো? …।" এরই মধ্যে তার সাহেবের অবির্ভাব। আচার্যদেবকে চিনতে পেরে উষ্ণ করমর্দন করলেন। বেয়ারার চোখ ছানাবড়া! আচার্যদেব কি ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসির রেখা টেনে জ্বলজ্বলে চোখে বেয়ারার দিকে একটি পলক নিক্ষেপ করেছিলেন? অস্যার্থ, বুঝলে তো।

একবার সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কমিশনের সদস্য হয়েছিলেন আচার্যদেব। সভায় উপস্থিত হওয়ার জন্য তাঁকে গ্রান্ড হোটেলে যেতে হয়। ওই সভায় অন্য আমন্ত্রিত সদস্য ছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ ও অকৃত্রিম বন্ধু স্যার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী। আচার্যদেব নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগেই পৌঁছলেন, কিন্তু ভেতরে প্রবেশ না করে গাড়ী বারান্দার নীচে বন্ধু দেবপ্রসাদের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। গেটের কাছে দাঁড়িয়েছিল একটি মুটে। আচার্যদেবের সেই কাকের বাসার মত চুল, খোঁচাখোঁচা দাড়ি, আর পরণে যথাবিহিত চেককোট দেখে মুটে মনে করল এ-ব্যক্তি কোন ইউরোপীয় সদস্যের বেয়ারা হবে, এবং তার প্রভুর জন্য অপেক্ষা করছে। এই ভেবে সে আচার্যদেবকে জিজ্ঞাসা করল,—"তুমহারা সাহেব কব আয়েঙ্গে?" আচার্যদেব কি উত্তর দিয়েছিলেন জানা নেই। তবে খুব সম্ভব স্মিতহাস্যে উত্তরটি হতো 'আভি আয়েঙ্গে'।

অশিক্ষিত চাষী, মুটে-মজুর, বেয়ারাদের এই ভ্রান্তি আচার্য স্মিত হাসিতে উপভোগ করতেন সত্য, কিন্তু এই ভ্রান্তি যখন জাতীয় মর্যাদা ও সম্মানে আঘাত করত, তখন তা বরদাস্ত না করে উপযুক্ত প্রতিকারের ব্যবস্থা করতেন।

আচার্যদেবের পোষাক-পরিচ্ছদ ও চেহারা দেখে একবার এক লিফ্‌টম্যান তাঁকে লিফ্‌টের ভেতরে নিতে অস্বীকার করল। কেবল তাই নয়, ঔদ্ধত্যপূর্ণ কর্তৃত্ব জাহির করে সিঁড়ি দিয়ে উঠে চারতলায় যাবার নির্দেশ দিয়ে বলল,—"ইয়ে সাহেব লোগোকো ওয়াস্তে হ্যায়, তুম্‌কো লিয়ে নেহি। সিঁড়ি সে চলা যাও।"

একজন এ-দেশীয় লিফ্‌টম্যানের ধৃষ্টতা, ঔদ্ধত্য ও কর্তৃত্বপূর্ণ মনোভাব, এবং প্রধানত ভারতীয় পোষাক-পরিচ্ছদের প্রতি অশ্রদ্ধা ও বিতৃষ্ণা আচার্যদেবকে ক্ষুব্ধ করে তুলল। ফলে, যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করায় লিফ্‌টম্যানের শাস্তি হলো।

আপামর জনসাধারণের জন্য আচার্যের দরজা থাকতো খোলা। কেউ আসতেন সমস্যা নিয়ে, কেউ আসতেন সাহায্যের জন্য, কেউ আসতেন তাঁকে দর্শন করার জন্য। একবার বোম্বাইয়ের এক ধনী ব্যবসায়ী প্রথমবার কলকাতায় এসে নানা দ্রষ্টব্য স্থান দেখার পর সুবিখ্যাত বিজ্ঞানী ডঃ পি.সি. রায়ের দর্শন লাভ করতে ইচ্ছা পোষণ করলেন। তখন আচার্যদেব ৯১নং আপার সারকুলার রোডে বেঙ্গল কেমিক্যালের দোতলায় থাকতেন। ভদ্রলোক দারোয়ানকে কার্ড দিলে সে বলল,— "কার্ড দরকার হবে না, আপনি ওই সিঁড়ি দিয়ে সোজা দোতলার ঘরে চলে যান, তিনি সেই ঘরেই আছেন।"

"ভদ্রলোক গেলেন, কিন্তু তখনই ফিরে এসে দারোয়ানকে বললেন, "ওঘরে একজন দপ্তরী বই জুড়ছে দেখলুম, আর তো কেউ নেই।" আচার্যদেবের পরণে ছিল একখানা লুঙ্গি, গায়ে গেঞ্জি—একখানা বই-এর পাতা ছিঁড়ে গিয়েছিল। তিনি তখন তাই জুড়ছিলেন।"

আচার্যদেবের সরল, অনাড়ম্বর ও মিতব্যয়িতার জীবনযাপন নিয়ে পরিচিত মহলে যে কানাঘুষা ছিল না তা নয়। স্বয়ং আচার্যদেব সে বিষয়ে অবহিতও ছিলেন। তখন তাঁর প্রিয় উজ্জ্বল ছাত্ররা ভারতে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছেন। অধ্যাপনা ও গবেষণায় নিযুক্ত আছেন। আচার্যদেব প্রায়ই ছাত্রদের বাড়ীতে যেতেন, কয়েকদিন করে থাকতেন। একবার তিনি এক প্রিয় ছাত্রের বাড়ীতে বেশ কিছুদিন অবস্থান করেছিলেন। সেখানে দেখেন বাথরুমের মগটি

খুবই পুরোনো, আর ফাটা। ফাটা মগ দিয়ে জল বেরিয়ে যাচ্ছে, অথচ নতুন মগ কেনার দিকে তাঁর ছাত্রের হুঁশ নেই। অতঃপর তিনি আর এক যশস্বী ছাত্র অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীতে এলেন। কথায় কথায় তাঁর স্ত্রীকে বললেন,—"আমার প্রিয় ছাত্রটি দেখছি 'plain living'-এ আমাকেও ছাড়িয়ে গেছে।"

আচার্যদেব স্বয়ং তাঁর ক্ষীণ তণুটি নিয়ে রসিকতা ও কৌতুক করতেও ছাড়েননি। উচ্চতর শিক্ষার জন্য প্রফুল্লচন্দ্র তখন লন্ডনে পৌঁছেছেন, কিন্তু এডিনবার্গে যাননি। ওই দেশের প্রথা ও রীতি অনুসারে ডিনার ও হল ডান্সের জন্য বিশেষ পোষাক দরকার। কিন্তু ব্রিটিশদের 'ট্রেইল কোট' তাঁর পছন্দ নয়। বিলেতে অবস্থানকালে রাজা রামমোহন রায় যে চোগা ও চাপকান পরতেন, তা-ই তাঁর উপযুক্ত বলে মনে হলো। অতঃপর আচার্যের ভাষায়,— "আমাকে অক্সফোর্ড স্ট্রীটের চার্লস কীন এন্ড কোম্পানীর দোকানে লইয়া যাওয়া হইল। বন্ধুদের নিকট ধার করিয়া পোষাকের (চোগা চাপকানের) নমুনাও সঙ্গে লইলাম। দোকানী আমার গায়ের মাপ লইল এবং পোষাক তৈরি হইলে পুনর্বার যাইয়া মাপ ঠিক করিয়া লইয়া আসিতে অনুরোধ করিল। পোষাক তৈরি হইলে আমাকে তাহারা সংবাদ দিল এবং দোকানে গেলাম। পোষাক পরিলে দেখা গেল যে যদিও মোটামুটি গায়ে লাগিয়াছে, তবুও স্থানে স্থানে একটু ঢিলা হইয়াছে। দর্জি প্রথমে আমাকে এই ত্রুটি দেখাইয়া কৈফিয়ৎ স্বরূপ বলিল—"মশায়, আপনি এত সরু ও পাতলা যে আপনার শরীরের জন্য মাপসই জামা করা শক্ত। কোনো কোনো পাঠক হয়ত আমার এই দুর্দশায় হাসিবেন। সম্ভবতঃ আমার চেহারা অনেকটা 'আইবড ক্রেনের' মতো ছিল।'

উৎস ঃ অধ্যয়ন ও বিঘ্ন

ডিগ্রীর মোহ আমাদের ঘুচেনি। ডিগ্রী চাই, তা যেমন করে হোক ;চুরি করে, নোট মুখস্থ করে, যেমন করে হোক। শেখার দরকার নেই, ডিগ্রী চাই-ই-চাই। কারণ, সম্মান ও মর্যাদার বাজারে, চাকরীর বাজারে প্রকৃত শিক্ষা, বিদ্যা ও জ্ঞানের চেয়ে ডিগ্রীর মূল্য অপরিসীম। আচার্যদেব এই ডিগ্রী অর্জনের মানসিকতা কখনো সমর্থন করেননি, তার অসারত্ব প্রতিপন্ন করেছেন দীর্ঘ বিশ্লেষণের মাধ্যমে তাঁর নানা লেখায়, বক্তৃতায়। আমরা তাঁর Irony-গুলির একটিমাত্র উল্লেখ করব ঃ "স্কুল কলেজের যুবকগণ যা গলাধঃকরণ করেন, পরীক্ষা-মন্দিরে তা উদ্গিরণ করে ডিগ্রী লাভ হলেই মা-সরস্বতীর সঙ্গে একেবারে সেলাম-আলেকম্।" আচার্যদেবের মতে, ডিগ্রী হলো অজ্ঞতার আবরণ, আর ডিগ্রীধারীরা হলেন 'ছদ্মবেশী মূর্খ'। এখানে Satrie-টি লক্ষ করার মত।

সময়ের মূল্য ও তার সদ্ব্যবহার সম্বন্ধে নিদারুণ অজ্ঞতা আমাদের জাতীয় চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্ব। আচার্যদেব ছিলেন বাঙালী চরিত্রের এক বিস্ময়কর ব্যতিক্রম। তাঁর সময় রুটিন বাঁধা ছকে চলত। ব্যতিক্রম ছিল না। তাই সহস্রমুখী কাজে তাঁর সময়ের অভাব কখনো হয়নি। কিন্তু লোকেরা সময়ের অসদ্ব্যবহার ও অপচয় করবে, আর অন্যদের সময়ের হানি ঘটাবেই। এমার্সন তাই একবার বলেছেন,—"At times the whole world seems to be in conspiracy to importunce you with emphatic trifles.

Friend, child, sickness, fear, want, charity, all knock at once at thy closet door and say--Come out unto us." যখন কেউ গভীর অধ্যয়ন ও মননে নিমগ্ন, তখন পরিচিতগণের প্রত্যেকে একবার দরজায় ধাক্কা দেবেই, বিঘ্ন সৃষ্টি করবেই করবে। এমন করেই কোলরিচের (Coleridge) 'কুবলাই খাঁ' কবিতাটি অসমাপ্ত থেকে গেল, 300/400 ছত্র লেখার পরিবর্তে 54 লাইনে অসংলগ্ন ও অসম্পূর্ণ হয়ে থেকে গেল।

আচার্যদেবের কাছে অধ্যয়ন ছিল সাধনার মত— ধ্যান-ধারণার সমতুল্য। সকাল সাড়ে পাঁচটায় তাঁর গভীর অধ্যয়ন শুরু হতো। তখন কোন 'বাবাতো ভাই' বা 'মামাতো ভাই'-এরও প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু নিষেধ থাকলে কি হবে, বিঘ্ন ঘটবেই ঘটবে। এই বিষয়টি স্মরণ রেখে তাঁর একটি Satrie ও Sarcasm ঃ

কেহ প্রাতঃকালে আপন ঘরে অধ্যয়ন-নিরত আছেন, এমন সময় কোন শিক্ষিত লোক— সম্ভবত বন্ধু এসে হাজির,—বললেন, "মশায় পড়ছেন নাকি?" আর মশাই, বই খুলে বসে পড়ছিনা তো পায়খানায় গেছি না কি? চেয়ার টেনে বসে আরম্ভ করলেন— খবর কি? ছেলেপুলে কেমন? মেয়ে সেয়ানা হচ্ছে , বিবাহের কি করছেন?" ব্যস, পড়াশোনায় ইতি হয়ে গেল। অমূল্য সময় বৃথা নষ্ট হল। বাস্তবিকই আমরা অতি সহজেই ভুলে যাই—"উপেক্ষায় রেখে যায় মরু ঘোরতর।"

উৎস ঃ গুরুর ছাঁদা ও ট্রিক

শিক্ষক, বিজ্ঞানী ও সমাজসেবী প্রফুল্লচন্দ্র। বহু উচ্চ ও নীচ মহলে তাঁর অতিপরিচিতি। সহজেই নানা উপলক্ষে তাঁর নিমন্ত্রণ জুটত। নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে আচার্যদেবের কার্পণ্য ছিলনা। নিজে খেতেন না তো কিছুই, বড় টিফিন বাক্সে ছাঁদা নিয়ে আসতেন। কারণ, 'ছেলেরা' (ছাত্ররা) আমোদ করে খাবে। এই নিয়ে একবার খুব বিভ্রাট ঘটে, এবং জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় লেডী বসু কর্তৃক ধৃত হন, তার কথা আমরা আগেই বলেছি। এখানে পালিত অধ্যাপকের কার্যের অসঙ্গতি থেকে হিউমার সৃষ্টির একটি ঘটনার উল্লেখ করা হলো ঃ

বর্ধমান বিভাগের কমিশনার বিখ্যাত রমেশচন্দ্র দত্তের জামাতা জে.এন.গুপ্ত থাকতেন হুগলী জেলা সদর চুঁচুড়ায়। একবার কৃষি-প্রদর্শনী খুলতে গিয়ে আচার্যদেব তাঁর অতিথি হন। প্রদর্শনীর কাজ শেষ হলে বিকালের জলখাবারের আসরে বসে, "আচার্য দেখলেন, চোব্যচুষ্যের ভিড়ে কয়েক ছড়া সোনার বরণ উত্তম মর্তমান রম্ভা রয়েছে। তখন রুমালখানি পকেট থেকে বার করে, দুই ছড়া কদলী তুলে বললেন, "ওহে, এ আমাদের অধ্যাপকদের পাওনা—লজ্জা করলে চলবে কি করে?" স্বচ্ছ হাসির লহর তুলে সকলে তখন আচার্যের পাওনা-গন্ডায় সেই পরম বিস্ময়কর হিসাব সম্বন্ধে অবহিত হলেন। তারপর গুপ্ত সাহেব শুভ্র বস্ত্রখন্ডে সমস্ত রম্ভাগুলি সহস্তে বেঁধে নিজ হাতে আচার্যের গাড়ীতে তুলে দিয়ে কৃতার্থ হলেন।"

রতনমণি চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থ থেকে ওপরের ঘটনাবলীর সহিত আর একটি ঘটনার উল্লেখ করা যাক। একবার আচার্যদেব পাবনার শীতলাইয়ে যোগেন মিত্রের অতিথি হন।

তাঁর বাড়ীতে ছিল হৃষ্টপুষ্ট গাই গরু, ঘিও তৈরী হতো বাড়ীতে। ঘৃতের সুগন্ধে আকৃষ্ঠ হলেন আচার্যদেব। পরের দিন "জনসভায় ধান ভানতে শিবের গীত"—মৈত্র মহাশয়ের গব্যঘৃত সম্বন্ধীয় উদ্যোগের তারিফ করে আচার্য বললেন, "বাড়ীতে তৈরী গব্যঘৃত উঁচুদরের খাঁটি জিনিস। আমরা অধ্যাপকরা এমন উপাদেয় জিনিস পেলেই নিয়ে থাকি।" আর কী করেন মৈত্র মহাশয়! অতঃপর কলসী-ভরা ঘি উঠল আচার্যের গাড়ীতে। আচার্যের ট্রিক(trick), যাবে কোথায়!

সন্ধ্যার আঁধারে ঢাকা দূরের গাছপালা; পুকুরের ঢেউগুলোও শান্ত। সোদপুরের এ হেন শান্ত ও নির্জন পরিবেশে ঘনিষ্ট সহকর্মী সতীশচন্দ্র দাশগুপ্তের সঙ্গে গল্পগুজবে মশগুল আচার্যদেব। বুদ্ধিমান ও উজ্জ্বল ছাত্ররা খাদি প্রতিষ্ঠানে যোগ দিচ্ছেনা। সতীশচন্দ্র বললেন,— "না-না, কী করে আসবে? বিশাল অট্টালিকা আর মোটা মাইনে দিয়ে আপনি দেশের সেরা মস্তিষ্কগুলি কিনে নিয়েছেন যে। যখন আমি বললাম, এই আপনাদের প্রকৃত মাতৃভূমি যেখানে প্রতিমাসে মানুষের মাথাপিছু আয় মাত্র তিন টাকা, এখানে আপনাদের টাকা দিয়ে আকর্ষণ করতে পারি না, তখন তারা আতঙ্কিত হলো; সবাই ছুটে পালালো।" হতাশার সুরে তাঁর কথা শেষ হলো।

'Old man' হাসালেন, আমার (ডঃ জগন্নাথ গুপ্ত) দিকে তাকিয়ে বললেন,—"তুই এঁকে চিনিস? শিশু অপহরণকারী", দুষ্টুমি করে বললেন। তারপর সতীশবাবুকে বললেন,— "দয়া করে তুমি আমার এই ছেলেটির ওপর ট্রিক খাটিওনা।" সতীশবাবু মাথা নীচু করে ছোট্ট করে বললেন,—"আশীর্বাদ করুণ, আপনার মত যেন ট্রিক শিখতে পারি।"

আচার্যদেবের ওপর ট্রিক চালানো কঠিন হলেও দুর্লভ নয়। রতনমণি তেমন একটি ঘটনার কথা বলেছেন। একদিন অভ্যাসমত আচার্যদেব তাঁর 'মেডিকেল বিল' অর্থাৎ ঘোড়ার গাড়ীর মাথায় দুই টুকরি ল্যাংড়া আম নিয়ে ফিরলেন। রতনমণিকে আম খাবার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিজ্ঞান কলেজেই রাত কাটাতে বললেন। "কলেজে পৌঁছে নিজের ঘরটির ভিতর এসে তিনি অবিলম্বে রাত্রের স্বল্পাহার শেষ করলেন। তারপর তাঁর বহুবিশ্রুত চৌপায়ের উপর শুয়ে পড়ে বললেন, "তোমরা সব একজনে গোটা একটা করে আম খাবে।" ঘর অন্ধকার—মুখ টিপে হাসলুম। কি কৃপণ রে বাবা! তাঁর মাথায় ও পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে তিনি শীঘ্রই নিদ্রাগত হলেন। তারপর আমরা প্রত্যেকে— যতদূর মনে পড়ে— খাবার সময় চারবার গোটা একটা করে আম খেলুম। সকালবেলা দুষ্টুমি ফাঁস করে দিলে পর তিনি হাসতে হাসতে বললেন, "বামুনের ছেলে, পেটুকতা তোমাদের পেশা।" ট্রিকের ওপর ট্রিক!

উৎস ঃ বাগ্‌বৈদগ্ধ্য—উইট

কখনো স্পষ্টবাদিতা ও নিছক রসিকতার মধ্য দিয়ে আচার্যদেব যে বৌদ্ধিক ঔজ্জ্বল্যের রসায়ন সৃষ্টি করেছেন, তা আজ প্রবাদবাক্যে পরিণত হয়েছে। একবার প্রখ্যাত মদনমোহন মালব্য অধিক বেতন ও সুযোগ-সুবিধা দিয়ে আচার্যদেবকে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের প্রস্তাব করলে তিনি তাঁর মুখের ওপর বলে দিলেন, "*Beangal is very much*

need of poor Dr. P.C. Ray and Pandit Madan Mohan Malavya has all the qualities of Sir Ashutosh Mookherjee minus his genius" ।

কোকনদ কংগ্রেসে যাচ্ছেন খাদি প্রদর্শনী উদ্বোধন করতে। গাড়ী বদল করে একটি কামরায় উঠে চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারীকে দেখেই বলে উঠলেন,—Frail, fragile, frame, রাজাজীও কম প্রত্যুৎপন্নমতি ছিলেন না। সঙ্গে সঙ্গে পদপূরণ করে উত্তর দিলেন, leading to the fourth F–failure পান্ডিত্য, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও রসবেত্তার রসায়নে উইট-এর কী অদ্ভুত উদ্ভব!

উৎস ঃ কাব্যিক হিউমার—দুই মহারথীর পত্র

দুই মহারথী—বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র। এক সময় প্রৌঢ় রাজশেখর



কবিগুরুর সহিত

বসুকে নিয়ে উভয়ের মধ্যে "tug of war"—টানাটানি হেঁচড়া হেঁচড়ি চলে। প্রথম টানটি আচার্যদেবের। পত্র লিখলেন বিশ্বকবিকে,—

"…. সম্প্রতি দেখিতেছি আপনি সত্য সত্যই আমার ক্ষতি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, 'গড্ডলিকা'র প্রথম সংস্করণ বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। কিন্তু যখন দেখি সাহিত্য সম্রাট স্বয়ং তাহার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখন অচিরে পর পর বারো হাজার কপি

যে বিক্রয় হইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। সেদিন গ্রন্থকার পরশুরামকে বলিলাম, এ প্রকার সৌভাগ্য কদাচিৎ কোনো লেখকের ঘটিয়া থাকে। এখন তাহার মাথা না বিগড়াইয়া যায়। তিনি আমারই হাতের তৈয়ারী একজন রাসায়নিক এবং আমার নির্দিষ্ট কোন বিশেষ কার্যে অনেকদিন যাবৎ ব্যাপৃত। কিন্তু এখন তিনি বুঝিলেন যে, তিনি সাহিত্যক্ষেত্রেও একজন 'কেষ্টবিষ্টু'। সুতরাং আমাকে অসহায় রাখিয়া ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হইতে পারেন।

আসল কথা এই যে, আপনাকে কি অনুরোধ করিব যে, আর একটি তীব্র সমালোচনা করুন যে, পরশুরামের হাত হইতে কুঠার খসিয়া পড়ে? এক সময় পড়িয়াছিলাম যে, অনেক তত্ত্ব ও শক্তি গুহায় নিহিত থাকে ;কিন্তু ভগবানের লীলা কে বুঝিবে, কাহাকে কখন গুপ্ত অবস্থা হইতে সুপ্রকাশ করিয়া তুলেন।

ভবদীয়

শ্রী প্রফুল্ল চন্দ্র রায়"

বিশ্বকবি পত্রের জবাব দিয়ে লিখলেন,—

"সুহৃদ্বর, বসে বসে Scientific American পড়ছিলুম, এমন সময় চিঠির খামের কোণে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান-সরস্বতীর পদাঙ্ক দেখতে পেয়ে সন্দেহ হল আমার হৃদপদ্ম থেকে কাব্য-সরস্বতীকে বিদায় দিয়ে তিনি স্বয়ং আসন নেবেন এমন একটা চক্রান্ত চলছে। খুলে দেখি—যাকে ইংরেজীতে বলে টেবিল ফেরানো—আমারই পরে অভিযোগ যে আমি রসায়নের কোঠা থেকে ভুলিয়ে ভদ্রসন্তানকে রসের রাস্তায় দাঁড় করাবার দুষ্কর্মে নিযুক্ত। কিন্তু আমার এই অজ্ঞানকৃত পাপের বিরুদ্ধে নালিশ আপনার মুখে শোভা পায়না, একদিন চিত্রগুপ্তের দরবারে বিচার হবে। হিসাব করে দেখবেন কত ছেলে যারা আজ পেট মোটা মাসিক পত্রে ছোট গল্প আর মিলহারা ছন্দের কবিতার সাহিত্য - লোকে একেবারে কিষ্কিন্ধ্যাকান্ড বাঁধিয়ে দিতে পারতো, এমন কি লেখা দায়গ্রস্ত, সম্পাদকমন্ডলীর আশীর্বাদে যারা দীপ্তশিখা সমালোচনায় লঙ্কাকান্ড পর্যন্ত বড় বড় লাফে ঘটিয়ে তুলত, তাদের আপনি কাউকে বি-এস-সি, কাউকে ডি-এস-সি লোকে পার করে দিয়ে ল্যাবরেটরির নির্জন নিঃশব্দ সাধনায় সন্ন্যাসী করে তুললেন। সাহিত্যের তরফ থেকে আমি যদি তার প্রতিশোধ নিতে চেষ্টা করে থাকি কতটুকুই বা কৃতকার্য হয়েছি। আপনার রাসায়নিক বন্ধুটিকে বলবেন, মাসিক পত্রবলে যে সব জীবাত্মা হয়ত বা সাহিত্যবীর হতে পরত ভূষন্ডীর মাঠে তাদের অঘটিত সম্ভাবনার প্রেতগুলির সঙ্গে আপনার মোকাবিলার পাল্টা যেন তিনি রচনা করেন।

আমার কথা যদি বলেন— আপনার চিঠি পড়ে আমি অনুতপ্ত হইনি, বরঞ্চ মনের মধ্যে গুমর হয়েছে। এমন কি ভাবছি স্বামী শ্রদ্ধানন্দের মতো শুদ্ধি কাজে লাগব; যে সব জন্ম-সাহিত্যিক গোলমালে ল্যাবরেটরির মধ্যে ঢুকে পড়ে জাত খুইয়ে বৈজ্ঞানিকের হাটে হারিয়ে গিয়েছেন তাঁদের জোর করে জাতে তুলব। আমার একেকবার সন্দেহ হয় আপনিও বা সেই দলের একজন হবেন। কিন্তু আপনার আর উদ্ধার নেই।....

আপনার

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর"

আচার্যদের যে 'সেই দলের একজন' ছিলেন তার প্রমাণ বহুবার তিনি দিয়েছেন। প্রখ্যাত বিজ্ঞানী জ্ঞানচন্দ্র ঘোষের ভাই ভূপেন্দ্রনাথের বিয়ের পর একদিন তাঁকে নিজের ঘরে ডেকে পাঠিয়ে মুখবন্ধ একটি খাম 'ছোট বৌমাকে' দিতে বললেন। খাম খুলে দেখা গেল লেখা আছে—

"Dr. B.N. Ghosh being very shy disposition has puzzled many as to how he won his bride. The explanation lies below :–

In Belmont is a lady richly left ; And she is fair and, fairer than that word, of wonderous virtue ; sometimes from her eyes I did receive fair speechless messages ;

1.1.161 - 164, Merchant of Venice".

উৎস ঃ উইট ও হিউমার — দাদু-নাতি

সুনীত কুমার ঘোষ ছিলেন আচার্যদেবের নাতি ;ভাইঝির বড় ছেলে। সুনীতের কিন্তু দাদু-অন্তপ্রাণ। আচার্যদেব এই নাতিটির বহু আবদার সহ্য করতেন ;ঠাট্টা-তামাশা ও কৌতুকে মেতে উঠতেন। তখন তিনি চিরন্তন দাদু হয়ে উঠতেন।

1913 সাল। সুনীত তাঁর সেজদাদা মশাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে গেছেন। কিন্তু



অধ্যয়নরত আচার্যদেব

আচার্যদেব তখন পড়ছেন। এ-সময় কারুর প্রবেশ করার অধিকার ছিল না। এমন কি 'বাবতো-ভাই'-এরও নয়। কিন্তু সুনীত ঘরে ঢুকে বসে রইলেন ;চুপচাপ বসে থাকতে না পেরে উস্‌খুস্‌ করতে লাগলেন। "ইহাতে তাঁহার পড়ার মনোযোগ নষ্ট হইল। তিনি বলিলেন, আমি এই সময়টি একমনে পড়ি। তুই আমায় বিরক্ত করিস না, আমি তৎক্ষণাৎ কুমারসম্ভব-এ পঠিত নতজানু সশারসনপৃষ্ঠ মদনের অনুকরণে বলিলাম—

কুর্য্যাং হরস্যাপি পিনাকপাণে

ধৈর্য্যচ্যুতিং কে মম ধন্বিনোহন্যে ?

পিনাকপাণি হরের ধ্যান আমি ভিন্ন অন্য ধনুর্ধারী কে ভাঙ্গিতে পারে ?

তিনি তৎক্ষণাৎ বিছানা হইতে উঠিয়া বলেন, তোকে কুমারসম্ভব পড়ান দাদার সার্থক হয়েছে। নাতি ভিন্ন অন্য কাহার আস্পর্ধা যে আমার পড়ার মনোযোগ ভাঙ্গিতে পারে?"

1919 সালে ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউটে আচার্যদেবের প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে অবসর গ্রহণ উপলক্ষে সম্বর্ধনা সভা। কিন্তু সুনীত্র যখন পৌঁছলেন তখন সভা শেষে আচার্য গাড়িতে উঠছেন। সুনীতকে দেখে তিনি বললেন, "তুই এতক্ষণ কোথায় ছিলি? ওরা আমায় কত কি বললে। আমি বল্লাম, থামুন আমার নাতি এলে আপনাদের মুখের মত জবাব দেবে ; আর আমি মনে মনে ওয়াটারলু যুদ্ধের পূর্বে নেপোলিয়ানের মত নাইট (রাত্রি) বা ব্লুচারের (তাঁহার অন্যতম সেনাপতি) আগমন প্রতীক্ষায় অধীরভাবে জপ করিতেছি।"

1919 সালে আচার্যদেব নাইট হুড খেতাব পান। সুনীত দেখা করলে তিনি বলে উঠলেন, "মহামান্য ভারত সরকার আমায় দিনের আলোয় ফেলিয়া না রাখিয়া রাত্রের অন্ধকারে মিশাইয়া দিতে চান।"

এই উপলক্ষে স্যার আশুতোষের সভাপতিত্বে এক সভা আহ্বান করা হয়েছিল। সুনীতের ওই সভায় যোগদান করার আমন্ত্রণ নেই। কিন্তু তিনি ওই দিন ওই সময় আচার্যদেবের কাছে থাকবেন বলে মত প্রকাশ করলেন। তখন আচার্যদেব বললেন, "ঐ দিন ঐ সময়ে আমার একটি সভায় যাইতে হইবে। সেখানে তুই গিয়া কি করবি ও বুঝবি?" আমি বলিলাম, "সভায় বেয়ারারা থাকিবে। আমি সভার গুরুত্ব না বুঝিতে পারিলেও তাহাদের মত উপস্থিত থাকিব। বিশেষতঃ বি.এস্.সি. তৃতীয় বার্ষিক ছাত্রেরা যদি আসে তবে আমরাই বা উপস্থিত থাকিব না কেন? উত্তরে তিনি বলিলেন, "তুই কি পাড়িস্?" প্রত্যুত্তরে জানাইলাম "আমি উত্তর কলিকাতার স্বনামধন্য মিশনারী কলেজের তৃতীয় বার্ষিক কলা বিভাগের ছাত্র।" তিনি আমায় তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "রসিককে ডেকে আন।"

"রসিক উপস্থিত হলে আচার্যদেব বললেন, "রসিক তোমাদের জন্য আমি ভাইপো ত্যাগ করেছি,ভাইঝি ত্যাগ করেছি। ভাগ্নে ও ভাগ্নিদের ত্যাগ করেছি। এটি আমার নাতি। দাদার বড় মেয়ের বড় ছেলে। ও ছুটে ছুটে আমায় দেখতে আসে। কিছুতেই আমায় ছাড়তে চায়না। ও বলে, আগামী সভায় তোমরা কিষ্কিন্ধ্যা সমাজের একদলকে

নিমন্ত্রণ করিয়াছ। উনি অন্য দলের লোক। ওঁরা নিমন্ত্রণ পান নাই। তাই এই অভিযোগ। তুমি একটা ব্যবস্থা করো।"

কথা প্রসঙ্গে একদিন আচার্যদেব সুনীতকে মূর্খ বলেন, এতে সুনীত কৃত্রিম আপত্তি করে বলেন, "তিনি যে কোন পথিককে ডেকে ডি-এস-সি উপাধি দেন, আসমুদ্র হিমাচলের সকল বিশ্ববিদ্যালয় তাহা স্বীকার করিবে। কবিকে জানিলে, সামান্য লোকও তাহার কাব্যরসের মাধুর্য বোঝে, আর আমি আজন্ম আপনাকে দেখিলেও আমি মূর্খ? তিনি বলিলেন তুই একজন এন পি পি (না পড়ে পন্ডিত) ও কামাস্কাটকা বিশ্ববিদ্যালয় তোকে এই উপাধি দিল।"

স্কুলের বাৎসরিক পরীক্ষার শেষে সুনীত তাঁর সেজদাদামশাইয়ের সহিত দেখা করতে গেছেন। কিন্তু চক্রব্যূহের দ্বারে প্রহরারত জয়দ্রথ - ছাত্র। সুতরাং সুনীতকে ফিরতে হল। কিন্তু তিনি এক চিলতে কাগজে চিঠি লিখলেন ঃ

শ্রীচরণেষু সেজদাদা মহাশয়,

আপনাকে দেখিতে আসিয়াছিলাম। একটি ছাত্র বলিলেন, দেখা হইবে না। আপনাকে বাঙলার দ্বিতীয় বিদ্যাসাগর বলে ;বিদ্যাসাগর বাড়ীতে শুনিয়াছি দর্শনপ্রার্থীর অবারিত দ্বার। তাই কি, আপনি ---- পুষিয়াছেন?

প্রণত

সুনীত

সঙ্গে সঙ্গে সুনীতকে ফিরিয়ে নিয়ে আসার নির্দেশ জারি হলো। সুনীত উপস্থিত হলে আচার্যদেব কোঁচার কাপড় খুলে গলবস্ত্র হয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রচ্ছন্ন কৌতুকে বললেন, "ছেলেরা অর্বাচীন। তাহারা সমাজপতির সমাদর জানে না। তাই এই ভুল। আপনি ইহাদিগকে ক্ষমা করুন।"

সুনীতবলেছেন, এই উক্তির মধ্যে তাঁর বংশ ও তৎকালীন সমাজে প্রচলিত সম্ভ্রমের প্রতি ব্যঙ্গচ্ছলে স্তুতির ইঙ্গিত আছে অর্থাৎ শ্লেষ অলঙ্কার প্রযুক্ত হয়েছে। যেমন,— ভারতচন্দ্রের রচনায়,—

অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধি তে নিপুণ।
কোন গুণ নাই তার কপালে আগুন।।

উৎস ঃ জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণ

1940 সাল। বিখ্যাত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র কেদারনাথ আচার্যদেব কঠিন অসুখে আচ্ছন্ন অবস্থায় আছেন শুনে ছুটে এলেন বিজ্ঞান কলেজে। সঙ্গে এলেন ডাঃ জ্যোতিপ্রকাশ সরকার।

চিকিৎসারত ডাক্তারের কাছে রোগীর অবস্থা সম্বন্ধে জানতে চাইলে, ডাক্তার বেশ

উঁচু গলায় বললেন,— 'অবস্থা মোটেই ভাল নয়। কোন সাড়াশব্দ নেই।' ডাক্তার জ্যোতিপ্রকাশ অনুরূপ উঁচু গলায় বললেন,— 'আমি কয়েক সপ্তাহ আগে আচার্যদেবকে দেখতে এসে জিজ্ঞাসা করেছিলাম,—'কেমন আছেন?' উনি উত্তর দিলেন, "আমরা তিনজন রবীন্দ্রনাথ, নীলরতন আর আমি একই সময়ে এই পৃথিবীতে এসেছিলাম। এখন রবির দেহখানি collapse করছে যদিও তাঁর মাথাটি পরিষ্কার ;নীলরতনের দেহ মোটামুটি অটুট আছে, কিন্তু তাঁর মাথাটি গুঁড়ো হয়েছে (স্বল্প কিছুদিন আগে স্যার নীলরতন সরকারের মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হয়) ;আর আমার কথা বলতে গেলে, আমার কখনো দেহই ছিল না, কিন্তু ক্ষুদ্র ব্রেনটি ঘোলা হয়ে যাচ্ছে।" শেষের কথাগুলি বলার সময় জ্যোতিপ্রকাশ আচার্যদেবের লঘু পরিহাসযুক্ত গলার স্বর ও উচ্চারণ অনুকরণ করায় উপস্থিত সকলের যখন হাস্যের উদ্রেক হয়েছে, তখনই সবাই শুনতে পেলেন সেই চিরপরিচিত উচ্চ শব্দের প্রাণখোলা হাসি!

অমনি ডাক্তার ছুটে গেলেন। তখন আচার্যদেব মৃদু ও স্পষ্ট স্বরে বললেন—"তুই কি জ্যোতি, জ্যোতিপ্রকাশ?"

জ্যোতিপ্রকাশ ছুটে গিয়ে বললেন,—"হ্যাঁ, এই যে আমি। আপনি কেমন আছেন, স্যার?"

উত্তর এল, "হুঁঃ। একই রকম, সেই আগেই বলেছি।" *

* এই অধ্যায় প্রধানত (Achrya Prafulla Chandra Roy, Birth Centenary Souvenir Volume, C.U.) ও রত্নমণি চট্টোপাধ্যায়ের 'আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের চিন্তাধারা' গ্রন্থ দুটির তথ্যাবলম্বনে রচিত।

চতুর্দশ অধ্যায়

বিবিধ প্রসঙ্গ

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সাধনা ও কর্মকান্ডের বহুল বিস্তৃতি সম্পর্কে আমরা বারবার উল্লেখ করেছি, এবং ইতিমধ্যে পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে আচার্যের জীবনবেদের প্রধান প্রধান দিক নিয়ে আলোচনা করেছি। কিন্তু আচার্যদেবের জীবনবেদের পরিপূর্ণ আলোচনা ও বিশ্লেষণ সীমিত পরিসরে সম্ভব নয়। কারণ, তা সম্পূর্ণ গবেষণাসাপেক্ষ, এবং উপযুক্ত অধিকারীর পক্ষেই সম্ভব। এতাবৎ আচার্যের জীবন ও কর্মকান্ডের ওপর কোন গবেষণা হয় নি বললেই চলে ;মাত্র একটি গবেষণা কর্মের কথা আমাদের গোচরে এসেছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, ওই গবেষণাকর্মটি আমাদের হস্তগত হয়নি ;খুব সম্ভব, এখনো অপ্রকাশিত আছে।* যাই হোক, এই অধ্যায়ে আমরা তিনটি বিষয়ে আলোচনায় নিবদ্ধ থাকব : i) আচার্যদেবের দৃষ্টিতে বংশগতি, ii) সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে তাঁর অভিমত, ও iii) মনস্বী ও খ্যাতনামা ব্যক্তিত্বের সহিত তাঁর সংস্পর্শ ও প্রভাব। পাঠকদের সবিনয়ে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, এই বিষয়গুলি 'বিবিধ প্রসঙ্গ' শিরোনামে আলোচিত হলেও তুচ্ছ নয়, বরং গুরুত্ব ও তাৎপর্যে খুবই ব্যঞ্জনাপূর্ণ।

আচর্যদেবের দৃষ্টিতে বংশগতি

একটি জনু থেকে পরবর্তী জনুগুলিতে জীবের বংশগত বৈশিষ্ট্যগুলির সঞ্চরণকে বংশগতি (heredity) বলা হয়। গ্রেগর যোহান মেন্ডেল (Gregor Johan Mendel) জিনতত্ত্বের জনক। কৃত্রিম ও সুনির্বাচিত সঙ্করায়ণের পদ্ধতি প্রয়োগ করে উদ্ভিদ ও প্রাণীদের মধ্যে নিহিত গুণাবলীর তারতম্য ঘটিয়ে উন্নত মানের ফসল ও গৃহপালিত প্রাণী সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। ল্যামার্কের প্রাণীদের জীবনকালে অর্জিত বৈশিষ্ট্যসমূহ বংশপরম্পরায় সঞ্চারিত হয় ভুল প্রমাণিত হয়ে ভাইসম্যানের জারমপ্লাজমবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। খোরনার জেনেটিক কোড এবং ওয়াটসন ও ক্রীকের ডি.এন.এ. (D.N.A.) অণুর দ্বিকুন্ডলী আবিষ্কার প্রাণবিজ্ঞানে বিস্ময়কর আবিষ্কার। ক্লোনিং আর এক বিস্ময় আবিষ্কার। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিস্ময়ের পর বিস্ময় সৃষ্টি করে চলেছে। কিন্তু মানুষ অতীব জটিল ও বিস্ময়কর জীব। মানুষের জীবনে বংশগতি বা বংশানুক্রমের ঐতিহ্য ও বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করা খুবই কঠিন। আচার্যদেব সেযুগের গবেষণার প্রেক্ষিতে বংশগতি বা বংশনুক্রমের ঐতিহ্য ও বৈশিষ্ট্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেন নি। তিনি বলেছেন, ".... গ্যাল্টন, কার্ল পিয়ার্সন প্রভৃতি বংশানুক্রমিক বিদ্যার

---

* আমরা দেবব্রত চক্রবর্তীর পি.এইচ.ডি. থিসিসের কথা বলছি।

ব্যাখ্যাতারা যেখানে বংশগত গুণের একটি দৃষ্টান্ত দেবেন, তৎস্থলে তাহার বিপরীত নয়টি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে।"[1]

তাঁর এই একটির স্থলে নয়টি দৃষ্টান্তের কিছু নমুনা প্রদান করা হলো। প্রথম দৃষ্টান্ত দরিদ্র কৃষকের মেষপালিকা কন্যা জোয়ান অফ আর্ক। দৈববাণী শুনে পরাধীন অর্লিন্সকে মুক্ত করার জন্য যে দুর্জয় সংগ্রাম তিনি করেছিলেন, তা তাঁর বংশগতির বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ছিল না। যিশু, মহম্মদ, কোপারনিকাস, গ্যালেলিও অথবা নিউটনের জীবনেও এমন কোন বংশনাক্রমিক গুণ ছিল না। সেক্সপীয়ারের পিতা-মাতা তো নিরক্ষর ছিলেন। তাঁরা কবিত্বের ধার ধারতেন না, অথচ তাঁদের পুত্র হলেন বাণীর বরপুত্র। বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ উইলিয়াম হার্শেলের মাতা লিখতে জানতেন না, বিদ্যাচর্চায় একান্ত বিমুখ ও নব্যভাবধারা তাঁকে বিন্দুমাত্র স্পর্শ করেনি। অথচ তাঁর পুত্র-কন্যাদের সকলেরই সঙ্গীতবিদ্যার প্রতি একান্ত অনুরাগ দেখা যায়। হার্শেলি অর্গান বাজিয়ে ও সঙ্গীত শিক্ষা দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন, আর রাত্রে গণিত ও আলোকবিদ্যা অধ্যয়ন করতেন, ইটালীয় ও গ্রীক ভাষার চর্চা করতেন। সঙ্গীত প্রতিভার পিছনে বংশানুক্রমিক গুণ থাকা চাই, একথা হ্যান্ডেলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কারণ, তাঁর পরিবারের কেউই সঙ্গীত জানত না। রামমোহন রায় জন্মেছিলেন গোঁড়া ব্রাহ্মণ পরিবারে। একেশ্বরবাদের ধারণা তাঁর কিশোর-মনেই দৃঢ়তা লাভ করে। সতীদাহের মত সামাজিক বিপ্লব সাধনের পিছনে বা প্রসারণশীল ভাবধারার বিকাশে তাঁর কোন পারিবারিক বা বংশানুক্রমিক বৈশিষ্ট্য ছিল না।

সহোদর বা যমজ ভাইয়ের মধ্যেও রুচি, প্রবৃত্তি ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ বিভিন্ন হতে দেখা যায়। যেমন, মিলটন ছিলেন ক্রমওয়েলের পৃষ্ঠপোষক, কিন্তু তাঁর কনিষ্ঠ ভাই ক্রিস্টোফার ছিলেন রাজতন্ত্রের সমর্থক। গাউসের পিতা ছিলেন কুলিমজুরদের ঠিকাদার, আর তাঁরই পুত্র হলেন 'গণিতজ্ঞদের রাজপুত্র'—বিস্ময়কর গাণিতিক প্রতিভার অধিকারী। শ্রীনিবাস রামানুজন, মেঘনাদ সাহা প্রমুখেরও নিজ নিজ ক্ষেত্রে স্বপ্রকাশিত হওয়ার পিছনে বংশানুক্রমের কোন ভূমিকা দেখা যায়না।

আচার্যদেব স্বয়ং তাঁর জীবনে বংশানুক্রমের কথা বলতে গিয়ে তাঁর ব্যবসায়িক বুদ্ধি র প্রসঙ্গটি উত্থাপন করেছেন। তিনি লিখেছেন,—"…. আমার বাল্যকলেই আমি যে ব্যবসাবুদ্ধি লাভ করিয়াছিলাম, তাহার কোন বংশানুক্রমিক ব্যাখ্যা করা যায়না।"[2] তা ছাড়া কৃষিকাজের প্রতি তাঁর প্রবল আগ্রহ দেখা যায়। কোদাল চালিয়ে জমি তৈরী করে ফসল উৎপাদন করা তাঁর বাল্যকালে দেখা যায়। এমন কি, বিলেত থেকে ফিরে বেকারত্বের সময়ে আচার্য জগদীশচন্দ্রের বাগানে কাপড় গুটিয়ে কোদাল চালাতেও তাঁকে দেখা যায়। ব্যবসা-বাণিজ্যে ও শিল্প স্থাপনের প্রতি যে একান্ত আগ্রহ প্রফুল্লচন্দ্রের জীবনে দেখা যায়, তাতে বংশানুক্রমিকতার বৈশিষ্ট্য নগণ্য পরিমাণও দেখা যায়না।

আচার্যদেব বংশগতি তত্ত্বে আস্থা স্থাপন না করলেও অন্তঃপ্রাদেশিক বিবাহের সমর্থক ছিলেন। এইখানে প্রফুল্লচন্দ্র স্ববিরোধী মনোভাব পোষণ করেছেন যেমন,—"যদি বাঙালী ও মাড়োয়ারীর মধ্যে বিবাহপ্রথা থাকিত তবে উভয়ের মিশ্রণের ফলে

1. *আত্মচরিত,* পৃ—৪১২

শ্রেণীর লোক হইত, যাহাদের মধ্যে উভয়জাতির গুণই বর্তমান থাকিত। একজন বিড়লা যদি কোন মুখোপাধ্যায়ের কন্যাকে বিবাহ করিত, তাহা হইলে তাহাদের সন্তানেরা একের ব্যবসা-বুদ্ধি এবং অন্যের তীক্ষ্ণ মস্তিষ্ক লাভকরিত। গোয়েঙ্কার কন্যার সঙ্গে বসুর ছেলের বিবাহ হইলে তাহাদের সন্তানের মধ্যে উভয় জাতির গুণই থাকিত।"[3] আচার্যদেবের এই অভিমত স্ববিরোধী মনে হলেও মনে হয় তিনি বিভিন্ন রক্তের সংমিশ্রণ ও পারিপার্শ্বিক-পরিবেশগত প্রভাবের কথাই বলেছেন।'Nature and Nurture'-এর বিরোধ এখনো বর্তমান।

সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র কখনো প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতির সহিত যুক্ত ছিলেন না, তাঁর স্বভাব ও প্রকৃতি রাজনীতি করার অনুকূলও ছিল না। কিন্তু তিনি ছিলেন রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের ছাত্র, তাঁর বক্তৃতাও শুনেছিলেন ;আর মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশন জাতীয় প্রতিষ্ঠান ছিল বলে তিনি ওই কলেজে ভর্তিও হয়েছিলেন। বস্তুতপক্ষে, ছাত্রাবস্থা থেকেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নগ্নতা তাঁর অপরিচিত ছিলনা। তাই এডিনবার্গে অধ্যয়ন করার সময় সুযোগ এলে তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও অপশাসনের বিরুদ্ধে সুস্পষ্টভাবে তাঁর অভিমত জ্ঞাপন করতে দ্বিধাবোধ করেন নি তাঁর *India before and after the Mutiny* পুস্তিকায়। সেজন্যই খুব সম্ভব, তিনি IES পদ পেলেন না, আর 'বৈজ্ঞানিকের বেশে বিপ্লবী' হওয়ার সুবাধে FRS-ও হলেন না। কংগ্রেস সদস্য না হয়েও তিনি বহু সম্মেলনে যোগদান করেছেন, ব্রিটিশ কুশাসন ও দমন নীতির তীব্র সমালোচনা করে বক্তৃতা প্রদান করেছেন, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের পাশে দাঁড়িয়ে রাওলাট আইনের বিরুদ্ধে অভিমত জ্ঞাপন করেছেন ;মহম্মদ আলপীর স্বল্পক্ষণের অনুপস্থিতিতে সভাপতিত্বও করেছেন। দেশের মুক্তি আন্দোলনে তাঁর সংযোগ পরোক্ষ হলেও তাৎপর্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

দেশের মুক্তি আন্দোলনকে চূর্ণ করার জন্য ইংরেজদের সাম্রাজ্যবাদী দমন ও পীড়ন নীতির তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন দেশের অন্যান্য পুরোধা নেতৃবর্গের সঙ্গে। হিজলি বন্দী শিবের নৃশংস গুলি চালনা ও হত্যার প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ মনুমেন্টের পাদদেশে যে ঐতিহাসিক ভাষণ পাঠ করেন, সেই প্রতিবাদ সভায় প্রফুল্লচন্দ্র উপস্থিত ছিলেন। তারপর সভা শেষে নীলরতন সরকার যে সব প্রস্তাব পেশ করেন তা কার্যকর করার জন্য যে কমিটি গঠিত হয় তার অন্যতম সদস্য ছিলেন প্রফুল্লচন্দ্র রায়।

আন্দামান বন্দীদের দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য কলকাতার প্রবল আন্দালন হয় 1933 সালে। তার আগে রবীন্দ্রনাথ ও প্রফুল্লচন্দ্রের আবেদনে সাড়া দিয়ে আন্দামান বন্দীরা বিভিন্ন দাবীতে অনশন স্থগিত রাখেন। কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি অনড় ও অটল হয়ে বন্দী আন্দামানে পাঠাতে থাকে। এই পরিস্থিতিতে রবীন্দ্রনাথ ও প্রফুল্লচন্দ্র ইউনাইটেড প্রেসের মাধ্যমে এক বিবৃতি প্রচার করেন। তার মধ্যে চারটি দাবী উত্থাপিত হয়ঃ— i) অনশনকারী তিনজন বন্দীর মৃত্যুর তদন্ত করতে হবে, ii) আন্দামান বন্দীদের সব দাবী ও অভাব-অভিযোগ

2. *আত্মচরিত*, পৃ ৪১৩
3. *তদেব*, পৃ ৪০২-৩

মেনে নিতে হবে, iii) নতুন করে আন্দামানে বন্দী পাঠানো বন্ধ করতে হবে, এবং iv) সব আন্দামান বন্দীদের দেশে ফিরিয়ে আনতে হবে ও ভবিষ্যতে কোন বন্দীকে আন্দামানে পাঠানো যাবে না।

বন্দীমুক্তি ও আন্দামান বন্দীদের ফিরিয়ে আনার কাজটি সহজে হয়নি। প্রবল আন্দোলন ও চাপের ফলে বাংলা সরকার বন্দীমুক্তি ও আন্দামান বন্দীদের ফিরিয়ে আনায় সম্মত হলে মুক্ত বন্দীদের নিয়ে আরো জটিল সমস্যা দেখা যায়। এর ফলে 'ডেটিনিউ কমিটি' গঠিত হয়। এ ক্ষেত্রেও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। দেশবাসীর উদ্দেশ্যে আবেদন জানিয়ে সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানানো হয়। এই আবেদনে রবীন্দ্রনাথ, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সহিত প্রফুল্লচন্দ্রেরও নাম ছিল।

'বঙ্গীয় ব্যক্তিস্বাধীনতা সঙঘ' প্রতিষ্ঠিত হয় 1936 সালে। ব্যক্তিস্বাধীনতার ওপর ব্রিটিশ সরকারের প্রচন্ড আক্রমণের ফলে এই প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। এই সময় আচার্যদেব সক্রিয়ভাবে এই সঙেঘর আবেদন পত্রে দেশবাসীর নিকট মুক্তহস্তে অর্থ সাহায্যের আবেদন করেন।

আচার্যদেব ছিলেন পরিপূর্ণ বৈজ্ঞানিক মানসিকতার অধিকারী। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ছিল স্বচ্ছ ও সুদূরপ্রসারী। তাই খিলাফৎ আন্দোলনের কুফল উপলব্ধি করতে তাঁর বিলম্ব হয়নি। এ নিয়ে গান্ধীজীর সহিত তাঁর মত বিরোধ হয় ;আবার সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারাকে তিনি তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন, এবং কংগ্রেসের সমালোচনা করতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হননি আচার্যদেব। এ-বিষয়ে তাঁর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য ঃ "তথাকথিত সাম্প্রদায়িক ভাগবাটোয়ারা সম্পর্কিত ব্রিটিশ গভার্ণমেন্টের সিদ্ধান্ত ভারতভূমিকে চিরকালের জন্য সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে বিবাদমান শিবিরে বিভক্ত করার উদ্দেশ্যেই পরিকল্পিত হইয়াছে। কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি এই বিষয়ে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে তাহাতে 1931 সালে কংগ্রেস কর্তৃক নির্দেশিত নীতির সুস্পষ্টভাবে ব্যত্যয় ঘটিয়াছে এবং সুবিধাবাদমূলক অদূরদর্শিতার নীতির নিকট পরাজয় স্বীকার করা ব্যতীত অন্যকিছু বলা চলে না।" এই সাবধান বাণী 1947 সালের কত আগে, অথচ নেহেরু প্রমুখ তাতে কর্ণপাত না করে খণ্ডিত ভারত নিয়ে মুকুটহীন রাজা হওয়ার স্বপ্নে মশগুল হলেন।

আচার্যদেব রাজনীতিক নন, কংগ্রেসের সদস্য নন, অথচ দেশের মুক্তি আন্দোলনে ছিলেন পুরোধা পুরুষ, সাম্রাজ্যবাদের কঠিন ও কঠোর প্রতিবাদী।

ঔপনিবেশিকতাবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের যিনি ঘোরতর বিরোধী, তীব্র সমালোচকতিনি যে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে, তাতে সন্দেহ নেই। স্পেনে ফ্যাসিস্ট শক্তির উত্থান ও ফ্যাসিবাদের উন্মত্ত আচরণের বিরুদ্ধে 1936 সালে বেলজিয়ামের ব্রাসেল্‌সে বিশ্বশান্তি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ওই সম্মেলনের উদ্দেশ্য ও বক্তব্যকে সমর্থন জানিয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রফুল্লচন্দ্রও ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানান। বিশ্ববিশ্রুত রঁমা রঁলা ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে বিশ্বজনমত গঠন ও সাহায্যের আবেদন করেন। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে ভারতে *League Against Fascism and War* কমিটি গঠিত হয়। ভারতবর্ষ থেকে রবীন্দ্রনাথ, প্রফুল্লচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, প্রমথ চৌধুরী প্রমুখের স্বাক্ষরিত একটি ইস্তেহার পাঠানো

হয়। ওই ইস্তেহারের উপসংহারে বলা হয় (প্রবাসী, আশ্বিন, পৃঃ ৯৪০)ঃ

"…. আমরা অন্যান্য দেশবাসীর সহিত সমস্বরে বলিতেছি, আমরা যুদ্ধ কে ঘৃণা করি এবং তাহা বর্জন করিতে চাই ;যুদ্ধে আমাদের কোন স্বার্থ নাই। কোনও সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে ভারতবর্ষের যোগদানের আমরা ঘোরতর বিরোধী। কারণ ইহা জানি, ভবিষ্যৎ যুদ্ধ সভ্যতা ধ্বংস করিবে। সোভিয়েট রাষ্ট্রমন্ডল বা নাৎসী জার্মানী, যেখানেই সংস্কৃতি বিপন্ন হইবে, তথায় উহা রক্ষার জন্য আমরা উদ্গ্রীব এবং আমাদের মহৎ উত্তরাধিকার রক্ষার জন্য আমরা যথাশক্তি চেষ্টা করিব।"

আচার্যদেব প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠেন যখন মানবজাতির কলঙ্ক হিটলারের নেতৃত্বে জার্মানীর ফ্যাসিস্ট বাহিনী পোল্যান্ড আক্রমণ করে। তিনি ফ্যাসিস্ট দের অশুভ অভ্যুদয়ে শঙ্কিত হয়ে ওঠেন।

1941 সালে নাৎসী বাহিনী সোভিয়েট রাশিয়া আক্রমণ করে। সারা বিশ্বজুড়ে ঘৃণা ও ধিক্কার ওঠে এই নগ্ন আক্রমণে। 1941 সালের 21শে জুলাই কলকাতার টাউন হলে 'Soviet Achivements--Indian Intellectuals' Manifesto'-য় যে বিবৃতি প্রচারিত হয়, তা উদ্ধারযোগ্য ঃ

"In a little over twenty years and in face of the most stupendous odds, the common people of the Soviet Union have created what we believe is a new civilisation. And even we in India, born down by generation of inanity, degradation, cannot remain undistrubed when that civilisation is in peril. Helpless and unfree we can at least send our good wishes to the Soviets and wait anxiously for the day when they will come out victorious over forces arrayed against them."[4]

আচার্যদেব সর্বক্ষেত্রে ও সর্বত্র সাম্রাজ্যবাদ , ফ্যাসিজম-নাৎসীজমের তীব্র নিন্দা ও সমালোচনা করেছেন এবং অশুভ শক্তির ধ্বংস কামনা করেছেন। বর্তমানে দেশে যেভাবে আঞ্চলিকবাদ, বিচ্ছিন্নতাবাদ ও সন্ত্রাসবাদ মাথা চাড়া দিয়ে দেশের ঐক্য ও অখন্ডতা, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে বিপন্ন করে তুলেছে, সেই দুর্দিন ও দুঃসময়ে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বড়ই প্রাসঙ্গিক।

মনস্বী ব্যক্তিত্বদের সহিত সংস্পর্শ ও প্রভাব

প্রফুল্লচন্দ্রের জন্ম 1861 সালের 2রা আগষ্ট, আর মৃত্যু 1944 সালের 16ই জুন। এই দীর্ঘজীবনে তিনি বহু মানুষের সংস্পর্শে এসেছিলেন ঃ কেউ রাজনীতিবিদ, কেউ শিক্ষাবিদ, কেউবা বৈজ্ঞানিক বা কবি ও সাহিত্যিক। মনস্বী ও বুদ্ধিজীবীদের সহিত তাঁর সংস্পর্শ ও সম্পর্কও কম ছিল না। এ-সবের বিস্তারিত বর্ণনা সম্ভব না হইলেও আমরা আচার্যজীবনীর শেষে মাত্র নির্বাচিত কয়েক জনের উল্লেখ করব।

ছাত্রাবস্থাতেই রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত প্রফুল্লচন্দ্রের পরিচয় হয়। তখন ছাত্রমহলে সুরেন্দ্রনাথ 'দেবতা' বলে পূজিত হতেন। সুরেন্দ্রনাথ মেট্রোপলিটন

4. উদ্ধৃতিটি নেপাল মজুমদারের 'আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়', 'পশ্চিমবঙ্গ', পৃ- ৯৯ থেকে গৃহীত।

ইনস্টিটিউশন অর্থাৎ বর্তমান বিদ্যাসাগর কলেজে ইংরাজী গদ্যসাহিত্য পড়াতেন। প্রফুল্লচন্দ্র প্রয়াশ তাঁর বক্তৃতা শুনতেন। অসাধারণ বাগ্মী ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ। একাদিক্রমে তিন ঘন্টা কোন 'নোটস' না দেখেই জ্বালাময়ী ভাষায় অনর্গল বক্তৃতা করার ক্ষমতা ছিল সুরেন্দ্রনাথের, কিন্তু তাঁর কিছু মুদ্রাদোষ ছিল। অন্যদিকে লালমোহন ঘোষের বক্তৃতা ছিল খুবই উচ্চাঙ্গের, তাঁর কোন মুদ্রাদোষ ছিল না। 1883 সালে প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর বক্তৃতা শোনেন। ভারতের প্রথম র‍্যাংলার আনন্দমোহন বসুর সহিতও প্রফুল্লচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। সুরেন্দ্রনাথ ও আনন্দমোহনকে তিনি গুরুর মত শ্রদ্ধা করতেন। 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গীয় সমাজ'-এর লেখক প্রখ্যাত শিবনাথ শাস্ত্রীর সঙ্গে তাঁর গভীর পরিচয় ছিল।

ডাঃ নীলরতন সরকার তো প্রফুল্লচন্দ্রে র বন্ধু ছিলেন ;আর রাধাগোবিন্দ কর প্রফুল্লচন্দ্রের ঔষধ ব্যবসায়ে প্রভূত সাহায্য করেন এবং আয়ুর্বেদিক ঔষধের প্রেসক্রিপশন লিখে দেশী ঔষধ প্রচলনে আগ্রহ দেখান। চিকিৎসাবিজ্ঞান ও সমাজসেবায় তাঁদের অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ কলকাতার দুটি মেডিক্যাল কলেজের নাম তাঁদের আত্মত্যাগের কীর্তি বহন করে চলেছে।

স্যার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী আচার্যদেবের সহপাঠী ছিলেন। দেবপ্রসাদ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হয়েছিলেন। ভূপেন্দ্রনাথ বসুও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদ অলঙ্কৃত করেন। কবি বায়রনের অনুকরণে একবার গোখেলেকে লিখেন,—"রাজনীতি ভূপেনের জীবনের একাংশ মাত্র, কিন্তু গোখেলের জীবনের সর্বস্ব।"[5] এখানে উল্লেখ করা যায় যে, বসু ও সর্বাধিকারী পরিবার রামমোহনের জন্মস্থান রাধানগর সংলগ্ন। প্রখ্যাত তান্ত্রিক আগমবাগীশদের অবস্থানও এখানে।

রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশচন্দ্রের সহিত আচার্যের বন্ধুত্বের বিবরণ আমরা এই গ্রন্থের নানা স্থানেই দিয়েছি। প্রফুল্লচন্দ্র কবির কাব্য-কবিতা ইত্যাদির ভক্ত ছিলেন, এবং 'আত্মজীবনী' ও অন্যান্য বহু লেখায় তা উদ্ধৃত করেছেন। তা ছাড়া উভয়ে সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে একই মঞ্চে দাঁড়িয়ে আন্দোলন ও প্রতিবাদও করে গেছেন।

আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের সহিত তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। আচার্যের অনুরোধে আচার্য শীল *History of Hindu Chemistry*-র একটি অধ্যায় রচনা করেন। দুই মনীষীর মধ্যে ঠাট্টা তামাসার সম্পর্কও বিদ্যমান ছিল। ব্রজেন্দ্রনাথ মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য পদে থাকা কালীন একটি চিঠিতে লেখেন,—'My dear Charakarshi*–

* Double Entendre

Charaka + Rishi, and Charkā+ Rishi

অন্য একটি পত্রে ব্রজেন্দ্রনাথ লেখেন,—"You are not only a Rishi of the test tube, and of Charka;– but like Charka (চরক, প্রাচীন ভারতের বিখ্যাত চিকিৎসাশাস্ত্রবিৎ) himself you are also a man of letters." আচার্যদেবও তাঁর 'আত্মচরিত'-এ আচার্য শীলের গভীর জ্ঞান ও বিদ্যার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।

সি.ভি.রমন, গনেশ প্রসাদ, সুরেন্দ্রনাথ সেন, রাধাকৃষ্ণণ, হীরালাল হালদার, যদুনাথ

5. *আত্মচরিত*, পৃ- ৯৬

সরকার প্রমুখের সহিত তাঁর পরিচিতি ছিল। আর সুভাষচন্দ্র তো উত্তর বঙ্গের বন্যাত্রাণে তাঁর ডানহাত ছিলেন বললেই চলে। শিক্ষাবিদ স্যার আশুতোষের সহিত সম্পর্কের আলোচনা ইতিপূর্বেই করেছি।

গোপালকৃষ্ণ গোখলে ও মহাত্মা গান্ধীর সহিত আচার্যের সম্পর্কের বিবরণ তাঁর 'আত্মচরিত'-এ দেখা যায় (পৃঃ ৯৫-৯৯)। গোখলে আচার্যদেবের থেকে বয়সে ছোট ছিলেন, কিন্তু উভয়ের মধ্যে মধুর প্রীতির সম্পর্ক গড়ে ওঠে। গোখলে আচার্যদেবকে 'বৈজ্ঞানিক সন্ন্যাসী' বলে আনন্দ অনুভব করতেন, আর বাঙালী জাতি সম্বন্ধে তাঁর বিখ্যাত উক্তি বিশেষভাবে স্মরণীয়—"What Bengal thinks today, India will think tomorrow." আচার্যদেব গোখলের পাণ্ডিত্য ও সংখ্যাভিত্তিক অনাড়ম্বর বক্তৃতার প্রশংসা করেছেন। গোখলের পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার প্রতি ছিল আচার্যদেবের অশেষ শ্রদ্ধা। আর ছিল গোখলের উত্তরাধিকারী শ্রীনিবাস শাস্ত্রীর সহিত পরিচয়। এই দুই বিদ্বান ও পণ্ডিত ব্যক্তি সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন,—"এই দুইজন বিখ্যাত রাজনীতিক— যাঁহারা স্বদেশে ও বিদেশে সর্বত্র শ্রদ্ধা ও সম্মান লাভ করিয়াছেন—তাঁদের জীবনের প্রথম ভাগে আমারই মত বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন—একথা ভাবিতে আমার আনন্দ হয়।"[৪]

আর যে মানুষটির প্রতি আচার্যদেব আকৃষ্ট হয়েছিলেন, তিনি আর কেউ নন— মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। 'আত্মচরিত'-এ তাঁর গান্ধীজীর প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার কারণ সম্বন্ধে লিখেছেন,— "আমাদের দুইজনের প্রকৃতির মধ্যে একটি বিষয়ে সাদৃশ্য ছিল— ত্যাগ ও তিতিক্ষার প্রতি নিষ্ঠা।" গান্ধীজী তাঁর আত্মজীবনীতে আচার্যদেব সম্বন্ধে অনেক কথাই লিখেছেন, কিন্তু একটি বিষয়ের অনুল্লেখ থেকে গেছে। তা হলো দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের দুঃখ-দুর্দশা দেশবাসীর সমক্ষে তুলে ধরার জন্য কলকাতার অ্যালবার্ট হলে গান্ধীজীর বক্তৃতা। এই বক্তৃতা আচার্যদেবের আগ্রহ ও উদ্যোগেই অনুষ্ঠিত হয়। বস্তুতপক্ষে, গান্ধীজীকে সর্বপ্রথম জনসমক্ষে আনার কৃতিত্ব প্রফুল্লচন্দ্রের। আচার্যদেবের প্রতি গান্ধীজীরও শ্রদ্ধার অন্ত ছিল না। যারবেদা সেন্ট্রাল জেল থেকেগান্ধীজী লেখেন,—"এটা বিশ্বাস করা কঠিন ছিল যে সাধারণ ভারতীয় পোষাক পরিহিত একজন মানুষ, যাঁর আচার-ব্যবহার আরও সাধারণ, আসলে এক বড় মাপের বিজ্ঞানী এবং অধ্যাপক হিসাবে ইতিমধ্যেই স্বীকৃত। আমি রুদ্ধ নিঃশ্বাসে শুনলাম যে, আচার্য রায় তাঁর রজোচিত বেতন থেকে সামান্য কিছু টাকা নিজের জন্য রেখে বাকি সবটাই জনহিতকর কাজে বিশেষ করে দরিদ্র ছাত্রদের সাহায্যদানে নিয়োজিত করতেন। .... বিরামবিহীন সেবা, উদ্দীপনা এবং আশাবাদের যে দৃষ্টান্ত তিনি আমাদের সামনে রেখেছেন তা নিয়ে অবশ্যই আমরা গর্ব করতে পারি।" গান্ধীজী যদি অর্ধনগ্ন ফকির হন, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র তাহলে নেংটিসার দধীচি। তাঁর অস্থিনির্মিত বজ্রে কি বাঙালীর চৈতন্যোদয় হবে না?

ব্রহ্মবান্ধব কেশবচন্দ্র সেনকে তিনি ভাবুক ও ঋষি বলতেন। তাঁর অসাধারণ হৃদয়স্পর্শী বক্তৃতার প্রভাব আচার্যের জীবনে কম নয়। আমাদের সন্দেহ হয়, কেশবচন্দ্রের বক্তৃতার প্রভাবেই তিনি ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করে থাকবেন, যদিও তাঁর জীবনে ব্রাহ্ম শিক্ষকদের ভূমিকা

৪. *তদেব*, পৃ- ৯৭

নগণ্য নয়। আর এক সূর্যকরোজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের প্রভাব আচার্যের জীবনে দেখা যায়। ইনি হলেন স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁর 'আত্মচরিত' ও বহু লেখায় বিবেকানন্দের অভিমতের উল্লেখ দেখা যায়,— বিশেষত জাতপাত ও অস্পৃশ্যতার প্রশ্নে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ বিবেকানন্দ অনুসারী। এখানে একটি ঘটনার উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক হবে ঃ

একবার রতনমণি চট্টোপাধ্যায়কে আচার্যদেব বললেন,—'ওহে এক কাজ করতে পারবে? কঠিন কাজ কিন্তু।"

উৎসুক হয়ে উত্তর করলুম, "কি বলুন।"

তিনি বললেন, "আমাদের খুলনা অঞ্চলে—আমরা বলি খুলনে—নমঃশূদ্ররা নাপিত পায় না। হিন্দু নাপিত মুসলমান, খ্রীষ্টানকে কামাবে, কিন্তু হিন্দু নমঃশূদ্রকে কামাবে না। .... অনেক দুঃখে বিবেকানন্দ বলেছিলেন—আমাদের ধর্ম এখন ভাতের হাঁড়িতে। সমস্ত জাতটা 'ছুয়ো না ছুয়ো না' করতে করতে মরতে চলেছে। তুমি তো বামুন। এখন নাপিত হয়ে খুলনা জেলার নমঃশূদ্র গ্রামে বসতে পারবে? এ কাজ বামুনদেরই হাতে নিতে হবে।"[7] ধর্মচর্চা, জাতপাত ও অস্পৃশ্যতার প্রশ্নে আচার্যদেবের জীবনে বিবেকানন্দের প্রভাব অস্বীকার করার হেতু নেই।

স্বদেশী বিদ্বান ও মনস্বীদের ন্যায় তিনি বহু বিদেশী মনস্বীদেরও সংস্পর্শে আসেন। সর্বপ্রথমে যাঁর নাম উল্লেখযোগ্য তিনি হলেন বিখ্যাত ফরাসী বৈজ্ঞানিক ও বিদ্বান বার্তেলো। তাঁর প্রভাবেই অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি *History of Hindu Chemistry* রচনা করেন। বিখ্যাত ফরাসী বিদ্বান ও মনস্বী সিলভ্যাঁ লেভীর সংস্পর্শেও আসেন প্রফুল্লচন্দ্র। তা ছাড়া তাঁর বিদেশ ভ্রমণের সময় বহু বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানীর সহিত তাঁর পরিচয় নিবিড় হয়। এঁদের মধ্যে আছেন ময়শাঁ, ভ্যান্ট হফ, রামজে প্রমুখ। অধ্যাপক ক্রাম ব্রাউনের প্রভাবও আচার্যের জীবনে কম নয়।

এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন'শ বছর পূর্তিতে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। আচার্যদেব ওই সভায় উপস্থিত হয়ে বহু বিশ্ববরেণ্যদের সংস্পর্শে আসেন। ওই সভায় যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে সুয়েজ খাল খনন করে যিনি বিখ্যাত হয়েছিলেন সেই ইঞ্জিনিয়ার ফার্ডিন্যান্ড লেসপ্‌স, জীবাণুতত্ত্বের আবিষ্কারক লুই পাস্তুর, বিখ্যাত গণিতজ্ঞ ও পদার্থবিদ হেরম্যান ফন হেল্‌মহোল্‌জ, বিখ্যাত মার্কিন কবি জেমস রাসেল লাওয়েল, কবি রবার্ট ব্রাউনিং, সুপ্রসিদ্ধ সাফী প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

আচার্যদেবের নবযুগের প্রবর্তক রামমোহনের সংস্পর্শে আসার সুযোগ ছিল না। কারণ, তাঁর জন্মের পূর্বেই রামমোহনের মৃত্যু হয়। কিন্তু রামমোহন আচার্যদেবের চিন্তা-ভাবনায় বহু প্রভাব বিস্তার করেছেন। অপর দিকে আচার্যদেব বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে এসেছিলেন কি না বলা সম্ভব না হলেও বিদ্যাসাগরের প্রভাব আচার্যের জীবনে দেখা যায়। আচার্যদেব তাঁর পিতার ন্যায় বিধবা বিবাহ ও স্ত্রীশিক্ষার প্রবল সমর্থক ছিলেন। আমাদের মনে হয়, আচার্যদেবের সমাজসেবা ও জনসেবার ব্রতের মূল রামমোহন, বিদ্যাসাগর ও বিবেকানন্দ-এর কর্মধারার মধ্যে নিহিত। রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর প্রভাব আচার্যের জীবনে

7. *আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের চিন্তাধারা,* পৃ- ১৭৮

বিরল নয়। আবার, কার্নেগী, বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন, কার্লাইল, এমার্সন প্রমুখের প্রভাবও তাঁর জীবনে দেখা যায়। কিন্তু কোন মনস্বী ও মহাত্মাকেই তিনি অন্ধভাবে অনুসরণ ও অনুকরণ করেন নি। সব উপনদীর মত একটি ধারায় মিলিত হয়ে নিজস্ব ধারার অবলুপ্তি ঘটিয়েছে, এবং আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র-ধারা নিজ খাতে প্রবাহিত হয়ে অববাহিকা অঞ্চলকে উর্বরা করে তুলেছে।

বর্তমানে 'আচার্য' শব্দটি অপাত্রে ব্যবহৃত হয়ে তার সম্মান ও মর্যাদা হারাতে বসেছে। তাই, এখন 'আচার্য অমুক', 'আচার্য তুমুক' বললে শ্রদ্ধা ও মর্যাদা উদ্রেক করেনা। বস্তুতপক্ষে, অনেকেই আচর্য, কিন্তু কেউ কেউ 'আচার্য'। এই বিরল ও দুর্লভ আচার্যপদের অধিকারী হলেন প্রফুল্লচন্দ্র। তিনি হলেন 'আচার্যঃ পূর্বরূপম্'—আচার্য পূর্ব রূপ বা পূর্ববর্ণ।[8] তিনি হলেন 'বিদ্যা সন্ধিঃ—সংযোগ স্থান বিদ্যা। তিনি হলেন 'প্রবচন সন্ধানম্'—প্রবচন বা জ্ঞানের সংযোগের কারণ। প্রাচীন ভারতের কুলপতির ন্যায় তিনিই উচ্চারণ করতে পারেন—**সহ নৌ যশঃ। সহ নৌ ব্রহ্মবর্চসম্।।**

আমাদের উভয়ের যশ সমান হোক। আমরা উভয়েই ব্রহ্ম অর্থাৎ সত্যে দীপ্তমান হয়ে উঠি।

---

৪. তৈত্তরীয় উপনিষদ, 3/5

পরিশিষ্ট—১

ময়দান ক্লাব

সমগ্র জীবনব্যাপী অজীর্ণতা ও নিদ্রাহীনতার শিকার হয়েছিলেন প্রফুল্লচন্দ্র। কিন্তু স্বল্পাহার ও চরম শৃঙ্খলাপরায়ণতার জন্য ক্ষীণ তণুটি নিয়ে তিনি দীর্ঘ জীবন অতিক্রম করেছিলেন (1861–1944)। ভাবতেও অবাক লাগে, রবীন্দ্রনাথের চেয়েও তিনি দীর্ঘ জীবন পেয়েছিলেন।

1874 সাল থেকেই প্রফুল্লচন্দ্রের স্বাস্থ্য ভঙ্গ শুরু হয়, এবং অনিদ্রাজনিত রোগ ক্রমশ আক্রমণ করতে থাকে। প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপনা শুরু করার পর 1891 সালে আবার এই পুরোনো রোগের আবির্ভাব দেখা দেয়। দেওঘরে পুজোর ছুটি কাটিয়ে এই রোগের কিছুটা উপশম হয়। অতিরিক্ত মস্তিষ্ক চালনা ও শারীরিক শ্রম না করার জন্য কেশব সেন, বিবেকানন্দ প্রমুখ বহুমূত্র রোগের শিকার হয়ে অকালে পরলোক গমন করেন ; আবার কার্লাইল,স্পেন্সার প্রমুখ অনিদ্রা রোগের শিকার হয়েও দীর্ঘজীবন লাভ করেন। প্রফুল্লচন্দ্র অজীর্ণতা ও অনিদ্রার হাত থেকে পরিত্রাণের উপায় সন্ধানে প্রতি সন্ধ্যায় গড়ের মাঠে যাওয়ার নির্দিষ্ট রুটিন করে ফেলেন। সেক্সপীয়ার অনুরাগী প্রফুল্লচন্দ্র ইন (inn) ও ট্যাভার্নের বিষয় অপরিজ্ঞাত ছিলেন না। বস্তুতপক্ষে, তাঁর 'ময়দান ক্লাব' এলিজাবেথীয় যুগের ট্যাভার্ন-এর অনুরূপ ছিল, কেবল গরম বা ঠান্ডা কোনরূপ পানীয়ের ব্যবস্থা ছিলনা সেখানে।



ময়দান ক্লাবের সাজে

অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তিত্ব ছিলেন এই ক্লাবের সদস্যঃ বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যক্ষ

গিরিশচন্দ্র বসু, অধ্যক্ষ দেবপ্রসাদ ঘোষ, ডাঃ প্রাণকৃষ্ণ আচার্য, সত্যানন্দ বসু প্রমুখ। প্রথমে জোর কদমে আধ ঘন্টা ধরে হাঁটা কার্য চলত, তারপর রবার্টসের মূর্তির নীচে বসে আলোচনা ; সামাজিক, রাজনৈতিক নানা বিষয়ে আলোচনা। কখনো কখনো ছাত্রদেরও ধরে নিয়ে যেতেন প্রফুল্লচন্দ্র। কলকাতায় এলে গান্ধীজীও ময়দান ক্লাবে যোগ দিতেন, এবং প্রায়ই এই ক্লাবের খোঁজ নিতেন। 1935 সালে ওয়ার্ধায় গান্ধীজীর সহিত প্রফুল্লচন্দ্রের সাক্ষাৎ হলে তিনি বলে উঠলেন, 'but what about your maidan claub ? That has bees a source of inspiration always.'

আচার্যদেবের বিলাসিতা বলতে ছিল একটি ভাড়া করা ঘোড়ার গাড়ী। এই গাড়ীটি ছিল তাঁর মেডিক্যাল বিল। তিনি বলতেন, এই গাড়ীতে করে গড়ের মাঠের হওয়া না খেলে তাঁকে ওষুধ খেতে হয়।

পরিতাপের বিষয়, ময়দানে ক্লাবে আলোচিত বিভিন্ন বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ কেউ লিপিবদ্ধ করেননি। টুকরো টুকরো এই আলোচনার বিবরণ লিখিত হলে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের বিবিধ বিষয়ের লেখার উৎস জানা যেত বলে আমাদের বিশ্বাস। 'ছোট যে হায় অনেক সময় বড়র দাবী দাবিয়ে চলে।'

পরিশিষ্ট—২

জীবনের সংক্ষিপ্ত ঘটনা ও রচনাপঞ্জী

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার সংক্ষিপ্তকরণ ঃ

ACP : *Annales de chim physique (France)*

JASB : *Journal of the Asiatic Society of Bengal*

JCS : *Journal of the Chemical Society (London)*

JICS : *Journal of the Indian Chemical Society*

Nat : *Nature (UK)*

PCS : *Proceedings of the Chemical Society (London)*

Z.anorg.allgem Chem : *Zeitschrift fiir anorganische allgemine Chemie (Germany)*

1861 ঃ জন্ম 2রা আগস্ট যশোহর জেলার রাড়ুলি-কাটিপাড়া গ্রামে। পিতা—হরিশ্চন্দ্র, মাতা— ভুবনমোহিনী।

1866-70 ঃ গ্রামের স্কুলে পড়াশোনা। অতঃপর কলকাতায় আগমন।

1871 ঃ হেয়ার স্কুলে ভর্তি।

1872 ঃ চতুর্থ শ্রেণী অর্থাৎ সপ্তম শ্রেণীতে পড়ার সময় রক্তমাশায় আক্রান্ত হওয়ায় পড়াশোনায় ছেদ।

1874 ঃ অ্যালবার্ট স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি। হেয়ার স্কুলে ভর্তি হওয়ার মানসে স্বেচ্ছায় পড়াশোনায় ছেদ।

1876 ঃ শিক্ষকদের আগ্রহে অ্যালবার্ট স্কুলেই পড়াশোনা।

1879 ঃ প্রথম বিভাগে এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশনে ভর্তি।

1881 ঃ এফ.এ. পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ। বি.এ.-তে 'B' কোর্স নিয়ে পড়াশোনা। প্রধান বিষয় রসায়ন।

1882 ঃ গোপনে গিলক্রাইস্ট বৃত্তি লাভের জন্য প্রস্তুতি ও ওই বৃত্তি লাভ। উচ্চতর পড়াশোনার জন্য ইংল্যান্ড গমন।

1883-84 ঃ এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন।

1885 ঃ বি.এস.সি. ডিগ্রী লাভ। *India before and after the Mutiny* রচনা।

1886 ঃ *Essays on India* রচনা।

1887 ঃ ডি.এস.সি. উপাধি লাভ। হোপ পাইজ লাভ। এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যায়ের কেমিক্যাল সোসাইটির সহসভাপতি।

1888 ঃ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন ; বন্ধু ডাঃ অমূল্যচরণ বসুর গৃহে আতিথ্যলাভ।

1889 ঃ জগদীশ-অবলা বসুর আতিথ্য গ্রহণ। অতঃপর প্রেসিডেন্সী কলেজে সহকারী অধ্যাপক হিসাবে যোগদান। বেতন 250 টাকা মাত্র।

1890 ঃ তেল ও ঘি-এর বিশুদ্ধতা সম্পর্কে গবেষণার সূত্রপাত।

1891 : 'নেচার ক্লাব' প্রতিষ্ঠা। ব্রাহ্মসমাজের কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য, 'ব্রাহ্মবন্ধু সভা' ও 'সান্ধ্যসম্মিলনী' গঠনের ভার গ্রহণ।

1892 : বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস-এর পত্তন ; দেশীয় ভেষজ নিয়ে গবেষণার সূত্রপাত।

1894 : On the chemical examination of certain Indian food stuff, Part-I, Fats and Oils, JASB 63, (Part-II), pp. 59-80.

1895 : মারকিউরাস নাইট্রাইট আবিষ্কার ; হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যু।

1896 : On Mercurous Nitrite, JASB, 65 (Part-II), pp.1-9

– Mercurous Nitrite, Zeit anorg. Chem, 12, p. 365

– Interaction of Mercurous Nitrite and Alkyl Iodides, PCS, P.T. 218.

1897 : Nitrites of Murcury and the varying conditions under which they are formed, JCS. 71, pp. 337-344.

– Mercurry Hyponitrites, JCS, 71, pp. 348-350.

– On the action of Sodium Hyponitrite on Mercuric solutions, JCS, 71, pp. 1097-1104.

– On a new method of preparing Mercuric Hyponitrite, JCS, 71, pp. 1105-1106.

1898 : প্রফুল্লচন্দ্রের প্রবন্ধ অবলম্বনে বার্তেলো কর্তৃক *Journal de Savante*-এ প্রবন্ধ প্রকাশ।

1899 : On the interaction of Mercurous and Mercuric Nitrites of Silver and Sodium, PCS, p. 103.

– Mercurous Iodide, PCS, p. 239.

– Interaction of Mercurous Nitrite and Ethyl Iodide, PCS, 239.

– Problem of Scientific Education in India, CR, 108, pp. 347-355.

1900 : (I) Further Researches on Mercurous Nitrite and its derivatives. (II) on Mercurous Iodide and a new method of its preparation, JASB, 69, pp. 476-488.

বর্তমান ও ভবিষ্যতের অর্জেয় সম্পত্তি ট্রাস্টিদের হাতে সমর্পণ।

1901 : Mercurous Nitrite, *Annalen der Chemie*, 316, pp. 250-256.

– A New Series of Dimercuriammonium salts, PCS, 1, p.96.

— চরক ও সুশ্রুতের সময় নিরূপণ, (সহ-লেখক নবকান্ত কবিভূষণ)সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ৮, ১৫০-১৬২, ১৩০৮।

— গোপালকৃষ্ণ গোখেলের সহিত সৌহার্দ্য ও গান্ধীজীর সহিত আন্তরিক সম্পর্ক স্থাপন।

1902 : Dimercuriammonium Nitrite-and its Haloid derivatives, JCS, 81, pp. 644-650.

– Dimercuriammonium Nitrite, Zeit anorg. Chem, 33, pp. 209-211.

– *A History of Hindu Chemistry*, Vol.-I, Bengal Chemical & Pharmaceutical Works Ltd., Calcutta, 1902.

— সরল প্রাণীবিজ্ঞান, চেরী প্রেস, কলকাতা।

1903 : (With Jatindra Nath Sen) : Decomposition of Mercurous Nitrite by heat, JCS, 83, pp. 491-494.

– A stydy on the constitution of Dimercuriammonium salts, JASB, 72 (Part-II), pp.1-4.

– Dimercuriammonium Nitrite. JASB, 72, (Part-II), pp. 4-6.

– Dimercuriammonium Nitrite, Ann. Chem. Phys. 72, p. 215.

— আয়ুর্বেদের প্রাচীনত্ব, সহ-লেখক নবকান্ত গুহ কবিভূষণ ; সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ১০, ৯১-১০২, ১৩১০।

1904 : Mercuric Nitrite and its decomposition by heat, JCS, 85, pp. 523-524.

— বিজ্ঞানসভা পুরাতন ও নূতন, প্রবাসী ৪, ১৯৬-১৯৭, ১৩১১,

— AHistory of Hindu Chemistry, Volume-I (Revised), William and Norgate, London.

— বিলাত যাত্রা ; মাতৃবিয়োগ।

1905 : The Sulphate and Phosphates of the Dimercuriammonium Series, JCS, 87, pp. 9-10.

– Theyory of the production of Mercurous Nitrite and its conversion into various Mercury Nitrates, JCS, 87, pp. 171-177.

– (With Atul Chandra Gangopadhyay) ; The Nitrites of the Alkali metals and metals of the Alkaline Earths and their composition, JCS, 87, pp. 177-184.

– (With Atul Chandra Gangopadhyay) ; Constitution of Nitrites, Part-I, Two varieties of Silver Nitrite, PCS, p. 278.

— উদ্দীপনা, কলকাতা।

— প্রবাসী বাঙালীর পত্র, প্রবাসী, ৪, ২৫ ও ১৪৭, ১৩১২।

— মনস্বী সিলভ্যাঁ লেভী, বার্তেলোর সহিত সাক্ষাৎ ও ময়শাঁর গবেষণাগার পরিদর্শন।

1906 : (With Atul Chandra Gangopadhyay) : Fischer's Salt and its Decomposition by heart, JCS, 89, pp. 551-56.

– (With Panchanan Neogi) : Interaction of Alkylsulphates with Nitrities of Alkali metals and of the Alkaline earths, JCS, 89, pp. 1900-05.

— নব্য রসায়নী বিদ্যা ও তাহার উৎপত্তি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা।

1907 : Notes from the Chemical Laboratory of the Presidency College, Note No. 3, on Silver Mercurose-Mercuric Nitrite, JASB, NS 3, pp. 137-138.

– Mercurous Hyponitrite, JCS, 91, pp. 1404-05

– Cupric Nitrite, JCS, 91, pp. 1405-07.

– (With Atul Chandra Gangopadhyay) : Decomposition of Mercurous and Silver Hyponitrites by heat, JCS, 91, pp. 1399-1403.

– (With Atul Chandra Gangopadhyay) : Decomposition of Hyponitrous acid in presence of Mineral acids, JCS, 91, 1866-1870.

– (With Panchanan Neogi) : Preparation of Aliphatic Nitro- Compounds by the Interaction of the Alkyl Iodides and Mercurous Nitrite, PCS, 23, p. 246.

– Double Nitrites of Mercury and Alkali Metals, JCS, 91, pp. 2031-2033.

– Silver Murcuroso-Mercuric Oxynitrates and the Isomorphous Replacement of Univalent mercurry by Silver, JCS, 91, pp. 2033-2037.

– The Persuit of Chemistry in Ancient India, Modern Review (MR), 1, pp. 186-188.

– National Education in National lives, MR, May.

1908 : On the retardation and acceleration in the dissolution of Mercury in Nitric Acid in the presence of minute traces of Ferric Nitrite and Manganous Nitrate, JASB, 4, p. 405.

– Molecular volumes of the Nitrites of Silver, Mercury and the Alkali metals, JCS, 93, pp. 997-1000.

– Lithium Nitrite and its decomposition by heat, PCS, 24, p. 75.

— কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সম্মানসূচক উপাধি প্রদান।

1909 : Molecular Volumes of Nitrites of Ba, Sr, and Ca, JCS, 95, pp. 66-69.

– Decomposition and sublimation of Ammonium Nitrite, JCS, 95, p. 345.

– (With A.C.Ghosh) : Decomposition of Ammonium Platinum Chloride and Ammonium Platinum Bromide by heat, Zeit anorg. Chem, 64, p. 184 ; JASB, NS 5, pp. 263-67.

– *A History of Hindu Chemistry*, Vol.- II, Bengal Chemical and Pharmaceutical Works Ltd., Calcutta.

– The International Longress of Applied Chemistry, a lession for India, MR, 6, 121-130.

— বঙ্গ সাহিত্যে বিজ্ঞান, প্রবাসী, ৮, মাঘ, ১৩২২, পৃ- ৬২৪-৬৩৫

— আচার্যের জ্যোতিষ্কমন্ডলীর সহিত ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি।

1910 : (With A.C.Ghosh) : Decomposition of dimercuriammonium Nitrite by heat, JCS, 97, pp. 323-325.

– Double Nitrites of Mercury and the metals of the alkaline earths, JCS, 97, pp. 326-237.

– Double Nitrite of Mercury and the bases of the Tetraalkylammonium Series, PCS, 26, p. 172.

–(With Satish Chandra Mukhopadhyay) : Ionisation of the Nitrites as measured by the Cryoscopic method, PCS, 26, pp. 173-174.

– Bengali Brain and its Misusem, City Book Society, Calcutta,

– (With H.C. Kaviratna) : The Rasamavam, Asiatic Society of Bengal, reprinted 1983.

রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচন।

1911 : ময়দান ক্লাবের সূত্রপাত। এই ক্লাবের বিশিষ্ট সদস্য : গিরিশচন্দ্র বসু, দেবপ্রসাদ ঘোষ, প্রাণকৃষ্ণ আচার্য, সত্যানন্দ বসু প্রমুখ। গান্ধীজীও আচার্যের নিকট ময়দান ক্লাবের খোঁজখবর করতেন।

– Influence of minute quantities of ferric salts and of manganese nitrite on the

rate of solution of mercury in nitric acid, JCS, 99, pp. 1012-1016.

– (With J.N.Rakshit) : Methylammonium Nitrate, JCS, 99, pp.1016-19.

– (With H.K.Sen) : Trtramethyle amonium hyponitrite and its decomposition by heat, JCS, 99, pp. 1466-70.

– (With J.N.Rakshit) : Nitrites of alkylammonium bases : ethyl ammonium nitrite, JCS, 99, pp. 1470-75.

– (With Rasiklal Datta) : Nitrites of Benzylammonium Series : Benzylammonium nitrite and their sublimation and decomposition by heat, Dimethyl Ammonia Nitrite and Trimethyle Ammonium Nitrite, JCS, 99, pp. 1475-77.

– (With J.N.Rakshit) : Trimercuridiethylammonium Nitrite, JCS, 99, pp. 1472-73.

1912 : ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের কংগ্রেসে যোগদানের উদ্দেশ্যে দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারীসহ তৃতীয়বার বিলাতে গমন ;ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডি.এস.সি. উপাধি প্রদান ;স্যার আশুতোষ কর্তৃক বিজ্ঞান কলেজে রসায়নের প্রধান অধ্যাপক পদ গ্রহণের জন্য আহ্বান ; C.I.E. উপাধি লাভ।

– (With J.N. Rakhit) : Nitrites of alkylammonium series II Propyl ammonium nitrite and butyl ammonium nitrite and their decomposition by heat, JCS, 101, pp. 141-143.

– (With J.N.Rakshit) : Nitrites of Alkyl Ammonium series III Tnethyl ammonium nitrite and its decomposition and sublimation by heat, JCS, 101, pp. 216-219.

– (With N.R.Dhar and Tincori De) : Vapour density of ammonium nitrite, JCS, 101, pp. 1185-1189.

– (With N.R.Dhar) : Molecular conductivities of potassium nitrite, mercuric nitrite and potassium mercurinitrite, JCs, 101, pp. 965-968.

– (With R.L. Dutta) : Benzylmethyl, benzylethyl and allylammonium nitrite,PCS, 28, p. 258.

– (With J.N. Rakshit) : Nitrites of alkylammonium Series IV, Isobutyl, Diethyl. Dipropyl and Tripropyl ammonium nitrites, JCS, 101, pp. 612-616.

– (With J.N. Rakshit and R.L.Datta) : Nitrites of mercurialkyl and mercurialkylaryl ammonium Series, JCS, 101, pp.616-20.

– (With N.R.Dhar and Tincori De) : Nitrites of mercurialkyl and mercurialkylaryl ammonium series II, JCS, 101, pp. 1552-57.

– (With R.L.Datta) : Decomposition of alkylammonium nitrite and isolation of a compound, University of Calcutta, 1912 4 pp ; also see JASB NS 8, pp. 101-02.

– (With R.L.Datta) · Isomeric allylamines, JASB ; NS 8, 103, pp. 378-72.

— একটি স্বদেশী কারখানা, প্রবাসী ১২, ৭৩-৮৪ বৈশাখ, ১৩১৯।

1913 : – (With N.R.Dhar) : Equivalent conductance and Ionization of Nitrites, JCS, 103, pp. 10-18.

– (With J.N.Rakshit) : Nitrites of the alicylic ammonium series ; Nitrosopiperazinium nitrite, JCS, 103, pp. 1-3.

– (With N.R.Dhar) : Chlorides of mercurialkyl and mercurialkylaryl ammonium series and their constitution based on conductivity mesurements, JCS, 103, pp. 3-10.

– (With M.L.De and S.C.Jana) : Guanidium nitrite and its decomposition by heat, JCS, 103, pp. 285.

– (With R.L.De and N.R.Dhar) : Equivalent conductivities of Sodium hyponitrite and Calcium hyponitrite and hyponitrous acid, JCS, 103, pp. 1565-68.

— রজনীকান্ত স্মৃতি ঃ নলিনীরঞ্জন পন্ডিত রচিত "কান্তকবি রজনীকান্ত" পুস্তকের ভূমিকা, ভারতবর্ষ ১, ৩০৩-৩০৫, ভাদ্র, ১৩২০ (২/৩৬)।

1914 ঃ Additive and substitutive compounds of mercuric nitrite with organic theoderivatives, PCS, 30, p. 140.

– Action of mercuric, cupric and platinic chlorides on organic nitrite with organic sulphar compounds, PCS, 30, p. 304.

– Place of mercury in the periodic system, Chem News, 109, p. 85.

– (With F.V. Fernandes) : Action of monochloracetic acid on thiocarbamides and monoalkylated thiocarbamides, JCS, 105, pp. 2159-61.

– Action of nitrous acid on dimethyl piperzine, PCS, 30, 143-145.

— অধ্যাপক আর্মস্ট্রং প্রফুল্লচন্দ্রকে 'Master of Nitrites' উপাধিতে ভূষিত করেন।

1915 ঃ Interaction of dimercuriammonium nitrite and the alkyl iodides, JCS, 107, pp. 1251-1254.

— হিন্দু রসায়ন শাস্ত্রের প্রাচীনত্ব, প্রবাসী ২২, ৫৬৩-৫৬৯, ভাদ্র ১৩২২।

1916 ঃ (With R.L.Datta) : Molecular volumes of the hyponitrites of the alkyli metals and metals of the alkyline earths, JCS, 109, pp. 122-31.

– (With M.L.De) : Interaction of iodine and thioacetamide in aqueous and alcoholic solutions, JCS, 109, pp. 698-701.

– Nitromercartides and their reaction with alkyl iodides. Componds of disulphonium series, JCS, 109, pp. 131-38.

– Mercury mercaptide nitrites and their reaction with alkyl iodies, JCS, 109, pp. 603-12.

প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে অবসর গ্রহণ ও বিজ্ঞান কলেজে রসায়নের প্রধান অধ্যাপকরূপে যোগদান।

1917 ঃ Mercury, mercaptide nitrites and their reactions with the alkyl halides III, Chain compounds of sulphur, JCS, 111, pp. 101-109.

– Cadmium and Zinc nitrites, JCS, 111, pp. 152-162.

– (With M.L. De and J.C. Ghosh) : The valocity of decomposition and the dissociation constant of nitrous acid, JCS, 111, pp. 413-417.

– (With M.L. De) : Synthetic of $\alpha\beta$ – thiocrotomic acid, JCS, 111, pp. 510-512.

– Alkaloidal derivatives of mercuric nitrite, JCS, 111, pp. 507-510.

– Possibilities of Chemical Industries in India, MR, 21, pp. 176-183.

— শিক্ষা বিষয়ে কয়েকটি কথা, প্রবাসী, ১৭, শ্রাবণ, ১৩২৪, পৃ- ৩৪১-৪৭।

1918 : Antiquity of Hindu Chemistry, MR, 23, pp. 196-200.

– Pursuit of Chemistry in India, MR, 23, pp. 191-196.

– Essays and Discourses, G.A. Natesan & Co., Madras.

(এই গ্রন্থে বহু প্রবন্ধ ও ভাষণ অন্তর্ভুক্ত হয়)

বাগেরহাটে কলেজ স্থাপন ; রাড়ুলি-কাটিপাড়া-বাঁকা-খোঁশরায় শিক্ষা পরিষদ স্থাপন ;এই পরিষদ থেকে ছাত্র ও বিধবাদের সাহায্যার্থে 10,000 টাকা দান।

1919 : রাউলাট বিলের প্রতিবাদ সভায় টাউন হলে বক্তৃতা দান। বেঙ্গল পটারিজ লিমিটেডের ডাইরেক্টর হিসাবে যোগদান ; বেঙ্গল এনামেল ওয়ার্কের সহিত সক্রিয়ভাবে যুক্ত।

– (With P.C. Guha) : Mercury mercaptide nitrites and their reaction with alkyal iodides IV, Chain compounsds of sulphur, JCS, 115, pp. 261-271.

– (With P.K. Sen) : Mercuric - Sulphoxychloride, JCS, 115, pp. 552-56.

– (With P.C. Guha) : Mercury mercaptide nitrites and their sulphur, JCS, 115, pp. 541-48.

– Mercury mercaptide nitrites and their reaction with alkyl iodides VI, JCS, 115, pp. 548-52.

– Interaction of mercuric and cupric chlorides respectively with the mercaptans and potential mercaptans, JCS, 115, pp. 871-878.

– (With P.C. Guha) : Mercury mercaptites and their reaction with alkyl iodides, JCs, 115, pp. 1148-55.

– (With P.C. Guha nad R.K. Das) : Reaction of potassium salts of 2-thiol- 5 thio-4 phenyl-4 : 5-dihydro- 1:3:4-thiodiazole and 2:5 - dithiol 1:3:4- thiodiazole with halogeneted organic compounds, JCS, 115, pp. 1308-12.

– The law limitation among the ancient Hindus, MR, 25, pp. 630-31.

— সমাজ সংস্কার সমস্যা, বেঙ্গল কেমিক্যাল প্রেস, কলকাতা।

— রাসায়নিক পরিভাষা, (প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়ের সাহিত) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা।

— পাঠাগার ও প্রকৃত শিক্ষা, প্রবাসী, ১৯, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৮, পৃঃ ৯৭-১০২।

— বিজ্ঞান চর্চা ও প্রচীন ও নব্য ভারতে একনিষ্ঠ সাধনা, প্রবাসী, ১৯ বৈশাখ, পৃঃ ১২-১৮।

— অসমীয়া গদ্যের প্রাচীনত্ব, প্রবাসী, ১৯, পৌষ, পৃ- ১৯৩-১৯৮।

— রসায়নে অবদানের জন্য 'নাইট' উপাধি প্রাপ্তি।

1920 : Triethylene tri and tetrasulphides, JCS, 117, pp. 1090-92.

— জাতিভেদ ও পাতিত্য সমস্যা, বেঙ্গল কেমিক্যাল প্রেস, কলকাতা।

— অন্ন সমস্যা, কলকাতা, এবং প্রবাসী, ১৯, পৃঃ ২৯৩-২৯৯ ইত্যাদি।

— অধ্যয়ন ও সাধনা, মর্ডান পাবলিসিং হাউস, কলকাতা।
— জাতিভেদ সমস্যা, প্রবাসী, ২০, ১৩২৭, পৃঃ ১১৭-২৫।
— পাতিত্য সমস্যা, প্রবাসী, ২০, ১৩২৭, পৃঃ ৩২৪-২৮।
— এখন ও তখন, (সহলেখক রতনমণি চট্টোপাধ্যায়), প্রবাসী, ২০, ১৩২৭, পৃঃ ৫০৯-৫১৫ ; 'আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের চিন্তাধারা' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত।
ইন্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেসের সভাপতি ; ঢাকা ও বেনারস বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডি.এস.সি. উপাধি প্রদান ; চতুর্থবার ইংল্যান্ড গমন।

1921 : (With K.K. Kumar) : Molecular conductivity of some Sulphonium compounds in acetone, JCS, 119, pp. 1643-44.
— জাতি গঠনে বাধা—ভিতরে ও বাহিরে, চক্রবর্তী চ্যাটার্জী অ্যান্ড কোং, কলকাতা
— পল্লী সমস্যা ও তাহার প্রতিকার, প্রবাসী, ২১, ১৩২৮, পৃঃ- ৪১৮।
— অন্ন সমস্যা ও তাহার সমাধান, প্রবাসী, ২১, পৃ- ৭৯১-৯৬।
— শিক্ষা ও সেবা (অনুলেখক চারুচন্দ্র পাল), প্রবাসী, ২১, অগ্রহায়ণ, ১৩২৮।
— আমাদের আদর্শ ও কর্তব্য, প্রবাসী, ২১, পৃ- ১৪২-৪৪।
খুলনা দুর্ভিক্ষে রিলিফ কমিটি গঠন ও আর্থিক সাহায্য দান ; অধ্যাপক রূপে বেতন গ্রহণে অনিচ্ছা ; নিজ নামে রিসার্চ স্কলারশিপের জন্য প্রতি মাসে 200 টাকা করে দান। ABTA-এর প্রথম সম্মেলনের সভাপতি ; Bengal Co-operative Organisation-এর সভাপতি।

1922 : (With R.K. Das) : Chloropicrim as a reagent for the diagnisis of mercaptans and potectial mercaptans, JCS, 121, pp. 323-328.
– Triwthylene tri-and tetrasulphides, JCS, 121, pp. 1279-83.
— দেশী রং, চক্রবর্তী চ্যাটার্জী অ্যান্ড কোং, কলকাতা।
— বস্ত্র সমস্যা, বেঙ্গল কেমিক্যাল স্টীম প্রেস, কলকাতা।
– The Spirit of Khaddar as I understand, The Indian Review,
– The bearing of Dr. Meghnad Saha's Researches on the problem of Cosmic Radiation, MR, 32, pp. 718-24.
— বাঁকুড়া শিল্প প্রদর্শনীর উদ্‌ঘাটন, প্রবাসী, ২১
— বস্ত্র সমস্যা, বঙ্গবাণী, ১, শ্রাবণ, ১৩২৯।
— বাঙলা ভাষায় নূতন গবেষণা, মাসিক বসুমতি, ১, ১৩২৯, পৃ- ১৮১-৮৪।
— চরকা ও বস্ত্র সমস্যায় বঙ্গমহিলার কর্তব্য, প্রবাসী, ২১, পৃ- ২৫৩-৫৫।
— বৈজ্ঞানিক জগতে ভারতের স্থান নির্ণয়, (প্রিয়দারঞ্জন রায়ের সহিত), প্রবাসী, ২২, আষাঢ়, ১৩২৯, পৃ- ৩১৫-২০।
— সভ্যতার মাপকাঠি, মাসিক বসুমতি, ১, পৃ- ২৭৩-৭৪।
— রসায়ন শাস্ত্র, নব্য ও প্রাচীন, মাসিক বসুমতি, ১, পৃ- ১৩৭-১৩৯।
— অস্পৃশ্যতা ও জাতিগঠনের অন্তরায়, বিকাশ, ২২, ১৩২৯, পৃ- ৩৬৩।
— সাহিত্য ও স্বাদেশিকতা, প্রবাসী, ২২, পৃ- ৩৬৩।
— সাধনা ও সিদ্ধি, প্রবাসী, ২২, পৃ- ৮১-৮৬।
— ল্যাভসিয়েরে ও নব্য রসায়নশাস্ত্রের উৎপত্তি, মাসিক বসুমতি, ১, পৃ- ২৮৩-৮৮।

উত্তরবঙ্গ বন্যার জন্য রিলিফ কমিটি গঠন ও বন্যাপীড়িতের আর্থিক সাহায্য প্রদান ও ত্রাণকার্য পরিচালনা ; চরখা ও খাদির উন্নতির জন্য সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা ; বিজ্ঞান কলেজে 10,000 টাকা দান করে নাগার্জুন পুরস্কার প্রবর্তন।

1923 : Varying valency of platanium with respect to mercaptamic radicals, JCS, 123, pp. 133-41.

– (With G.C. Chakraborty and P.K. Bose) : Mercaptans of purine group, JCS, 123, p. 1957.

– Triethyline tri and tetrasulphides III. The Sulphones, sulphinic and sulphonic acids of the series. Extension of Stuffer's law, JCS, 123, pp. 2174-78.

– Muslim Constitution to India, The Indian Review, 2, pp. 173-74.

— খদ্দর বলিতে কি বুঝি, মাসিক বসুমতি, ১, মাঘ, ১৩২৯, পৃ- ৪১৩-১৬।

— অন্নসমস্যা ও বাঙ্গালীর নিশ্চেষ্টতা, মাসিক বসুমতি, ১, ফাল্গুন, ১৩২৯, পৃ- ৫৪৯-৫৯।

— বন্যায় শিক্ষা, বঙ্গবাণী, ২, ১৩২৯, পৃ- ১২৭-১৩৪।

— সামাজিক ব্যাধি ও তাহার প্রতিকার, মাসিক বসুমতি, ২, শ্রাবণ, ১৩২৯, পৃ- ৪৪৫।

— খদ্দর পরিব কেন? মাসিক বসুমতি, ২, ভাদ্র, ১৩৩০, পৃ- ৫৯৭।

— প্রাচীন ভারতে রসায়নের চর্চা, বঙ্গবাণী, ২, অগ্রহায়ণ, ১৩৩০, পৃ- ১৪২৪-২৮।

— খাদির সার্থকতা, মাসিক বসুমতি, ২, অগ্রহায়ণ, পৃ- ১৩৭, ১৩৩০।

— আলিগড় জামিয়া মিলিয়া ইসলামিক কলেজে সমাবর্তন ভাষণ ; কোকনদে অনুষ্ঠিত খাদি প্রদর্শনীর উদ্বোধনী সভায় সভাপতিত্ব ও ভাষণ।

1924 : Indian Chemical Society প্রতিষ্ঠা ; গৃহনির্মাণকল্পে 10,000 টাকা দান ; প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি।

– Varying valency of gold with respect to mercaptanic radicals, JICS, 1, pp. 63-73.

– The oxidation of trithylene tetrasulphide by means of potassium permanganate, JICS, 1, pp. 207-12.

– Presidential address at the Utkal Provincial conference, Calcutta conference, Calcutta. এই সভায় তাঁর বিখ্যাত উক্তি : "Science can effort to wait but Swaraj can not."

– Speech as Chairman, Reception Committee, Hindu Mahasabha 8th session, Faridpur.

— কোকনদ খদ্দর প্রদর্শনী, বঙ্গবাণী, ২, মাঘ, ১৩৩০, পৃ- ৭৯৫-৮০০।

— বাঙ্গালীর শক্তি সামর্থ্যের অপব্যবহার ও বর্তমান সমস্যা, মাসিক বসুমতি, ৩, আষাঢ়, ১৩৩১, পৃ- ৩২৫।

— প্রাণীদের দংশন কাহাকে বলে, প্রকৃতি, ১, ১৩৩১, পৃ- ২৮৩-২৯০।

1925 : Synthesis of cylic polysulphides I. Condensation of dithioethylene glycol with benzylidene chloride, JCS, 125, pp. 1141-44

– Chemical knowledge of the Hindus of Old, JICS, 1, pp. 225-34

– (With K.C. Basu Ray) : Varying valency of platinium with respect to mercaptanic radicals II, JICS, 2, pp. 178-90.

– Makers of Modern Chemistry, Probsthain & Co., London ; Chakraborty, Chatterjee & Co. Ltd.

– A History of Hindu Chemistry, Vol-II revised, Chakraborty, Chatterjee & Co. Ltd.

— বাংলা গদ্যসাহিত্যের ধারা, মাসিক বসুমতি, ৩, ১৩৩১, পৃ- ৬৭৩-৬৮৪, ৮০৫-১৫; ৪, ১৩৩২, পৃঃ ৬-১২।

— দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, মাসিক বসুমতি, ৪, ১৩৩২, পৃ- ৩৮১-৮২।

— সুরেন্দ্রনাথের তিরোধান, মাসিক বসুমতি, ৪, ভাদ্র, ১৩৩২, পৃঃ ১-২।

— বিবেকানন্দ ও বর্তমান বাঙ্গালা, (সহলেখক কলিঙ্গনাথ ঘোষ), বঙ্গবাণী, ৪, ভাদ্র, ১৩৩২, পৃ- ৪১।

— মিথ্যার সহিত আপোষ ও শক্তিক্রয়, চক্রবর্তী চ্যাটার্জী অ্যান্ড কোং।

— 'অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়' বক্তৃতা দান ও নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা।

1926 : আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের আহ্বানে মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন ভাষণ।

– The discovery of Oxygen, JICS, 3, p. 1322

– (With B.C. Guha and K.C. Basu Ray) : Synthesis of condensed heterocyclic systems. Interaction between 2, 5 dithiol-1,3,4 thiodiazole and some organic dihalides, JICS, 3, pp. 23-29

– (With K.C. Basu Ray) : Triethylene Trisulphide and 1:4 dithian, JICS, 3, pp. 73-74.

– (With K.C. Basu Ray) : Lengthened chain compounds of sulphur, JICS, 3, pp. 75-80.

– (With B.C. Guha and K.C. Basu Ray) : Varying valency of platinum with respect to mercaptanic radicals IV. The inadequency of Werner's theory to explain certain anomalous cases, JICS, 3, pp. 358-70.

– The Discovery of Oxygen, Calcutta University.

— দেশেরে কর্তব্য ও সেবা সম্বন্ধে দুটো কথা, প্রবাসী, ৩৩, বৈশাখ, ১৩৩৩, পৃ- ১২৭-২৯।

— সুন্দরবনের গন্ডার ও বিহঙ্গকুলের বিশ্বাস ও ভালোবাসা অর্জন, প্রকৃতি, ৩, পৃ- ৪০-৪৪।

— অক্সিজেন ও তাহার আবিষ্কার (সুবোধ মজুমদার অনূদিত), প্রকৃতি, ৩, পৃ- ২৮৯-৩০১ ; ৪৬৫-৪৭১ ; ১৩৩৩ ; ৪, ১০৪-১০৮, ১৩৩৪।

– All Bengal College and University Teacher's conference-এ সভাপতির ভাষণ।

1927 : Lengthened Chain compounds of sulphur, Nature, 119, p. 124

– (With N.N. Ray) : A new series of double sulphates of copper-magnasium groups and sulphonium bases, JICS, 4, pp. 37-42.

– The Variability of Valency, JICS, 4, pp. 89-95.

— সময়ের সদ্ব্যবহার, ভারবর্ষ, ১৫, ১৩৩৪, পৃ- ৫৭।

— রাসায়নিক গবেষণায় জার্ম্মানীর সৌভাগ্য, বার্ষিক বসুমতি, ১৩৩৪, পৃ- ৩০৬-১০।

— স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের জন্য জেনানা সম্মিলনীকে পুনর্গঠিত করে আর্থিক সাহায্য।

1928 : (With K.C. Basu Ray and N.B. Adhikari) : Complex copmpounds of platinum with respect to mercaptanic radicals VI, JICS, 4, pp. 457-75.

–(With N.N. Ray) : Double sulphates of the copper-magnesium group and the sulphonium bases, JICS, 5, pp. 69-72.

– (With K.C. Basu Ray and S.N. Raychoudhuri) : Varying Valency of platinum with respect to mercaptanic radicals VIII, JICS, 5, pp. 139-147.

– (With K.C. Basu Ray) : Complex compounds of gold with mercaptanic radicals II, Rasidual affinities of Chlorauric acid, JICS, 5, pp. 527-533.

– (With N.N. Ray) : tetreathylphosphonium nitrite, JICS, 5, pp. 733-34.

— বঙ্গ দেশে কায়স্থের প্রতিভা ও প্রতিপত্তি, ভারতবর্ষ, ১৬, ১৩৩৫, পৃ- ১০৭-১১১।

মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটি সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা ও মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা বিস্তারের আহ্বান।

1929 : পঞ্চমবার ইংল্যান্ডে গমন। কেম্ব্রিজে Congress of the Universities of the Empire-এ যোগদান। 'রাষ্ট্র ও বিশ্ববিদ্যালয়' শীর্ষক বক্তব্যে ব্রিটিশ সরকারের বিজ্ঞান কলেজের প্রতি বিরূপ মনোভাবের সমালোচনা।

– Isomorphism and homology, Nature, 124, pp. 480-481

– (With K.C. Basu Ray) : A new kind of complex platinum compound, Tetravalent and quinquevalent platinum, Zeit. anorg allgem. Chem., 178, pp. 329-336.

– (With N. N. Ray) : A new series of Double Sulphates of copper magnesium group and the phosphonium bases I, JICS, 6, pp. 27-30.

– (With S.K. Mitra) : Synthesis of lengthened sulphur-chain compounds, JICS, 6, pp. 865-69.

– Dignity of Labour taught at the Government Agricultural Farm, MR, 45, pp. 426-430.

— কৃষি, ব্যবসা ও বাঙালী যুবকের অন্নসমস্যা, ভারতবর্ষ, ১৬, ১৩৩৫, পৃ-৬১৪-২০।

— ছুটির অবকাশে ছাত্রদের কর্তব্য, ভারতবর্ষ, ১৭, ১৩৩৬, পৃঃ ৪৯৫-৯৮।

— নব্য চীন ও বাঙ্গালা, প্রবাসী, ২৯, ১৩৩৬, পৃ- ৮০-৯৯।

— ডিগ্রীর অভিশাপ, ভারতবর্ষ, ১৭, ১৩৩৬, পৃ- ৮২৫-৩০।

1930 : Isomorpism and Chemical homology, Nature, 126, p. 310.

– Chemical elements and compoudnds, JICS, 7, pp. 1-9.

– (With D.C. Sen) : Studies on complexes of gold chlorides with organic sulphides, JICS, 7, pp. 67-77.

– (With N.B. Adhikari) : Complexes of mercuric iodide with alkyl sulphonium iodide, JICS, 7, pp. 297-303.

– (With S.C Sengupta) : A new kind of complex platinum compound. Tetravalent and quinquevalent platinum, Zeit anorg. allegem. Chem., 187, pp. 33-48.

– (With P.C. Mukherjee) : Complex compounds of chloroferric acid with organic sulphur compounds (the analogy between gold and iron compounds), Ziet, anorg. allegem Chem, 187, pp. 121-126.

– Milk for Calcutta– A Scheme for a model diary farm, The Calcutta Municipal Gazatte, 6th Aniversary No.1930

— বাঙালীর শক্তি ও তার অপচয়, ভারতবর্ষ, ১৭, ১৩৩৬, পৃ- ২৩২।

— পাঠাগারের ব্যবহার, মাধবী, ৭, ১৩৩৬, পৃ- ৩৪৬।

— মরুভূমিতে সোনা ফলন, প্রবাসী, ৩০, ১৩৩৭, পৃ- ২৪-৩০।

বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন ভাষণ।

1931 : Synthesis of ethyl thioacetoacetate, Nature, 128, p. 189.

– Compounds of metalic salts with organic sulphides, JICS, 8, pp. 537-40.

– (With S.C. Sengupta) : A new type of complex platinium compounds. tervalent and pentavalent platinum, Ziet anorg allgem Chem, 198, pp. 53-56.

– (With N. B. Adhikari and H. N. Ray) : Reaction of Silver nitrate with Cadmium iodide with alkylsulphonium iodides, JICS, 8, pp. 739-751.

– Radha Charan Pal, a study, Calcutta.

— চা পান ও দেশের সর্বনাশ, মাসিক বসুমতি, ১০, ১৩৩৮, পৃ- ৭৬৯-৭৭৩।

— স্বদেশী, বাঙ্গালার বাণী, ৩, ৯, ১৩৩৮।

ব্রহ্মপুত্রের বন্যায় বঙ্গীয় সঙ্কট ত্রাণ সমিতি গঠন ; সাহায্যের জন্য দেশবাসীর নিকট গান্ধীজীর আহ্বান ; গান্ধীজী কর্তৃক Doctor of flood অভিধা জ্ঞাপন।

1932 : Life and experiences of a Bengali Chemist, Vol-I, Chakraborty Chatterjee & Co. Ltd.

– (With N.B. Adhikari) : Complex compounds of iridium I Compounds with organic sulphides, JICS, 9, pp. 251-257.

– (With S.C. Sengupta) : A new type of complex platinum compounds. Tetravalent and quinquevalent platinum, Ziet anorg allgem Chem, 203, pp. 401-404.

— চান পান ও দেশের সর্বনাশ, কলকাতা।

— বর্তমান যুগ সমস্যা ও ছাত্রদের কর্তব্য, বঙ্গবাণী, ১১, ১৩৩৯, পৃ- ৩৫১।

সত্তর বৎসর পূর্তিতে রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে কলকাতার নাগরিকবৃন্দ ও পৌরসভা কর্তৃক সম্বর্ধনা জ্ঞাপন ; আচার্যদেবের নামে বাগেরহাট কলেজের নামকরণ।

1933 : (With S.C. Sengupta) : A new type of complex platinum compound of trivalent and quinquevalent platinum, Ziet anorg allgem Chem, 211, pp. 62-64.

– (With S.K. Mitra and N.N. Ghosh) : Thioketonic esters III. Alkylation of ethyle thioacetoacetate, JICS, 10, pp. 75-79.

– A new method of fluorination of organic compounds, Nature 132, p. 173.

– (With N.B. Adhikari and Ranajit Ghosh) : Complex compounds of iridium II. Compounds of crganic sulphides and pyridine, JICS, 10, pp. 275-79.

– (With P.B. Sarkar and Anit Ray) : Fluorination of inorganic compounds. Monofluoroacetone, Nature, 132, pp. 749-50.

– (With N.N. Ghosh) : Complex platinum compounds with trivalent and quinquevalent platinum VI, Zeit anorg allgem Chem, 215, pp. 201-04.

– Swadeshi and Economic Salvation– Address on the Occasion of opening the Swadeshi Exhibition, Indore, January 12, 1933.

– Swadesh and Revival of Home Industries– Address at the Opening Ceremony of the All India Industrial Exhibition at Delhi, March 1, 1933.

— বর্তমান শিল্পপদ্ধতি ও জীবন সংগ্রামে তাহার মূল্য, প্রবাসী, ৩৩ ১ম খন্ড, পৃ- ৫১১-৫১৩, ১৩৪০।

— শ্রমের মর্যাদাবোধ ও বাঙালীর পরাজয়, প্রবাসী, ৩২, ২য় খন্ড, পৃঃ ৫৩২-৫৩৪, ১৩৩৯ ;৩৩, ১ম খন্ড, পৃ- ৩২৬-৩৩১, আষাঢ় ১৩৪০।

— বাঙালী কোথায় গেল, প্রবাসী, ৩২, ২য় খন্ড, পৃ- ৮৩৮-৮৪০, ১৩৩৯।

— শ্রমের মর্যাদাবোধ ও বাঙ্গালীর বিমুখতা, প্রবাসী, ৩৩, ১ম খন্ড, পৃঃ ৫১১-৫১৩, শ্রাবণ ১৩৪০ ;ঐ বিষয়ে প্রশ্নোত্তর, প্রবাসী, ৩৩, পৃঃ ৬৭৯-৬৮০ ভাদ্র ১৩৪০।

— শ্রমের মর্যাদাবোধ ও বাঙ্গালীর অন্ন সমস্যায় পরাজয়—ঝাড়ুদারী ও ভাবী উন্নতির উপায়, প্রবাসী, ৩৩, ১ম খন্ড পৃ- ৮৪০-৮৪৩ আশ্বিন ১৩৪০। (২/৪৮)

— প্রবাসী জমিদার ও দুরবস্থ পল্লী, ভারতবর্ষ ২০, পৃ- ৩২৯-৩৩২ ভাদ্র ১৩৪০।

— বাংলার জমিদার বর্গ (২) ভারতবর্ষ ২০, পৃ- ৭৯০-৭৯২ কার্তিক;(৩) ২১, পৃ- ২০-২৩ পৌষ ;(৪) পৃ- ৪৪২-৪৪৫ ফাল্গুন, ১৩৪০ ;(৫) পৃ- ৮৩৩-৮৩৫ জৈষ্ঠ ১৩৪১।

— বাঙ্গালীর দাস মনোভাব, খুলনাবাসী ৩রা জুন ১৯৩৩।

— অন্ন সমস্যা ও শিক্ষার বাহন, দেশ ১, ১৩, ২৪শে নভেম্বর, ১৯৩৩।

— বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন ভাষণ ;রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির দাবীতে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর নিকট টেলিগ্রাম প্রেরণ।

1934 ঃ Isomophism and chemical constitution–Constitutions of formic acid and formates, Nature, 133, pp. 646-47.

–(With N.B. Adhikari) : Complex compounds of iridium III Compounds with Ammonium ethylanine, JCS, III, pp 517-20.

– (With N.N. Ghosh) : A new type of complex platinum compounds of trivalent and quinquevalent platinum VIII, Zeit anorg allgem Chem, 220, JICS, pp. 737-42.

– Synthesis of thiocamphor and other Cyclic thioketones, Nature, 134, p. 1010

— লুই পাস্তুর ও তাহার গবেষণা (সহলেখক অরবিন্দ সরদার), প্রবাসী, ৩৪, পৃ- ৪৯ ;৩২৪ ;৮২০, ১৩৪১।

— মাদাম কুরী (সহলেখক অরবিন্দ সরদার), প্রবাসী, ৩৪, পৃ- ৫৮০, ১৩৪১।

— কলেজে ছাত্রদের অপব্যয়, ব্যবসা ও বাণিজ্য, কার্তিক, ১৩৪১।

— চীনে ছাত্রদের আন্দোলন, ব্যবসা ও বাণিজ্য, আষাঢ়, ১৩৪১।

— ভাইটামিন (সহলেখক হরগোপাল বিশ্বাস), ভারতবর্ষ, ২২, পৃ- ৮২৫-৮৩১ ; ১-৮ পৌষ, ১৩৪১।

1935 : Life and experiences of a Bengali Chemist, Vol-II, Chakraborty, Chatterjee & Co. Ltd.

– (With H.C. Goswami and A.C. Roy) : Fluorination of organic compounds, JICS, 12, pp. 93-95.

— অন্ন সমস্যা ও গোপালন, প্রবাসী, ৩৫, ভাদ্র, ১৩৪২, পৃ- ৬১০-১৬।

— অন্ন সমস্যায় বাঙ্গালীর পরাজয়, দেশ, ৩, সংখ্যা ১,৯,২৪, ২৩শে নভেম্বর।

— চা-এর প্রচার ও দেশের সর্বনাশ, দেশ, ৩, পৃঃ ১৬২, ১৬৩, ১৭১, ৭ই ডিসেম্বর।

1936 : Synthesis of two bithiocamphors, Nature, 138, p. 548.

– (With N.N. Ghosh) : Complex compounds of iridium IV, JICS, 13, pp. 138-140.

– (With A.C. Roy) : Fluorination of organic compounds, JICS, 13, pp. 427-28.

— রসায়ন শাস্ত্রে নোবেল পুরস্কার (সহলেখক পুলিনবিহারী সরকার ও ভবেশচন্দ্র রায়), প্রবাসী, ৩৫, মাঘ, ১৩৪২, পৃ- ৪৬৭-৪৭০।

— অন্নসমস্যায় বাঙ্গালীর পরাজয় ও তাহার প্রতিকার, চক্রবর্তী, চ্যাটার্জী অ্যান্ড কোং লিমিটেড।

— জাতীয় মুক্তির পথে অন্তরায়, চক্রবর্তী, চ্যাটার্জী অ্যান্ড কোং লিমিটেড।

— খাদ্য-বিজ্ঞান (সহলেখক হরগোপাল বিশ্বাস), চক্রবর্তী, চ্যাটার্জী অ্যান্ড কোং।

1937 : বিশ্ববিদ্যালয়ের তকমা ও শিল্প ব্যবসায়ে কৃতিত্ব, কলকাতা।

— আত্মচরিত, চক্রবর্তী, চ্যাটার্জী অ্যান্ড কোং ; ওরিয়েন্ট বুক কোং, ১৯৬১।

— হিন্দু রসায়নী বিদ্যা, বিশ্বভারতী।

— বাঙ্গালী তুমি কি ধ্বংস সাগরে ঝাঁপ দিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছ, ভারতবর্ষ, ২৫, কার্তিক, ১৩৪৪, পৃ- ৬২৫।

— প্রাচীন ভারতে রসায়ন শাস্ত্রের উন্নতি, প্রকৃতি, ১৪, ৮৭, ১৩৩৪,

— গবেষণামূলক রসায়নে উন্নতি ও দান, দেশ, ৪, সংখ্যা ২৩, পৃ-৬৯০-৬৯১, এপ্রিল।

— বস্ত্রশিল্পে বাঙ্গালীর আশার কথা, মাসিক বসুমতি, ১৬, মাঘ, ১৩৪৪, পৃ- ৫৭২-৭৯।

— ভাগাড় হইতে চর্মশালা, প্রবাসী, ৩৭, চৈত্র, ১৩৪৪, পৃ-৮১১-১৮।

— চিড়া, মুড়ি খই, বিস্কুট, ভারতবর্ষও, ২৫, বৈশাখ, ১৩৪৫, পৃ- ৩৭৩।

1938 : শিল্প ব্যবসায়ে বাঙ্গালীর কৃতিত্ব ঃ যোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, প্রবাসী, ৩৮, ১৩৪৫, পৃ-৬৭৬-৭০০ ;

আলামোহন দাস, প্রবাসী, ৩৮, ১ম খন্ড, পৃ- ৭৬৫-৬৮ ; ২য় খন্ড পৃ-৭৫-৮০ ; ২৬৬-২৬৯, ১৩৪৫।

— আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের প্রবন্ধ ও বক্তৃতাবলী, ১ম খন্ড, চক্রবর্তী, চ্যাটার্জী অ্যান্ড কোং

1939 : The Shakespearean Puzzle–Endevour after its solution, CR, 73, pp. 129139 ; 247-256.

— শিল্প ব্যবসায়ে বাঙ্গালীর কৃতিত্ব ঃ শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবাসী, ৩৮, ১৩৪৫, পৃ- ৬৭৩-৬৭৮।

— জাতীয় সম্পদের মূলে বিজ্ঞানের শক্তি, পাঠশালা, ১৩৪৫।

— বাঙ্গালী কোথায়, আনন্দবাজার পত্রিকা, পূজা সংখ্যা, ১৩৪৬।

1940 : The Shakespearean Puzzle--Endevour after its solution, CR, 74, pp. 1-13, 103-112, 231-237, 75, 1-12, 91-100, 76, 1-8, 115-124, 235-246, 77, 1-10, 131-140, 241-248.

— কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে সভাপতির ভাষণ ; কলকাতা রেডিওতে ভাষণ ; বেঙ্গল কেমিক্যাল থেকে পদত্যাগ।

1941 : The Shakespearean Puzzle--Endevour after its solution, CR, 78, pp. 1-7, 87-92, 207-213, 79, pp. 1-5.

— কালাজ্বর ও তাহার প্রতিকারের ইতিহাস (সহলেখক প্রবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়), ভারতবর্ষ, ২৯, ভাদ্র, ১৩৪৮, পৃ- ৩০৫-১১।

— আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের প্রবন্ধ ও বক্তৃতাবলী, ২য় খন্ড, চক্রবর্তী, চ্যাটার্জী অ্যান্ড কোং।

—রাষ্ট্রভাষা, দেশ, ৯, সংখ্যা-২, ২২শে নভেম্বর, পৃ- ৪২৪।

— রবীন্দ্র প্রয়াণে, ভারতবর্ষ, ২৯, আশ্বিন, ১৩৪৮, পৃ- ৪২৪।

নাৎসী বাহিনীর সোভিয়েট আক্রমণের প্রতিবাদের প্রস্তাবে প্রথম স্বাক্ষর দান।

1942 : অরবিন্দ সরদারের টাউন শ্রীপুরে কিছুদিন অবস্থান।

1943 : খুলনা শহর ও রাড়ুলির অধিবাসীদের দ্বারা সর্বশেষ সম্বর্ধনা জ্ঞাপন।

1944 : তিরোধান : 16ই জুন ; সন্ধ্যা 6টা 27মিনিটে।

গ্রন্থপঞ্জী ও তথ্যসূত্র

কর, সমরজিৎ ঃ অগ্রজ বিজ্ঞানী, আনন্দ পাবিলাশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৯৮০।

ঘোড়ুই, সন্তোষকুমার ঃ কর্মযোগী বিজ্ঞানী জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, দীপ প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৯৮।

ঘোষ, অনিলচন্দ্র ঃ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র জীবনী ও বাণী, প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৩৩৮।

ঘোষ, ননীগোপাল ঃ প্রফুল্লচরিত, কমলা বুক ডিপো, কলকাতা, ১৯১৯।

চক্রবর্তী, শ্যামল ঃ বিজ্ঞানের পৃথিবী বিজ্ঞানীর পৃথিবী, অর্পণা বুক, কলকাতা, ১৯৯৯।

চট্টোপাধ্যায়, রতনমণি ঃ আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের চিন্তাধারা, ওরিয়েন্ট বুক অ্যান্ড কোম্পানী। কলকাতা, ১৪০৮।

চট্টোপাধ্যায়, শক্তিময় ও এণাক্ষ্মী ঃ সত্যেন্দ্রনাথ বোস, এন.বি.টি., নিউ দিল্লী, ১৯৮৫।

বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার ঃ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, মডার্ণ বুক এজেন্সী, কলকাতা

বসু, যোগীরাজ ঃ বেদের পরিখে, ফার্মা কেবলক্রম প্রা. লি., কলকাতা।

বিশ্বাস, দেবেন্দ্রনাথ ঃ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ১৯৭৯।

ভট্টাচার্য, গোপিকামোহন ঃ সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস, (২য়), সংস্কৃত কলেজ, কলকাতা, ১৯৬১।

মাইতি, নন্দলাল ঃ আদর্শ শিক্ষক সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ, গীতাঞ্জলী, কলকাতা, ২০০১

—চীনা গণিতের ইতিবৃত্ত, ফার্মা কে এল এম. প্রা. লি. কলকাতা

মিত্র, বিমলেন্দু ঃ রসয়ানাচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী, কলকাতা, ১৯৮৮।

রায়, প্রফুল্লচন্দ্র ঃ আত্মচরিত, শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ, কলকাতা, ১৯৯৮।

সেন, সমরেন্দ্র নাথ ঃ বিজ্ঞানাচার্য ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অফ সায়েন্স, ১৯৮৫।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ঃ সত্যেন্দ্রনাথ বসু রচনা সঙ্কলন, কলকাতা, ১৩৮৭।

সেনগুপ্ত, সত্যপ্রসাদ ঃ ইংরাজী সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রাঃ লিঃ কলকাতা, ২০০১।

পত্রিকা

প্রবাসী, মাসিক বসুমতি, জ্ঞান ও বিজ্ঞান, জ্ঞান বিচিত্রা, পশ্চিমবঙ্গ প্রফুল্লচন্দ্র রায় বিশেষ সংখ্যা ইত্যাদি।

Asiatic Society : Renascent Bengal, Calcutta, 1972.

Basham, A.L. : The Wonder That was India. Rupa & Co. Calcutta, 1999

Bose, D.M., Sen. S.N. and Subbarayappa, B.V. : A cnoice History of Science in India, Indian National Science Academy (=INSA), New Delhi, 1971.

Bose, P.N. : Centenary Review of the Asiatic Society of Bengal (1784-1883), Pt.-III, Calcutta, 1986.

Calcutta University : Acharya Prafulla Chandra Ray, Birth Centenary Souvenir Volume, 1962.

Chatterjee, S, and Sen, A. : Acharya Prafulla Chandra Ray, some aspects of his life and work, Indian Science News Association, Calcutta, 1986.

Kosambi, D.D. : The Culture and Civilisation in Ancient India in Historical Outline, Vikash Publishing House Pvt. Ltd., New Delhi, 1982.

Long, W. J. : English Literature, New Delhi

Mukherjee, B.N. : The Rise and Fall of Kushana Empire, Firma KLM Pvt. Ltd.. Calcutta, 1988.

Ray, A and Bagchi, S.K. : Technology in Ancient and Medieval India, Sandeep Prakashan, New Delhi, 1986.

Ray, J.N. : 'Acharya Ray and Chemical Research in Modem Indian', Indian Journal of Chemical Society, Calcutta, 1961, pp. 423-431.

Ray, M, and Subarayappa, B.V. : Rasārnavakalpa, INSA, New Delhi, 1976.

Ray, P.C.* : India before and after the Mutiny, Rammohon, Library, Calcutta.

—— Life and Experiences of a Bengali Chemist, Vol-I and Vol-II, Chakraborti, Chatterjee & Co. Ltd. Calcutta, 1932 and 1935. Reprint, Asiatic Society, 1996.

—— 'Varying Valency of Gold with respect to Mercaptanic Radicals', JICS, 1, 1924, pp. 63-73.

—— 'On the Variability of Valency', JICS, 4, 1927, pp. 89-95.

—— 'The Shakespearean Puzzle – Endevours after its solution', CR 73, 74, 75, 76, 77, 78, 1939-1941.

Sengupta, J.C. : P.C. Ray, National Book Trust of India, New Delhi, 1972.

JICS : 'Obituary', JICS 21, 1944, pp. 253-260.

---

* JICS-এ প্রকাশিত আরো কিছু প্রবন্ধ দেখার সুযোগ ঘটেছিল লেখকের, কিন্তু এখানে উল্লেখ করা গেল না। আগ্রহী পাঠকগণ ওই জার্নাল দেখতে পারেন।

নির্ঘন্ট

জ

ট

ড

ঢ

ত

থ

দ

র

ল

শ

স

হ

ক্ষ